অলৌকিক রহস্য।

তৃতীয় বর্ষ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত।

প্রকাশক,

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

ইউনিভার্সেল লাইব্রেরী,

৫৬৷১ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

সূচীপত্র।

তৃতীয় বর্ষ।

অলৌকিক রহস্য।

১ম সংখ্যা] তৃতীয় বর্ষ। [শ্রাবণ, ১৩[illegible]

নিবেদন।

নানা দৈবদুর্ব্বিপাকে এবং কতকটা কর্ম্মদোষেও বটে, সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট আমি অপরাধী হইয়াছি। তাঁহাদের ক্ষতিরও কারণ হইয়াছি। সম্পাদকত্বের অনুপযোগিতাহেতু প্রবন্ধের বিষয়-নির্ব্বাচনে সকল সময়ে সম্যক সফলকাম হইয়াছি বলিয়া আমার মনে হয় না। উপযুক্ত লোকের হস্তে পরিচালনার ভার থাকিলেও যথাসময়ে পত্রিকা পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত হইতে পারে নাই। ইহার জন্য অসমর্থের যা কার্য্য,—আমি আন্তরিক দুঃখজ্ঞাপন করিতেছি। বিশেষতঃ যে পত্রিকা অতি অল্পসময়ের মধ্যে জন-সাধারণের প্রিয় ও গ্রাহ্য হইয়াছে, তাহার পরিচালনায় ত্রুটি বাস্তবিকই ক্ষোভের বিষয়। এখন হইতে আমি পত্রিকা-পরিচালনার ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিতেছি। প্রতিশ্রুত হইতে সাহসী নই,—তবে যথাসময়ে পত্রিকা প্রকাশিত করিতে চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না। শুধু আমি পাঠকবর্গের নিকটে সহানুভূতি ও ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

যে উদ্দেশ্যে এই পত্রিকার প্রচার, তাহা পূর্ব্বেই জ্ঞাপিত হইয়াছে। অনেকেই বলিতে পারেন, তাঁহাদের বলিবারও অধিকার আছে—আর্য্যাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশে এরূপ পত্রিকা-প্রকাশে কাহার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে? অনেক বিজ্ঞ সমালোচক একথা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছেন।

অনেকে প্রকাশ না করিলেও এইরূপ একটা প্রশ্ন স্বতঃই তাঁহাদের মনে উঠিবার সম্ভাবনা। বাস্তবিক যে জাতি এক সময়ে জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সমগ্র জগতের শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছেন, ধর্ম্মনিষ্ঠা যাঁহারা উত্তরাধিকারিত্বের ন্যায় সেই সুদূর অতীতকাল হইতে একায়ত্ত করিয়া আসিতেছেন, সেই আর্য্যজাতির বংশধরগণের সম্মুখে এরূপ কতকগুলা ভৌতিক গল্পপূর্ণ উপহার-পাত্র উপস্থিত করিবার প্রয়োজন কি? ইহাতে কাহার কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে? ইহাতে ত পাঠকবর্গের আধ্যাত্মিক ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই!

অনেকেই বলিতে পারেন, "বেদ-বেদান্তাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অনাদিকাল হইতে যে দেশের সার সম্পত্তি, স্মৃতি যাঁহাদের কার্য্যকলাপের উপর আজিও পর্য্যন্ত অব্যাহতভাবে আধিপত্য করিতেছে, ষড়্‌দর্শনের বিমলজ্যোতি আজিও পর্য্যন্ত যাঁহাদিগের প্রজ্ঞাচক্ষু বিস্ফারিত রাখিয়াছে, তাঁহাদের চক্ষুপলকের উপর কতকগুলা অশরীরীর করস্পর্শ করাইয়া নিদ্রিতের প্রবোধনের একটা বিকট অভিনয় দেখাইবার আয়োজন কেন? যে দেশে তাহাদের শরীরী সঙ্গী আছে, ভূত-প্রেতগুলাকে সেই দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা হউক। আমরা আর্য্য-সন্তান—সাম আমাদের গান, ব্রহ্ম আমাদের ধ্যান, প্রেম আমাদের প্রাণ, লৌকিক মহত্ত্বে আমরা চিরমহান্—আমাদের কাছে আর অলৌকিকের রহস্যোদ্ঘাটন রূপ বিড়ম্বনার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।"

"যেখানে জাতির মস্তিষ্কাশ্রয়ী ভূতাপসারণ করিবার জন্য মাঝে মাঝে ভগবানকে শরীর ধরিয়া অবতীর্ণ হইতে হয়, বাস্তবিকই সেদেশে এরূপ ধরণের পত্রিকা-প্রকাশের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিতে পারে না। বঙ্গদেশে আজিকালি নানা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিকপত্র বাহির হইতেছে। সেগুলিই জাতিকে প্রবুদ্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট।" এরূপ প্রশ্ন

অনেকেরই মনে উদিত হইবার সম্ভাবনা। কেহ এ প্রশ্ন করিলে, তাহার যথাযথ উত্তর দেওয়াও দুরূহ। পত্রিকা-প্রকাশের পূর্ব্বে আমারও মনে ঐরূপ প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল। আমার মনে হইয়াছিল, সাধারণকে ধর্ম্মপথে চালিত করিবার জন্য যে সকল পুস্তকাদি সাধারণ্যে প্রচারিত হইতেছে, কার্য্যসিদ্ধির পক্ষে সেই সকলই যথেষ্ট।

এ সমস্ত জানিয়াও আমি এই পত্রিকা সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি। পত্রিকা প্রকাশের স্বল্পদিন পরেই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমাদের দেশে এখন এরূপ ধরণের পত্রিকারও প্রয়োজন আছে। ইংরাজী শিক্ষার ফলে জড়বাদ আমাদের উপরে যথেষ্ট আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। প্রেতাদি জীবের অস্তিত্বে এখন অনেকেরই বিশ্বাস নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের ত কথাই নাই, এ অবিশ্বাস এখন অনেক শাস্ত্র-ব্যবসায়ীকেও আশ্রয় করিয়াছে।

নিজের প্রয়োজনমত শাস্ত্রাংশ বাছিয়া লইয়া বিশ্বাস করিলে চলিবে না। সনাতনধর্ম্মে আস্থা আনিতে হইলে শাস্ত্রের সকল অংশেই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে হইবে। শাস্ত্র যেমন আমাদিগকে ত্যাগ-শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে মুক্তির অধিকারী হইবার প্রয়াসী করিয়াছে, সেইরূপ কর্ম্মের ফলাফল আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া আমাদিগকে সৎকর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত ও অসৎ কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছে। একটা ছাড়িয়া একটা ধরিলে কার্য্য বিজ্ঞানানুমোদিত হইবে না। ঋষিগণ শাস্ত্রে যে সমস্ত তত্ত্বকথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা লোক ভুলাইবার ছল নহে, বহুকালব্যাপী তত্ত্বানুসন্ধানের ফল।

পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞান যে উপায়ে পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, চিদ্বিজ্ঞানে এখন আমাদিগকেও অনেকটা সেই উপায় অবলম্বন

করিতে হইবে। ঋষিবাক্যে অন্ধবিশ্বাস করিতে বলা এখন সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত নহে। তবে সমীক্ষায় সেই সকল বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহাতে অবিশ্বাস করাও মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে।

গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তেমনসাস্মরণ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল সংযত রাখিয়া কেবল মনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে লোভ রাখিয়া এতকাল শুধু আমরা আত্মপ্রতারণা করিয়া আসিতেছি। কোন কার্য্য করিতে পারিব না, অথচ কেহ কোন কার্য্য করিয়া তাহার ফল প্রত্যক্ষ করিলে, তাহাতে অবিশ্বাস করিয়া পরিশ্রমের দায় হইতে নিষ্কৃতি লইব, এরূপভাবে আত্মপ্রতারণায় আমরা আমাদিগকে যথেষ্ট সঙ্কুচিত করিয়াছি। আর করিলে চলিবে না।

সনাতনধর্ম্মী বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি, কিন্তু কার্য্যতঃ অনেক জড়বাদী মনীষী নিজেদের অজ্ঞাতসারে ঋষি-নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতেছেন। তাঁহাদের একদিন সত্যোপলব্ধির আশা আছে, কিন্তু মিথ্যাচার-রত আমাদিগের কোনও কালে সে প্রত্যাশা নাই।

সার অলিভার লজ, সার উইলিয়ম ক্রুক প্রভৃতি পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ এখন জড়বিজ্ঞান-সীমান্তের এই সত্যের আভাষ উপলব্ধি করিতেছেন, আর আমরা বেদান্ত-উপনিষদাদির উপদেশামৃত আকণ্ঠ পান করিয়াও সন্দেহ-দোলায় দুলিতেছি, মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া রহিয়াছি; কিন্তু এরূপ থাকিলে আর চলিবে না। মুখে কতকগুলা শাস্ত্রকথা বলিয়া বৃথা বাক্যাড়ম্বরের কাল গিয়াছে। সনাতনধর্ম্মের সত্যতা-সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সাধুর সাক্ষ্যে আমরা আজ গৃহের দিকে মুখ

ফিরাইতেছি, শাস্ত্রব্যবসায়ীর করুণ ক্রন্দন আমাদিগকে মৃত্যুর পথ হইতে ফিরাইতে পারে নাই।

সমগ্র জগৎ শিক্ষার জন্য আমাদের মুখপানে চাহিয়া আছে। আজিকার অবিশ্বাসী হিন্দুসন্তানকে কাল সনাতনধর্ম্মে সমগ্র জগদ্বাসীর বিশ্বাস আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সুতরাং একার্য্যে আমাদিগের সাধ্যানুযায়ী সাহায্য কর্ত্তব্য। মহতী শক্তির অধিকারী আপনাদিগকে সত্যের প্রভায় আলোকিত করিতে প্রভাকরের প্রভা উন্মুক্ত করুন, ক্ষুদ্রশক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্র দীপালোকে অন্ধকারের ক্ষুদ্রাংশও দূরীভূত করিতে যত্নবান্ হউন!

স্বল্পশক্তি আমরা তাই এই ক্ষুদ্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার যতদিন অস্তিত্বের প্রয়োজন হইবে, ততদিন ইহা থাকিবে। প্রয়োজনাভাবে ইহা আপনিই অন্তর্হিত হইবে, কাহাকেও ইহার দূরীকরণের প্রয়াস পাইতে হইবে না। অনাত্মবাদী সনাতনধর্ম্মীর যজ্ঞ শিবহীন। শিবহীন যজ্ঞে ভূতপ্রেতাদিরই উৎপাত হইয়া থাকে। অলমতি বিস্তরেণ।

অন্তর্দ্ধান।

এই ঘটনা মিষ্টার এচ, জি, বেল্ তাঁহার "ওবিয়া" (Obeah) নামক পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন, তথা হইতে ডাক্তার ক্যাসিকানারাই পুনরায় নিজ গ্রন্থে ইহার প্রচার করেন। একজন রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজক ইহার বক্তা। এইসকল কারণে এই ঘটনাটি অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় নাই। মন্ত্রবিদ্যা ও ওঝাঘটিত ব্যাপারে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাস খৃষ্টিয় ধর্ম্মযাজকদের মুখ্য লক্ষণ,

এরূপ শত্রুপক্ষের উক্তি সত্য ব্যতীত কথনও সম্ভবে না, একারণেও আমরা ঘটনাটিতে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"আমি একজন ধর্ম্মযাজক, ট্রিনিডাডে (Trinidad) থাকিতাম, তথাকার আর্কবিসপ আমাকে নগরের মধ্যস্থল হইতে মফঃস্বলে কোন একটি পল্লীতে যাইতে আদেশ দেন। এই পল্লীতে কোন গির্জাঘর নাই। যে পর্য্যন্ত না গির্জাঘর হয়, ততদিন আমাকে একটি কাষ্ঠের ঘরে থাকিবার স্থান করিয়া লইতে হইল, এই কাষ্ঠের ঘরের দুইটি মাত্র কুঠারী। একটিতে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নিজ কন্যাসহ বাস করেন, অপরটি আমার জন্য দেওয়া হইল। এই বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে পল্লির লোকে অতিশয় ভয় করিত, ইহার অনেক প্রকার মন্দ করিবার শক্তি থাকা লোকে স্বীকার করিত লোকে মনে করিল যে ইহার বাটীর নিকটে গির্জাঘর হইলে বৃদ্ধার অনেক ভাল হইবে, তাহার মন্দ স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আমি উক্ত ঘরে যাইলে বৃদ্ধা তাহার ঘর আমাকে দেখাইল, বৃদ্ধার ঘরে অনেক আসবাব রহিয়াছে দেখিলাম। একটি প্রকাণ্ড খাট ও তাহার নিকটে একটি বৃহৎ আলমারি ও অন্যান্য নানা প্রকার দ্রব্যে বৃদ্ধার ঘর পূর্ণ। বৃদ্ধার ঘরে দুইটি ক্ষুদ্র জানালা এবং বাহির হইবার দ্বার আমার ঘরের দিকে, অর্থাৎ বাহিরে যাইতে হইলে আমার ঘরের মধ্য দিয়া না যাইলে আর উপায় নাই।

রাত্রে শয়ন করিয়াছি, বৃদ্ধার ঘরে এক প্রকার একঘেয়ে মন্ত্রপাঠ করার মত শব্দ পাইতে লাগিলাম, অনেকবার আমার ইচ্ছা হইল বৃদ্ধাকে থামিতে বলি, কিন্তু শেষে যেন ঘুম পাড়াইবার ছড়ার মত হওয়ায় ঐ শব্দ শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রাতে উঠিয়া কাপড় পড়িয়া বসিয়া আছি, পার্শ্বের ঘরে কোন শব্দ পাই না, উঠিয়া বেশ করিয়া কান পাতিয়া রহিলাম, ভিতরে লোক থাকায়

কোন শব্দ পাওয়া গেল না, ভিতরে কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে মনে হইতে লাগিল। রাত্রে বৃদ্ধার ঘরের বাহির হইবার কপাটের উপর একখানি চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা কেহ নাড়ে নাই, যেমন ভাবে ছিল সেইরূপই আছে দেখিতেছি, তখন বৃদ্ধার বাহিরে যাইবারও সম্ভাবনা নাই। তাহার কপাট দুই চারিবার ঠেলিয়াও কোন উত্তর পাইলাম না। পরে আমি আর থাকিতে না পারিয়া ঠেলিয়া কপাট খুলিয়া ফেলিলাম, যাহা দেখিলাম তাহাতে ঘোর বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িলাম। বৃদ্ধার ঘর একেবারে খালি; খাট, আলমারি প্রভৃতি আসবাবপত্র কিছুই নাই, জনমানব নাই—ঘরটি যেন কেহ ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছে বোধ হইল। ঘরের ভিতর বিশেষ করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, ক্ষুদ্র দুইটি জানালা ও আমার ঘরের ভিতরের দ্বার ব্যতীত অন্য কোন গবাক্ষ বা দ্বার নাই।

সেই অবধি আমি ঐ বৃদ্ধা বা তাহার কন্যাকে ঐ গ্রামে বা নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে বা পল্লীতে দেখি নাই, অন্য লোকেও উহাদের সংবাদ পায় নাই। কিরূপে যে এই সকল খাট আলমারি অন্তর্দ্ধান হইল ও তাহারা কোথায় গেল, আজ পর্য্যন্ত আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। কোন লোক একা এই আলমারি কখনও নাড়িতে পারিবে না, এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোক নিজে নাড়িতে পারে ধরিয়া লইলেও আমার ঘরের মধ্য দিয়া না হইলে তাহা বাহির করিবার উপায় ছিল না, আর উহা বাহির করিবার সময় নিশ্চয়ই আমায় নিদ্রাভঙ্গ হইত।”

অবিরোধে শূন্যপথে ভ্রমণশক্তি তন্ত্রশাস্ত্রমতে জীব সাধন দ্বারা লাভ করিতে পারে, না হয় ধরা গেল যে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির মন্ত্রবলে এই কার্য্য করিবার শক্তি ছিল, কিন্তু কাষ্ঠের বৃহৎ দ্রব্যাদি কিরূপে অদৃশ্যভাবে স্থানান্তরিত হইল! নিশ্চয়ই বৃদ্ধার পিশাচ বা কোন এলিমেণ্ট্যাল (Elemental) বশীভূত ছিল, তাহার সাহায্য ব্যতীত

একা বৃদ্ধার দ্বারা এরূপ কার্য্য হওয়া অসাধ্য। একবার সালকিয়া অঞ্চলে একটি হিন্দুস্থানী লোক আসিয়াছিল, সে ব্যক্তি ভৈরোঁ নামক পিশাচ-সিদ্ধ ছিল বলিয়া প্রকাশ করিত এবং ইহার সাহায্যে আমার পরিচিত অনেকের বাটীতে দূর হইতে ফল, পুষ্প ও মিষ্টান্ন আনিয়া সমাগত লোকদের আপ্যায়িত করিয়াছিল।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

অপূর্ণ বাসনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বাল্য বন্ধু।

ব্রিষ্টল নগরের পাদরি রেভারেণ্ড আর্থার বেলামি ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে লিখিয়াছেন ঃ—

যখন আমার স্ত্রী স্কুলে পড়িতেন, তখন এক সমপাঠিনী বালিকার সহিত তিনি এই প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হন যে, তাঁহাদের মধ্যে যাহার অগ্রে মৃত্যু হইবে, তিনি (যদি সম্ভব হয়) আসিয়া বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন। এ কথা আমার স্ত্রীর মনেই ছিল না এবং অনেক কাল তিনি উক্ত বন্ধুর কোন সংবাদ রাখেন নাই। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে একদিন তিনি সংবাদ পাইলেন তাঁহার বন্ধু মারা গিয়াছে। ইহাতে তিনি একটু চঞ্চল হইয়া ঐ অঙ্গীকার-বৃত্তান্ত আমাকে জ্ঞাপন করিলেন। আমি অবশ্য ঐ স্ত্রীলোককে কখনও দেখি নাই এবং তাঁহার কোন বর্ণনাও শুনি নাই।

এই ঘটনার ২।১ দিন পরে (অর্থাৎ স্ত্রীলোকটির মৃত্যুর প্রায় ১৫ দিন পরে) এক রাত্রিতে আমি নিদ্রা যাইতেছিলাম। স্ত্রীও ঐ ঘরে

নিদ্রিত ছিলেন। একটি উজ্জ্বল বাতি জ্বলিতেছিল। হঠাৎ আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখি, স্ত্রীর শয্যার পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। তাঁহার আপাদমস্তক তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলাম। চেহারাটি এত স্পষ্টরূপে ও মনোযোগের সহিত দেখিয়াছিলাম যে, এখনও তাহার প্রত্যেক অংশ আমার স্মরণ আছে। যদি তৎকালে আমার নিকট একখণ্ড কাগজ ও তুলি থাকিত, আমি তাঁহার ছবি তুলিয়া লইতে পারিতাম। তাঁহার সুন্দর কেশবিন্যাসের প্রতিই আমার চিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হইয়াছিল। এরূপ সুবিন্যস্ত কেশ আমি আর কোথায় দেখি নাই—প্রত্যেক চুলটি যথাস্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, একটিও এদিক্-ওদিক্ হয় নাই। কতক্ষণ আমি এই মূর্ত্তিটি দেখিতেছিলাম ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু ক্রমশঃ উহা অদৃশ্য হইল। তখন আমার মনে হইল হয়ত ইহা আমার চক্ষুর ভ্রান্তি, হয়ত আমার স্ত্রীর বস্ত্রের উপর আলো পড়িয়া এইরূপ ঘটিয়াছে। ইহা ভাবিয়া উঠিলাম। নিদ্রিতা স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে গিয়া সেই স্থানটা পরীক্ষা করিলাম। দেখিলাম তথায় বস্ত্রাদি কিছুই নাই। তখন বিশ্বাস হইল, প্রকৃতই আমি কোন প্রেতমূর্ত্তি দেখিয়াছি।

কয়েক ঘণ্টা পরে স্ত্রীর নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্তটি বলিলাম। চেহারার বর্ণনা শুনিবামাত্র তিনি বলিলেন, "ইহা নিশ্চয়ই আমার সহপাঠিনীর প্রেতমূর্ত্তি।" আমি বলিলাম, "আচ্ছা তাঁহার চেহারাতে কোন বিশেষত্ব ছিল কি?" তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন "হাঁ তাঁহার কেশের পরিপাট্য। তিনি সর্ব্বদা কেশ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন, এইজন্য আমরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতাম।"

উদ্দেশ্যহীন আবির্ভাব।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, প্রেতগণ কোন বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য আবির্ভূত হন না, অথবা তাঁহাদের কি উদ্দেশ্য আছে,

তাহা বুঝা যায় না। এরূপ স্থলে প্রায়ই দেখা যায় যে, যে বাটী, যে গৃহ অথবা যে স্থানটি তাঁহাদের অতিশয় প্রিয় ছিল, পরলোকে গিয়াও তাঁহারা সেগুলি ভুলিতে পারেন না, মধ্যে মধ্যে তথায় আসিয়া বাস করেন। এইরূপ কয়েকটি ঘটনা আমরা এই অধ্যায়ে বিবৃত করিব।

প্রেতের ছায়া।

সৈন্যবিভাগের কর্ম্মচারী চার্লস্ লেট্ সাহেব নব্য দক্ষিণ ওয়েল্সের (New South Wales) অধিবাসী। তিনি ১৮৮৫, ৩রা ডিসেম্বর তারিখে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই :—

১৮৭৩ খৃঃ অব্দের ৫ই এপ্রিল আমার শ্বশুর কাপ্তেন টাউন্স এই স্থানেই মারা যান। মৃত্যুর প্রায় দেড় মাস পরে একদিন রাত্রি নয়টার সময় কোন প্রয়োজনবশতঃ আমার স্ত্রী একটি শয়নাগারে প্রবেশ করেন। তাঁহার সহিত বার্থন নামে এক যুবতী ছিল। ঐ ঘরে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছিল। তাঁহারা প্রবেশ করিয়াই দেখেন যে, পালিস্‌করা আল্‌মারির উপর কাপ্তেনের প্রতিফলিত ছবি (reflected image) পতিত হইয়াছে। প্রথমে তাঁহাদের মনে হইল যে, হয়ত বিপরীত দেয়ালে তাঁহার কোন ফটো আছে এবং আলমারির উপর ঐ ফটোরই একটা ছায়া (reflection) পড়িয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া ঘরে কোন ফটো কিংবা ছবি পাওয়া গেল না, তথাপি ঐ ছায়াটি স্পষ্ট দেখিতে লাগিলেন। ছায়াটির বিশেষত্ব এই যে, উহা একটি অর্দ্ধ ছায়া—মস্তক হইতে কটিদেশ পর্য্যন্ত ছিল, নিম্নার্দ্ধ আদৌ ছিল না। কাপ্তেনের মুখ মলিন ও রক্তশূন্য এবং গাত্রে একটি ধূসর বর্ণের ফ্লানেল জামা।

তাঁহারা বিস্মিত ও ভীত হইয়া ইহা দেখিতেছেন, এমন সময়ে ঐ ঘরে আমার স্ত্রীর ভগিনী প্রবেশ করিলেন। আলমারির দিকে

তাঁহার চক্ষু যাইবামাত্র তিনি সভয়ে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ঐ বাবা দাঁড়াইয়া আছেন! তোমরা কি দেখিতে পাইয়াছ?" এই সময়ে একজন দাসী নীচে যাইতেছিল। তাহার পদশব্দ শুনিয়া তাহাকে উচ্চস্বরে ডাকা হইল। ঘরে প্রবেশ করিলে, স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে, তুই কিছু দেখিতেছিস্ কি?" সে বলিল, "হাঁ মা! কর্ত্তা!" গ্রাহাম্ নামে শ্বশুরের এক প্রাচীন ভৃত্য ছিল। তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল। তাহাকে কিছুই বলিতে হইল না। প্রবেশ করিয়াই সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ভগবান্ রক্ষা করুন! ঐ যে কাপ্তেন্!" অতঃপর বাটীর অন্যান্য চাকর-চাকরাণী প্রভৃতিকে ডাকা হইল। সকলেই দেখিতে পাইল। পরিশেষে আমার শাশুড়ী আসিয়া হাত বাড়াইয়া উহা ধরিতে গেলেন। তিনি যেমন আল্‌মারির উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন, অমনই ঐ ছায়াটি ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সকলে ঐ ঘরে বসিয়া রহিলেন, কিন্তু উহা আর দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি ঘটনা-সময়ে বাটীতেই ছিলাম্ এবং আমাকে ডাকাও হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় উহা আমি আদৌ শুনিতে পাই নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

সংযম।

দুইটী সত্য ঘটনার সংমিশ্রণে।

সন্ধ্যার শ্যামছায়া যখন ধীরে ধীরে ও নিঃশব্দে প্রকৃতির উজ্জলতাকে ম্লান করিয়া আপন আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, তখন আমাদের নৌকা গোপালগঞ্জের মোড় ছাড়াইয়া অনুকূল বায়ু-ভরে তীর-বেগে বরুণার দিকে অগ্রসর হইতেছিল।

কুললক্ষ্মীগণ যখন শঙ্খধ্বনির সহিত দিবসের মুখরিত কোলাহলকে বিদায় দিতেছিল ও নিম্নের গ্রাম-ভরা প্রদীপের সহিত উপরের আকাশ-ভরা তারার মালা ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেই সঙ্গে ক্ষণেকের তরে আমাদের মনোরাজ্যেও একটা স্নিগ্ধ শান্তি আসিয়া চাঞ্চল্যের উপর আপনার প্রভাব বিস্তার করিতেছিল ; এই অবসরে আমরাও নদীবক্ষে সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া লইলাম। এই দিবাযামিনীর, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে কিয়ৎক্ষণের জন্য সংসার ও জগৎ ভুলিয়া আপনাতে আপনি আত্মহারা হইয়া বিশ্ব-পতির ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম। নৌকা যখন বরুণার বাজারঘাটে আসিয়া লাগিল, তখন রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড অতীত হইয়াছে। ম্লান চন্দ্রালোকে গ্রামখানিকে সুদূর অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতির ন্যায় আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত করিতেছিল। গ্রামখানি এক সময়ে বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ছিল, এখন ম্যালেরিয়া, দারিদ্র ও জমিদারবাবুদের বর্ত্তমান দুরবস্থার জন্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। গঞ্জ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে ব্যবসা বন্ধ হইয়া যাইতেছে, তবে অতীত ঐশ্বর্য্যের চিহ্ন এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান। দূরে জমিদারদের জ্যোৎস্না-ধৌত বিশাল পতনোন্মুখ অট্টালিকা যেন প্রেতযোনির ন্যায় বর্ত্তমান অবস্থাকে তাচ্ছল্য করিয়া উপহাসের হাসি হাসিতেছিল। ঘাটে বিস্তর লোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতে-

ছিলেন। আমি ও গুরুজী নৌকা হইতে নামিবামাত্র, গুরুজীর অন্ত-তম শিষ্য রামকালীবাবু আসিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। দেখাদেখি কেহ বা ভক্তিভরে, কেহ বা লৌকিকতা হেতু পদধূলি গ্রহণ করিল বা শুদ্ধ প্রণাম করিল।

পল্লীগ্রামে এখন একটী নূতন ঘটনা ঘটিলে বা কোন নূতন লোক আসিলে হুলস্থুল পড়িয়া যায় ও প্রায় গ্রামশুদ্ধ লোকে তাহার সুখ-দুঃখের অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং একজন সাধু আসিয়াছেন বলিয়া প্রায় সকলেই আমাদের আগমন-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন। যথা-বিহিত কুশলাদি সম্ভাষণের পর, তাঁহারা আমাদের লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে বালক-বালিকাদের ঔৎসুক্যপূর্ণ সকৌতুক চাহনি ও বাতায়নস্থিত গৃহলক্ষ্মীগণের ভক্তিপূর্ণ সলজ্জ দৃষ্টির মধ্য দিয়া আমরা গন্তব্য স্থানে উপনীত হইলাম। রামকালীবাবুর গৃহ অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র বলিয়া ও বহুলোক সমাগমের আশঙ্কা করিয়া বাবুদের দ্বিতলের বৈঠকখানায় আমাদের বিশ্রামস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

যদিও বাটীটি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, উদ্যান জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে ও নানা 'সরিকে' বিভক্ত হওয়ায় তাহাদের অবস্থা হীনতম হইয়াছে, তথাপি দু'এক জনের অবস্থা কিয়ৎপরিমাণে উন্নত থাকায় বহুকষ্টে বৈঠকখানাটিকে, প্রাচীন সাজসজ্জা দ্বারা সজ্জিত রাখা হইয়াছে। মানুষের অদৃষ্ট-চক্রের পরিবর্ত্তনের সময়ে যখন লক্ষ্মীদেবী বিশেষ চঞ্চলা হইয়া উঠেন, তখন প্রায় খোলাখুলিভাবে বলিয়া ফেলেন যে, বাপু রে আমাকে ছাড়,—নয়, তোমরা চালচলন ছাড়। অন্তঃসার-শূন্য মানব কিন্তু তখন ভিতর হারাইয়া বহু দিনের সঙ্গী বাহিরের মান-সম্ভ্রম ও চটককে দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে; কাজেই লক্ষ্মী ঠাকুরুণকেও স্বস্থানে প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে হয়।

আমরা সদলবলে বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম; জমীদার

কামিনীবাবু ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক করজোড়ে আবাহন করিলেন। বৃদ্ধ চাটুর্য্যে মশায় বলিলেন, "এ খাসা ঘর এখানে কোন অসুবিধা হবে না।"

বসুজা মহাশয় "সে আর বল্‌তে একেবারে ইন্দ্রপুরী।

গাঙ্গুলী। "এ রকম আর এ তল্লাটে নাই। আমিই ত এই স্থানটা মনোনীত করিয়াছি।"

দত্তজা। হবে না কেন?

সকলে বলিলেন, "পুণ্যের সংসার বলে স্বর্গীয় কর্ত্তারা প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন, এখন তাঁহাদের নাম করিলে দিন সুখে কাটে। গুরুজী কিন্তু সেই সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়াই একটু থতমত খাইয়া গেলেন, তাঁহার সর্ব্বশরীর যেন এক বৈদ্যুতিক তরঙ্গে কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু যদিও মুহূর্ত্তমধ্যে সকলের অগোচরে সে ভাব সামলাইয়া লইলেন, তথাপি আমি উহা বেশ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তার পরই একটু পিছাইয়া আসিলে ঠিক যেন কোনও অদৃশ্য হস্ত তাঁর মনোময় দেহকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল। গৃহ হইতে ত্বরিতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বলিলেন, "রামকালী চল তোমার গৃহে যাই, সেখানেই রাত্রিযাপন করিব।" সকলে একটু উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন—কেন—এখানে কোন অসুবিধা হইবে না।"

কামিনীবাবু যেন একটু ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া করজোড়ে বলিলেন,—"প্রভু কোন ত অপরাধ করি নাই, তবে কেন এ স্থান ত্যাগ করিতেছেন।" গুরুজী সহাস্যে কামিনীবাবুকে বলিলেন, "না না ওরূপ কিছু মনে করিবেন না। লাল কাপড় পরিয়া অবধি বিলাস-বাসনা ত্যাগ করিয়াছি, আমাদের পক্ষে বৃক্ষতলই যথেষ্ট; অন্ততঃপক্ষে পর্ণকুটীরই উচিত; এ সজ্জিত গৃহে অবস্থান আমাদের শ্রেয়ঃ নহে। নতুবা আপনারা আমার ন্যায় সামান্য লোকের জন্য যে আদর-অভ্যর্থনা

করিতেছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ ও আপনাদের শত ধন্যবাদ; আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না, সেজন্য মার্জ্জনা করিবেন।"

. সকলে। "সে কি কথা, সে কি কথা,—আপনার যেখানে অভিরুচি, যেখানে স্বাচ্ছন্দ হইবে সেইখানেই অবস্থিতি করিবেন।"

অগত্যা রামকালীবাবুর বাড়িতেই যাওয়া স্থির হইল; পথে যাইতে যাইতে সকলে একটু অগ্রসর হইলে গুরুজী সস্নেহে আমার পিঠে হাত দিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "বিজয়! তুমি একটু বিস্মিত হয়েছ না?—দেখ ওটী মহাপাপের গৃহ, ওখানে যে কত দুষ্কার্য্য হয়েছে তার আর ইয়ত্তা নাই। এখনও সকল পৈশাচিক কার্য্য ও আর্ত্তের কাতর-প্রার্থনাগুলি যেন চিত্রের ন্যায় মূর্ত্তিমান হইয়া গৃহমধ্যে বিচরণ করিতেছে। একটী যুবতী যেন তার অমূল্য ধন সতীত্ব রক্ষার্থ ছুটিয়া আসিয়া ব্যাকুল চীৎকারে সাহায্য চাহিল। তারপর যেন বিফল আশায় ব্যথিত হইয়া, দিশাহারা হইয়া শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। পরে হঠাৎ রুদ্ধ আবেগে আরক্তিম হইয়া আপন বক্ষে ছুরি বসাইয়া সকল জ্বালার শেষ করিল" একটু চুপ করিয়া পুনরায় বলিলেন,—"এখনও যেন সত্য বলিয়া ভ্রম হচ্ছে, এখনও যেন সেই ব্যাকুল প্রার্থনা ও রক্তস্রোত আমাকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতেছে—যদিও কল্পিত দৃশ্য কিন্তু সহ্য করিতে পারিলাম না, ছুটিয়া বাহির হইলাম। আবার একটু থাকিয়া থামিয়া পুনরায় বলিলেন, "দেখ স্ত্রীলোকটী যেন বহু পরিচিত বলে বোধ হল;—হতে পারে; কিম্বা কোন সৌসাদৃশ্য জন্য হয় ত এ ভ্রমের উৎপত্তি—আচ্ছা তুমিও কি কিছুই বুঝিতে পার নাই?" আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "থাক্ ওসব মায়াবিক ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু দরকার নেই।"

এখানেও অনেক লোক জমিল, তবে তাহাদের মধ্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসু বা ভক্তিপিপাসুর সংখ্যা অতি বিরল; সাধারণতঃ তারা একটা নূতন জিনিস দেখ্‌তে এসেছে। কেহ বা হাত দেখাইতে ও ভবিষ্যৎ জানিতে, কেহ বা কঠিন রোগারোগ্যের কামনায়, কেহ বা কিছু একটা অলৌকিক দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিবার আশায় আসিয়াছে। সুতরাং সংযতবাক্ গুরুজীর দুএকটী শুষ্ক কথা তাঁহাদের ভাল লাগিল না। প্রথমে মৃদুস্বরে কথা কহিতে কহিতে বেশ গল্প জমিয়া উঠিল। বৃদ্ধ চাটুর্য্যে মশায়ই সভায় অধিনায়ক হইলেন, হুঁকা হাতে করিয়া কাসিতে কাসিতে বলিলেন, "আমরা গরীব লোক, আমাদের এ মেটে ঘরই ভাল।"

বসুজা। যা বলেছেন, এখানে আমরা হাত-পা ছড়িয়ে, প্রাণ খুলে দুটো মনের কথা বলতে পারব।

গাঙ্গুলি। তা নিশ্চয়, বড়লোকের কাছে কেমন কিন্তু-কিন্তু হয়ে থাক্‌তে হয়, আমি ঐ জন্যে ওখানটা আদপেই পছন্দ করি নাই।

চাটুয্যে। গুরুজীর যদিও অবশ্য একটু কষ্ট হবে, তবু কি ওঁরা ওখানে থাক্‌তে পারেন?

বসুজা। ও কি সাধুলোকের থাক্‌বার জায়গা, উনি দেখেই সরে এলেন।

গাঙ্গুলি। আমি ঐখানে থাক্‌বার কথা শুনে গোড়া থেকেই বিরক্ত হয়েছিলাম।

দত্তজা। পাপপুরী! পাপপুরী! আমাদেরই যেতে ইচ্ছে করে না, তা সাধু সন্ন্যাসীর!

চাটুর্য্যে। তা না হলে আর এদশা হবে কেন?

বসুজা কি ছিল আর কি হল!

পা। যেন দেখ্‌তে দেখ্‌তে উপে গেল!

দ। এক সময়ে দরজায় হাতী বাঁধা থাক্‌ত, আর এখন শেয়াল কুকুর চর্‌ছে।

চাটুর্য্যে মশায় তখন মুরুব্বি-আনা সুরে বল্‌লেন, "কেন এমন হলো তা জান ?"

ব। তা আর জানি না, কত লোকের সর্ব্বনাশ করেছে।

গা। আমাদের তের বিঘা ব্রহ্মত্তরই কেড়ে নিলে, দুর্দ্দশা আর হবে না !

দ। দরিদ্রের প্রাণে কষ্ট, মানীর মান নষ্ট, এতে কি আর রক্ষা থাকে ?

চা। তবে তোমরা আসল ব্যাপার কিছুই জান না দেখ্‌ছি ?

ব। জানি না ? জাল করে জগবন্ধু বোসের বিধবা স্ত্রীকে সর্ব্বস্বান্ত কর্‌লে।

পা। গুপী খুড়োর স্ত্রীকে কুলের বাহির করে শেষে তাড়িয়ে দিলে। পরে গঞ্জে গিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করে খেত। এসব পাপ যাবে কোথায় ?

দ। কালী সরকারকে সেই যে গুম্ কর্‌লে, তার আর কিনারা হ'ল না ! লোকে বলে যে মেরে ফেলেছে। পয়সার জোরে সব চাপা পড়্‌ল।

চাটুর্য্যে মশায় একটু বিদ্রূপের তীব্র হাসি হেসে বল্লেন, "তবে তোমরা কিছুই জান না দেখছি, আমি বলি তবে শুন"। অল্পবয়স্কেরা বলিল, "হাঁ হাঁ চাটুর্য্যে মশায়ই বলুন।" ফলকথা চাটুয্যে মশায় সর্ব্ব-তত্ত্ববিদ্ ও খুব মজলিসী লোক ছিলেন ও গল্প বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল ও এক কথায় তিনি যেন গ্রামের Encylopadea Britapica ছিলেন।

চাটুয্যে মশায় তখন বেশ করিয়া হুঁকাটী বাগাইয়া যথারীতি

ভূমিকার পর বলিতে লাগিলেন। "আমরা কর্ত্তাদের মুখে শুনেছি যে, ঘনশ্যামবাবু পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন, তিনিই এই জমিদারী স্থাপন করেন, কখন অতিথি বা প্রার্থী বিমুখ হইত না, যথার্থই প্রাতঃস্মরণীয় লোক ছিলেন। যেমন স্বামী, ভগবান তাঁর উপযুক্ত স্ত্রীও মিলাইয়া দিয়াছিলেন, গৃহে যেন তিনি মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণার মত বিরাজ করিতেন।

কিন্তু বিধাতার কি লীলা, অমন পিতামাতা হতে কিনা শ্যামচাঁদ বাবুর জন্ম! কর্ত্তা বর্ত্তমান থাক্‌তেই তাঁর কুকীর্ত্তির কথা লোকে জান্‌তে পেরেছিল, কিন্তু ততটা বাড়াবাড়ি হতে পারে নাই। কিন্তু কর্ত্তার ৺লাভের পর হতেই নিজমূর্ত্তি ধর্‌লেন; অত্যাচার, উৎপীড়ন, কুসঙ্গী ও বিলাসিতার দ্বারা দিন কাটাতে লাগালেন; কিন্তু তবু এতটা বাড়াবাড়ি হয় নাই। আর স্বর্গীয় কর্ত্তা-গিন্নির পুণ্যেই হউক, আর যাতেই হউক—বিষয় কিন্তু নষ্ট করেন নাই।

ব। নষ্ট ত করেন নাই, বরং কিছু বাড়িয়েছিলেন।

গা। অমন লাট চাকদারা তালুকখানা কিনেছিলেন।

দ। সেত এক রকম অমনই যোগাড় করেছিলেন।

চা। কিন্তু তাঁর পুত্র তারিণীবাবুর সময়ে এ সকল একেবারে চরমে উঠিল!

ব। চরম বলে চরম!

গা। লোকের ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম রাখা দায় হয়েছিল।

দ। তার ফলও হ'ল তেমনই, ওগো চারপো হলেই আপনি ফলে।

চা। সেসকল এখনও মনে পড়ে।

ব। সেত সেদিনকার কথা। আমি তখন স্কুলে পড়ি।

গা। আমার তখন পৈতে হয়েছে আর কি!

দ। আমার ঠাকুরের কাল হবার কিছু পরেই এসব ঘটে আর কি?

চাটুয্যে মশায় একটু বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "ওহে বাপু এ রকম রসভঙ্গ করলে গল্প হয় না, যদি শুন্‌তে হয় ত শুন।" সকলে থামিলে চাটুয্যে মশায় বল্‌তে আরম্ভ করলেন "তারিণীবাবুর আমলেই এঁদের নাম নবাববাবু হয়, সে বড় মজার কথা, অসাবধানতায় চাকরে একটা ঝাড়ের কলম ভাঙ্গিয়া ফেলে, বাবু নেশার ঝোঁকে বল্‌লেন, "কিরে কিসের শব্দ রে"। চাকরে সভয়ে বল্লে, "হজুর ঝাড়ের একটা কলম ভেঙ্গে গেছে"। বাবু শুনে বল্লেন, "বা বেশ ত শব্দ হ'ল, আচ্ছা ভাঙ্গ সব ভাঙ্গ—খাসা শব্দ শুনা যাবে"। চাকরেরা কি করে লাঠি দিয়ে বহু সহস্র টাকার সমস্ত ঝাড় টঙ টাঙ টুঙ টাঙ শব্দে ভাঙ্গতে লাগ্‌ল, বাবু শুনে মহা তারিপ করতে লাগিলেন! এই সব বাবুগিরি হতে এদের নাম নবাববাবু হয়।"

"কিন্তু 'অতি'র শেষ আছে, একদিন এক ঘটনাতে সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করেন। মরিচ গাঁয়ে নিধিরাম ভট্টাচার্য্য নামে এক পরম পণ্ডিত ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁর একটী মাত্র কন্যা ছিল, নাম যোগমায়া। মেয়েটী যেন ভারতচন্দ্রের বর্ণিত "রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী ছিল," আর মুখে একটী দেবভাব পরিস্ফুট ছিল, পথের পথিকেরা পর্য্যন্ত সে স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখিয়া চাহিয়া থাকিত।"

"এরূপ সুলক্ষণা একটীমাত্র কন্যাকে সুপাত্রে অর্পণ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন ও সেজন্য মেয়েটির সুশিক্ষার বন্দোবস্তের ত্রুটি করেন নাই, শেষে ভগবানের কৃপায় তেমনই সুপাত্রও জুটিয়াছিল, কালীপুরের বিশ্বনাথ তর্কালঙ্কারের একমাত্র পুত্র রামজীবনের সহিত বিবাহ হইল। পাত্রটী রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, মানে খুবই উৎকৃষ্ট ছিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় এরূপ পাত্রে কন্যা দিয়া শেষ

বয়সে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। একবৎসর বৈশাখী পূর্ণিমার সময় মরিচর্গা হইতে স্ত্রীলোকেরা যখন আমাদের এখানে নদী-স্নানে আসিতেছিল, যোগমায়া ও অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া পিতা-মাতার মত লইয়া তাহাদের সঙ্গিনী হইল। কিন্তু হতভাগিনীকে আর ফিরিতে হইল না, লোকের ভিড়ে ও গোলমালে একদল দস্যু আসিয়া ত্বরিতবেগে তাহাকে উধাও করিয়া লইয়া গেল। সঙ্গের স্ত্রীলোকেরা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল প্রতি বৎসরই প্রায় এইরূপ ঘটনা ঘটে এবং যদিও গোলযোগে অনেকে ব্যাপার কি বুঝিতে পারিল না, তথাপি দু'চারিজনে অনুসরণ করিয়াছিল ; কিন্তু দস্যুদের লাঠির চোটে তাহাদিগকে ফিরিতে হইল। অনেকে স্ত্রীলোকদিগকে সান্ত্বনা করিয়া পুলিসে খবর দিল, পুলিস প্রথমে কিছুই গ্রাহ্য করিল না, পরে অনেক অনুরোধ, জেদাজিদি ও কিছু প্রণামী দিবার পর জমাদার সাহেব সদলবলে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "যাবে আর কোথায়? কেউ নিয়ে গেছে, ফের পাওয়া যাবে।"

"চারিদিকে এ সংবাদে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, ব্যাপারটা সকলে বুঝিল, কিন্তু একে পুলিশ বশ ও তার উপর বড়লোক—ভয়ে কেহ কিছু করিতে পারিল না। আমাদের কাপুরুষ জাতি কোনরূপে নিজের প্রাণ বাঁচাইতে ব্যস্ত, অপরের ভাবনা লইয়া কেহ মাথা ঘামাইতে চায় না। আমি তখন গ্রামে ছিলাম না, তাহলে একবার সর্ব্বস্ব দিয়াও দেখিয়া লইতাম!"

বন্ধু। কি বলিব আমি তখন শয্যাগত, তা না হলে একবার এ অত্যাচারের শোধ তুলিতাম।

গা। আমি তাল ঠুকে এসেছিলাম, কিন্তু সকলেই পিছাইয়া পড়িল, একা কি করিব?

ন্দ। বাবা তখন মৃত্যুশয্যায়, তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত, নইলে কি সহজে ছাড়্তাম !

চা। স্ত্রীলোকেরা ফিরিয়া গিয়া বলিল, যোগমায়াকে নদীতে কুমীরে লইয়া গিয়াছে। একথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিছানা লইলেন ; কোথায় নয়নের মণি বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র কন্যা আনন্দ করিয়া স্নানে গিয়াছে, আর কোথায় এই বিনামেঘে বজ্রাঘাত, প্রাণপ্রতিম-কন্যার অপঘাত-মৃত্যু।

কিন্তু স্ত্রীলোকের পেটে কথা কখন চাপা থাকে না, বরদা পিসি যখন সালঙ্কারে ঘটনার বিবরণ দিতেছিলেন, শ্রোতাদিগের চক্ষু ও মুখগহ্বর অধিকতর বিস্তৃত ও গোলাকার হইয়া উঠিতেছিল, তখন ললিতা দিদি আস্তে আস্তে বলিলেন, "কাউকে বলিস নি ভাই, বড় খারাপ কথা, বড় ভয়ানক ব্যাপার !"

সকলে কি কি করিয়া মহাব্যস্ত হইয়া উঠিলে নিস্তারিণী মাথায় দিব্য দিয়া বলিল, "ওলো যে সে কুমীর নয়, মানুষ কুমীর লো মানুষ কুমীর ! নদীতে যাবে কেন, তারিণীবাবু ধরে নিয়ে গেছেন, দেখিস ভাই, যেন পেরকাশ না হয়, তোরা নেহাত আপনা আপনি তাই বল্লুম।" বামা শুনিয়া বলিল, "ধরে নিয়ে গেল, সে'ও কিছু বল্লে না, তোরাও কিছু বল্লি না।" বরদা পিসি গর্জ্জন করিয়া বলিল, "একটু আগে জানতে পারলে কি আর রক্ষে রাখতুম, পোড়ারমুখোদের ঝেঁটাপেটা করে ছাড়তুম।"

বামা। তা নয়লো তা নয় ! বোধ হয় সড় ছিল।

নিস্তা। আমারও তাই বোধ হয় বাপু, ছুঁড়িটার রকম-সকম কিন্তু ভাল ছিল না। রূপে গুণে যাহারা যোগমায়ার চেয়ে হীন ছিল, তাহারা সকলেই একবাক্যে নিস্তারিণীর কথার সমর্থন করিল।

কিন্তু এই কথাগুলি তার সঙ্গিনী ও সমবয়স্কাদের সহ্য হল না,

তারা তার রূপে, গুণে ও দেবদুর্লভ অমায়িকতায় মুগ্ধ ছিল, কাজেই মহা কোলাহলসহকারে তীব্র প্রতিবাদ করিল ও এরূপ যারা বলিতেছে তাদের মুখ নামক অঙ্গটি যে নীরোগ থাকিবে না, ও শরীরের স্থানে স্থানে শ্বেত বর্ণোৎপত্তির সম্ভাবনা, তাহাও বুঝাইয়া দিল আর জননীদের সন্তানেরাও যে চিরসুস্থ থাকৃবে এমন কোন আশাই দিল না। এই গোলযোগ না হইলে সমালোচনা যে কতক্ষণ চলিত তা বলা যায় না। ক্রমে এইরূপে সঠিক খবর প্রকারান্তরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সেই দেশপূজ্য দীপ্ত বৈশাখের তুল্য ব্রাহ্মণকে দেখিয়া দারোগা সাহেব একটু ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে সদলবলে তদন্তে চলিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত লোকও পশ্চাদনুগামী হইল। কিন্তু তাঁহারা যখন বরুণায় উপস্থিত হইলেন তখন বহু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে, আর বিধাতা পুরুষের অদৃশ্য অঙ্গুলিসঙ্কেতে এ অঙ্কের যবনিকা অন্য উপায়ে পতিত হইয়াছে।

তারিণীবাবু বহু আশায় যোগমায়াকে বন্দিনী করিয়া দেখিলেন যে, বুঝি তার সকল আশাই বিফল হয়। কিন্তু পাপিষ্ঠ তখনও হাল' ছাড়ে নাই, জানিত যে অনেক সতীই অবশেষে কষ্টে, নির্য্যাতনে বা প্রলোভনে তাঁহার কাছে সতীত্ব বিক্রয় করিয়াছে, এজন্য সে নির্য্যাতন বা প্রলোভনের কিছুমাত্র ত্রুটি করিল না।

একদিন স্নান করিয়া যোগমায়া মিষ্টমুখে বলিল যে, সে কিছু আহার করিবে, তবে ফলমূল আহার করিবে। তারিণীবাবু শুনিয়া মহা আহ্লাদিত, বুঝিল পেটের জ্বালা বড় জ্বালা, কত সহ্য করিবে। সাগ্রহে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াছিল, মনে মনে বলিল, অমন সতী ঢের ঢের দেখেছি, শেষে সকলেই এইরূপে নরম হয়েছে, যাবার সময়ে বোধ হয় সেই সদ্যস্নাত ফুল্ল পুষ্পের দিকে একবার অনিমেষ নয়নে চাহিয়াছিল।

কিছুতে নিষ্কৃতি বা মুক্তির আশা না দেখিয়া হতভাগিনী চরম উপায়ের কামনা করিল, বহু অশ্রুপাত ও প্রার্থনায় নারায়ণের দয়া না পাইয়া নিজেই প্রতীকারের সঙ্কল্প করিল। ফলমূল দূরে ফেলিয়া সে গুলি কুটিবার তীক্ষ্ণধার ছুরিকা লইয়া আপন বক্ষে আমূল বসাইয়া দিল। বন্দিনী-অবস্থায় ও মরণের কালে স্নেহময় পিতামাতা, সুখের সংসার, দেবতুল্য স্বামী, নবীন বয়স, নব অনুরাগ ও অতৃপ্ত পিপাসায় আকুল হইয়া মনে মনে কি ভাবিয়াছিল, কে বলিতে পারে? পাপিষ্ঠ মহা উৎফুল্ল হৃদয়ে আসিয়া দেখিল, তার সুখের ঘরে বজ্র পড়িয়াছে, সতী প্রাণ দিয়াছে, মান দেয় নাই! নরধামকে হয়ত স্বীকার করিতে হইল, প্রলোভনের সীমা আছে। সকলেরই মূল্য আছে, কিন্তু জগতে এমন দুর্ল্লভ জিনিষ আছে যা মূল্য দিয়া পাওয়া যায় না। ধূল্যবলুণ্ঠিতা, রক্তাক্তকলেবরা দেবীমূর্ত্তিকে দেখিয়া, সে হতভাগ্যের মন নৈরাশ্যে ব্যথিত, কি যাতনায় আকুল হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে? ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিরাশ হইয়া ক্রোধে জমীদার-বংশের প্রতি ও গ্রামস্থ লোকের প্রতি দারুণ অভিশাপ দিয়া গেলেন। তিনি যে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন, তাহার ফলে জমীদার-বংশের ও গ্রামের এই দুর্দ্দশা!

ইহার পরে তারিণীবাবু মকর্দ্দমায় হারিলেন ও একরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। একমাত্র উপযুক্ত পুত্রের অপঘাতে মৃত্যু হইল, স্ত্রী আত্মহত্যা করিলেন, শেষে ভয়েও যাতনায়, উৎকণ্ঠায় ও অনিদ্রায়, উন্মাদের ন্যায় হইয়া, বহু কষ্টভোগের পর ক্রমে তিন জনেই মৃত্যুর ক্রোড়ে স্থান পাইলেন। গুজব যে সরিকেরা মারিয়া ফেলিয়াছিল—হবে?

এখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কামিনীবাবু, কোন উপায়ে জমীদারের নাম রক্ষা করিতেছেন। বহুদিন পর্য্যন্ত লোকে বাবুদের বৈঠকখানায়

গভীর রাত্রে, অদৃশ্য মানবের দ্রুত পদশব্দ ও কাতর অস্ফুট রোদনের রুদ্ধ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইত।

নানা আকারে পল্লবিত হইয়া এ সংবাদ কাশীপুরে পৌঁছিবার পর তাহার স্বামী রামজীবন ত নিরুদ্দেশ হইল, কেহ বলে বিবাগী হইয়াছে, কেহ বলে যে নিষ্কণ্টক হইবার আশায় তারিণীবাবু লোকদ্বারা চিরকালের জন্য সরাইয়া দিয়াছেন, সত্য-মিথ্যা ভগবান জানেন।

শুনিয়া আমরা সকলেই ব্যথিত হইলাম; কাহারও কাহারও চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জলও বাহির হইল। গুরুজীর পূর্ব্বের কথা শুনিয়া আমি বিশেষভাবে শিহরিয়া উঠিলাম। গুরুদেব রাত্রিতে বলিলেন যে, তিনি প্রত্যুষেই চলিয়া যাইবেন। রামকালীর বিশ্বাস ছিল অন্ততঃ দু-একদিনও থাকিবেন, গুরুজীও যে এরূপ একটু-আধটু আশা না দিয়াছিলেন, এমন নয়, কিন্তু এই কথা শুনিয়া রামকালীবাবু কাতর হইয়া অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু গুরুদেব যাওয়াই স্থির করিলেন। অগত্যা আমরা প্রত্যুষেই যাত্রা করিলাম।

নৌকায় উঠিয়া গুরুদেব একবার স্থিরদৃষ্টিতে, বরুণার জমীদার-বাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহাকে যেন একটু কাতর ও তাঁহার চক্ষু যেন একটু সজল বোধ হইল; আমি বিস্মিত হইলাম, নিজেকে ও নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। একি হ'তে পারে? প্রশান্ত সাগর চঞ্চল! এ মহাপুরুষেরও উদ্বেগ আছে, সংযমীও কাতর হয়! যাঁহাকে বরাবর সহাস্য, প্রফুল্ল, প্রেমময় ও সন্তোষের মূর্ত্তিমান্ আদর্শ দেখে এসেছি, তাঁহার এই অবস্থা! কিয়ৎক্ষণ পরে গুরুদেব সস্নেহে বলিলেন, "বিজয়, বড় মুস্কিলে পড়েছ না? দেখ, মানুষকে কখন আদর্শ মনে ক'র না, দোষ দেখিয়া ঘৃণা বা গুণ দেখিয়া অন্ধভাবে ভক্তি করিও না। মানুষ চিরকালই মানুষ, তার

ভিতরের প্রবৃত্তি যাবে কোথায়? দেখ সংযম বড় শক্ত জিনিস; বহু সাধনা, বহু পুণ্যের ফল। সেইজন্য অর্জ্জুন বলেছিলেন:—

চঞ্চলম্ হি মনঃ কৃষ্ণ প্রসাথি বল বদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥

—এর এক মাত্র উপায় "বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে"।

কিন্তু তা, কয়জনের হয়, যার হয় সে ত দেবতা। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বলিলেন, "কাল ব্রাহ্মণ যা গল্প বলিয়াছিলেন তা এক বর্ণও মিথ্যা নয়—আমিই রামজীবন" বলিবার সময় যেন তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়াছিল। "এত দিন এক রুদ্ধ যাতনা বুকে পুষিয়া ঘুরিতাম, শক্তিময়ের আশ্রয়ে আসিয়াও ঠিক শান্তি পাই নাই। আজ হ'তে সে বোঝা নামিয়া গেল, প্রাণটা হালকা হইল, যেন পূর্ণ শান্তি পাইলাম। যোগমায়ার স্বামী বলিয়া আজ গর্ব্ব অনুভব করেছি, আমি ধন্য, আমার জন্ম, জীবন ও সাধনা ধন্য। বহু পুণ্যফলে অদৃষ্টে সতী লাভ হয়। এখন হ'তে বরুণা আমার তীর্থ।" এ সমস্ত শুনিয়া আমার অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। মূর্চ্ছিত হই নাই সত্য, কিন্তু একেবারে আত্মহারা হইয়াছিলাম। কতক্ষণ ঐ অবস্থায় ছিলাম তা' বল্‌তে পারি না। কিন্তু যখন চমক ভাঙ্গিল, তখন দেখি বেলা হইয়াছে, গুরুদেব নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রপাঠ করিতেছেন, আর এক জেলে তাহার ডিঙ্গীর উপর বসিয়া ত রঙ্গের তালে তলে তন্ময় হইয়া গাহিতেছে,

"আমায় পার করে দাও চিকণ কালা।"

ক্রমশঃ

শ্রীঅরূপ চাঁদ।

প্রত্যাবৃত্তের কথা।

আমি যখন শিলচর হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলাম, তখন একদা বন্ধের সময় কোন এক জাহাজে আরোহণ পূর্ব্বক ঢাকা যাত্রা করিয়াছিলাম। গমনকালে আমাদের জাহাজ কোন এক ষ্টেশনে উপনীত হইলে তথায় অনেক যাত্রী আমাদের জাহাজে আরোহণ করিয়াছিল। তন্মধ্যে তারকবাবু নামক একটি ভদ্রলোক ছিলেন, ইনি আমার পূর্ব্বপরিচিত জনৈক বন্ধু। বহুকাল পরে পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়ায় আমরা উভয়ে জাহাজের এক পার্শ্বে শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতে লাগিলাম। তখন কথা-প্রসঙ্গে তিনি আমায় একটি বিস্ময়াবহ গল্প বলিলেন এবং ইহার সত্যতা-সম্বন্ধে আমাকে সন্দেহবিহীন করিবার নিমিত্ত তিনি বলিলেন যে, এ ঘটনাটি আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তুমি যাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর, তাহাতে যেমন তোমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, ইহাতেও তুমি তদ্রূপ দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিবে; বস্তুতঃ ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের কোন কারণ নাই। ঘটনাটি এই—আমি বহুকাল যাবৎ এখানে বীরশ্রী গ্রামের মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়া আসিতেছি কিছুকাল হইল, এই গ্রামে ভয়ঙ্কর বসন্ত রোগের আবির্ভাব হইয়াছিল। গ্রামবাসীদের মধ্যে অনেকেই এই সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিল। আমি যে বাটীতে বাস করি, সেই বাটীর একটি ভদ্রলোকও তখন এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার পীড়া ক্রমে বিকটাকার ধারণ করিল এবং অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিল। তখন আমরা তাঁহার জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে ঘরের বাহিরে আনয়ন করিলাম। হায়, তখন মৃতের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবগণের হৃদয়-বিদারক বিলাপধ্বনিতে গগন

বিদীর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর আমরা এই মৃতদেহ দগ্ধ করিবার উদ্দেশে শ্মশানে লইয়া চলিলাম। তথায় উপনীত হইলে পর যাহা কর্ত্তব্য তৎসমস্তই সম্পন্ন হইতে লাগিল। ইত্যবসরে এমন একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল যে, তদ্দর্শনে আমরা সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে একবারে স্তম্ভিত হইয়া জড়প্রায় উপবিষ্ট রহিলাম। ভূপতিত মৃতদেহ হঠাৎ কম্পিত হইল, ক্রমে উহা চক্ষু বিস্ফারিত করিল ও নাসিকায় অল্প অল্প শ্বাস বহিতে লাগিল। তখন আমরা মৃতের মস্তকে জল দিয়া বাতাস দিতে লাগিলাম। অনন্তর ঐ মৃত ব্যক্তি কথঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিয়া উঠিল, "কাগজ পেন্‌সিল্ লইয়া কতকগুলি নাম লিখ; ঘটনাটি অদ্যোপান্ত পরে বলিব।" তখন আমরা কাগজ পেন্‌সিল্ লইয়া নাম লিখিতে লাগিলাম ও তিনি বলিতে লাগিলেন। বলা শেষ হইলে আমরা অতি সাবধানে তাহাকে পুনরায় গৃহে আনয়ন করিলাম। কিছুকাল পরে তিনি ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিলেন যে, দুইটী দিব্য পুরুষ আসিয়া আমাকে এক অত্যদ্ভুত অপরিচিত রাজ্যে লইয়া গেলে পর, তথায় এক মহাপুরুষ তাহাদিগকে বলিলেন, "ইহাকে আনিতে বলি নাই, তোমাদের বড়ই ভ্রম হইয়াছে। ইহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাও এবং ঐ গ্রামের এই সকল লোক লইয়া এস"। এই বলিয়া তিনি যে যে লোকের নাম বলিলেন, তাহাদিগের নামই আমি তোমাদিগকে লিখিতে বলিয়াছি। কিন্তু অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ গ্রামে অতঃপর উক্ত সংক্রামক রোগে কেবল ঐ সকল লোকই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল! এতদ্ভিন্ন অন্য একটি লোকও উক্তরোগে প্রাণত্যাগ করে নাই।

শ্রীকান্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পুনরাগমন।

(২য়ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ২৭৬ পৃষ্ঠার পর)

(৩৪)

পিতা আরোগ্যলাভ করিলেন। প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আরোগ্য-কথা পল্লীমধ্যে প্রচারিত হইয়া গেল। প্রতিবেশিগণ শুনিল, রাত্রিকালে কোথা হইতে এক সন্ন্যাসিনী আমাদের গৃহে আসিয়া আমার মৃত পিতাকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছে।

এক দুই করিয়া প্রতিবেশী-প্রতিবেশিনী এই কথার সত্যতা-নির্দ্ধারণের জন্য আমাদের গৃহে আসিতে লাগিল। আমরা সে পল্লীতে নবাগত হইলেও পিতা সহরের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তর্করত্ন মহাশয়কে জানে না, এমন লোক সহরে বিরল। তাহারা সংবাদ লইতে আসিল। কিন্তু কেমন করিয়া এত শীঘ্র একথার প্রচার হইল। অনিচ্ছা সত্ত্বে এমন কি বিরক্তির সহিত আমাকে তাহাদের কৌতুহল চরিতার্থ করিতে হইল। লোকে বুঝিল, আমার পিতা শুধু যশস্বী ও ভাগ্য-বান্ পণ্ডিত নহেন; তিনি একজন দেব-পরিচিত ব্যক্তি।

আমি কিন্তু অন্যরূপ বুঝিলাম — বুঝিলাম ভাগ্যের শিখরে বসিয়াও পিতার মত ভাগ্যহীন কয়জন আছে! পূর্ব্ব রাত্রির যে অদ্ভুত ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা যদি আমার বিকৃত মস্তিষ্কের ক্রিয়া না হয়, পিতার ব্যাধি হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটনা-পরম্পরা যদি কোন শক্তিমান্ ঐন্দ্রজালিকের ক্রিয়ার ন্যায় আমার চক্ষুতে প্রতিভাত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পিতা আমার কি ভাগ্যহীন! অন্ধের সম্মুখে নন্দন-শোভা, বধিরের কর্ণসমীপে গন্ধর্ব্বগীতি যেমন কোন কার্য্যেরই হয় না, পিতার পক্ষেও তাহাই হইয়াছে।

আমার এমন মা, যাঁহার পুণ্যহৃদয়ের আকর্ষণে মৃতের রাজ্য হইতে প্রাণ ফিরিয়া আসিয়াছে, যাঁহার গুণগীতিতে পূর্ণমহানবমীর নৈশবায়ু নবোল্লাসে স্পন্দিত হইয়াছে, সেই মাকে আমার পণ্ডিত পিতা চিনিতে পারিলেন না।, এতকালের সাহচর্য্যে, এতকালের দর্শনে আলাপনেও পিতা জননীর স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইলেন না! যা দেখিলাম, তাই যদি সত্য, তাহা হইলে পিতার পাণ্ডিত্যের মূল্য কি! সত্য কথা বলিতে কি মুহূর্ত্তের জন্য অন্তর্দৃষ্টিশূন্য তথাকথিত পাণ্ডিত্যের উপর আমার ঘৃণা উপস্থিত হইল। আর ঘৃণা উপস্থিত হইল; আমার নিজের উপর। পূর্ব্বকথা সমস্ত স্মরণে আনিয়া আমি বুঝিলাম, আমি পিতা হইতেও ভাগ্যহীন। অথবা আমা হইতে ভাগ্যহীন জগতে আর নাই। যাহারা রত্ন পায় নাই, রত্ন দেখে নাই, রত্ন কি তাহা শুনে নাই, তাহারাও ভাগ্যহীন বটে, কিন্তু যে রত্ন হাতে পাইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে, তাহার তুল্য হতভাগ্য আর কে আছে! দেবতার অশ্রুজলে যুগান্ত কাল নিষিক্ত হইলেও তাহার গৃহের উত্তাপ দূরীভূত হইবার নহে।

ব্যাপার কি বুঝিতে পারি আর না পারি, পূর্ব্বরাত্রের সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিয়া আমি অশ্রুজল ত্যাগ করিলাম। অথবা ত্যাগ করিলামই বলি কেন, ঘটনা স্মরণমাত্রেই আমার অজ্ঞাতসারে চক্ষু হইতে অশ্রু-ধারা প্রবাহিত হইল। কেন না আমার তদানীন্তন অবস্থা আমার সম্পূর্ণরূপ অজ্ঞাতই ছিল। ডাক্তারবাবুর সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবুদ্ধ হইয়া বুঝিলাম আমি কাঁদিতেছি। এত চিন্তা লুকাইয়া লুকাইয়া আমার মানস-পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে!

চিন্তা—এত চিন্তা—অনুমানে ধরিতে গেলাম, ধরিতে পারিলাম না বাল্যকাল হইতে যে মলিন চিত্তের পোষণ করিয়া আসিয়াছি, তাহা এখন প্রবল শক্তিধারণ করিয়া বিভিন্নমুখী গতির প্রহারে আমাকে, বিকারগ্রস্ত করিয়াছে।

বাল্যকাল হইতে এক মাতৃহীন শিশুর উপর ঈর্ষা করিয়া আসিয়াছি। আমার করুণাময়ী মা গর্ভধারিণীর আদরে তাহাকে কক্ষে স্থান দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিয়াছি। শেষে পিতাপুত্রে একরূপ সম্মিলিত হইয়াই কৌশলে তাহাকে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়াছি। শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পিতাকে পণ্ডিতবোধে তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া নিরক্ষরা অথচ জ্ঞানময়ী জননীকে চিরদিনই অশ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিয়াছি। সময় অসময়ে মাকে তাহার পণ্ডিতাভিমানী মোহগ্রস্ত স্বামী ও এই বৃথা জ্ঞানগর্ব্বিত পুত্রের কাছে কতই না লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে।

চিন্তার ভারে মথিত মর্ম্ম অশ্রুজলরূপে প্রবাহিত হইতেছিল। এমন সময়ে ডাক্তারবাবু পশ্চাৎ হইতে অতি ধীরে আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিলেন—"গোপীনাথ! কাঁদিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন আবার প্রকৃতিস্থ হইবার সময়। যে কয়দিন অথবা যে কয়দণ্ড মা বাঁচিয়া থাকেন, সে ক'টা দিন অথবা দণ্ড মায়ের সেবা করিয়া পূর্ব্ব অকার্য্যের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লও। আমি কিছুক্ষণের জন্য বাটী চলিলাম। হতভাগ্য সংসারী, গৃহকর্ম্ম ত আছে। আমি আমার স্ত্রীকে বাটীতে রাখিয়া যত সত্বর পারি ফিরিতেছি।"

ডাক্তারবাবু সমস্ত রাত্রি আমারই মতন জাগিয়াছেন। আমি বলিলাম—"এবেলা আর যাইবেন কেন? কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম লইয়া আহারান্তে গেলেই ভাল হয়।"

"বিশ্রাম আমি লইয়াছি এবং যেটুকু লইয়াছি, তাহাতেই আমার যথেষ্ট তৃপ্তি হইয়াছে। মায়ের আদেশ আমাকে এইখানেই আজ মধ্যাহ্নে প্রসাদ পাইতে হইবে। সে আদেশ অমান্য করিতে পারিব না। বিশেষতঃ যখন বুঝিতেছি এগৃহের অন্ন আর আমার ভাগ্যে ঘটিবে না।"

"আপনি কি স্থির বুঝিয়াছেন মা আর থাকিবেন না।"

"সেকি তুমিও বুঝিতে পার নাই গোপীনাথ!"

"বিষয় সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।"

"না পার, তাহাতেই বা তোমার ক্ষতি কি! তবে একান্তে বসিয়া কাঁদিতেছ কেন? বুঝিতেছি তুমি সারারাত্রির মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও চক্ষুর পলক মুদ্রিত করিতে অবসর পাও নাই! ক্ষণেকের জন্য বিশ্রাম লও—নিদ্রা যাও।"

"আপনি আশ্বাস না দিলে কি আর নিদ্রা আসিবে!"

"আর আশ্বাস দিবারই বা প্রয়োজন কি! তোমার পিতা আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তবে সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে আরও দিন দুই লাগিবে।"

"আর মা?"

"মা ত কাল রাত্রিতেই নিজের আয়ু-দানে সমস্তই নিঃশেষ করিয়াছেন। গোপীনাথ! কাল রাত্রিতেই ত আমরা মাকে হারাইয়াছি।"

কথা শুনিবামাত্রই আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। "মাকে হারাইয়াছি!"—উন্মত্তের মত উঠিতে যাইতেছি, ডাক্তারবাবু আমার স্কন্ধে হস্ত ন্যস্ত করিয়া আমাকে বসাইলেন—উঠিতে দিলেন না। বলিলেন—ব্যস্ত হইও না। কি দেখিতে ছুটিতেছিলে? মায়ের প্রাণহীন দেহ? ব্যাকুল হইও না। মা আয়ুঃশেষ করিয়াছেন, তবে এখনও দেহত্যাগ করেন নাই; কেন করেন নাই, তা মাই বলিতে পারেন।"

এই কথা শুনিয়া পুনঃ প্রকৃতিস্থ হইলাম। বুঝিলাম, ডাক্তারবাবু মায়ের আসন্ন-মৃত্যু-সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস করিয়াছেন। তাঁহাকে আর কোনও প্রশ্ন করিলাম না। তিনিও মায়ের সম্বন্ধে আর কোনও কথা না বলিয়া আমাকে বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন।

আমি মাতার মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু-সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় নহি। কথার আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিয়া বুঝিলাম, মা আজি হইতে আমাদের সংসারে জীবন্মৃত হইয়া থাকিবেন। প্রকৃত মৃত্যু হইলে পূর্ব্ব রাত্রিতেই হইত—পিতার জীবন পুনঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মাতার দেহ প্রাণশূন্য হইত।

মনকে এক প্রকারে বুঝাইলাম বটে, কিন্তু বুঝাইতে গিয়া বুঝিলাম, মাতার প্রতি আমার অননুভূত পূর্ব্বমমতা জাগিয়াছে।

মমতা জাগিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তে বোধ হইতেছে, মা বুঝি এ পাপ সংসারে আর থাকিবেন না। যদি না থাকিতে চান, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। তৎসম্বন্ধে পিতার যদি এইরূপই মনোভাব, তখন এ গৃহে তাঁহার না থাকাই বরং কর্ত্তব্য।

কিন্তু মা যদি না থাকেন, তাহা হইলে এ সংসারে আর রহিল কি? দূর ভবিষ্যৎ কল্পনার তুলিতে আঙ্কিত করিয়া একবার দেখিয়া লইলাম। কিন্তু দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অতীতের সংসার-চিত্র যুগপৎ আমার মনশ্চক্ষুতে উদিত হইয়া ভবিষ্যৎ চিত্র মলিন করিয়া দিল, দেখিলাম পর্ণকুটীর-বাসিনী একটী দেবীর সম্মুখে আমরা কতকগুলা পিশাচ নৃত্য করিতেছি। দেবী দুই অভয় করে দুটী বালককে ধরিয়া—সম্মুখের দম্ভাহঙ্কার-কলুষিত চিত্র দেখিয়া অশ্রুজল-বর্ষণ করিতেছেন।

চিন্তার প্রহারে মস্তকে বিষম বেদনা অনুভব করিলাম। মাথায় হাত দিতে গিয়া দেখি, মাথা বাঁধা। তখন পূর্ব্বদিবসের আঘাতের কথা মনে পড়িল। একবার দর্পণ-সম্মুখে দাঁড়াইলাম, দেখিলাম কপাল ঈষৎ স্ফীত হইয়াছে।

বন্ধন খুলিয়া ক্ষতের গভীরতা দেখিতে যাইতেছি, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে আমাকে সে কার্য্য করিতে নিষেধ করিল। ফিরিয়া দেখি কালীঘাটের সেই চিকিৎসক বন্ধু।

তিনি পূর্ব্বরাত্রির প্রতিশ্রুতি-মত পিতার রোগের সংবাদ লইতে আসিয়াছেন। প্রথমেই তিনি আমাকে বন্ধন খুলিতে নিষেধ করিলেন। বলিলেন—"যেরূপ বাঁধা আছে, তিন দিন আর তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। চতুর্থ দিবসে যে কোন চিকিৎসককে দিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করাইলেই চলিবে। মুখের অবস্থা দেখিয়া বুঝিতেছি, ভয় করিবার কিছুই নাই। এখন আপনার পিতার সংবাদ জানিতে ইচ্ছা করি।"

"আপনি কি অনুমান করিয়াছেন ?"

"অনুমান কেন, মৃত্যুই স্থির করিয়া আসিতেছিলাম। বাটীর নিস্তব্ধতা দেখিয়াও তাহাই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু আপনাকে দেখিয়া বুঝিতেছি, আপনার পিতা বাঁচিয়া আছেন। কাল পিতার রোগচিন্তায় আপনাকে উন্মত্তবৎ দেখিয়াছিলাম, আজ প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি। দেখিতেছি নিজের দেহের উপর আপনার দৃষ্টি পড়িয়াছে।"

"পিতা আরোগ্যলাভ করিয়াছেন।"

"আরোগ্যলাভ করিয়াছেন !"

"একেবারে নীরোগ হইয়াছেন।"

বন্ধুটি তীব্র দৃষ্টিতে একবার আমার মুখের পানে চাহিল। ভাবে বুঝিলাম, আমার কথায় তাহার বিশ্বাস হইল না। বলিলাম,—"এখনও কি আপনি আমাকে উন্মত্ত স্থির করিতেছেন ?"

"তা না করি, আপনাকে আশ্চর্য্যরূপে প্রকৃতিস্থ দেখিতেছি।"

"চিকিৎসকে কি বলেন যে, এরূপ রোগে মুক্তি নাই ?"

"রোগের অবস্থা-বিশেষে মুক্তির আশা করা যাইতে পারে ? কিন্তু এরোগে সেরূপ উদাহরণও বিরল। বিশেষতঃ কাল আপনার পিতাকে একরূপ প্রাণহীনই দেখিয়া গিয়াছি। যদি এখন পর্য্যন্ত তিনি বাঁচিয়া থাকেন, তাহাও বিস্ময়ের কথা বলিতে হইবে।"

"আসুন, পিতার কাছে আপনাকে লইয়া যাই।"

"বন্ধু আমার হাত ধরিলেন। আমি বলিলাম—"আমি রহস্য করিতেছি না।"

"আপনি দাঁড়ান—আমি দেখিলেও প্রত্যয় করিতে ইতস্ততঃ করিব।"

"রোগ-নির্ণয়ে ভ্রম হইলে বিশ্বাস করিতাম। যদি কোন অজ্ঞাত শক্তি নব প্রাণরূপে দেহমধ্যে প্রবেশ করে, তবেই তোমার পিতা জীবিত হইবেন ; নতুবা নহে।

"আপনি আমার সঙ্গে আসুন। পিতা যথার্থই রোগমুক্ত হইয়াছেন। তবে বোধ হয় এখনও দুই চারিদিন তিনি শয্যাত্যাগ করিতে পারিবেন না।"

চলিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দেখি পিতা যষ্টিতে ভর দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। বন্ধু দেখিয়া নির্ব্বাক্। একবার পিতার মুখের দিকে চাহিলেন, একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন, আমি কিন্তু বিস্ময়ের পারে উপস্থিত হইয়াছি। পিতাকে দেখিয়া কোনও কথা বলিলাম না! তাঁহাকে দুর্ব্বল বুঝিয়া কেবল তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলাম।

পিতা আমার মনোভাব বুঝিয়া বলিলেন,—"থাক্, সাহায্যের প্রয়োজন নাই। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ।" এই বলিয়া তিনি বন্ধুর দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তারপর বলিলেন,—"আমি তোমাকে নির্জ্জনে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি।"

"যদি বলিবার বিশেষ আপত্তি না থাকে, তাহ'লে এইখানেই বলুন। ইনি আমার সহৃদয় বন্ধু।"

"তোমার কপালে কি ?"

"উহার দিকে এখন লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই। মাথায় সামান্য

আঘাত লাগিয়াছে। ইনি চিকিৎসক। সযত্নে ইনি আমার চিকিৎসা করিয়াছেন। আপনি কি বলিতেছিলেন, বলুন।"

"আমাকে গোপালের সন্ধানে যাইতে হইবে। যদি কোনও সন্ধান না পাও, তাহা হইলে সেই দুরাত্মাকে জিজ্ঞাসা করিবে। গোপাল কোথায় নিশ্চয়ই তাহার অবিদিত নাই।"

"আমি বলিলাম—"আমি জানি।"

"জান!" বলিতে বলিতে পিতার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইল। হস্ত হইতে যষ্টি চ্যুত হইল।

বন্ধু বলিলেন,--"ধরুন—ধরুন।"

পিতা বলিলেন,—"না, আর ধরিতে হইবে না—আমি আবার সুস্থ হইয়াছি।"

আমি তাহার হস্তে যষ্টি উঠাইয়া দিলাম। পিতা বলিতে লাগিলেন,—"যদি জান, তাহা হইলে তাহাকে লইয়া আইস।"

"সে কি আসিবে!"

"আমার সর্ব্বস্ব দিলেও আসিবে না?"

"বেশ, আজই আমি তাঁহাকে আনিতে যাইব।"

"আজ নয়—এখনই যদি যাইতে পার, তাহা হইলে, এখনই যাও। গোপালকে লইয়া আইস, তাহার পিতাকে লইয়া আইস।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি এখনই গোপালকে আনিতে চলিলাম।" পিতা কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। জামার পকেটে গোপালের ভাবী শ্বশুরের ঠিকানা আছে জানিয়া জামা লইতে যাইতেছি, এমন সময়ে বাটীর বহির্ভাগে সেই হৃদয়-বিকম্পী হাসি। জানালা হইতে দেখি, বৃদ্ধা বাটীর পার্শ্বস্থ পথ দিয়া বিদ্যুৎ-বেগে চলিয়া গেল! পকেটে হাত দিয়া দেখি, পত্র অন্তর্হিত হইয়াছে। মাথায় হাত দিয়া আমি বসিয়া পড়িলাম।   ক্রমশঃ

গোধূলি-সঙ্গমে।

কল্যাণপুর একখানি বৰ্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম। ইহার পাদদেশ ধৌত করিয়া স্বচ্ছসলিলা এক ক্ষুদ্রা স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা। নদীর তীরে এক প্রাচীন শিবমন্দির। ইহার সম্মুখে এক বিশাল বটবৃক্ষ। বৃক্ষমূল ইষ্টক দিয়া বাঁধান। স্থানটি অতি পবিত্র এবং পরিষ্কার।

অস্তোন্মুখ তপনের রক্তিম-রাগে যখন পশ্চিম গগন রঞ্জিত হইত, কুলায়াভিমুখী বিহগবৃন্দের সান্ধ্য-কাকলী যখন ক্রমশঃ নীরব হইতে আসিত, গোপাল যখন গ্রাম্য ধেনুদলকে লইয়া নদী পার হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইত এবং নদী-শীকর-সম্পৃক্ত দক্ষিণ বায়ু যখন বিটপী-লতার শ্যামল দেহ স্পর্শ করিয়া ক্রীড়া করিত, তখন কল্যাণপুরের কয়েকজন বিশিষ্ট অধিবাসী এই শিবমন্দিরের সম্মুখস্থিত বটবৃক্ষমূলে সমবেত হইয়া নানাপ্রকার সৎকথার আলোচনা করিতেন।

যাঁহারা এখানে সমবেত হইতেন, তাঁহাদের সকলেই জীবন-গোধূলির সীমান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গোধূলি-শেষে, কাল রজনীর পরে তাঁহাদের জীবন আবার যে অভিনব প্রভাতে উপস্থিত হইবে, আবার যে তাঁহাদিগকে নূতন পথে যাত্রা করিতে হইবে, সে পথে গমন করিবার জন্য কোন্ কোন্ প্রয়োজনীয় পাথেয় সঙ্গে লইতে হইবে,—গোধূলি-সমাগমে এই শিবমন্দিরের সম্মুখে তাঁহারা অধিকাংশ সময়ে সে সকলের আলোচনা করিতেন।

*　　*　　*　　*　　*

সেদিন বৈশাখের ২রা। চৈত্র-সংক্রান্তির রক্তধ্বজা তখনও মন্দির-শীর্ষে বায়ুভরে উড়িতেছিল; মন্দিরদ্বারে সংলগ্ন আম্রপত্র ও পুষ্পমালিকা তখনও সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া যায় নাই। সন্ধ্যা-সমাগমে বটতরুতলে

প্রাচীনদিগের গ্রাম্য বৈঠক যেমন নিত্য বসে, সেদিনও তেমনই বসিল। বৈঠকে গ্রাম্য-টোলের অধ্যাপক সর্ব্বাগ্রে আসিলেন,—তিনিই বৈঠকের মুরুব্বি। তাহার পর ক্রমে ক্রমে নায়েব, জমীদারপুত্র, জ্যোতিষী, কবিরাজ মহাশয় ও মন্দিরের পুরোহিত আসিলেন। বিশ্রম্ভালাপের নিত্যসঙ্গী তাম্রকূট সেবন আরম্ভ হইল।

তামাক খাইতে খাইতে অধ্যাপক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, আজ আমাদের ডাক্তারবাবু কোথা ?"

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "ডাক্তারবাবু আজ সকালে তাঁর কন্মার শ্বশুর-বাড়ীতে গিয়াছেন ; বোধ হয়, আজ তিনি আসিতে পারিবেন না।"

কবিরাজ মহাশয় একমুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিলেন, "নবীন রজকের পুত্রটি কাল রাত্রে মারা পড়িয়াছে।"

জ্যোতিষী। আমি ত পূর্ব্বেই গণনা করিয়াছিলাম যে, উহার আর আয়ু নাই।

নায়েব। আহা বৃদ্ধ নবীনের শেষ বয়সে বড়ই কষ্ট হইল! নটবর উহার একমাত্র পুত্র।

সকলেই নবীনের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ডাক্তারবাবু বৈঠকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অধ্যাপক। কি ডাক্তারবাবু! কন্যা-জামাতার সংবাদ ভাল ত ?

ডাক্তারবাবু সহাস্যবদনে বলিলেন, "হাঁ সংবাদ ভাল। কাল শেষরাত্রে আমার এক দৌহিত্র সন্তান হইয়াছে।"

অধ্যাপক। আমরা এ সংবাদে বড়ই সন্তোষলাভ করিলাম।

জমীদার-পুত্র। যা'ক এ সকল কথা। আচ্ছা ডাক্তারবাবু আপনি কাল যে অলৌকিক ঘটনার বিষয় বলিতে যাইতেছিলেন, সেইটা আজ আমাদের বলুন।

ডাক্তারবাবু। হাঁ বলিতেছি ; আগে তামাকটা খাইয়া লই।

তখন হুঁকা হাতে লইয়া ডাক্তারবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"সে আজ বিশ বৎসরের কথা। আমি একবার আমার জন্মভূমি-পরিদর্শনে গিয়াছিলাম। ছোটনাগপুরের বুন্দু গ্রামে আমার জন্ম হয়। গ্রামখানির চারিদিকে পাহাড়। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। অতি বাল্যকালে জন্মভূমি ছাড়িয়া আমি এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হই। তখন হইতে কল্যাণপুর আমার দ্বিতীয় জন্মভূমি-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

মনে পড়ে, এক মধুর বসন্ত-প্রভাতে তথায় উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের উপর দিয়া পথ। ঘুরিয়া-ফিরিয়া সে পথ পাহাডের শিখরে উঠিয়াছে। এই পথ দিয়া পাহাড় পার হইলেই পরপারে আমার গন্তব্য গ্রাম।

পাহাড়ের শিখরদেশে উঠিয়া আমি পর পারস্থ সানুদেশে উপস্থিত হইলাম। যে পথ ধরিয়া আমি যাইতেছিলাম, তাহা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছিল। শেষে এমন একস্থানে আসিয়া পড়িলাম, যেখানে পথ অতি সঙ্কীর্ণ। আমি এযাবৎ অশ্বারোহণে আসিতে-ছিলাম, এইবার আমাকে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদব্রজে চলিতে হইল।

বাল্যকালে কতবার এ পথে আসিয়াছি, কিন্তু পথ ত তখন এরূপ সঙ্কীর্ণ দেখি নাই। সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত পথেরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র ও অল্পপরিসর পথের দুই পার্শ্বে পার্ব্বত্য কণ্টক-বৃক্ষাদি এরূপ ঘন সন্নিবিষ্টভাবে জন্মিয়াছে এবং উহাদের শাখাপ্রশাখা পথের উপরে এরূপ নিবিড়ভাবে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, যে সেই সঙ্কীর্ণ পথটুকুও আমি আর খুঁজিয়া পাইলাম না। সেই লতা-গুল্ম ও কণ্টক-তরুর শাখা-প্রশাখা-সমাচ্ছন্ন পথ-হীন স্থানে আমি

দাঁড়াইয়া রহিলাম। পথ খুঁজিবার জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলাম, কিন্তু সেই সঙ্কীর্ণ পথ-রেখার চিহ্নমাত্র আর আমার নয়ন পথে পতিত হইল না। তখন স্পষ্টই বুঝিলাম, আমি পথভ্রষ্ট হইয়াছি।

আমি যখন এইরূপ নিষ্ফলভাবে চারিদিকে পথের সন্ধান করিতে-ছিলাম, সেই সময়ে হঠাৎ আমার সম্মুখে একটা বৃহৎ পাংশুবর্ণের কুক্কুর আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে অত্যন্ত ভীতির সঞ্চার হইল। বিশেষতঃ কুকুরটা যেরূপ দ্রুতবেগে আমার নিকটে দৌড়িয়া আসিল, তাহাতে শঙ্কিত হইবার আমার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু যখন দেখিলাম, সে কোনপ্রকার আক্রমণের ভাব না দেখাইয়া আমার কাছে আসিল, তখন আমার মন হইতে ভয় দূরীভূত হইল।

ক্রমশঃ কুকুরটি আমার কাছ ঘেঁসিয়া আসিল এবং ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। আমার পায়ের উপর মাথা ঘসিয়া অস্ফুট ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ করিল। আমি বুঝিলাম, কুকুরটির দ্বারা কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই।

হঠাৎ কুকুরটি আমার নিকট হইতে একটু দূরে চলিয়া গেল। পুনরায় আমার কাছে দৌড়িয়া আসিল এবং আমার পায়ে মাথা কুটিতে লাগিল। আবার আমার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেল। তাহার ভাব দেখিয়া আমি বুঝিলাম, সে যেন আমায় তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে বলিতেছে। তাহার উপরে আমার বিশ্বাস এতই দৃঢ়মূল হইয়া পড়িল, যে আমি নিঃসন্দিগ্ধভাবে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। এইরূপে এই ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাদির মধ্য দিয়া কিয়দ্দূর আমি যাইতে লাগিলাম। আমি বরাবরই কুকুরটির প্রায় দেহস্পর্শ করিয়া যাইতেছিলাম। কতকদূর আসিবার পর আমি একটা উন্মুক্ত

স্থানে আসিয়া পৌঁছিলাম। সঙ্গী কুকুরটিও আমার সম্মুখে সম্মুখে যাইতেছিল।

এইস্থানে যেমন পৌঁছিয়াছি, অমনই চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে দেখি, কুকুরটি আমার সম্মুখ হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। এত শীঘ্র চক্ষুর পলকে এত বড় একটা বৃহৎ জন্তু আমার সম্মুখ হইতে কোথায় মিলাইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। বস্তুতঃই, এই অপ্রত্যাশিত বন্ধুর আকস্মিক অন্তর্দ্ধানে আমি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম,—যেমন বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম, তেমনই আবার অত্যন্ত দুঃখিতও হইলাম।

যাহা হউক, এই উন্মুক্ত স্থান হইতে পশ্চাতে পাহাড়ের শিখরদেশ ও তথায় উঠিবার সুগম পথ আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম এবং সম্মুখে আমার গন্তব্য গ্রামের নির্দ্দিষ্ট পথও আমার দৃষ্টিগোচর হইল।

আমি কুকুরটিকে অনুসন্ধান করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহা বৃথা হইল। তাহাকে আর কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

এই আশ্চর্য্য ঘটনায় আমি এতই বিস্মিত হইয়া পড়িলাম যে, আমার আর সেই গ্রামে যাওয়া হইল না। আমি ফিরিলাম। তাহার পর যেখানে আমার অশ্বটিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, সেইখানে উপস্থিত হইলাম।

অশ্বটিকে যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলাম, সেখানে একঘর কোলের বাস। বলা বাহুল্য, তাহাদিগের উপরেই আমি অশ্বটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া গিয়াছিলাম।

আমি এইখানে উপস্থিত হইয়াই কোল-গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, তোমরা এখানে একটা পাঁশুটে রঙ্গের কুকুর

দেখিয়াছ কি? বোধ হয়, সেটা আমার আগে আগে এখানে পৌঁছিয়া থাকিবে।"

গৃহস্বামী উত্তর করিল, "কৈ বাবু! না। পাঁশুটে রঙ্গের কুকুরের কথা কি, নেকৃড়ে বাঘের উপদ্রবে এ গ্রামে কুকুর থাকিবার যো নাই।"

কোলের উত্তরে আমার বিস্ময়ের মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিল। আমি মুখে হাত জল দিয়া তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় উঠিয়া পড়িয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

সারা পথটা কেবল সেই কুকুরটার কথাই ভাবিতে ভাবিতে আসিয়াছি। আমার এই চতুষ্পদবন্ধু কেনই বা ওরূপ দুর্গমস্থানে আমাকে দেখা দিল এবং তাহার পর কেনই বা ওরূপ আকস্মিক ভাবে অন্তর্হিত হইল? সেটা কি প্রকৃত কুকুর? আমার পদদেশে তাহার মস্তক-ঘর্ষণের অনুভূতি এখনও পর্য্যন্ত আমার মস্তিষ্কে বর্ত্তমান রহিয়াছে! তাহার অস্ফুট ধ্বনি এখনও আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে! আমি কি করিয়া বলিব সে অশরীরী,—সেটা কুকুর নয়, একটা কুকুর-রূপী প্রেত?. তাহার কার্য্যকলাপের সহিত একটা প্রকৃত কুকুরের কিছুমাত্র পার্থক্য যে নাই! সে হঠাৎ দামিনী-স্ফুরণের মত একবার আমার নয়ন-পথে পতিত হইয়া, আমার সম্মুখ হইতে পরক্ষণেই তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিয়া কোথায় মিলাইয়া গেল!"

ডাক্তারবাবুর মুখে এই অদ্ভুত বিবরণ শুনিয়া অধ্যাপক মহাশয় এক টিপ্ নস্য লইয়া বলিলেন, "ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? কুকুরটা নিশ্চয়ই কোন পথিকের হইবে।"

জ্যোতিষী। পথিকেরই যদি হইবে, তবে সে ঐ ভুল পথে কেন আসিবে?—সে তাহার প্রভুর সহিতই থাকিতে পারিত।

নায়েব। ঠিক কথা।

পুরোহিত। আমার বোধ হয়, ডাক্তারবাবুর কথিত কুকুরটি প্রকৃত

কুকুর নহে, পথভ্রষ্ট ডাক্তারবাবুর বিপদ দেখিয়া পরোপকারী কোন মৃত ব্যক্তির আত্মা কুকুরের রূপধারণ করিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, ডাক্তারবাবুকে সোজা পথ দেখাইয়া দেওয়া। সেই কার্য্য শেষ হইতেই সে অন্তর্হিত হইয়াছিল। পৃথিবীতে অনেক মৃত ব্যক্তির আত্মা এইরূপ নানা বেশে, নানা স্থানে, নানা উপায়ে পরের উপকার করিয়া থাকে।

জমীদার-পুত্র। মৃত আত্মার পক্ষে কোন মূর্ত্তি-পরিগ্রহ করা বিস্ময়ের বিষয় নহে। তাঁহাদের পক্ষে উহা অসম্ভব নহে।

জ্যোতিষী। এরূপ হইতে পারে, হয়ত কোনও পরোপকারী আত্মা ডাক্তারবাবুর এই বিপদ দেখিয়া মূর্ত্তিপরিগ্রহ না করিয়া এই কুকুরের দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কারণ, তাহার উদ্দেশ্য ডাক্তারবাবুকে পথ দেখান। বিশেষতঃ মূর্ত্তিপরিগ্রহের অপেক্ষা কোন জন্তু বা মনুষ্যের দেহে আবিষ্ট হওয়া অধিকতর সহজ।

নায়েব। সহজ বটে, কিন্তু তাহাতে বিপদের আশঙ্কাও যথেষ্ট। প্রথমতঃ কোন ইতর জন্তুর শরীরে আত্মা প্রবিষ্ট হইতে যাইবে কেন? একবার প্রবেশ করিলে যদি আত্মা কোনরূপে প্রলোভনের হাতে পড়ে, তবে বহুদিন সেই কুকুরের দেহে সে আবদ্ধ থাকিতেপারে।

পুরোহিত। তাহা হইলে নিশ্চয়ই কোন আত্মা কুকুর-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ডাক্তারবাবুকে পথ দেখাইয়াছিলেন।

জ্যোতিষী। তবে আর এক উপায় আছে; যদি কোন দৃঢ়চেতা আত্মা তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তি পথভ্রষ্ট ডাক্তারবাবুর সাহায্যের জন্য প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে কুকুররূপধারী আত্মার আবির্ভাবের প্রয়োজন হইত না।

অধ্যাপক মহাশয় গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "হাঁ একথা মানি বটে।"

কবিরাজ। ডাক্তারবাবুর কথা ত আপনারা শুনিলেন, এইবার আমি এক অদ্ভুত ঘটনার বিষয় বলিতেছি, আপনারা শুনুন।

পুরোহিত মহাশয় কবিরাজ মহাশয়ের কথায় বাধাপ্রদান করিয়া বলিলেন, "আজকার মত বৈঠক শেষ হউক। মন্দিরে আরতির সময় হইয়া আসিল। কাল আপনার কথা শুনা যাইবে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

[২য় ভাগ, ৭ম সংখ্যা, ৩২৮ পৃষ্ঠার পর।]

চতুর্থ অধ্যায়।

২। পিণ্ড-দেহ।

আমরা পূর্ব্বেই এই দেহের কথার উল্লেখ করিয়াছি। আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, ইহা প্রাণের বাহন,—এই দেহেরই সাহায্যে প্রাণশক্তি ভাণ্ডদেহকে জীবিত রাখিয়াছে। এই বিষয়টী আমরা এইবারে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিব। সাধনবলে মানব সূক্ষ্মদর্শনলাভ করিয়া প্রাণশক্তির কার্য্য যেরূপভাবে দেখিয়াছেন, আমরা তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ দিব।

আমাদিগের প্রত্যেক দেহেই গুটিকতক শক্তিকেন্দ্র আছে। দেখিতে ঘূর্ণায়মান চক্রের মত বলিয়া তাহাদিগকে চক্র বলা হয়। এই চক্রগুলির সাহায্যেই কোন শক্তিপ্রবাহ এক দেহ হইতে,

দেহান্তরে গমনাগমন করিয়া থাকে। পিণ্ডদেহে সেইগুলি অতি সহজেই প্রত্যক্ষীভূত হয়। নদীর জলাবর্ত্তের যেরূপ আকার, ইহারাও দেখিতে কতকটা সেইরূপ,—মধ্যদেশ গহ্বরাকৃতি, তাহার পর ক্রমে ক্রমে চারিধার স্ফীত হইতে হইতে একখানি শরবের আকার ধারণ করে। জলাবর্ত্তেরই মত ইহারা ঘূর্ণায়মান শক্তি-চক্র-সমষ্টি। ভাণ্ড-দেহে আমাদিগের যে সমস্ত যন্ত্র আছে, ইহাদিগেরও সাধারণতঃ তদনুযায়ী স্থাননির্দ্দেশ হইয়া থাকে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। পিণ্ড-দেহের এই চক্রগুলি দেহের অভ্যন্তরে নিবিষ্ট নহে, তাহারা পিণ্ডদেহের বহির্ভাগে সন্নিবেশিত। আবার পিণ্ডদেহ আকৃতিতে ভাণ্ড-দেহের সম্পূর্ণ অনুরূপ হইলেও, এই দুটী দেহের আয়তন সমান নয়,—পিণ্ড-দেহ ভাণ্ডদেহ অপেক্ষা এক-চতুর্থাংশ ইঞ্চি বৃহৎ। মূলাধার হইতে যে ক্রমান্বয়ে সপ্ত চক্র আছে, তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ আমাদিগের এখানে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। তবে যেখানে আমাদিগের প্লীহা-যন্ত্রটী আছে, তাহার নিকটবর্ত্তীস্থানে এইরূপ একটা শক্তিকেন্দ্র আছে, যেটীকে প্রাণ-গতি-নিয়ামক যন্ত্র বলা যাইতে পারে। তাহা দেখিতে তড়িদ্বৎ সমুজ্জ্বল ষড়্‌দলযুক্ত পদ্মের মত।

চক্র।

প্রাণশক্তি হিন্দুদিগের সৃষ্টিতত্ত্বের দ্বিতীয় পুরুষ হইতে আসিয়াছে। ইহা বিষ্ণুশক্তি। একপ্রকারের অতি সূক্ষ্ম অণু আছে, উহারা বিষ্ণুর ইচ্ছাতেই সৃষ্ট। ইহারাই এই প্রাণশক্তির বাহক। আমরা এই অনুগুলিকে প্রাণ-অণু বলিব। এই প্রাণ-অণু সাধারণ অণু হইতে বিভিন্ন। সাধারণ অণু তৃতীয় পুরুষের বা ব্রহ্মার ইচ্ছায় সৃষ্ট। দেখিতেও তাহারা প্রাণ-অণু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রাণ-অণু অতিশয় উজ্জ্বল ও কার্য্যশীল। তাহাদিগকে প্রকৃতি বলিয়া মনে হয় না; তাহাদিগকে

প্রাণ-শক্তি ও প্রাণ-অণু।

দেখিলে, তাহারা শক্তিকেন্দ্র বলিয়া অনুমিত হয়। এই প্রাণ-অণুগুলির উজ্জ্বলতা ও জীবনীশক্তির সূর্য্যালোকের সহিত কোনও সম্বন্ধ না থাকিলেও, সেই জীবনীশক্তির বহিঃপ্রকাশ যে সূর্য্যালোকের উপর নির্ভর করে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। দীপ্ত সমুজ্জ্বল রবিকরে যখন ধরণী স্নাতা হইতে থাকে, তখন দেখিতে পাওয়া যায় এই প্রাণ-অণুগুলিও তাহাতে অবগাহিত হইয়া একপ্রকার মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করে ; তখন মনে হয় যেন তাহাদিগের জীবনীশক্তি বর্ত্তমান হইয়াছে। আবার মেঘাবৃত দিবসে তাহাদিগের জীবনীশক্তির বেশ হ্রস্বতা লক্ষিত হয় ; নিশাকালে মনে হয় যেন তাহাদিগের সেই শক্তি একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে, দিবসে যে প্রাণ-সঞ্চার হয় তাহাই রজনীতে কার্য্য করিতে থাকে। এই প্রাণ-অণুগুলির একটী বিশেষত্ব আছে,—একবার তাহাতে প্রাণ সঞ্চিত ও সম্ভূত হইলে, তাহা যতক্ষণ না কোনও জীবিত প্রাণীর দ্বারা শোষিত ও আত্মসাৎ হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগের অধিগত প্রাণ-শক্তির নাশ বা অপচয় হয় না, সেই শক্তি তাহাদিগের অন্তর্নিহিত থাকে।

পূর্ব্বকথিত পিণ্ডদেহস্থ প্লীহা-সন্নিহিত প্রাণ-গতি-নিয়ামক যন্ত্রের সাহায্যে মানব বায়ুমণ্ডল হইতে প্রাণ-অণু আহরণ করে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই প্রাণগতি-নিয়ামক যন্ত্রটী দেখিতে একটী ষড়দল-যুক্ত পদ্মের মত। এই পদ্মাকৃতি কেন্দ্রস্থল হইতে ষড়ধারায় চারিদিকে তরঙ্গগতিতে শক্তি নির্গত হয়। মনে করুন, একটী চক্রের নাভি হইতে নেমি পর্য্যন্ত ছয়টী দণ্ড আছে। এই ছয়টী অরকে পর্য্যায়ক্রমে বেষ্টন করিয়া আর একপ্রকার শক্তিপ্রবাহ চক্রাকারে ঘুরিতেছে। যেমন "চেঙ্গারি" বয়ন হয় ঠিক সেইরূপ, এই ঘূর্ণায়মান শক্তি পর্য্যায়ক্রমে কোনটির ঊর্দ্ধদেশ এবং কোনটির অধোদেশ দিয়া যায়। ইহাতেই

ষড়্‌দল পদ্ম ও প্রাণশক্তির ক্রিয়া।

ইহা ষড়্‌দল পদ্মের আকার ধারণ করে। যখন পূর্ব্বকথিত প্রাণ-অণু বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া বেড়ায়, তখন তাহারা অতি জ্যোতির্ম্ময় হইলেও, তাহাদিগের কোনও নির্দ্দিষ্ট বর্ণ থাকে না, তখন তাহারা সূর্য্যালোকের মত শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। তাহার পর যখন এই বর্ণহীন অণুগুলি এই প্লীহা-সন্নিহিত শক্তি-আবর্ত্তের কেন্দ্রস্থলে আকৃষ্ট হয়, তখন এই শ্বেতবর্ণ সপ্তবর্ণে বিভক্ত হয়। সেই বিশ্লিষ্ট সপ্তবর্ণের ন্যায় —ধূমল, নীল, হরিৎ, পীত, কমলালেবুর রং, গাঢ় রক্তবর্ণ ও গোলাপ পুষ্পের বর্ণ। পূর্ব্বকথিত চক্রের ছয়টী অর সাহায্যে এক একটী বর্ণ প্রবাহিত হইয়া দেহের নানাস্থানে যায় এবং গোলাপ বর্ণ সেই চক্রের কেন্দ্র দিয়া নির্গত হয়। এইরূপে প্রাণ সপ্তভাগে বিভক্ত হইলেও দেহে তাহা পঞ্চধারায় প্রবাহিত হয়;—ধূমল ও নীল এবং গাঢ় রক্তবর্ণ ও কমলালেবুর বর্ণ বহির্গমনের কালে একত্র সংমিশ্রিত হয়। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রাণ পঞ্চধা বিভক্ত হয়।

"তান্ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ—মা মোহমাপদ্যথাঽহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি।"—প্রশ্নোপনিষৎ—২-৩

(তখন মুখ্যপ্রাণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, হে দেবগণ, তোমরা "আমরা ধারক ও প্রকাশক" বলিয়া যে অভিমান করিতেছ, তাহা তোমাদিগের অভিমানমাত্র, অতএব উহা পরিত্যাগ কর; কারণ, আমিই এই শরীরে আপনাকে প্রাণাদিরূপে পঞ্চধা বিভাগ করিয়া এই শরীরকে আশ্রয় করিয়া ধারক ও প্রকাশক হইয়া আছি।)

সংযুক্ত বেগুনি ও নীল প্রবাহ উর্দ্ধদিকে ধাবিত হইয়া কণ্ঠপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তখন দুইভাগে বিভক্ত হয়,—ঈষৎ নীল এবং সংযুক্ত গাঢ় নীল ও বেগুনি। প্রথমাংশ তত্রস্থ শক্তিচক্রকে সঞ্জীবিত করে এবং শেষাংশ মস্তিষ্কে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা আবার দুই ভাগে বিভক্ত হয়,—গাঢ় নীলাংশ মস্তিষ্কের নিম্ন ও মধ্য প্রদেশে

প্রবাহিত হয় এবং বেগুনি অংশটুকু মস্তিষ্কের উপরিভাগে প্রধাবিত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে যে শক্তিচক্র আছে, তাহাকে বিশেষতঃ তাহার বহিস্থ ৯৬০ দল মধ্যে সঞ্চারিত হয়! পীতপ্রবাহ প্রথমে হৃদয়কেন্দ্রে উপস্থিত হয়, তাহার পর তাহাও মস্তিষ্ক-প্রদেশে প্রধাবিত হয়। হরিৎ প্রবাহ কুক্ষিদেশে প্রধাবিত হয় এবং তত্রস্থ শক্তিকেন্দ্রে সঞ্চারিত হইয়া মানবের যকৃৎ, মুত্রাশয়, অন্ত্র ও পাকস্থলীর কার্য্য করায়। সংযুক্ত কমলালেবু ও রক্তবর্ণবিশিষ্ট প্রবাহ প্রথমে মেরুদণ্ডের পাদদেশে প্রধাবিত হয় এবং তাহার পর তাহা জননেন্দ্রিয়ের নিকটস্থ শক্তিকেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে আসিয়া তাহা ত্রিধারায় বিভক্ত হয়,—কমলালেবুর বর্ণ, বেগুনি বর্ণ (purple) এবং গাঢ় রক্তবর্ণ। সাধারণ মানবে এই প্রাণপ্রবাহ মানবের কাম বৃদ্ধি করে ও দেহের উত্তাপ রক্ষা করে। কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনি কিছুকাল সাধন করিয়া এই প্রবাহের উর্দ্ধগতি করাইয়া মস্তিষ্কে আনয়ন করিতে পারেন। তখন ইহার বেশ পরিবর্ত্তন হয়। কমলালেবুর বর্ণ পবিত্র সুন্দর পীতবর্ণে পরিণত হয় এবং ইহাতে ধীশক্তি বর্দ্ধিত হয়; গাঢ় রক্তবর্ণ (dark red), সুন্দর অলক্তকবর্ণ (crimson) পরিণত হয় এবং তাহার নিঃস্বার্থ প্রেম বর্দ্ধিত হয়; এবং গাঢ় বেগুনি সুন্দর অগভীর নীল-লোহিত বর্ণে পরিণত হয় এবং তদ্দ্বারা তাঁহার আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপ লোক যদ্যপি কুণ্ডলিনীকে জাগায় তাহা হইলে তাহাতে তাহার কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকে না। এইবার আমরা পঞ্চম প্রবাহের কথা বলিব। এই গোলাপবর্ণও প্রহাহ প্রাণ-প্রবাহ-নিয়ামক যন্ত্রের কেন্দ্র-স্থল দিয়া নাড়ী-সাহায্যে দেহের সর্ব্বাংশে পরিব্যাপ্ত হয়। ইহাকেই প্রাণ বলা হয়। ইহাই একজন মানব অপর রুগ্নদেহে সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হয়। ইহার প্রবাহের হ্রাস হইলেই মানব অধীর হয়।

প্রাণ-প্রবাহ।

প্রাণের এই নানা প্রবাহ দেহের যে যে অংশের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহার সম্যক্ কার্য্যকারিতা তৎসম্বন্ধীয় প্রবাহের উপর নির্ভর করে। যাঁহারই পিণ্ড-দেহ দেখিবার শক্তি আছে, তিনিই কোনও লোককে দেখাইয়া বলিতে পারেন, তাহার অসুস্থতার কারণ কি। কাহারও পাকযন্ত্রের ক্রিয়ায় দোষ থাকিলে সেই মানবের হরিৎ-প্রাণ-প্রবাহে দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যায়, সেই প্রবাহ মন্থরগতিযুক্ত বা অল্প হয়। যখন শীতপ্রবাহ প্রখর থাকে তখন তাহার দ্বারা অনুমিত হইবে যে তাহার হৃদয়যন্ত্রের কার্য্য বেশ সুন্দরভাবে চলিতেছে।

এই সমস্ত প্রবাহ স্ব স্ব স্থানে কার্য্য করিবার পর সেই সমস্ত প্রাণাধিষ্ঠিত অণুগুলির প্রাণশক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়। গোলাপবর্ণ প্রাণাধিষ্ঠিত অণুগুলি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইতে হইতে অবশেষে নীল ও ও শ্বেতে পরিণত হয়। তখন তাহারা দেহের নানাস্থান দিয়া বহির্গত হইতে থাকে। এইরূপে মানবদেহকে নীলাভ শ্বেত ওজঃ বেষ্টন করিয়া থাকে। ইহাকেই স্বাস্থ্যে ওজঃ (health aura) বলা হয়। দেহ হইতে যখন তাহা বহির্গমন করে, তখন তাহার আর প্রায় গোলাপী আভা থাকে না।

ক্রমশঃ

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

অলৌকিক রহস্য।

২য় সংখ্যা] তৃতীয় বর্ষ। [ভাদ্র, ১৩১৮।

সূক্ষ্ম শরীরের প্রমাণ।

মানুষের যে দেহ আমরা চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিতে পারি, এক কথায় যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর তাহাকে স্থূল দেহ বলা যায়। স্থূল দেহের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই, কিন্তু স্থূল দেহ ছাড়া মানুষের যে সূক্ষ্ম দেহ আছে, একথা অনেকে স্বীকার করেন না। স্থূল দেহ নাশ হইলে মানুষ সূক্ষ্ম দেহে অবস্থান করে—একথা তাঁহারা মানিতে চান না। মানুষের স্থূল দেহের সঙ্গে তাহার সূক্ষ্ম দেহ যে প্রতিক্ষণ বিজড়িত রহিয়াছে, একথা তাঁহাদের কল্পনাতেও আসে না। এই শ্রেণীর লোকেরা প্রধানতঃ জড়বাদী। তাঁহারা বলেন যে, যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই তাহা আমরা কেন বিশ্বাস করিব? সূক্ষ্ম দেহের কি কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে?

একটা কথা মনে রাখা উচিত, এমন অনেক জিনিস আছে যাহা আমরা চক্ষুতে দেখিতে পাই না অথচ যাহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না। যদি রাত্রিকালে নির্ম্মল আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তবে অনেক সহস্র নক্ষত্র আমাদের নয়নগোচর হইবে। যদি আমরা দূরবীক্ষণের সাহায্য লই তবে যে সকল তারা পূর্ব্বে আমাদের স্থূল চক্ষুর গোচর ছিল না, এমন অনেক সহস্র তারা আমরা দেখিতে

পাইব। কিন্তু এমন সকলও তারা আছে যাহাদের আলোকরশ্মি এতই ক্ষীণ যে, শ্রেষ্ঠতম দূরবীক্ষণের সাহায্যেও তাহাদিগকে নয়নগোচর করা যায় না। কিন্তু অন্য প্রণালী দ্বারা তাহাদের অস্তিত্বও প্রমাণিত করা যায়। দূরবীক্ষণের মুখে একটা প্লেট দিয়া যদি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দূরবীক্ষণকে সেই তারার অভিমুখে স্থিরভাবে ধরিয়া রাখা যায়, তবে সেই তারার ছবি সেই আলোকচিত্রফলকে অঙ্কিত হইয়া যায়। পরে সেই প্লেট হইতে ফটো উঠাইলে সেই তারার ছবি সুস্পষ্ট দেখা যায়; তখন তারার অস্তিত্বসম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহারা সূক্ষ্মতা বশতঃ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না অথচ বৈজ্ঞানিক কৌশলে তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা যায়।

সূর্য্যের শুভ্র রশ্মিকে যদি একটা কাচের কলমের (prism) মধ্য দিয়া দেখা যায়, তবে আমরা দেখিতে পাই যে, সেই শুভ্র রশ্মি সাতটী বিভিন্ন বর্ণে সজ্জিত হইয়াছে। বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাকে spectrum (বর্ণসপ্তক) বলে। এই spectrumএ আমরা পর পর সাতটী বর্ণ দেখিতে পাই যথা:—লাল (red), কমলা (orange), হলুদ (yellow), সবুজ (green), নীল (blue), সুনীল (indigo) ও বেগুনি (violet)। বৈজ্ঞানিকমাত্রেই অবগত আছেন, যে, এই যে সপ্তবর্ণ (যাহার spectrum আমাদের নয়নগোচর হয়) সেই বর্ণগুচ্ছের পূর্ব্বের এবং পরে অন্য বর্ণের রশ্মি বিদ্যমান থাকে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই রশ্মিকে ultra violet এবং infra red বলে। এই সকল রশ্মি আছে, অথচ আমরা দেখিতে পাই না। তাহার কারণ এই যে, আমাদের চক্ষু এমনভাবে গঠিত যে আলোকের স্পন্দন-নির্দ্দিষ্ট সীমার কম অথবা বেশী হইলে আর তাহা আমাদের চক্ষুর গোচর হয় না। আলোকের স্পন্দন যদি প্রতি সেকেণ্ডে ৪৮৪০০০০০০০০০ বার হয়, তবে তাহার

রং লাল। এইরূপ স্পন্দনের সংখ্যা বাড়িয়া বাড়িয়া যখন প্রতি সেকেণ্ডে ইথর ৭০৯০০০০০০০০০০ বার স্পন্দিত হইতে থাকে, তখন সেই আলো বেগুনী বর্ণ ধারণ করে। ইথরের স্পন্দন যে ঐ সীমার মধ্যে নিবদ্ধ থাকিবে এমন কোন কথা নাই। স্পন্দন সেকেণ্ডে লালের কম হইতে পারে এবং বেগুনীর বেশীও হইতে পারে, কিন্তু ৪৮৪০০০০০০০০০০ সংখ্যার কম হইলে আর আমরা সে আলো দেখিতে পাই না এবং ৭০৯০০০০০০০০০০ সংখ্যার বেশী হইলেও আর আমরা সে আলো দেখিতে পাই না। ৪৮৪০০০০০০০০০০ অপেক্ষা কম স্পন্দনে উদ্ভূত যে রশ্মি তাহাই infra red রশ্মি এবং ৭০৯০০০০০০০০০০ স্পন্দনের অধিক স্পন্দনে উদ্ভূত যে রশ্মি তাহাই ultra violet rays। এই উভয় রশ্মিই আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। অথচ বৈজ্ঞানিকেরা নানাবিধ প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এইরূপ ultra violet এবং infra red রশ্মির অস্তিত্বসম্বন্ধে সন্দেহ করা অনুচিত। কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের একজন বৈজ্ঞানিক ঐরূপ রশ্মির সাহায্যে কতকগুলি আলোকচিত্র (photo) উঠাইয়াছেন। বিগত জুন মাসের Illustrated London News পত্রিকায় ঐরূপ কয়েকখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠক ঐ চিত্র দেখিতে পারেন।

সূক্ষ্ম শরীর হইতে যে রশ্মি নির্গত হয়, তাহা যদি সাধারণ মনুষ্য-চক্ষুর গোচরযোগ্য লাল, নীল প্রভৃতি সপ্তরশ্মির অতীত ঐরূপ ultra violet বা infra red রশ্মি হয়, তবে স্থূল চক্ষুর সাহায্যে সূক্ষ্ম শরীর কিরূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে? এবং প্রত্যক্ষ না হইলেই যে তাহার অস্তিত্ব নাই এরূপ সিদ্ধান্ত কিরূপে করা যায়?

সুখের বিষয়, সম্প্রতি এক জন বৈজ্ঞানিক একটী যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন যাহার সাহায্যে সূক্ষ্ম শরীরের রশ্মি মন্দীভূত করা যায়। যে রশ্মি ultra violet তাহাকে যদি বৈজ্ঞানিক কৌশলে এবং কোন

রূপ কাচের সাহায্যে বেগুনী করা যাইতে পারে, তবে তাহা প্রত্যক্ষ হওয়া বিচিত্র নহে। ডাক্তার কিল্‌নার (Kilner) নামে একজন বৈজ্ঞানিক ঐরূপই করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সে গ্রন্থ সম্প্রতি মুদ্রিত হইতেছে। গ্রন্থের নাম "The Human atmosphere or the Aura made visible by the aid of chemical screens"। কিছুদিন পূর্ব্বে বিলাতের Daily Express পত্রিকার একজন প্রতিনিধি এই বিষয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ সংবাদপত্রে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহার সার মর্ম্ম এই :—Daily Express সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে ডাক্তার কিল্‌নারের বন্ধু ডাক্তার ফেল্‌কিন্ একটী ঘরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। সেই ঘরের একটী মাত্র জানালা। তখন দিবা, সেই জানালা দিয়া ঘরের মধ্যে আলো আসিতেছিল। সেই জানালার অপর পার্শ্বের দেয়ালে একখানা কাল পর্দ্দা টাঙ্গান ছিল, সেই পর্দ্দার সাম্‌নে একটী মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোক দুই হস্ত কটীদেশে রাখিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন সেই জানালায় একটী পর্দ্দা টানিয়া ঘর প্রায় অন্ধকার করিয়া দেওয়া হইল। কেবল সেই পর্দ্দার মধ্য দিয়া অতি ক্ষীণ আলোক গৃহের মধ্যে আসিতে লাগিল। সেই আলোকে সেই স্ত্রীলোকের শ্বেত মূর্ত্তি কাল পর্দ্দার সম্মুখে স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। ডাক্তার ফেল্‌কিন্ spectauranine কাচ-নির্ম্মিত একটী যন্ত্র দর্শকের হাতে দিলেন। সে যন্ত্র আর কিছু নহে, চার ইঞ্চি দীর্ঘ এবং দেড় ইঞ্চ প্রস্থ এইরূপ দুইখানি কাচের মধ্যে ডাক্তার কিল্‌নারের আবিষ্কৃত এক প্রকার আরক *।

---

* Daily Express পত্রে এই যন্ত্রের যেরূপ বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

The apparatus, if apparatus it can be termed, consists of a

এই যন্ত্রের মধ্য দিয়া Daily Expressএর প্রতিনিধি সেই স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। তিনি যাহা দেখিলেন তাহার এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। * প্রায় ¼ মিনিট পর্য্যন্ত সেই অন্ধকার গৃহে সেই রমণীর মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছু দেখা গেল না। ক্রমশঃ দেখিলাম যে, যেন একটা ছায়া বা ছটা সেই মূর্ত্তিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। সেই ছটার দুইটী স্তর—একের মধ্যে অন্য স্তর; অন্তঃস্তর যেন বহিঃস্তরের অপেক্ষা ঘন। বহিঃস্তরের বর্ণ ফিকে নীল (blue-grey)। অন্তঃস্তরের বর্ণ আরও গাঢ়। অন্তঃস্তর আরও ঘন বলিয়া বোধ

---

number of what are technically termed 'Spectauranine' glass screens, each about four inches in length by an inch and a half in breadth. These screens are made each of two plates of very thin glass, between which, hermetically sealed in, is a wonderful fluid that Dr. Kilner has discovered.

* For some moments, perhaps a quarter of a minute, the only object that could be made out in the darkness was the subjects form and its outline. Then gradually, as the eyes grew accustomed to the darkness, a sort of double mist or halo, the one within the other and the inner one denser than the outer, became more and more distinctly visible.

The outlines of this mist exactly followed the curves and the contour of the subjects body. The color of the outer aura seemed to be a blue-gray ; that of the inner aura was darker—also, apparently, the inner aura was denser. In the triangular space formed by the sides of the body and the angle of the arms, as the subject remained with her hands resting lightly on her hips, the halo could be seen most clearly

Presently, acting upon Dr. Felkin's instructions, the subject raised and extended first, one arm, then the other. Then she joined her hands at the back of her neck. and always the mist of the aura followed, as though it were itself an outline of some sort of shadow of the limbs.

হইল। স্ত্রীলোকের দুই হস্ত কটিদেশে অর্পিত ছিল। এই হস্তের সন্নিহিত প্রদেশে সেই ছায়া বা ছটা বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। পরে ডাক্তার ফেল্‌কিনের উপদেশমত সেই রমণী প্রথমে এক হস্ত পরে অপর হস্ত উত্তোলন করিল। পরে সে দুই হস্ত সংযুক্ত করিয়া আপন গ্রীবার উপর স্থাপন করিল। সেখানেও ঐ ছটা বা ছায়া বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। ছটা দেখিয়া বোধ হইল যে, উহা অঙ্গপ্রত্যঙ্গেরই ছায়া বা প্রতিকৃতি।

ডাক্তার কিল্‌নার এইরূপে সূক্ষ্ম শরীর সাধারণের নয়নগোচর করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Edmund Gates নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক আর একভাবে সূক্ষ্ম শরীর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাহার বিবরণ আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ওঙ্গোলের মুস্তান।

আমরা এই প্রবন্ধে যে মহাত্মার বিষয় লিখিতেছি, তাঁহার জন্মস্থান ও নাম কেহই জানেন না। তিনি কাহাকেও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলেন না। তবে অনেক সময়ে তাঁহাকে মান্দ্রাজ বিভাগের ওঙ্গোল জেলায় দেখা গিয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে "ওঙ্গোলের মুস্তান" বলিয়া অনেকে জানেন।

মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্টের জনৈক সরকারী কর্ম্মচারী (তহশীলদার) অনেকদিন যাবৎ ইহার সঙ্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার মুখেই পাঠকবর্গ এই বিবরণ শুনুন ;—

"সরকারী কার্য্যোপলক্ষে আমাদের মধ্যে মধ্যে মফঃস্বলে যাইতে হয়, একবার একটি বন্ধুসহ মফ:স্বলে যাইয়া একটি ডাকবাঙ্গলায় আছি, সে আজ প্রায় ত্রিশ বর্ষ হইবে। সন্ধ্যাকালে পথে বেড়াইতে বেড়াইতে অদূরে একটি শিখার মত আলোক দেখিতে পাইলাম। আলোকটি আমাদের নিকট হইতে একটি বৃক্ষতলে ও মৃত্তিকা হইতে প্রায় দুইফিট উপরে স্থিরভাবে রহিয়াছে। বন্ধু ও আমি বিশেষ করিয়া দেখিয়াও আলোক কোথা হইতে আসিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার কৌতুক বৃদ্ধি হওয়ায় আমি অগ্রসর হইয়া দেখিতে ইচ্ছুক হইলাম, বন্ধুটি বয়স্থ বলিয়া তিনি আমার সহিত মাঠ ভাঙ্গিয়া হাঁটিতে সম্মত হইলেন না। আমি বন্ধুটিকে পথিমধ্যে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অগ্রসর হইলাম, নিকটস্থ হইলে আলোকটি আর দেখিতে পাইলাম না, দেখিলাম বৃক্ষতলে একটি উলঙ্গ লোক বসিয়া আছে মাত্র। ফিরিয়া বন্ধুর নিকট আসিলে আবার পূর্ব্ববৎ আলোক-শিখাটি দেখিতে লাগিলাম। এবারে আমরা দুই জনেই আলোকশিখা লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলাম, কিন্তু নিকটস্থ হইলেই আর শিখাটি দেখা গেল না, সেই উলঙ্গ লোকটি বৃক্ষতলে বসিয়া আছে মাত্র। আমাদের কথা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না, স্থিরভাবে বসিয়া আছেন দেখিলাম, আমরা অনেক ভাষায় তাঁহার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করিলাম, শেষে এমন কি তাঁহাকে স্কন্ধ দেশে হাত দিয়া ঠেলিলাম, কিন্তু তিনি নির্ব্বাক্ ও নিশ্চল। অগত্যা আমরা মাঠ ভাঙ্গিয়া ফিরিলাম, পথের উপর যাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া আলোকশিখাটি দেখিতে লাগিলাম, সন্ধ্যা হওয়ায় আলোকটি অপেক্ষাকৃত অধিক উজ্জ্বল দেখাইতে লাগিল, আমরা আলোকটির কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিলাম না, শেষে ডাকবাঙ্গলায় ফিরিয়া গেলাম।"

"পরদিন বেলা দশটার সময় আপন কর্ম্ম শেষ করিয়া ডাকবাঙ্গলায়

ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় দেখিলাম সেই উলঙ্গ লোকটি আমাদের বাঙ্গলার নিকটে একটি আবর্জ্জনার স্তূপের উপর বসিয়া আছে, আমার প্রশ্নে তিনি আজও কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহাকে কিছু খাদ্য দিলাম, তিনি তাহা স্পর্শও করিলেন না। আমার বন্ধু ও অন্যান্য যে সকল লোক তথায় ছিলেন সকলেই তাঁহার সহিত কথোপকথনের বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না, তিনি যে তাঁহাদের কথা শুনিলেন এরূপ ইঙ্গিতেও বুঝা গেল না। পরদিন আমি তথা হইতে আঠার মাইল দূরে আমার দেশে চলিয়া আসি।"

"আমি দেশে আসিয়াছি, দুই দিন পরে আমার আফিসের একটি পিয়ন আসিয়া সংবাদ দিল যে, সেই উলঙ্গ লোকটি আমাদের গ্রামে আসিয়াছে, একটি মুসাফেরখানার নিকট বসিয়া আছে। আমি যাইয়া দেখিলাম যে পূর্ব্বদৃষ্ট সেই লোকটিই বটে। আমি তাহাকে নিজবাটীতে আনিতে চাহিলে তিনি তখন সম্মত হইলেন না। দুই তিন দিন পরে তিনি আসিলেন, পরদিন কিছু দুগ্ধমাত্র খাইলেন। তদবধি তিনি আমার বাটীতে রহিলেন, কিন্তু কাহারও সহিত একটি মাত্র কথা কহিলেন না, কেহ তাহার মুখে একটিও কথা শুনিতে পাইল না। তিনি কে এবং তাঁহার কি প্রয়োজন কিছুই আমরা জানিতে পারিলাম না।"

"দুই একদিন পরে একদা আমার বাটীতে কয়েকটি বন্ধু সম্মিলিত হইয়াছে, আমার আত্মীয় এক ডিষ্ট্রিক্ট মুন্সেফও আসিয়াছেন, বেলা তিনটার সময় সকলে বসিয়া আছি, ডাকওয়ালা চিঠি লইয়া আসিল। আমার স্ত্রী পূর্ণগর্ভাবস্থায় মান্দ্রাজে তাহার পিত্রালয়ে থাকায় আমি তথাকার সংবাদ পাইবার জন্য ব্যস্ত ছিলাম। আমাকে কয়েকখানি চিঠি দেওয়ায় আমি সকলের সাক্ষাতে চিঠি না খুলিয়া চিঠিগুলি লইয়া পকেটে রাখিয়া দিলাম। আমার আত্মীয় মুন্সেফবাবু বলিলেন, তুমি

চিঠি দেখ না, উহাতে তোমার স্ত্রীর সংবাদ থাকিলেও থাকিতে পারে, তাঁহার কথা অমান্য করা উচিত নয় বোধে আমি চিঠি খুলিতে যাইতেছি এমন সময়ে সেই উলঙ্গ সাধু, যাঁহাকে আমরা মুস্তান বলিতে আরম্ভ করিয়াছি, তিনি এ পর্য্যন্ত কোন কথা কহেন নাই, কিন্তু অকস্মাৎ আমার দিকে দৃষ্টি করিলেন ও বলিলেন, 'মুন্সি আমি বলিতেছি, তোমার চিঠিতে কি আছে, তোমার স্ত্রী একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিয়াছে এই সংবাদ উহাতে আছে।' ইহাতে আমাদের সকলের কৌতূহল বৃদ্ধি হওয়ায় তাড়াতাড়ি চিঠি খুলিয়া দেখিলাম যে, মুস্তানের কথা সত্য। আমার চিঠি পড়া শেষ হইলে মুস্তান পুনরায় বলিলেন, আর একটি চিঠি তোমার জন্য ডাকে আসিতেছে, উহাতে লেখা আছে যে তোমার নবপ্রসূতা কন্যা মৃতা হইয়াছে। আমরা সকলে আরও আশ্চর্য্য হইয়া পুনরায় ঐ চিঠির খবর মিলাইবার জন্য অপেক্ষায় রহিলাম।"

"ডাকওয়ালা পুনরায় চিঠি আনিলে ঐরূপ সংবাদ পাওয়া গেল। লোকমুখে এইকথা চতুর্দ্দিকে প্রচার হইয়া পড়িল, নানাস্থান হইতে প্রত্যহ বহু লোক মুস্তানকে দেখিতে আসিতে লাগিল। একদিন তাঁহার নিকট আমি একা বসিয়া আছি। তিনি আমাকে বলিলেন, 'তোমার স্ত্রীর উপর অপদেবতা চাপিয়াছে, কিন্তু ইহাতে কোন ভয়ের কারণ না থাকিলেও এই অবস্থা থাকিতে দেওয়া উচিত নয়।' তিনি একটি কবচ করিয়া দিতে সম্মত হইলেন, আমি একটি স্বর্ণের চতুষ্কোণ পদক তাঁহার উপদেশমত প্রস্তুত করাইলাম। তিনি একটি কাগজে কুড়িটি ঘর করিয়া তাহাতে এক একটি চিহ্ন করিয়া বলিলেন যে 'এই পদকের উপর এইরূপ ঘর কাটিয়া এই চিহ্নগুলি প্রত্যেক ঘরে ঘরে খোদাইয়া লও।' আমি তদনুরূপ করিলাম।"

"পদকটি প্রস্তুত হইলে মুস্তান উহা লইয়া কয়েক দিন নিজের

কাছে রাখিলেন। তিনি কখনও উহাকে মুখের ভিতর রাখিতেন, কখনও উরুদেশের তলে রাখিয়া তদুপরি বসিতেন, কখনও বা তাঁহার গাঁজার কলিকার উপর রাখিতেন। তিনি প্রায়ই একখান চেয়ারে বসিতেন ও পার্শ্বে একটি ছোট অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেন। এই গাঁজার কলিকা ও হুঁকা তাহার সহিত থাকিত না, আমার বাটীতে থাকার সময় আমার অফিসের একটি মুসলমান পিয়ন গাঁজা সাজিয়া মুস্তানকে দেওয়ায় তিনি খাইলেন ও সেই অবধি তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে গাঁজা সাজিয়া দিতে হইত। আমি ঐ পদকটি মান্দ্রাজে আমার স্ত্রীর জন্য পাঠাইয়া দিলাম, পদক ধারণ করা অবধি তাহার আর কোন উপদ্রব হয় নাই।"

"আমাদের গ্রামে একটি মিসনারীদের আকড়া ছিল। দুইজন পাদরি একদিন আমাদের মুস্তানকে দেখিতে আসেন। মুস্তান চেয়ারে বসিয়া গাঁজা খাইতেছেন, পাদরি দুইজনা তাঁহার দিকে চাহিয়া বসিয়া আছেন। তাহাদের মধ্যে বৃদ্ধ পাদরিটি মুস্তানকে বলিলেন, 'তুমি কেন গাঁজা খাওয়া ছাড় না, গাঁজা খাওয়া যে বড় মন্দ কাজ তাহা কি তুমি জান না।' ...রে আমার দিকে চাহিয়া পাদরি পুঙ্গব বলিলেন, দেখুন আপনারা ইহাকে ভক্তি করেন, এবং ইহাকে একজন মহৎলোক বলিয়া মনে করেন, কিন্তু দেখুন লোকটা গাঁজা খায়, গাঁজা খাওয়া অতিশয় মন্দ ও ঘৃণিত কাজ সন্দেহ নাই।' আমি চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু আমাদের মুস্তান হিন্দিতে উত্তর করিলেন, 'হা হতভাগ্য পাদার! গাঁজা খাওয়া মন্দ কাজ আমি বুঝি, আমি তোমার সহিত চুক্তি করিতেছি, আমি এই কু-অভ্যাস ত্যাগ করিব, যদ্যপি তুমি তোমার নানা প্রকার কু-অভ্যাসের মধ্যে একটি ত্যাগ করিতে পার।' পাদরি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'আমার কি কু-অভ্যাস আছে?' মুস্তান বলিলেন, 'তুমি মদ খাও।' পাদরি বেচারার মুখ শুষ্ক

হইল এবং বলিল 'আমি মদ খাই বটে কিন্তু কখনও বেশী মাত্রায় খাই না, বিশেষ মদে লোকের ক্ষতি হয় না, কিন্তু গাঁজাতে লোক মারা যায়।' মুস্তান কহিলেন, 'তুমি এমন কথা কলিতেছ? আচ্ছা, এস যত গাঁজা খাইলে লোক মরে সেই পরিমাণ গাঁজা তুমি আমাকে আনাইয়া দেও, আমি তাহা খাইতে প্রস্তুত হইব, যে পরিমাণ মদ খাইলে লোক মরে আমি বুঝি, সেই পরিমাণ মদ যদ্যপি তুমি খাইতে সম্মত হও।' পাদরি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন, এবং প্রচুর গাঁজা আনাইলেন, গাঁজার বস্তাটি প্রায় একফুট উচ্চ একফুট দীর্ঘ ও একফুট প্রস্থ বোধ হইল। অনেকগুলি কলিকা আনা হইল ও বহুলোকে গাঁজা সাজিয়া দিতে লাগিল। মুস্তান এক এক টানে এক এক কলিকা গাঁজা ভস্ম করিতে লাগিলেন, প্রায় এক ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে গাঁজার বস্তা শেষ হইল। তিনি গাঁজা শেষ করিয়া পাদরিদের বলিলেন, 'হে পাদরি, আমি ত তোমার গাঁজা খাইলাম ও মরিলাম না।' পাদরির অবস্থা খারাপ হইয়া উঠিল, বেচারার শুষ্কমুখ হইল, কিন্তু মুস্তান ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি বলিলেন 'এক্ষণে তোমাদের পালা, আমি যে পরিমাণ মদ আনিব তাহা তোমাদের খাইতে হইবে।' পাদরিদ্বয় তাড়াতাড়ি উঠিল, মুস্তানকে ঘাড় নত করিয়া সেলাম করিয়া, পলায়ন করিল।"

"অবশ্য মুস্তানের গাঁজা খাওয়াকে দোষাবহ নহে বলা যায় না, কিন্তু এরূপ হওয়াও আশ্চর্য্য নহে যে, আত্মম্ভরী পাদরি বেচারাদের শিক্ষা দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় তিনি পূর্ব্ব হইতেই ছল করিয়া গাঁজা খাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।"

"কেবল যে মিসনারীরাই মুস্তানকে অপগ্রাহ্য করিত তাহা নহে, আমার আফিসের কালেক্টর সাহেব যাঁহার অধীনে আমি কর্ম্ম করিতাম তিনি প্রায়ই মুস্তানের কথা বলিতেন ও তাহাকে পাগল বলিতেন,

অথচ তিনি প্রায়ই মুস্তানকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেন। একদা মুস্তানের সহিত আমি কালেক্টর সাহেবের বাটীর সম্মুখের রাস্তায় বেড়াইতেছি, এমন সময়ে কালেক্টর সাহেব সস্ত্রীক আমাদের সম্মুখে পড়ায় তিনি মুস্তানকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কি সেই পাগল যাহার কথা তোমার নিকট শুনিয়াছিলাম।' আমি বলিলাম 'ইনিই মুস্তান আমার বাটীতে অতিথি হইয়াছেন।' সাহেব বলিলেন, 'উহাকে জিজ্ঞাসা কর আমার কবে পদোন্নতি হইবে।' মুস্তান কহিলেন, 'তুমি কখনও উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না, শীঘ্র তোমাকে স্বদেশে চলিয়া যাইতে হইবে।'

"কালেক্টর সাহেব মুস্তানের উক্তি শুনিয়া বলিলেন, 'ইহা হইতেই লোকটিকে পাগল বলিয়া বুঝা যায়, আমার অল্পদিন পরেই পদোন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে, এবং এই অল্পদিন হইল আমি বিলাত হইতে আসিয়াছি ; তুমি জান, আমার কিছুকাল আর স্বদেশ যাইবার প্রয়োজন হইবে না।' আমরা এই কথার পর বাটী ফিরিলাম। কয়েকদিন পরেই কালেক্টর সাহেবের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল, চিকিৎসকে তাঁহাকে স্বদেশে যাইবার ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহাকে বহুদিনের ছুটি লইয়া বিলাত যাইতে হইল, আমি পরে জানিলাম যখন তিনি পুনরায় এদেশে আসিলেন, জনৈক চিকিৎসক ভারতের জলবায়ু তাঁহার পক্ষে একেবারে অসহ্য বলিয়া মত প্রকাশ করায় তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইল।"

"আমাদের বাটীতে মুস্তানের নিকট অনেক লোক পীড়ার ঔষধের জন্য আসিত। একটি বৈশ্য ভদ্রলোক বহুকাল হইতে হাঁপানি পীড়ায় ভুগিয়া মুস্তানের নিকট আসেন। মুস্তানের কথামত কার্য্য করিতে বৈশ্য সম্মত হওয়ায়, তিনি বলিলেন, অমাবস্যার রাত্রিতে কিছু ঘৃত ও পলিতা ও একটি দীপ লইয়া একা তুমি সমুদ্রতীরে যাইবে এবং তথায়

দীপটি ঘৃত ও পলিতা দিয়া জ্বালিয়া তীরে রাখিয়া তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে, পরে কি করিতে হইবে তাহার আদেশ সেই সময় পাইবে।' আমাদের গ্রাম হইতে সমুদ্রতীর আট মাইল দূরে, অন্ধকার রাত্রে একা যাইতে বৈশ্যের প্রথমে সাহস হইল না, শেষে রোগের জ্বালায় মনে সাহস করিয়া সমুদ্রতীরে যাইয়া দীপ জ্বালিয়া দুইবার প্রদক্ষিণের পর সহসা পার্শ্বে মুস্তানকে দেখিতে পাইল, মুস্তান তাহার পিট চাপড়াইয়া বলিলেন, 'ভাল ভাল, তৃতীয় বার প্রদক্ষিণ করিয়া ফেল। তোমার কোন ভয় নাই।' প্রদক্ষিণ শেষ হইলে মুস্তান বৈশ্যটির সহিত বরাবর গ্রামের দিকে আসিলেন, কিন্তু গ্রামের সন্নিকটে আসিয়া অদৃশ্য হইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই রাত্রে মুস্তান বরাবর আমার নিকট ছিলেন। লোকটির হাঁপানি আরাম হইল, আর হয় নাই।"

"মুস্তানের ফটো তুলাইয়া রাখিবার আমাদের বড় ইচ্ছা হয়। গ্রামের একজন ডাক্তারের ক্যামেরা ছিল, তিনি ফটো তুলিতে সম্মত হইলেন। অনেক অনুরোধের পর মুস্তানকে ফটোর জন্য বসাইতে মত করিলাম। মুস্তানের গাত্র বস্ত্র দিয়া ঢাকা দেওয়া হইল। তিনি বসিলেন। ডাক্তার ক্রমশঃ সাত খানি প্লেট নষ্ট করিলেন, অর্থাৎ সাত বার ফটো লইলেন, পরে চেহারা উঠান কার্য্য (ডেভেলপ্ করা) শেষ হইলে দেখা গেল যে মুস্তানের দেহের বেশ ছবি উঠিয়াছে, কিন্তু মস্তক আদৌ উঠে নাই, সাতবার এইরূপ হওয়ায় ডাক্তার বেশ বুঝিলেন যে, ইহা ক্যামেরার দোষ নহে বা তাঁহার নিজের কৃতিত্বের দোষেও ঘটা সম্ভব নহে, তখন তিনি ভাবিলেন যে তিনি মুস্তানকে ভক্তি করেন না বলিয়া মুস্তান তাহার এই দণ্ড করিতেছেন, তখন মুস্তানের নিকট তিনি ক্ষমাপ্রার্থনা করায় মুস্তান বলিলেন, 'তুমি কি এখনও আমাকে পাগল বলিতে চাও?' ডাক্তার বলিলেন, 'না'—

আমি নিজ কার্য্যের জন্য বড় দুঃখিত আছি, মুস্তান ফটো লইতে অনুমতি দিলেন, এবারে সুন্দর ফটো উঠিল।"

"আমার বাটীতে তিন সপ্তাহ থাকিবার পর তিনি যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রায় ১০ ক্রোশ দূরে একটি গ্রামে আমি কয়েকটি বন্ধুসহ মুস্তানকে লইয়া গেলাম। এখানে একটি লোককে আমাদের থাকিবার জন্য একটি বাসা ঠিক করিয়া রাখিতে পূর্ব্ব হইতে সংবাদ দিয়াছিলাম, তিনি গ্রামে অন্য ঘর না পাইয়া একটি ভূতের আবাসযুক্ত ঘর আমাদের জন্য স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই বাটী তিন বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়, যাহার বাটী তিনি ইহাতে এক রাত্রিমাত্র বাস করিয়াছিলেন, সেই রাত্রিতেই শয্যাসহ তাহাকে তুলিয়া লইয়া কে রাস্তায় রাখিয়া দিয়াছিল! লোকে মনে করে, এই বাটীতে কোন দৈত্য বাস করে; এইজন্যই কেহ এই বাটীতে থাকে না, বাটী পড়িয়া আছে। আমরা ঐ বাটীতে যাইয়া একটি ঘরে সকলে রাত্রে নিদ্রিত হইলাম, মুস্তান কেবল তাঁহার চেয়ারে বসিয়া রহিলেন। মধ্যরাত্রে মুস্তানের উচ্চ কথা শুনিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি বলিতেছেন—'মুরসাদ, মুরসাদ, এই দৈত্য আমা অপেক্ষা অধিক বলবান, এস আমাকে সাহায্য কর।' মুরসাদ অর্থে গুরু বুঝায়। আমি দেখিলাম, মুস্তান চেয়ারের নিকট দাঁড়াইয়া কাহার সহিত রাগান্বিত ভাবে কথা কহিতেছেন। তিনি কাহার সহিত কথা কহিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে বা দেখিতে পাইলাম না, এবং অন্যের কথাও শুনিতে পাইলাম না। কিছু পরে মুস্তান চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন ও বলিতে লাগিলেন, 'এতক্ষণে আমি এই দুর্বৃত্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম, যদিও এটি একটি শক্ত লোক, এবং আমাকে গুরুদেবের সাহায্য পর্য্যন্ত লইতে হইয়াছিল'।"

"মুস্তান পরে আমাকে বলিলেন, 'এই বাটীতে একটি দুষ্ট ও শক্তিশালী দৈত্য বাস করিত। পরদিন প্রাতে আমরা গৃহস্বামীকে

তাঁহার বাটীতে আসিয়া বাস করিতে বলিলাম, আমরাও তাহার সহিত ঐ বাটীতে তিনদিন রহিলাম। ইতিমধ্যে দৈত্য আর ফিরিল না বা কোন অত্যাচার করিল না।' এই দিন বৈকালে মুস্তান কিছু মন্ত্রপাঠ করিয়া আমাদের লইয়া একটি গাছের তলায় যাইলেন, গাছটি গ্রাম হইতে আধ ক্রোশ দূরে, তথায় আরও কয়েকটি মন্ত্রপাঠ করিয়া তিনি গাছে একটি পেরেক পুঁতিয়া দিয়া বলিলেন, 'দৈত্যটি এইগাছে আবদ্ধ রহিল, এই গাছের তলায় যেন কেহ নিদ্রা না যায়'।

"মুস্তান পুনরায় অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিলেন, আমাকে তিনি একটি ছোট ঘোড়া সংগ্রহ করিতে বলায়, একটি ঘোড়া আমি দিলাম। ঘোড়াটি জিন ও লাগাম দেওয়া প্রস্তুত, কিন্তু মুস্তান তাহার জিন ও লাগাম খুলিয়া ফেলিলেন, পরে তিনি ঘোড়াটির উপর তাহার লেজের দিকে মুখ করিয়া বসিলেন ও আমাদের সহিত কথা কহিতে কহিতে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন, ঘোড়াটি যেন লাগাম দ্বারা চালিত হইতেছে, এরূপভাবে যাইতে লাগিল। কিয়দ্দূর যাইয়া আমরা সকলে বাটীর দিকে ফিরিলাম মুস্তান চলিয়া গেলেন, তাহার পর আর তাঁহাকে দেখি নাই।"

"জনৈক পণ্ডিতজীর নিকট হইতে ইহার সম্বন্ধে আর একটী সংবাদ এইরূপ পাওয়া যায়। ১৮৮২ সালের মে মাসে মহামতি কর্ণেল অলকট ও গুপ্তবিদ্যার প্রকাশিকা শ্রীমতী হেলেনা পেট্রোভ্না ব্ল্যাভাট্স্কি দুই জনে নেল্লোর নগরে পরাবিদ্যাসমিতির একটি শাখা স্থাপন করিয়া বকিমহাম্ ক্যানাল দিয়া গুণ্টুর নগরে যাইতেছিলেন, পথি-মধ্যে রামায়াপট নামে আমার জনৈক বন্ধুর সহিত তাহাদের দেখা হয়, বন্ধুটি ওঙ্গোলের কালেক্টরি আফিসে সেরেস্তাদারের কাজ করেন। বন্ধুটি উহাদের নৌকায় উঠিলেন এবং শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কি উহার পায়ে কাপড় বাঁধা রহিয়াছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় জানিলেন যে, তাহার

পায়ে একটি দুষ্ট ক্ষত হইয়াছে, নানা প্রকার চিকিৎসাতেও ইহা সারিতেছে না। ইহাতে বিদুষী শ্রীমতী হেলেনা বলিলেন, এক বৎসর পরে তোমার একটি মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, তিনি তোমার ক্ষত আরাম করিবেন। ঠিক একবৎসর পরে এই মুস্তান ওঙ্গোলে আসেন। তিনি সেরেস্তাদারের ক্ষত দেখিয়া নিজের মুখ হইতে একটু থু থু লইয়া ঐ ক্ষততে মাখাইয়া দিয়া তাহাকে স্নান করিতে বলিলেন। ক্ষত তৎক্ষণাৎ সারিয়া যাইতে আরম্ভ হইল এবং দুই দিনের মধ্যে একেবারে সারিয়া গেল। শ্রীমতী ব্লাভাট্‌স্কিও এই মুস্তানকে জানিতেন দেখা যাইতেছে।" মুস্তানের ফটোর একটি চিত্র ও তাঁহার দত্ত পদকের চিত্র ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসের 'থিয়জফিষ্ট'-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং এই বিবরণও উক্ত পত্র হইতে সঙ্কলিত হইল।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যক্ষের প্রতিহিংসা।

গত পূজার বন্ধে বিজয়া দশমীর পর একদিন সন্ধ্যার সময় আহ্নিক শেষ করিয়া ছাদ হইতে নীচে আসিয়া শুনিলাম, বাড়ীতে এক ঘোরতর কলরব পড়িয়া গিয়াছে। স্ত্রী বলিল, 'সুরেন্দ্রের ফিট উঠিয়াছে; সুরেন্দ্র পাক করিতেছিল, হঠাৎ ফিট হওয়াতে উনানের মুখে পড়িয়া যায়, প্যারী ঝি না থাকিলে ছেলেটি একেবারে পুড়িয়া ছাই হইত! তাই তাহাকে লইয়া এই হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।' আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, সেখান হইতে সুরেনের অমানুষিক বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল। আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, সুরেনের উপর ৬ মাস পূর্ব্বে একবার ভৌতিক আশ্রয় হইয়াছিল, ওঝার কবচ

ধারণ করিয়া মুক্তি পায়। সেই হইতে তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে নিরুপদ্রব মনে করিত। এইবার আমার একটু সন্দেহ হইল। আমি আমার কোন বন্ধুর নিকট হইতে ভূতের দু' একটা মন্ত্র শিখিয়াছিলাম। তাহার একটী পরীক্ষা করিতে বড়ই ইচ্ছা হইল। আমার বিশ্বাস ছিল যদি প্রকৃত ফিটের ব্যারাম হয়, তবে আমার মন্ত্রের কোন কার্য্য হইবে না, তাহা না হইলে আমার ক্ষুদ্র মন্ত্রের সাহায্যে বালকটীর জীবনরক্ষা হইতে পারে। আমি সুরেনের বিছানায় যাইয়া দেখিলাম, ১২ জন লোক তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। পায়ের ও হাতের এক একটি আঘাতে ৪।৫ জন লোক যেন তৃণবৎ ঝরিয়া পড়িতেছে। ১৮ বৎসর বয়স্ক একটী বালকের সহিত এতগুলি লোকের রণাভিনয় দেখিয়া আমি বাস্তবিকই কিছুকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। স্থির করিলাম, ইহা নিশ্চয়ই ভৌতিক উপদ্রব। একজন চাকরকে দিয়া কয়টি ছোট কচুর ডগা আনাইলাম, এবং একটি ডগাতে মন্ত্র পড়িয়া সুরেনের কানের ভিতর দিবার নিমিত্ত একটি লোককে বলিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, ডগাটি হাতে লইবামাত্র লাফালাফি চতুর্গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং কোন রকমেই কানের ভিতর ডগাটি প্রবেশ করাইতে দিল না। আমি আদেশ করিলাম, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া এই কচুর ডগা কানের ভিতর দাও। ডগাটি কানের ভিতর দিয়া একবার নাড়িবা মাত্র সুরেন আমাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল এবং নিম্নলিখিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল :—

সু। তুমি কে? কেন আমাকে কষ্ট দাও?

আ। তুমি কে, আগে আমাকে বল। না হ'লে আমার পরিচয় তোমাকে দিব না!

সু। তুমি আমাকে চেন, সুরেন্দ্রবিজয় দাস তোমার কেহ নহে, তার জন্য আমাকে কষ্ট দেওয়া তোমার উচিত হইতেছে না, তোমার

কচুর ডগায় আমাদের ভারি যন্ত্রণা হয়, তোমার আত্মীয়কুটুম্বের অমঙ্গল হইবে।

আ। তোমার ঐ কথাকে আমি ভয় করি না, তুমি কে বল। না হয় আবার কচুর ডগা কানের ভিতর দিব।

সু। দেখ! আমারা দুইজন, আমি যক্ষ ও আর একজন কাল ইহাকে লইয়া বসিয়াছি।

আ। কি অপরাধে ইহার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছ?

যক্ষ। এই ছেলেটা মহাপাপী ও হতভাগা। তিনজন ব্রাহ্মণকে অনর্থক লাথি মারিয়াছে। একজনের নাম কালীপ্রসন্ন, একজনের নাম তারিণীচণ, ও একজনের নাম উমাচরণ।

সুরেনের পিতা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইহা প্রকৃত।

আ। সুরেন তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তোমরা তাহাকে ছাড়।

যক্ষ। অসম্ভব। তাহার রক্ত খাইব। তাহার বংশ পর্য্যন্ত ধ্বংস করিব। তাহার ভগিনী ও ভাগিনেয়াকে বিনাশ করিয়াছি, তাহার সসত্বা জ্যেঠাই মাকে নষ্ট করিয়াছি এবং তাকেও নষ্ট করিব। আমাদের সাহায্য তার মাও করিতেছে।

আ। তার মা তোমাদের সঙ্গে জুটিল কেমন করিয়া? সেও মরিয়াছে আজ ১২।১৪ বৎসর হইবে।

যক্ষ। তার মা অমুক্ত, হতভাগ্য তার মার সপিণ্ডকরণ এমন কি একটা মাসিকও করে নাই। সে এখন এখানে আসিয়াছে, তার মাথার নিকট দাঁড়াইয়া আছে।

সুরেনের পিতা কহিল, ইহা সমস্ত সত্য কিছুই মিথ্যা নহে।

আ। তোমরা তাহাকে কোথায় আশ্রয় করিলে?

যক্ষ। আমরা নিধুরাম সেনের পুকুর পারে যে তাল গাছ আছে,

সেখানে থাকি। এই ছেলেটী একদিন দুপুরে সেখানে গিয়াছিল, প্রতিহিংসাবশতঃ পাইয়া বসিয়াছি।

আ। তোমরা কি কাহারও উপকার করিতে পার না ?

যক্ষ। কাহারও উপকার করিবার ইচ্ছাও আমাদের মনে হয় না। অপকার করিতে ভাল লাগে। সুরেনের হাতপাগুলি যদি ভাঙ্গিয়া দাও, তবে আমাদের বড় আনন্দ হইবে।

আ। তুমি পূর্ব্বে কি ছিলে, আর কেনই বা এইরূপ অবস্থায় আছ ?

যক্ষ। আমি এক জন্মে বরুয়া ছিলাম (বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীকে আমাদের দেশে বরুয়া বলে) তার পর একবার ব্রাহ্মণ হইয়াছিলাম। সঞ্চিত অর্থ অনেক ছিল, সেই অর্থের দায়ে পড়িয়া এই দুর্গতি হইয়াছে। কিছুতেই আর উর্দ্ধে যাইতে পারিতেছি না।

আ। তোমরা এখন বালকটিকে ছাড়, যাহা চাও তাহা দিব।

যক্ষ। এক জোড়া পাঁঠা দিয়া ঐ তালগাছ তলে পূজা দিতে হইবে। ১৫ জন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইবে, তবে ছাড়িব ; কিন্তু একেবারে যাইব না। সুরেন্দ্র হয় অন্ধ হইবে, নয় আতুর, নয় পাগল হইয়া মরিবে। ইহার যেটি ইচ্ছা নিতে পার, তবে আমরা যাইব।

আ। ইহা অত্যন্ত অন্যায় কথা, না যাও ত আবার ডগা মারিব, এবং মা মগধেশ্বরীকে জানাইব।

মগধেশ্বরী চট্টলের একটী প্রত্যক্ষ দেবতা। সমস্ত অপদেবতারা ইঁহাকে ভয় করে বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

যক্ষ। তাঁহাকে আমরা ভয় করি না, আমরা শঙ্করের অনুচর, মগধেশ্বরীর কথায় ছাড়িব না।

'এমন সময় আর একটী মন্ত্র পাঠ করিলাম। সুরেন বলিতে লাগিল, 'আমি মগধেশ্বরী তোমার কাছে আসিয়াছি, কি চাও।"

আ। বালকটিকে রক্ষা কর।

মগধেশ্বরী। আমি পারিব না, আমি তিন বার ইহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, একবার কুমিল্লায়, এক বার চট্টগ্রামে, এক বার তাহার বাড়ীতে। আজ চৌদ্দ বৎসর হইল, আমায় একটী সেবা দিবার মানসিক ছিল, তাহাও দেয় নাই। যাক্ সে কথা, কিন্তু এই দুটি আমার অনুগত নহে, তাহারা আমার কথায় ছাড়িবে না।

কুমিল্লায় যখন জ্যেঠা মহাশয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন ডেপুটি ছিলেন, তখন সুরেন তাহার পিতার সহিত সেখানে ছিল। তাহার পিতা সেখানে পাক করিত, সেই সময় একবার সুরেনের উৎকট রোগ হইয়াছিল বলিয়া তাহার পিতা স্বীকার করিল।

আ। মা তুমি যেমন করিয়া পার ছেলেটির প্রাণ বাঁচাও।

মগধেশ্বরী। আমি এইখানে থাকিতে পারিতেছি না, স্থানটি অপবিত্র, তাহাকে বিষ্ণুমণ্ডপে লইয়া আইস। আমি একবার শিবকে অনুরোধ করিয়া দেখিব।

এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতেই, আবার লাফালাফি আরম্ভ হইল। আমি ইতিমধ্যে শান্তিরাম দে নামক একটী ওঝাকে ডাকিতে পাঠাইলাম। সে আমাদের বাড়ীতে পা দিবা মাত্রই অজ্ঞান সুরেন ভয়ানক কুৎসিৎভাবে তাহাকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। সে আসিয়া একটি কলার ডগায় কি মন্ত্র পড়িয়া ভয় দেখাইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তাহারা কিছুতেই ছাড়িবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। অগত্যা সুরেনকে ধরাধরি করিয়া মণ্ডপে আনা হইল। সেইখানেও প্রায় এক ঘণ্টাকাল নানারূপ চেষ্টা করিবার পর উভয়ে তাহাকে পরিত্যাগ করে। তবে এই প্রতিজ্ঞা করাইল যে, পাঁঠা দিয়া পূজা দিতে হইবে, দুটি পারাবত কাটিয়া নিধুরাম সেনের পুকুরের জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। শিবের অনুগ্রহে তাহারা

বালকটিকে পরিত্যাগ করিল। যাইবার সময় এই বলিয়া গেল যে, আমরা চলিয়া যাইবার পর তাহার জ্ঞান হইবে ; কিন্তু ১৫ মিনিট কথা কহিতে পারিবে না। বাস্তবিকই তাহা হইল। সুরেন্দ্র ভাল হইলে পরও ১৫ মিনিট বোবার মতন ছিল। জিজ্ঞাসা করিলে কোন কথার জবাব দিতে পারিত না। রাত্রি ১১টার সময় সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়। আজ পর্য্যন্ত তাহার উপর আর দ্বিতীয় আক্রমণ হয় নাই। এই ঘটনা দেখিবার জন্য অনেক লোক উপস্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে আমার পিতাঠাকুর স্বয়ং ছিলেন ও দুই একজন খ্যাতনামা পণ্ডিতও উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীসুখেন্দুবিকাশ রায়।
চট্টগ্রাম জজ কোর্টের উকীল।

অদ্ভুত জন্ম।

আমি আজ প্রায় ১০ বৎসর অতীত হইল বিবাহ করিয়াছি। সন্তানসন্ততির মধ্যে তিনপুত্র, দুই কন্যা। সকলেই সুস্থ শরীরে বর্ত্তমান। সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র সন্তান ১৩১৬ সালের ৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার প্রাতঃকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

যে ঘটনাটি বিবৃত করিতেছি, তাহা আমার এই কনিষ্ঠ শিশু পুত্রটীর জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত থাকায় এতদ্‌সম্বন্ধে ২।৪ কথা বলিতে হইল। শিশুটী মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত যত ঘটনা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, সমস্তই অতি আশ্চর্য্য ও অলৌকিক রহস্যে পরিপূর্ণ।

প্রথমতঃ শিশুটী মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতেই দেখা গেল যে, উহার "চুন্নত" সমাধা হইয়াছে অর্থাৎ আমাদের শাস্ত্রের আদেশ-

অনুসারে প্রত্যেক পুত্র সন্তানকে ৪ বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া ১০।১২ বৎসর বয়সের মধ্যে জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগের চর্ম্ম কর্ত্তন করিয়া ঘুরাইয়া উল্টাইয়া দেওয়া হয়। ১৫।১৬ দিন মধ্যে ঘা শুকাইয়া যায়। এই জননেন্দ্রিয়ের কর্ত্তিত স্থানে এক প্রকার কাটা' চিহ্ন থাকিয়া যায়। প্রত্যেক মুসলমানকেই এই অনুষ্ঠান সমাধা করিতে হয়, নতুবা সে মুসলমান নহে। সে ঘোর নারকী এবং সমগ্র মুসলমান সমাজে সে একঘরে অর্থাৎ আপনাদের উপনয়ন (পৈতা) দীক্ষা কার্য্য যেমন গুরুতর, আমাদের এই 'ছুন্নত' কার্য্যও তদ্রূপ গুরুতর, (ফড়ক) শিশুটী মাতৃগর্ভ হইতেই এইভাবে অর্থাৎ পূর্ণ-'ছুন্নত' হইয়া কর্ত্তনচিহ্নসহ জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

প্রথম দিনের ঘটনাটী এইরূপ:—ছেলেটী সবে এই ৫ মাসে পড়িয়াছে, বিগত ফাল্গুন মাস হইতে ঘটনার সূত্রপাত হয়। শিশুটীকে রাত্রিতে বিছানায় শোওয়াইয়া রাখা হইয়াছে, অতি প্রত্যূষে শিশুর জননী নিদ্রাভঙ্গের পর চাহিয়া দেখে শিশু বিছানায় নাই। এ ঘর ও ঘর আনাচ-কানাচ পাতিপাতি করিয়া অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। সকলেই ব্যতিব্যস্ত, শিশুর জননী কাঁদিয়া আকুল ও অচৈতন্য। পরে সকলের হা-হুতাশ নিবৃত্তি হইল। প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা পরে অন্য ঘরের বারান্দায় সিঁড়ির ধাপের উপর ছেলেকে ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল।

২য় দিনের ঘটনা।—প্রথম ঘটনার ২।৩ দিন পরে রাত্রি অনুমান ৯টার সময় শিশুটী অদৃশ্য হইয়া যায় এবং আধ ঘণ্টা পরে অন্য ঘরের মধ্যে রোরুদ্যমান অবস্থায় পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, যে ঘরে শিশুকে পাওয়া গেল, সে ঘরটার চারিদিকে কাঠের বেড়া এবং সমস্ত অর্গল ও দরজা লৌহকীলকে বন্ধ ছিল। প্রায় এক মাসের অধিককাল এই ঘরে কেহই অবস্থান করে নাই।

৩য় দিনের ঘটনা।—রাত্রি আন্দাজ সাড়ে তিনটার সময় ছেলেটিকে দুগ্ধ পান করাইয়া মাতৃপাশে শোওয়াইয়া রাখা হইয়াছে, ঠিক পনের মিনিট কাল না যাইতেই ছেলে আবার অদৃশ্য হইল। সকলেই সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি ঐ ভাবেই কাটিয়া গেল। পরদিন অতি প্রত্যূষে পূর্ব্বকথিত ঘরের বারান্দায় ঘুমন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল। তাহার পর হইতে প্রায় ৩।৪ দিন অন্তর কিম্বা হয়ত ২।১ দিন পরে রাত্রিতে অথবা প্রকাশ্য দিবা-লোকে মাতা ও ধাত্রী ও অন্যান্য শত শত চক্ষুর পরিরক্ষিত অবস্থার মধ্যে শিশুটী অদৃশ্য হইয়া সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হইতেছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শিশুর অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বে ও পরে অদৃশ্য স্থানের চতুর্দ্দিকে কেমন এক প্রকার মনোপ্রাণ-মাতোয়ারা সৌরভ অনুভূত হইতে থাকে। যেন নিকটেই কোন ফুলের বাগান হইতে উক্ত সৌরভ আসিতেছে। অথবা কেহ আতর ঢালিয়া দিয়াছে, এরূপ অনুভব হয়। এখনকার ঘটনায় অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ছেলে অদৃশ্য হইবার পর আর পূর্ব্বের ন্যায় ঘুমন্ত বা রোরুদ্যমান অবস্থায় পাওয়া যায় না, হয় ত কোনও দিন বাটীর যে ঘর অপেক্ষা-কৃত পবিত্র সেই ঘরের মধ্যে কিংবা হয় ত প্রাঙ্গণে সবুজ দূর্ব্বা ঘাসের উপর পাওয়া যায়।

এই অলৌকিক রহস্যপূর্ণ ঘটনাটীর বিবরণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইহার যুক্তিতত্ত্ব মীমাংসা-সম্পর্কে আমার নিম্নলিখিত কৌতূহল-দীপক প্রশ্নগুলির যথাযথ ব্যাখ্যা ও উত্তরপ্রদানে আমাদের ঔৎসুক্য নিবৃত্তি করিবেন এবং শিশুর জননীর শোকসন্তাপিত হৃদয়ের আশু শান্তিদায়ক যদি কোন সিদ্ধ যোগী বা সাধু-সন্ন্যাসী ফকির আপনার জানা বা পরিচিত থাকে, তবে তাঁহাদিগের নিকট উল্লিখিত ঘটনাটী আদ্যোপান্ত জানাইয়া যে কোনও প্রতিকার বিহিত বিবেচনা করেন,

লিখিয়া জানাইলে আপনাদিগের সমীপে আমরা যাবজ্জীবন চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ও চির-বাধিত থাকিব।

১ম প্রশ্ন। যে শিশুর বয়স সবে মাত্র ৫ মাস, হাঁটিতে পারে না, সে কোন্ শক্তির বলে শত শত লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথায় নীত হয়?

২য় প্রশ্ন। যদি কোন প্রেতাত্মার দৈব শক্তির বলে অদৃশ্য হয়, তবে কোথায় অবস্থান করে ও পুনর্ব্বার আইসে কেন?

৩য় প্রশ্ন। ঐ প্রেতাত্মা ছেলেটী লইয়া গিয়া অনিষ্ট করে কি না কিম্বা ভবিষ্যতে উহার কোন অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে কি না; কিম্বা হইতে পারে কি না?

৪র্থ প্রশ্ন। লোকচক্ষুর অন্তরালে দীর্ঘ সময় এমন কি প্রায় ১৫।১৬ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়; শিশু ক্ষুধা-তৃষ্ণায় বা কেন কাতর হয় না?

৫ম প্রশ্ন। লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়া আবার যখন তাহাকে পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন হয়ত ঘুমন্ত কিংবা সহজ সুখাসনে ক্রীড়ারত, হাস্যস্ফুরিতবদনে বা স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক অবস্থায় পাওয়া যায় কেন?

৬ষ্ঠ প্রশ্ন। যে প্রেতাত্মার দৈবীশক্তিতে শিশুটি পরিচালিত হয়, তাহার উদ্দেশ্য অনিষ্ট করা কি মঙ্গল করা?

আমরা সকলেই বিশেষতঃ শিশুর জননী উদ্বিগ্নভাবে আছেন এবং আমরা সকলেই সমস্ত রাত্রি বিনিদ্রভাবে কাটাইতেছি।

আশা করি, আপনি কোনও সিদ্ধ মহাযোগী ও সাধু সন্ন্যাসী ফকিরের নিকট হইতে ইহার প্রতিকারকল্পে যে কোন উপায় হয়, লিখিয়া জানাইবেন। *

শ্রীসৈয়েদ জামালদ্দিন্।

---

* পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ উপরোক্ত প্রশ্নগুলির কোন সুমীমাংসাসূচক উত্তর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমরা তাহা প্রকাশিত করিব। অঃ সঃ।

"পুনরাগমন।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৩৫)

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার দেখিয়া বন্ধুটী স্তম্ভিত। আমি মাথা তুলিয়া দেখি তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলাম। বলিলাম—"পিতার কথায় বুঝিলেন, আমাকে একটী আত্মীয়ের সন্ধানে এখনই গৃহত্যাগ করিতে হইবে।"

বন্ধু বলিলেন—"বুঝিয়াছি। আর ইহাও বুঝিয়াছি, সেই আত্মীয়ের সঙ্গে আপনার পিতার ব্যাধির একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।"

আমি বলিলাম—"ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না হউক, আপনার অনুমান একেবারেই ভিত্তি-শূন্য নয়—কিছু সম্বন্ধ আছে।"

বন্ধু। যে রোগ আপনার পিতার হইয়াছিল, বোধ হয় একান্ত মানসিক উদ্বেগই তাহার কারণ। আপনি যত শীঘ্র পারেন, আপনার আত্মীয়কে সন্ধান করিয়া লইয়া আসুন।

আমি। কিন্তু সন্ধানের উপায় হারাইয়াছি।

বন্ধু। কিসে?

আমি। একখানি পত্র—আত্মীয় যেখানে আছেন, সেই পত্রে সে স্থানের ঠিকানা আছে। পত্র আমার জামার পকেটে ছিল। কালিকার দুর্ঘটনায় বোধ হয় তাহা পথে পড়িয়া গিয়াছে।

আমার সমস্ত রক্তাক্ত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত করিয়া বন্ধু নিজেদের ঘর হইতে আমাকে কাপড় ও জামা দিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,

"আমার জামার পকেটে যে যে বস্তু ছিল, সে সমস্তই তিনি নূতন জামার পকেটে রাখিয়াছিলেন।"

আমি দ্বিতীয়বার পকেট অনুসন্ধান করিলাম, পত্র পাইলাম না।

বন্ধু বলিলেন—"পত্র যদি না পাওয়া যায়, তা'হইলে সন্ধানের কি করিবেন?"

আমি উত্তর করিলাম—"তথাপি আমি তাহার সন্ধানে যাইব। যে ব্যক্তির গৃহে আমার আত্মীয় আছেন, তিনি একজন আতিথেয় ব্যক্তি। পল্লীগ্রামে তাঁহার গৃহের সন্ধান করিতে বোধ হয় কষ্ট পাইতে হইবে না।"

বন্ধু বলিলেন—"আপনি যদি একবেলা অপেক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে পত্রের একবার সন্ধান করিয়া আপনাকে সংবাদ দিই।"

আমি। পিতার আদেশ ত শুনিলেন।

বন্ধু। তথাপি আমি সংবাদ লইব।

এই বলিয়া বন্ধু প্রস্থানোদ্যত হইলেন। আমি পিতার আচরণের জন্য তাঁহার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বলিলাম—"পিতার মানসিক অবস্থার কথা আপনার অবিদিত নাই। সেইজন্য আপনাদের কৃত সহায়তার কথা তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। সময়ান্তরে পিতার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করাইয়া দিব, আপনার পিতার সঙ্গেও পরিচিত করিব, তখন দেখিবেন আমার পিতার প্রকৃতি কেমন মধুর।"

বন্ধু বলিলেন—"কৈফিয়ৎ আমাকে দিতে হইবে না। আপনার আঘাত-উপলক্ষে আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইলাম এবং আপনার আত্মীয়ের আগমন-সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক রহিলাম।"

বন্ধু বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমিও যাত্রার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, অতীতের সুখের সংসার ফিরাইয়া

আনিবার এমন শুভ সময় হয় ত আর আসিবে না। অর্থে, যশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছি বটে,কিন্তু গোপালের গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিও আমাদের গৃহত্যাগ করিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, অনুতাপে হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়াছে। আমি শান্তির আশায় ব্যাকুল হইয়াছি। সর্ব্বস্ব দিলেও যদি গোপাল ফিরিয়া আসে, গোপাল ফিরিয়া আসুক। আমি আমার সমস্ত প্রাপ্যই গোপালকে প্রদান করিব। পিতার উপার্জ্জনের এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিব না। কি গোপাল, কি পিতামহ উভয়েরই তুলনায় আমার চরিত্র আমারই কাছে এখন পশুবৎ প্রতীয়মান হইয়াছে। যদি পৃথিবী ঘুরিয়াও গোপালকে আনিতে হয়, আমি তাহাও করিয়া মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।

সঙ্কল্প স্থির করিলাম। শুধু তাই নয়, স্থির করিলাম, আমি একাকী যাইব। চাকর সঙ্গী পরের কথা, ঐশ্বর্য্যের চিহ্নমাত্রও সঙ্গে লইব না। গোপালের জন্য কাতর হইয়াছি, কিন্তু গোপালের উপর ঈর্ষা পরিত্যাগ করিতে পারি নাই। দারিদ্র্যে গোপাল কিরূপ সুখভোগ করিতেছে, তাহা বুঝিবার আমার ইচ্ছা হইল।

আমি গৃহত্যাগ করিলাম। সঙ্গে সামান্য মাত্র পাথেয় লইলাম। এমন মনের ভাব—চণ্ডীতলা পর্য্যন্ত পদব্রজেই যাইব। পিতামাতা কাহারও সহিত আর দেখা করিলাম না। আমি একরূপ গোপনেই গৃহত্যাগ করিলাম।

গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া নৌকাভাড়া করিতেছি, এমন সময় চির সুহৃৎ ডাক্তারবাবুর কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল—"একি গোপীনাথ, তুমি এমন সময়ে কোথায় যাইতেছ ?"

ফিরিয়া দেখিলাম, তিনি সস্ত্রীক গঙ্গাস্নানে আসিয়াছেন। গোপন করিতে পারিলাম না। কোথায় যাইতেছি, কেন যাইতেছি, তাঁহাকে বলিতে হইল।

শুনিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন—“এরূপ ঘটিবে—আমি আশা করিয়াছিলাম। আমি প্রভাতে তোমার পিতাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছি। তাঁহার স্বাস্থ্য-প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষা করিতে পারি নাই। গোপাল-সম্বন্ধে সমস্ত কথা ও শ্যামচাঁদের আচরণ তুমি যেমন যেমন আমাকে বলিয়াছিলে সমস্তই আমি তাঁহাকে বলিয়াছি। এখন বুঝিতেছি, মনুষ্যত্ব তোমার পিতাকে একেবারে ত্যাগ করে নাই। তবে এখন ঘরে ফিরিয়া চল, আমিও তোমার সঙ্গে গোপালের সন্ধানে যাইব।”

আমি বলিলাম—“ফিরিতে অনুরোধ করিবেন না, আমি গোপালকে না লইয়া ফিরিব না।”

ডাক্তারবাবু বলিলেন—“বেশ, বাড়ীতে যাইতে না চাও, আমার গৃহে চল। আমি তোমার বউঠাকুরাণীকে ঘরে রাখিয়া তোমার সঙ্গে যাই।”

এই সময় ডাক্তারবাবুর স্ত্রীও আমার কাছে আসিলেন। আমি কোথায় যাইতেছি জানিতে চাহিলেন. স্বামীর কাছে সমস্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন—“সেকি, গোপীনাথ যদি না ফিরে, তুমিও তাহার সঙ্গে যাও। যদিই কর্ত্তার মতি ফিরিয়া থাকে, যদিই মা শুভচণ্ডী গোপালকে আনিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিলম্বে তোমরা কার্য্য পণ্ড করিও না। আমি যাইয়া মাকে সমস্ত কথা বলিতেছি।”

চিরকরুণাময়ী রমণীর এক কথাতেই কর্ত্তব্য সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। ডাক্তারবাবু পাল্‌কী করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে আমাদের বাড়ীতে পাঠাইয়া গোপালের অনুসন্ধানে আমার সঙ্গী হইলেন। আমরা উত্তরপাড়া যাইবার জন্য নৌকা ভাড়া করিলাম।

(৩৬)

আমাকে নৌকায় কিয়ৎক্ষণের জন্য বসিতে অনুরোধ করিয়া

ডাক্তারবাবু স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিতে জলে নামিলেন। "আদি" বলিলাম কেন, দেখিলাম যে ব্যক্তি একদিন পূজারী-ব্রাহ্মণ পুত্রের দেহ-রক্ষার ব্যবস্থায় অম্লানমুখে সুরুয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছে, আজ সেই ব্যক্তি স্নানান্তে জাহ্নবীতীরে বসিয়া হাতে পৈতা জড়াইয়া চক্ষু মুদিয়াছে। আমি নৌকায় বসিয়া কখন ডাক্তারবাবুর ধ্যান দেখিতে লাগিলাম, কখন বা অসংখ্য স্নানযাত্রীর জাহ্নবীজলে ধর্ম্মব্যাকুলতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে লাগিলাম। একবার নদীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম।

আশ্বিনী দশমীর নবাগত জোয়ার। দেখিলাম, গৈরিকাভ বিশাল জলরাশি দেখিতে দেখিতে একটী একটী করিয়া ঘাটের সোপানগুলি গ্রাস করিতেছে। সিন্ধুসহায়া জাহ্নবী নানাদেশাগত জলরাশিকে উপেক্ষা করিয়া পলে পলে গর্ব্বভরে উত্তরোত্তর স্ফীত হইতেছে। অনুকূল দক্ষিণবায়ু জাহ্নবীকে যেন হিমালয়ের পাদমূলে ফিরাইয়া লইবার প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। তাহার এই তীর্থযাত্রার পথে অসংখ্য সঙ্গিনী যেন সহচরী হইবার জন্য ব্যাকুল হইল। অসংখ্য ছোটবড় নৌকা নানা বর্ণের পাল ফুলাইয়া ছুটিয়াছে। জাহ্নবীর গর্ব্বোল্লাস যেন সকলকেই আশ্রয় করিয়াছে, সমীরত্রস্তবসনা কুলাঙ্গনার মত দুইচারিখানি মাত্র পানসী কেবল কূলাশ্রয়ে দাঁড়াইয়া আছে—সমীরণে তাহাদের অঞ্চল উড়িতেছে। কূলের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই তাহারাও ফুলিয়া ফুলিয়া ছুটিয়া যায়।

আমি সেই চারিখানির মধ্যে একটীতে বসিয়াছিলাম। তখন সহর হইতে গঙ্গাতীরস্থ গ্রামগুলিতে যাতায়াতে নৌকাই একমাত্র উপায় ছিল। আজ বিজয়াদশমী না হইলে, শত শত পানসীতে ঘাট ভরিয়া থাকিত। পূজায় লোকজন সকলেই প্রায় দেশে গিয়াছে,

অতি অল্প লোকেই কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসে। এইজন্য নৌকার সংখ্যা সেদিন অল্পই ছিল এবং যাহাও ছিল, তাহার অধিকাংশই জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। মোটে চারিখানি অবশিষ্ট, তাহারও তিনখানি ঘাট ছাড়িবার উপক্রম করিল। তাহাদের পানসী লোকপূর্ণ হইয়াছে। আমাদের মাঝী বলিল—"বাবু! আর দেরী করিলে পথে ভাঁটা পড়িবে। একটানার গঙ্গা ভাঁটা পড়িলে পৌঁছিতে বড়ই বেলা হইবে।"

কাজেই বাধ্য হইয়া ডাক্তারবাবুর ধ্যান ভঙ্গ করিতে হইল। তিনি আমার সম্বোধনে নৌকায় উঠিলেন। দেখিলাম, তাঁহার গণ্ডে অশ্রু পড়িয়াছে।

তিনি নৌকায় উঠিয়া বস্ত্রপরিবর্ত্তন করিলেন। মাঝীও নৌকা ছাড়িয়া দিল।

উভয়েই আমরা ছত্রের মধ্যে আশ্রয় লইলাম। ডাক্তারবাবু একবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় যাইবে স্থির করিয়াছ? তোমাদের দরোয়ান ত বলিয়াছে গোপাল দেশে নাই।"

আমি। গোপাল দেশে নাই।

ডাক্তার। ঠিক জানিয়াছ?

আমি। জানিয়াছি। তুলা সিং ঠিক জানিয়া আসিয়াছে।

ডাক্তার। তাহ'লেত তোমাদের ঘর পর্য্যন্ত নাই।

আমি। কিছু নাই। ভিটায় জঙ্গল হইয়াছে। জমিজিরাত সমস্তই শ্যাম গ্রাস করিয়াছে।

ডাক্তার। শুধু তুলা সিংএর কথায় নির্ভর করিয়া বলিতেছ, না অন্য কোন উপায় জানিয়াছ?

আমি। তুলা সিং যাহা বলিয়াছে সমস্তই সত্য। অন্য উপায়ে জানিয়াছি।

ডাক্তার। তাহ'লে তোমার পিতাকে গোপালের কথা বলিয়া অন্যায় করি নাই।

আমি। যাহা আপনি শুনিয়াছেন, তাহা হইতেও বলিবার যথেষ্ট আছে। পিতাকে তাহা শুনাইলে বোধ হয় তাঁহার হৃদয় ভগ্ন হইত। আবার তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইতে হইত।

ডাক্তার। আমি অতি সাবধানে তাঁহার সহিত কথা কহিয়াছি। কথাশেষে বুঝিয়াছি, তাঁহার মনে অনুতাপ জাগিয়াছে। আমি দুই একটা কথা অনুমানে যোগ করিয়াছিলাম। তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "কলিকাতা ত্যাগ করিবার পর হইতে আজিও পর্য্যন্ত গোপাল আজিও পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে এক কপর্দ্দকও সাহায্য পায় নাই। কত দীন, অনাথ তাঁহার সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া মানুষ হইয়া গেল, আর তাঁহার আত্মীয় অর্থাভাবে দীন ও মূর্খ হইয়া দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে।" অবশ্য আমি কথায় একটু কল্পনার যোগ করিয়াছিলাম। কেন করিয়াছিলাম, তা' বলিতে পারি না। গোপাল যতটকু ইংরাজী শিখিয়াছিল, তাহাতে অক্লেশে সে সাহেবদের আফিসে চাকরী করিতে পারিত। কিন্তু আমার কেমন যেন বোধ হইল গোপাল তাহা করে নাই।

আমি। আপনি কল্পনাতে যাহা দেখিয়াছেন, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

ডাক্তার। তা হইলে শ্যাম মাসোহারা সমস্তই উদরসাৎ করিয়াছে?

আমি। সমস্ত।

ডাক্তার। আমি হরিয়ার মুখে দুর্ঘটনার কথা শুনিয়াছি। শুনিয়াছি, তুমি পথ হইতে ফিরিয়াছ, মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছ। কিন্তু এমন বিপদ গিয়াছে যে, তোমাকে সে সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ পাই নাই।

আমি। আমিও পাই নাই। অথচ আপনাকে সমস্ত দুর্ঘটনার কথা বলা আমারই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ডাক্তারবাবু! গোপাল যথার্থই ভিখারী।

ডাক্তার। তুমি কেমন করিয়া জানিলে?

আমি। আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি।

ডাক্তার। দেখিয়াছ!

আমি। দেখিয়াছি। যে বেশে গোপালকে দেখিয়াছি তাহা আমি জীবনে ভুলিতে পারিব কি না সন্দেহ।

এই বলিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা, আমার কলিকাতা-ত্যাগের পর হইতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত—আদ্যোপান্ত ডাক্তারবাবুর কাছে বিবৃত করিলাম।

কথা শেষ হইল, নৌকাও উত্তরপাড়ার ঘাটে লাগিল। ডাক্তার-বাবু কথার শেষে বুঝিলেন, আমরা কোথায় যাইতেছি, তাহা আমাদিগকে পথে চেষ্টা করিয়া ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

ক্রমশঃ

গোধূলি-সঙ্গমে। *

৩রা বৈশাখ। বটমূলস্থ বেদীর উপরে আজ পূরা বৈঠক বসিয়াছে। সকলেই কবিরাজ মহাশয়ের কথা শুনিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়া আছেন এবং ব্যাকুলভাবে তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছেন।

অধ্যাপক মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কবিরাজ কি ঠিক সময়ে আসিবে? হয়ত কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছে।"

---

* "The Theosophist" নামক পত্রে প্রকাশিত "In the Twilight"এর অনুকরণে।

নায়েব। কবিরাজ মহাশয় এখনই আসিতেছেন; তিনি বাটী হইতে বাহির হইয়াছেন। পথে জমীদারবাটী হইতে রোগী দেখিয়া আসিবেন।

পুরোহিত মহাশয় তরমুজের সরবৎ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সকলকে তাহা বণ্টন করিয়া খাইতে দিলেন। সরবৎ খাওয়া হইতেছে, এমন সময়ে কবিরাজ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তখন জমীদার-পুত্র বলিলেন, "এই যে কবিরাজ মহাশয় আসিয়াছেন।"

পুরোহিত। কবিরাজ মহাশয়! সরবৎ খাইবেন কি?

কবিরাজ। আপত্তি কি?

কবিরাজ মহাশয় একবাটি সরবৎ পান করিলেন এবং তাহার পর তামাকু সেবন করিয়া সুস্থির হইয়া বসিলেন।

জ্যোতিষী। কবিরাজ মহাশয়, আপনার গল্পটা এইবার বলুন। আজ আর অন্য কথাবার্ত্তার প্রয়োজন নাই।

কবিরাজ মহাশয় উত্তরীয়খানি স্কন্ধদেশ হইতে ক্রোড়ে নামাইয়া রাখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"অনেক দিনের কথা, আমি তখন কলিকাতার এক টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করি। সেই সময়ে এক ব্যক্তির সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়। বন্ধুটি কলিকাতার কেল্লায় কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ-সামরিক কর্ম্মচারীর অধীনে কেরাণীগিরি করিতেন।

এই সামরিক কর্ম্মচারী মহাশয় খুব সাদাসিদে ধরণের লোক ছিলেন। কল্পনা কাহাকে বলে জানিতেন না এবং পরলোক-সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাসাদি একেবারেই ছিল না। জীবনে তাঁহার প্রিয় কার্য্য ছিল—মৃগয়া। তাঁহার স্বাস্থ্য খুব ভাল এবং দেহও যথেষ্ট বলিষ্ঠ ছিল।

কোন কারণে এই সামরিক কর্ম্মচারী মহাশয়ের নাম প্রকাশ করিব না। তাঁহাকে কর্নেল নীল এই কল্পিত নামেই এখানে পরিচিত করিলাম।

একবার এই কর্ণেল সাহেব কোন নিবিড় জঙ্গলে ব্যাঘ্র শীকার করিতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে লোকজনও যথেষ্ট ছিল। জঙ্গলের যেখানে বাঘ আছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল, সেইস্থানের ঝোঁপ-ঝাঁপ তাঁহার লোকেরা দীর্ঘ বংশদণ্ড সাহায্যে 'ঠেঙ্গাইতে' আরম্ভ করিল। পরে দেখা গেল, একটা বড় গোছের খানার মধ্যে ব্যাঘ্র মহাশয় বসিয়া আছেন। কর্ণেল সাহেব খানার ভিতরে ব্যাঘ্রকে বসিতে দেখিয়া উহার সম্মুখবর্ত্তী একটা ঝোঁপের আড়ালে উপস্থিত হইয়া উহাকে গুলি করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

বাঘ যেখানে বসিয়াছিল, সেখানটায় গাছ-পালা বেশী থাকায় অত্যন্ত অন্ধকার। বিশেষতঃ সে দিনটা আবার 'মেঘ্‌লা' ছিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে কর্ণেল সাহেব দেখিতে পাইলেন, বাঘের চোখ-দুটা জ্বলিতেছে এবং যেন তাঁহারই দিকে বাঘের দৃষ্টি রহিয়াছে।

কর্ণেল সাহেব তখন আপনাকে নিরাপদ করিবার জন্য সম্মুখের ঝোঁপ হইতে সামান্য একটু পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তবুও তিনি ব্যাঘ্রের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিলেন না।

তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহাতে তিনি দারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। খানার ভিতর হইতে তিনি হঠাৎ মনুষ্যের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। সে স্বর ভীষণ যাতনা ও অনুতাপপূর্ণ। স্বর ঠিক যেন ব্যাঘ্রের কণ্ঠ হইতে বাহির হইতেছে। বাঘ ঠিক মানুষের ভাষায় বলিতেছে—"ঈশ্বরের দিব্য, আমায় গুলি করুন এবং গুলি করিয়া এই নরক-যন্ত্রণা হইতে আমাকে উদ্ধার করুন।"

সেই সময় মেঘ অপসারিত হওয়ায় হঠাৎ সূর্য্যরশ্মি প্রকট হইয়া

উঠিল। সেই আলোকে কর্ণেল সাহেব খানাটা বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। বাঘ ছাড়া খানার মধ্যে আর দ্বিতীয় প্রাণী নাই—মানুষ ত দূরের কথা!

কর্ণেল সাহেব এই কথার কি উত্তর দিয়াছিলেন বলিতে পারি না। কিন্তু পরে ব্যাঘ্রের মুখ হইতে যে সকল কথা বাহির হইয়াছিল, তাহাতে কর্ণেল মহাশয় বুঝিতে পারেন যে, এই কণ্ঠস্বর এক ইংরাজ মহিলার; কোন কারণে ইঁহার আত্মা এই হিংস্র পশুর দেহে প্রবিষ্ট ও আবদ্ধ হইয়াছে। তিনি ভয়ানক যন্ত্রণা ও অনুশোচনা ভোগ করিতেছেন। মহিলাটির এই আবদ্ধ আত্মা আরও প্রকাশ করেন যে, যদি আপনি (কর্ণেল সাহেব) এই ব্যাঘ্রকে মারিয়া আমাকে উন্মুক্ত করেন, তবে আমি চিরকাল আপনার নিকটে কৃতজ্ঞ থাকিব এবং আপনার বিপদের সময়ে সর্ব্বদা আপনার সহায়তা করিব। যখনই আপনার কোন বিপদ উপস্থিত হইবার উপক্রম হইবে, তখনই আমি আপনার সম্মুখে হরিণীরূপে আবির্ভূত হইব। আপনি তখন হরিণীরূপ-ধারিণীকে দেখিয়া বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া সতর্ক হইবেন।

মুক্তি-অভিলাষী আত্মার এই সকল উক্তি শুনিয়া কর্ণেল সাহেব স্বপ্নাবিষ্টের মত ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িলেন। পরক্ষণেই উহার মৃতদেহ 'খানা'র ভিতরে লুটাইয়া পড়িল ও চিরদিনের মত বিশ্রামলাভ করিল।

এই ঘটনার পর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। কর্ণেল সাহেবের চিত্তপট হইতে এই বিস্ময়কর ঘটনার স্মৃতি-চিহ্ন একেবারে মুছিয়া না যাইলেও তিনি ইহা লইয়া আর বড় একটা আলোচনা করিতেন না। এখন যদিও বা কখনও এই ঘটনার একটা অস্পষ্ট ছায়া তাহার স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তিনি তাহা হাসির আলোকে বিদূরিত করিতেন।

যাহা হউক, আর একবার কর্ণেল সাহেবকে অপর এক জঙ্গলে শীকার করিতে যাইতে হয়। শীকারের অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহাকে এমন এক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়, যেখানে আর চলিবার পথ নাই। তখন কাজেকাজেই কর্ণেল সাহেবকে বাধ্য হইয়া বড় বড় ঘাস ও ঝোঁপের উপর দিয়াই চলিতে হইল। তিনি কিছুদুর অগ্রসর হইলে হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে এক হরিণী উপস্থিত হইল এবং কর্ণেল সাহেবের দিকে একবারমাত্র করুণ নয়নে চাহিয়া দেখিয়াই অন্তর্হিত হইল।

হঠাৎ হরিণের আবির্ভাবে কর্ণেলের মনে বহু দিনের পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠিল; তিনি আকস্মিক বিপদের আশঙ্কা অনুভব করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর সঙ্গের কুলিদিগকে অগ্রসর হইতে এবং ঘাস 'ঠেঙ্গাইতে' বলিলেন। ঘাস 'ঠেঙ্গাইবার' সময়ে দেখা গেল, কর্ণেল সাহেবের সম্মুখে—প্রায় হাত তিন তফাতে একটা প্রকাণ্ড গোখুরা সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিয়াছে। আর দুই তিন পদ অগ্রসর হইলে নিশ্চয়ই কর্ণেল সাহেব তাহাকে পদদলিত করিতেন এবং সেই ভীষণ গোখুরা সর্পের দংশনে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইতে পারিত।

এই ঘটনার পর আরও কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, এখন কর্ণেল সাহেব অবসর লইয়া স্বীয় জন্মভূমি ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু তখনও তাঁহার মন হইতে শীকার করিবার বাসনা যায় নাই।

খরগোস শীকার করিবার মানসে একদিন তিনি কোন ক্ষুদ্র পল্লী-গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী এক শস্যক্ষেত্রের 'বেড়া'র ধার দিয়া যাইতে-ছিলেন। ঘন-সন্নিবিষ্ট কণ্টক-বৃক্ষের 'বেড়া' দ্বারা সেই ক্ষেত্রের চারি দিক সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি ক্ষেত্রমধ্যস্থ 'বেড়া'র পার্শ্ব দিয়া যাইতে-ছিলেন—উদ্দেশ্য কোন স্থানে একটু ফাঁক পাইলেই সেইখান দিয়া

ক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া পড়িবেন; নতুবা ক্ষেত্রের ফটক দিয়া বাহির হইতে হইলে অনেক দূর হাঁটিতে হয়।

কিছুদূর যাইতে যাইতে তিনি একস্থানে 'বেড়া'তে একটু ফাঁক দেখিতে পাইয়া যেমন ঐ স্থান দিয়া বাহির হইতে যাইবেন, অমনই তাঁহার সম্মুখে আবার সেই হরিণী হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া সেই ফাঁকের নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া বোধ হইল যেন সে কর্ণেল সাহেবকে সেই ফাঁক দিয়া বাহির হইতে নিষেধ করিতেছে। বিস্ময়ের বিষয়, এই জাতীয় হরিণী ইংলণ্ডে নাই।

কর্ণেল সাহেব হঠাৎ এই হরিণীকে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, এই ফাঁক দিয়া বাহির হইলে নিশ্চয়ই কোন বিপদে পড়িতে হইবে। সুতরাং তিনি সেখান দিয়া 'বেড়া'র অপর পার্শ্বে না গিয়া পুনরায় গতি পরিবর্ত্তন করিলেন এবং যে পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই পথেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে করিতে ক্ষেত্রের ফটক দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

এখন কর্ণেল সাহেবের মনে কৌতূহল হইল, বহু বর্ষ পরে কেন আবার হরিণী দেখা দিল, তবে কি ঐ স্থানে সত্য সত্যই আমার কোন বিপদ হইত। এই ভাবিয়া তিনি ক্ষেত্রের বাহির দিক দিয়া অর্থাৎ বেড়ার অপর পার্শ্ব ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। পরিশেষে যে স্থান দিয়া প্রথমে তিনি 'বেড়া'র বাহির হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন, সেই স্থানের ঠিক বিপরীত দিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবার ক্ষেত্রের মধ্যে নহে ক্ষেত্রের বাহিরে। সেইস্থানে দাঁড়াইয়া তিনি বেড়ার সেই ফাঁকটুকু বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলেন; ফাঁকটুকুর এক পার্শ্বে একটা অপেক্ষাকৃত মোটা গুঁড়িযুক্ত গাছ ছিল এবং সেই গুঁড়ির এক স্থানে একটু গর্ত্তের মত ছিল। কর্ণেল সাহেব দেখিলেন, সেই গর্ত্তের মধ্যে একটা ভীষণ

ভীমরুলের চাক; যদি তিনি ঐ 'বেড়া'স্থিত ঐ সামান্য ফাঁকটুকু দিয়া বাহির হইতেন, তাহা হইলে, 'নাড়াচাড়া' পাইয়া ভীমরুলেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিত। কি সর্ব্বনাশ! ভীমরুলের কামড়ে সম্ভবতঃ তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারিত।

ইহার পর কর্ণেল সাহেব আরও দুই একবার সেই হরিণীর দেখা পাইয়াছিলেন এবং উহা দ্বারা সেই সেই সময়ে সতর্ক না হইলে তাঁহার বিপদ অবশ্যম্ভাবী হইত।"

কবিরাজ মহাশয়ের মুখে এই বিস্ময়কর অলৌকিক ঘটনার বিষয় শুনিয়া অধ্যাপক মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "গল্পটি চমৎকার বটে, তবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই! মানুষের জীবনে এমন কত শত ঘটনা ঘটে। একটা বাঘের দেহে কখনও কি একটা স্ত্রীলোকের আত্মা আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে?—অসম্ভব ব্যাপার!"

ডাক্তারবাবু। অধ্যাপক মহাশয় দেখিতেছি সকল কথাই অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেন!

কবিরাজ মহাশয়। ওঁর বিশ্বাস না হইলে উনি মানিবেন কেন?

অধ্যাপক। আমি কি নাস্তিক? প্রকারান্তরে আমাকে নাস্তিক বলা হইতেছে!

জমীদার-পুত্র। যাউক অধ্যাপক মহাশয় ক্রুদ্ধ হইবেন না।

জ্যোতিষী। বাঘের দেহে মানুষের আত্মা আবদ্ধ থাকিতে পারে। উহা অসম্ভব নয়। জগতে অসম্ভব কিছুই নাই। তবে যে সকল অলৌকিক ঘটনার সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিজ্ঞতা নাই, কেন সে গুলি ঘটে তাহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি না, সেই ঘটনাগুলিকে অসম্ভব বলি। বাস্তবিক যেগুলি সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ সেইগুলিকেই আমরা অসম্ভব বলিয়া থাকি। কিন্তু কবিরাজ

মহাশয়ের কথিত এই ঘটনার বিষয় আমাদিগের একেবারে অনধিগম্য নহে। ইহার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

পুরোহিত। তবে প্রথমে বলুন, কেন এক স্ত্রীলোকের আত্মা বাঘের দেহে প্রবিষ্ট হইল?

জ্যোতিষী। স্ত্রীলোকটির আত্মা যখন কামলোকে অবস্থান করিতেছিল, তখন প্রবৃত্তির তাড়নায় বা প্রলোভনের বশে সে ব্যাঘ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। মনে করিয়াছিল যে, ইহার দেহে অবস্থান করিলে যথেষ্ট মাংসভোজন ও জীবহত্যা করা যাইবে, ইচ্ছামত নিরপরাধ প্রাণীদের প্রাণহরণ করা যাইবে।"

নায়েব। কি ভয়ানক! স্ত্রীলোকটির আত্মার এমন নীচ প্রবৃত্তি কেন হইল?

জ্যোতিষী। সে মনে ধারণা করিয়াছিল, বুঝি বা ইহাতে খুব তৃপ্তি হইবে। কিন্তু যখন দেখিল, বাঘের দেহে থাকিয়া তৃপ্তি নাই, কেবল অতৃপ্তি ও অশান্তি, তখন সে বাহির হইবার চেষ্টা করিল। মনে করিল, বাহির হইয়া আর এমন নীচ কার্য্য করিব না, সাধুভাবে থাকিব। কিন্তু তাহার মনে সাধু বাসনার উদয় হইলেও আর সে বাঘের দেহ হইতে বাহির হইতে পারিল না। তারপর যখন কর্ণেল সাহেব শীকারের জন্য জঙ্গলে উপস্থিত হইলেন, তখন সে বাঘকে মারিয়া নিজ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিল।

পুরোহিত। অথবা এমনও হইতে পারে, কোন নিষ্ঠুর কার্য্যের জন্য হয়ত সে ব্যাঘ্রের দেহের সহিত এমন ভাবে আবদ্ধ হইয়াছিল, যে তাহার নিষ্কৃতি পাইবার উপায় ছিল না।

ডাক্তারবাবু। হয়ত স্ত্রীলোকটিকে কেহ ব্যাঘ্র করিয়া রাখিয়াছিল। কোন কোন ঐন্দ্রজালিকের এমন শক্তি আছে যে, তাহারা ইচ্ছা করিলে মানুষকে ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি করিতে পারে। এই স্ত্রীলোকটি

সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর কোন ঐন্দ্রজালিকের ক্রোধ উদ্রিক্ত করিয়া থাকিবে এবং সেও প্রতিহিংসাবশে তাহাকে বাঘ করিয়া থাকিতে পারে। অসম্ভব কিছুই নাই।

জমীদার-পুত্র। একি আপনি আরব্য-উপন্যাসের গল্প বলিতেছেন!

ডাক্তার-বাবু। না! না! আমি বলিতেছিলাম, কর্ম্মফলের হাত কেহই এড়াইতে পারে না। স্ত্রীলোকটি এমন কোন গর্হিত কর্ম্ম করিয়া থাকিতে পারে, যাহাতে কোন ঐন্দ্রজালিকের ভীষণ ক্রোধ হইয়াছিল এবং সেই ক্রোধের বশে ও প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য—অপর দিকে তাহাকে কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য,—সে ব্যাঘ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল।

নায়েব মহাশয়। সে যাহা হউক, এই গল্পে অসামঞ্জস্য যথেষ্ট আছে। কখনও শুনি নাই, পশুর দেহে আবদ্ধ অবস্থায় কোন আত্মা মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিয়া মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে!

জমীদার-পুত্র। আর যে কার্য্য একজন দেবদূত বা কোন লোক-হিতকাঙ্ক্ষী অদৃশ্য আত্মার দ্বারা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা এক মৃত ব্যক্তির আত্মা হরিণীর রূপধারণ করিয়া কিরূপে সম্পন্ন করিল?

জ্যোতিষী। আশ্চর্য্য কথা বটে! সম্ভবতঃ এই স্ত্রীলোকের জীবনে কিছু অসাধারণত্ব ছিল; তাহা না হইলে সে কথা কহিতে পারিবে কি করিয়া?

কবিরাজ মহাশয়। আশ্চর্য্য কিছুই নয়! ব্যাঘ্রদেহে আবদ্ধ এই রমণীর আত্মার ক্লেশ ও দুর্দ্দশা দেখিয়া কোন অদৃশ্য পরোপকারী আত্মা তাহার হইয়া কথা কহিয়া থাকিবে! রমণী যে মনোভাব বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে নাই, অদৃশ্য আত্মা সেই মনোভাব নিজে মানুষের ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিল। এমন ঘটনা বিস্তর হইয়া থাকে। আর কামলোকে অবস্থিতিকারী আত্মার পক্ষে কোন প্রাণীর রূপধারণ

করা অধিক বিস্ময়ের কথা নহে। সে রূপ ত প্রকৃত রূপ নহে, তাহা মায়ারূপ; উহা ধারণ করিতেও যতক্ষণ, উহা হরণ করিতেও ততক্ষণ।

জ্যোতিষী। আমার কোন আত্মীয়ার মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহারা যখন পার্ব্বত্য পথ দিয়া বদরিকাশ্রমে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহারা দলশুদ্ধ এমন একস্থানে আসিয়া পড়েন, যেখানে আর পথ নাই। অন্যান্য তীর্থযাত্রিগণ অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছিল, কেবল ইঁহারাই পশ্চাতে ছিলেন। প্রায় অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াও ইঁহারা পূর্ব্বগামী দলকে ধরিতে পারিলেন না। তাহারা ইঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর ইঁহারা এইরূপে পথভ্রষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, অনেক কষ্টে এই দুর্গম পুণ্য-তীর্থের অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিলাম। হায় ভগবন! এতদূরে আসিয়া আমাদিগকে ফিরিতে হইল! অনেকের চক্ষু দিয়া দর্ দর্ ধারে অশ্রু গড়াইতে লাগিল। কেহ কেহ উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সম্মুখে আর পথ নাই—কেবল এক উচ্চ পর্ব্বতখণ্ড সরলভাবে মহা-শূন্যে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান। সেই পর্ব্বতে উঠিবার কোন পথই নাই। হায় কি হইল! আমার আত্মীয়ার সহযাত্রী ও সহযাত্রিণী-গণের ক্ষোভের, দুঃখের সীমা নাই। তাঁহারা সকলেই বলিলেন, 'বরং এইখানে ভগবানের নাম লইয়া অনশনে মরিব, তবুও পশ্চাৎ ফিরিব না।' তাহার পর হঠাৎ তাঁহাদের দলের একজন দেখিতে পাইলেন, তাঁহার সম্মুখে—অদূরবর্ত্তী এক বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে এক বানর নীচে নামিল এবং তাঁহার দিকে মস্তক-সঞ্চালন করিয়া যেন তাঁহাকে উহার অনুগামী হইতে বলিল। তিনি দলস্থ অন্যান্য লোককে এই বানরের অদ্ভুত আচরণ ও মস্তক-সঞ্চালনের বিষয় দেখাইলেন এবং বলিলেন, "বানরটি কি বলে, একবার দেখা যাক্।"

তিনি ও দলস্থ অন্যান্য দুইচারিজন বানরের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র সে পর্ব্বতের সানুদেশ দিয়া কিছু উপরে উঠিল এবং তাহার পর সেই-খানে বসিয়া তাঁহাদের দিকে মস্তক-সঞ্চালন করিয়া ডাকিতে লাগিল। তাঁহারা সেইস্থানে উপস্থিত হইলেই বানর এক অল্পপরিসর পথ দিয়া একবার নামিতে ও একবার উঠিতে লাগিল। তখন তাঁহারা সেইপথে খানিকদূর নামিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এক সুন্দর পথ ক্রমে নিম্নদিকে নামিয়াছে, তবে অল্পপরিসর। তাহারা আনন্দে ভগবানের নামে উচ্চ জয়ধ্বনি করিয়া দলস্থ অন্যান্য সকলকে আহ্বান করিলেন এবং সকলে মহানন্দে সেই ক্ষুদ্র পথ বাহিয়া চলিলেন। তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে পথপ্রদর্শকরূপে চলিতেছে—সেই বানর। যেখানে রাত্রি-যাপনের প্রয়োজন হয়, বানর সেইখানে নিকটবর্ত্তী কোন বৃক্ষে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই, যাত্রিগণ বানরকে যথোচিত আদর-অভ্যর্থনা করিয়া খাদ্যসামগ্রী দিলে সে তাহা স্পর্শ করে না, বা সে সকলের দিকে চাহিয়াও দেখে না; অপর দিকে চলিয়া যায়। যাত্রিগণ বানরের এই অদ্ভুত ত্যাগনিষ্ঠা দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ!

যাহা হউক, এইরূপে যাত্রিগণকে পথ দেখাইয়া বানর তাঁহাদিগকে বদরিকাশ্রমে আনয়ন করিল। যাত্রিগণ দেখিল, তখনও তাঁহাদের পূর্ব্বগামীদল তথায় পৌঁছিতে পারে নাই।

বদরিকাশ্রমে আসিয়া বানর কিছুক্ষণ যাত্রিগণের সম্মুখস্থ এক বৃক্ষ-মূলে বসিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর সে যে কোথায় অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল, তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।

ক্রমে বদরিকাশ্রমে সমাগত বহুলোকের নিকট এই যাত্রিগণের অনেকে এই বানরের ও তাহার সহায়তার কথার উল্লেখ করিলে তাহারা সকলেই ইহা অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। কারণ, সে পথে বানর কখনও দেখা যায় না; সেই শীত-প্রপীড়িত

স্থানে স্নানরের আবির্ভাব কেহ কখনও দেখে নাই। তবে তাঁহারা যে কি করিয়া সকলের পশ্চাতে পড়িয়াও অগ্রে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাতেই অন্যান্য লোকে বিস্ময় প্রকাশ করিল।

পুরোহিত। বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই! পরোপকারী আত্মাগণ কি ছলে, কোন্ রূপ ধারণ করিয়া, কখন্ যে বিপদগ্রস্ত লোকের উপকার করিয়া থাকে, তাহা বলা যায় না; তাঁহারা নানারূপে মানুষের উপকার করেন। পরের উপকার করিবার জন্যই তাঁহারা আবশ্যক-মত মায়ারূপ ধারণ করেন এবং কার্য্য ফুরাইলেই সেই মায়ারূপাত্মক দেহ নষ্ট করিয়া ফেলেন। ইচ্ছামাত্রেই তাঁহারা যে কোনরূপ ধারণ ও হরণ করিতে সমর্থ।

অধ্যাপক। সায়ংসন্ধ্যার সময় হইয়া আসিল, আজ উঠা যাউক। আমাকে কেহ নাস্তিক মনে করিবেন না। আমি নাস্তিক নহি; আমার ভগবানেও যেমন বিশ্বাস আছে,—পরলোকে, জন্মান্তর প্রভৃতিতেও তেমনই প্রত্যয় আছে। তবে পরের মুখের কথায় সহসা বিশ্বাস হয় না, যুক্তি-তর্কের দ্বারা যাহার যথার্থ্য প্রতিষ্ঠিত না হয়, আমি তাহা বিশ্বাস করিব কেমন করিয়া? এই বানর-রূপী পথপ্রদর্শকের অপূর্ব্ব আচরণে আমি বিস্মিত হই নাই; বরং এই ঘটনায় আমার আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপারের কথা স্মৃতি-পথে উদিত হইল। কাল আমি সেই গল্প বলিব।

পুরোহিত মহাশয়ের ভ্রাতা আজ মন্দিরে আরতির উদ্যোগ-আয়োজন করিতেছেন, এমন সময়ে বটমূলস্থ গোধূলি-সভা ভাঙ্গিয়া গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

স্বপ্নতত্ত্ব।

পিণ্ড-দেহে প্রাণ-বায়ুর যে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, তাহা স্নায়ুপথ দিয়া প্রবাহিত হইয়া আমাদিগের ভাণ্ডদেহকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। স্নায়ু-পথ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয় বলিয়া স্নায়ুগুলির অপর নাম বায়ু-প্রবাহিনী নাড়ী। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি পিণ্ড-দেহের প্রতিকৃতিতে ভাণ্ডদেহ গঠিত হয়। পিণ্ড-দেহের প্রতি অবয়ব স্থূলতরভাবে ভাণ্ডদেহে বর্ত্তমান। অতএব মানব-দেহে যে রুধিরপ্রবাহ প্রবহমান, তাহা পিণ্ড-দেহের গোলাপাস্ত প্রবাহের সাহায্যে এবং তাহারই স্থূলতর অনুকরণ মাত্র। ইহাকে একপ্রকার "স্থূল-ছায়া" বলিলে চলে। আবার ভাণ্ড ও পিণ্ড-দেহ উভয়ে বড় চমৎকার সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত আবদ্ধ। তাহারা যেন প্রকৃত যমজ ভ্রাতাদ্বয়। একের স্বাস্থ্যে অপরের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। মরণের পর ভাণ্ড-দেহের নিকট পিণ্ডদেহ অবস্থান করে এবং উভয়ে একইভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর শবদেহের দাহ হইলে সঙ্গে সঙ্গে পিণ্ডদেহও ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে যদ্যপি ভাণ্ড-দেহকে কবরে প্রোথিত করা হয়, তাহা হইলে স্থূলদেহ অল্পে অল্পে গলিতে ও পচিতে থাকে, পিণ্ডদেহও ধীরে ধীরে নষ্ট হইতে থাকে। জীবদ্দশায়ও ঠিক তাহাই হয়। ভাণ্ড-দেহের যেইরূপ অবস্থা, পিণ্ড-দেহের অবস্থাও তদ্রূপ হয় * ভাণ্ডদেহের একটী

পিণ্ড ও ভাণ্ড দেহের পরস্পর সম্বন্ধ।

---

* এই সংখ্যায় প্রকাশিত হীরেন্দ্রবাবুর "সূক্ষ্ম শরীরের প্রমাণ" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি।

হস্ত যাইলে পিণ্ড-দেহের হস্তও ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া যায়। জীবদ্দশায় এইমাত্র পার্থক্য যে, পিণ্ডদেহের অঙ্গ তাণ্ডদেহের সঙ্গে সঙ্গেই নষ্ট হয় না, তাহা নষ্ট হইতে কিছু অধিক সময় লাগে। ইহা জানা নাই বলিয়া প্রতীচ্য শরীর-বিজ্ঞান একটী রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারে নাই, আমরা তাহারই এইখানে আলোচনা করিব।

শরীর বিজ্ঞানবিদ্ বলেন যে, মানবের প্লীহাযন্ত্রটী কোনও একটা বিশেষ কার্য্য করে না এবং তাহাকে বাহির করিয়া লইলে মানব-জীবনের কোনও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। উহার যাহা কার্য্য, শ্লৈষ্মিক গুটিকার (Lymphatic glands) কার্য্যও তাহাই ; রুধিরে বর্ণহীন অণুকোষ (Colourless corpuscles) সৃষ্টি করা। ইহাকে বাহির করিয়া লইলে শ্লৈষ্মিক গুটিকার সঙ্গে সঙ্গেই অতি বৃদ্ধি হয়, এবং ইহার অভাব মোচন করে। আরও দুই একটী সামান্য সামান্য ইহার কার্য্য আছে, যথা, কোন কোন রুধিরের রক্তবর্ণ অণু-কোষ যাহা কার্য্য শেষ করিয়াছে, তাহাদিগকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেওয়া ইত্যাদি।+ তাহাও অপর যন্ত্রের দ্বারা সাধিত হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে ইহার কোনও বিশেষ কার্য্য নাই। অতএব বৈজ্ঞানিকের নেত্রে ইহা থাকা অনাবশ্যক।

প্লীহা যন্ত্র
ও
প্রতীচ্য বিজ্ঞান।

+ The spleen, like the Lymphatic glands is engaged in the formation of colourless blood corpuscles..................Removal of the spleen is not fatal ; but after its removal there is an overgrowth of the lymphatic glands to make up for its absence.........Langley. From M. D. Halliburton M. D. F. R. S's Hand book of Physiology.

যাহা অনাবশ্যক, তাহার সৃষ্টি ও পোষণে প্রকৃতির শক্তির বৃথা অপচয় হইতেছে, ইহাতে তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত। কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী,—যাঁহারা প্রাণের ক্রিয়া দেখিতে পান, তাঁহারা জানেন এই প্লীহাযন্ত্রটী কি করিয়া উদ্ভূত হয় এবং তাহার কার্য্যকারিতাই বা কি। ভাণ্ডদেহ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিণ্ডদেহের অনুরূপে গঠিত। অতএব, যেমন পিণ্ডদেহে প্লীহা আছে, ভাণ্ড-দেহেও তাহা আছে। পিণ্ডদেহস্থিত প্লীহাগত চক্রটীর উপর আমাদিগের স্থূলদেহের প্রাণ ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে। অতএব পিণ্ডদেহের প্লীহাযন্ত্রটী আমাদিগের অতি প্রয়োজনীয় এবং কিছুতেই তাহার স্বাভাবিক পুষ্টির ব্যাঘাৎ জন্মাইতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, ভাণ্ড-দেহের কোন একটী স্থানের স্বাস্থ্যের উপর পিণ্ড-দেহের সেই স্থানের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। অতএব আমাদিগের প্লীহাযন্ত্রটী যে অতি প্রয়োজনীয়, তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মস্তিষ্কের সাহায্যে মানবের বহির্বিষয়ের অনুভূতি হয় এবং এই অনুভূতি মস্তিষ্কের সামান্য বিকারেই কি প্রকার বিকৃত হইতে পারে! যখন ভাণ্ড-দেহস্থিত মস্তিষ্কের এই ব্যাপার, তখন পিণ্ড-দেহস্থি ত মস্তিষ্কের ত কোন কথাই নাই। অতএব পিণ্ড-দেহে

শৈত্য বা ঔষধ-সাহায্যে ও কৃত্রিম নিদ্রাবেশ দ্বারা (Mesmerism) সংজ্ঞা-স্তম্ভন।

বায়ু-প্রবাহিনী নাড়ীপথে প্রবাহিত প্রাণ-শক্তির গতি এবং সঞ্চারিত প্রাণ-অণুর আধিক্য বা অল্পতার উপর মানবের অনুভূতি নির্ভর করে। যাহাদিগের সূক্ষ্মদর্শনশক্তি নাই, তাহাদিগকে এই তথ্যসম্বন্ধে নিঃসংশয় করা অতীব দুরূহ। তবে কতকটা যুক্তির দ্বারাও বুঝা যায়। অঙ্গুলিকে বরফের দ্বারা বেষ্টিত করিয়া উহাকে এইরূপ সংজ্ঞাহীন করা যাইতে পারে যে, উহাতে আর বোধশক্তি থাকে না।

হস্তাদি সঞ্চালনদ্বারা দেহে স্বপ্নাবস্থা সঞ্চারিত (Mesmerised) হইলেও তাহাই হয়। তখন সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিলে বা অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিলেও তাহার আর কোনও অনুভূতি থাকে না। এই যে সংজ্ঞানাশ হয়, তাহার কারণ কি? বরফের দ্বারা যে স্তম্ভন হয়, তাহার কারণ বিজ্ঞানবিদ্ বলিবেন, শৈত্যের দ্বারা সংজ্ঞাকারিণী স্নায়ুর সংজ্ঞা লোপ হয় অথবা তীব্র শৈত্যে রুধির সরিয়া যায়, তাই আর কিছু বোধ থাকে না। কিন্তু দ্বিতীয় উপায়ে সম্মোহনদ্বারা কিরূপে সংজ্ঞালোপ হয়, তাহার সুন্দর ব্যাখ্যা শরীরতত্ত্ববিদেরা আজ পর্য্যন্ত দিতে পারেন নাই। তাঁহারা 'সম্মোহিতের' রুধিরপ্রবাহ পরীক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু দেখিয়াছেন সেই প্রবাহের কোনও ব্যতিক্রম হয় নাই; তাপমান যন্ত্রের দ্বারা তাঁহারা দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়াছেন এবং দেখিয়াছেন যে, দেহের স্বাভাবিক উত্তাপের কোনও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই। ইহার প্রকৃত তথ্যের নিরূপণ কে করিতে পারে? যিনি জানেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানান্ধ তোমরা! তাঁহার কথা কি বিশ্বাস করিবে? এই জটিল রহস্যের উদ্ঘাটন করিতে পারেন,—যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা। সাধনাবলে তাঁহারা সাধারণ মানব-নয়নের অগোচর, প্রকৃতির যে রহস্য-লীলা হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। পিণ্ড-দেহোপকরণ-ভূতসকল যদিও স্থূল চক্ষুর গোচরীভূত হয় না, তথাপি তাহারা পার্থিব ভূত। আমরা এ বিষয় পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। পার্থিব ভূত বলিয়া, তাহারা তাপ-শৈত্যাদিরূপ পার্থিব শক্তির ক্রিয়ার অধীন। পূর্ব্বকথিত বায়ু-প্রবাহিনী নাড়ীপথে চালিত প্রাণ-অণু, শৈত্যনিবন্ধন মস্তিষ্কে আর প্রবাহিত হইতে পারে না, তাই আর বেদনা অনুভূত হয় না।

এইবার পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিতীয় উদাহরণটীর বিষয় আলোচনা করা যাউক। যখন সম্মোহক হস্ত-সঞ্চালনের দ্বারা কাহাকেও আবিষ্ট করে, (mesmerise) তখন স্বপ্নাবিষ্টের প্রাণ-অণু তাড়িত হয় এবং

তাহার পরিবর্ত্তে আবেশকের প্রাণ-স্রোতে আবিষ্টের সর্ব্বশরীর ভরিয়া উঠে। অতএব তাহার জীবনীশক্তির বা দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতার কিছুই হ্রাস হয় না। কিন্তু এই সঞ্চালিত প্রাণ-প্রবাহের সহিত তাহার নিজের কোনও সম্বন্ধ না থাকায়, আবিষ্টকে সূচী বদ্ধাদি করিলে সে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না; পর-প্রাণ প্রচারিত কোন সুখকরী বা বা দুঃখকরী উত্তেজনা তাহার নিজের সংবিত্তি বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং বহির্দ্দেশ হইতে কোনও কিছুর তাহার অনুভব হয় না।

আমরা দেখিলাম, বায়ু-প্রবাহিনী-নাড়ীপথে সঞ্চারিত প্রাণ-অণু-প্রবাহের উপর মানবের সংবিত্তি নির্ভর করে। যখন প্লীহাচক্রের দ্বারা আকৃষ্ট ও সঞ্চালিত প্রাণ-অণুর হ্রাস হয় এবং তৎসঙ্গে প্রাণ-প্রবাহের গতি দ্রুততর হইয়া পড়ে, তখন মানব দুর্ব্বল ও সহিষ্ণুতা-হীন হইয়া পড়ে। অধিক মাত্রায় হইলে তাহাতে বায়ুরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়; তখন অনেক অপার্থিব দ্রব্য তাহার নয়নগোচর হয়। অতএব আমাদিগের ভাণ্ড ও পিণ্ডদেহের জীবনী শক্তির প্রবাহ স্বাভাবিক থাকিলে, তবে বাহ্যবস্তুর অনুভূতি

উপসংহার।]

স্বাভাবিক হয়। আমরা আরও দেখিয়া আসিয়াছি যে, ভাণ্ডদেহ ও পিণ্ডদেহের কত নিকট সম্বন্ধ,—একের ব্যতিক্রমে অপরের ব্যতিক্রম হয়। আমরা পরে দেখাইব, জাগ্রৎ অবস্থায় দেহের ব্যতিক্রমে চৈতন্যের যে ব্যতিক্রম হয়, নিদ্রাকালীন তাহা অপেক্ষা অধিক ব্যতিক্রম হয়। স্বপ্নের সত্যতা নিরাকরণ করিতে হইলে এই তথ্যটি মনে রাখা অতীব প্রয়োজনীয়।

ক্রমশঃ

শ্রীকিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায়।

অলৌকিক রহস্য।

৩য় সংখ্যা] তৃতীয় বর্ষ। [আশ্বিন, ১৩১৮।

সন্দীপনী।

আমাদের উদ্দেশ্য,—"জড়বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের মৌলিক একত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করা।" এতদভিপ্রায়ে আমার পরম সুহৃদ, শ্রদ্ধাস্পদ, স্বনামধন্য, দার্শনিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় "সূক্ষ্ম শরীরের প্রমাণ" নামধেয় প্রবন্ধে জড়বিজ্ঞানের উৎকর্ষ আলোচনার ফল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং ধারাবাহিক ক্রমে তাহা 'অলৌকিক রহস্যে' প্রচার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, আর আমার অন্যতম বন্ধু শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায় "স্বপ্নতত্ত্বে" অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন। উভয়েই আমাদিগের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। বর্ত্তমানকালে ব্রহ্মবিদ্যাসমিতি (Theosophical Society) যে সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব প্রচার করিতেছেন, তাহারই সাহায্যে অবশ্য শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়, আর্য্যঋষিদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধ্যাত্মবিজ্ঞানক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে সাহসী হইয়াছেন। আমার এই উক্তিতে হয়ত অনেকে নিরাশ হইবেন, অনেকে আশঙ্কা করিবেন যে, ব্রহ্মবিদ্যা-সমিতির (Theosophical Society) আলোচিততত্ত্ব প্রচারে "হিন্দুশাস্ত্রের মর্য্যাদা নষ্ট করা হইতেছে।" এইটী বিষম ভ্রম।

যাঁহারাই "ব্রহ্মবিদ্যা"র (Theosophy) আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন, সকল ধর্ম্মের রহস্যাংশ ইহার সাহায্যে নবালোকে আলোকিত হইতেছে। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার পক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা যে কতদূর সহায়তা করে, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অপরে অনুভব করিতে পারে না। যাঁহারা প্রচলিত ভাষ্য ও টীকার সাহায্যে এবং তথাকথিত আচার্য্যের উপদেশে এই সকল নিগূঢ়তত্ত্ব আয়ত্ত করিবার বিপুল আয়াস ও বিফল সময়ক্ষেপের মর্ম্মপীড়া অনুভব করিয়া, পরে থিওসফির অরুণরাগে আপনাদিগের হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত দেখিয়াছেন, তাহারাই একথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। অনেকস্থলে থিওসফি যে সকল তত্ত্বের পুনঃ প্রচার করিতেছেন, তাহা ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিধ্বনিমাত্র। কিন্তু যে আকারে ঐ সকল তত্ত্বকথা আর্য্যশাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে, তাহা ভেদ করিয়া অন্তর্নিহিত সত্যের আবিষ্কার করিবার প্রণালী এখন প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। যে সঙ্কেতে রহস্য গৃহের দৃঢ়বদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইবে, তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। থিওসফির সাহায্যে সেই সঙ্কেতের পুনরুদ্ধারের সম্ভব; কারণ এই যে,—থিওসফি, দর্শন ও বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ও স্বীকৃত, সর্ব্বজনবিদিত চরম সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া ধর্ম্মমন্দির সুগঠিত করে। ইহার দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যার বোধিলব্ধ তত্ত্বজ্ঞান, দর্শন ও বিজ্ঞানের বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের সহিত সমজ্ঞান হয়। আমরা উদাহরণস্বরূপ "স্বপ্নতত্ত্বে" আলোচিত দুই একটী বিষয়ের সহিত উপনিষদের দুই একটী উক্তির বিচার করিব।

"তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। তেনৈব পূর্ণঃ। স বা এব পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্।" তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, দ্বিতীয়বল্লী, দ্বিতীয় অনুবাক্।

[সেই এই অন্নরসময় পুরুষ হইতে পৃথক কিন্তু তদভ্যন্তরে "প্রাণময়" পুরুষ অবস্থিত আছেন ; এই প্রাণময় পুরুষই অন্নময়ের সম্বন্ধে আত্মা ; এই প্রাণময়ের দ্বারা অন্নময় পূর্ণ (ব্যাপ্ত)।]

উল্লিখিত এই উক্তির সহিত "স্বপ্নতত্ত্বে" আলোচিত পিণ্ডদেহ ও প্রাণবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিতে আমরা সহৃদয় পাঠকগণকে অনুরোধ করি। আমাদিগের বিশ্বাস, তাঁহারা আমার এই বন্ধুবরের গবেষণাকে "অহিন্দুজাতীয় কপোলকল্পিত উপকথা" বলিবেন না।

শ্রীব্রহ্মসূত্রে, সূক্ষ্মদেহের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে ঋষি সূত্র করিয়াছেন, অস্যৈব চোপপত্তেরুষ্মা"—৪ অঃ, ২য় পাদ, ১১ সূত্র।

দেবর্ষি নারদের শিষ্য শ্রীমন্ নিয়মানন্দাচার্য্য বা নিম্বার্ক এই সূত্রের এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন,—"স্থূলদেহে সূক্ষ্মদেহস্যৈব ধর্ম্মভূতঃ উষ্মোপলভ্যতে। তস্মিন্নসতি তদনুপলব্ধেরিত্যুপপত্তেঃ।"

[সূক্ষ্মশরীরেরই ধর্ম্মভূত উষ্মা (উত্তাপ) স্থূলদেহে দৃষ্ট হয় ; কারণ সূক্ষ্মশরীর নিষ্ক্রান্ত হইলে স্থূলদেহে উষ্মাদৃষ্ট হয় না ; ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, স্থূলদেহের উত্তাপ নিজের নহে, তাহা সূক্ষ্মদেহের।]

এই সূত্র ও তাহার ভাষ্য পাঠ করিয়া আধুনিক শিক্ষিত মানব কি বলিবেন ? তিনি তাহা অজ্ঞ মানবশিশুর প্রলাপোক্তি বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন না কি ? বর্ত্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, দেহের অভ্যন্তরে অম্লজানের রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা দেহে উত্তাপ পরিলক্ষিত হয় ; উষ্মা বা উত্তাপ সূক্ষ্মদেহের ধর্ম্ম হইবে কেন ? কিন্তু প্রাণ-ময় কোষে প্রাণবায়ুর ক্রিয়ার কথা জানা থাকিলে তিনি কি ঋষির এই উক্তিকে উপহাস করিতে পারেন ? তিনি দেখিবেন যে, রাসায়নিক ক্রিয়ায় শরীরে উত্তাপ দৃষ্ট হয় সত্য, কিন্তু এই রাসায়নিক ক্রিয়া হইতেছে কেন ? ইহা প্রাণবায়ুর ক্রিয়ার জন্যই হইতেছে। প্রাণবায়ুর ক্রিয়া বন্ধ হইলে ত আর রাসায়নিক ক্রিয়া হয় না। অতএব

সূক্ষ্মদেহেরই যে ধর্ম্মভূত উষ্মা তাহাই রাসায়নিক ক্রিয়ারূপে স্থূলতঃ পরিলক্ষিত হয়। অতএব আমাদিগের মনে হয়, শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায় থিওসফির আলোচিত তত্ত্বকথার দ্বারা হিন্দুর শাস্ত্রীয় সমস্যার মীমাংসা করিতে যাইয়া শাস্ত্রের কোনও "অমর্য্যাদা" করিতে অগ্রসর হন নাই। তবে, আমার বোধ হয় তিনি স্বয়ং সূক্ষ্মদর্শী যোগী নহেন এবং এই সমস্ত তত্ত্বকথা তাঁহার নিজের সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রত্যক্ষীভূত বিষয়ও নহে। তিনি শাস্ত্র ও থিওসফির আলোচনা করিয়া বিচার বুদ্ধিতে যে সত্যে উপনীত হইয়াছেন এবং সেই জ্ঞান হইতে তিনি যে শান্তি পাইয়াছেন, তাহাই অপরকে বণ্টন করিয়া দিতে এই সমস্ত আলোচনা করিতেছেন। আমাদিগের পাঠকদিগের নিকট বিনীত নিবেদন যে, তাঁহারা যেন এই জাতীয় প্রবন্ধগুলিকে স্বাধীনভাবে বিচার করেন এবং সেগুলি তাঁহাদিগের জ্ঞানানুমোদিত হইলে তবে যেন তাঁহারা সেগুলিকে গ্রহণ করেন। আমরা স্বপ্ন-তত্ত্বের বিষয় এতটা লিখিতাম না, তবে আমাদিগের দুই একজন হিতাকাঙ্ক্ষী গ্রাহক এই সম্বন্ধে পত্রপ্রেরণ করিয়াছেন এবং প্রতিবাদ না করিলেও অনেকের ঐরূপ ধারণা থাকিতে পারে, তাই আমাদিগকে সাধারণভাবে একটা উত্তর দিতে হইল।

আমরা এখানে একটী সুপ্রচলিত, কিন্তু দুর্বোধ্য শাস্ত্রাদেশের বিষয় আলোচনা করিব। এক দেহ হইতে দেহান্তরে ব্যাধি, স্বাস্থ্য, পাপ, পুণ্য সংক্রামিত হয়।

"সহ শয্যাসনাৎ যানাৎ সংলাপাৎ সহভোজনাৎ।
সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥"

[একবিন্দু তৈল জলে পড়িলে যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে, এমনই যাহারা এক শয্যায় শয়ন, একাসনে গমনাগমন করে, অথবা

একত্র বসিয়া কথোপকথন বা একত্রে বসিয়া ভোজন করে, তাহা-দিগের পরস্পরের পাপ পরস্পরের দেহে সংক্রামিত হয়।]

ইহা হয় কেন? ইহা মানবের "অরা" হইতে হয়। থিওসফিষ্ট-দিগের নেত্রী মহামতি শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কি বলিয়াছেন, "অরা একপ্রকার সূক্ষ্ম অদৃশ্য তরল পদার্থ—যাহা চেতন অচেতন যাবতীয় বস্তু হইতে বিনির্গত হয়। ইহা দৈহিক মানসিক উভয়বিধ ধর্ম্মাক্রান্ত আধ্যাত্মিক বাষ্পোদ্গম বিশেষ, অথবা চিজ্জড়াত্মক বৈদ্যুতিক ভূত-বিশেষ। এই অরা একজাতীয় বাষ্পোদ্গম নহে। ইহা অতি জটিল এবং ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ধাতু আছে। কতকগুলি ধাতু স্থূল দেহ হইতে বিনির্গত হয়, কতকগুলি লিঙ্গশরীর হইতে এবং কতকগুলি আধ্যাত্মিক বৃত্তিসমূহ হইতে বিনির্গত হয়।" সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের দৃষ্টিতে অরায় উপর্য্যুপরি পাঁচটী স্তর লক্ষিত হয়। আমরা স্বাস্থ্য অরার কেবল এইখানে আলোচনা করিব। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা দেখিতে পান যে, দেহ অসুস্থ হইলে, অসুস্থ দেহের অরার প্রথম স্তরের সরল সমান্তরাল রেখাগুলি বক্র ও জটিল হইয়া যায় এবং মিসমেরিজম্ প্রক্রিয়া দ্বারা সেই দেহের শান্তিবিধান করিবার সময় যিনি মিসমেরাইজ করেন তাঁহার জীবনশক্তি-অধিষ্ঠিত অরার সাহায্যে রুগ্নের বক্র ও জটিল রেখাগুলি আবার সরল হইয়া যায়। এই অরার কথা "স্বপ্নতত্ত্বে" আলোচিত হইয়াছে। অরার কোন একটা বিশেষ শাস্ত্রীয় নাম না পাইয়া লেখক তাহাকে "স্বাস্থ্য-ওজঃ" নাম দিয়াছেন। ওজঃ শব্দ বৈদ্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। উহা দুই অর্থে দেখা যায়, একটী স্থূল ও অপরটী সূক্ষ্ম। স্থূলার্থে যে ওজঃ তাহাকে কোন কোন বৈদ্য আলবুমেন (Albumen) অর্থে ব্যবহার করেন। সূক্ষ্ম অর্থে তাহাকে "স্বাস্থ্য-অরা" বলিলে কোন দোষ হয় না। স্থূল অর্থে "ওজঃ" শব্দের অর্থ এইরূপ—"রসাদি সপ্তধাতুসারভাগজ ধাতুবিশেষঃ। তস্য গুণাঃ—

সর্ব্বশরীরস্থিতত্বম্। স্নিগ্ধত্বং। শীতলত্বং স্থিরত্বং। শুক্লবর্ণত্বং। কফাত্মকত্বম্। শরীরস্য বলপুষ্টিকারিত্বঞ্চ।" কিন্তু আর একভাবেও ইহাকে দেখা যাইতে পারে ;—

"ভ্রমরৈ ফলপুষ্পেভ্যো যথা সংভ্রিয়তে মধু।
তদ্বদোজঃ শরীরেভ্যো ধাতুঃ সংভ্রিয়তে নৃণাম্॥"

ইহা স্থূল ধাতুর সূক্ষ্ম সারাংশ। আমাদিগের পত্রপ্রেরক মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"বাস্তবিক ওজঃ ধাতু কি অরা, ওজঃ প্রভাযুক্ত নিশ্চয়, কিন্তু ইহা ধাতু বলিয়া শাস্ত্রে গণিত হইয়াছে,—"চিত্র-প্রভা" যতদূর আমার ধারণা "ধাতু" হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে, ইহাকে (ওজঃকে ?) কখনও "প্রভা" অর্থাৎ "অরা" বলা যাইতে পারে না।" এই উক্তি যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না, কারণ তিনি যে ব্লাভাট্স্কির দোহাই দিয়াছেন, তাঁহারই মতে যে "অরা" ধাতুবিশেষ তাহা আমরা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি। "অরা" হইতেছে,—প্রভাযুক্ত ভূত, কেবল প্রভার জন্য শরীরে স্বাস্থ্য সঞ্চারিত হয় না। পত্রপ্রেরক মহাশয় আর একস্থানে লিখিয়াছেন,—"বাস্তবিক ওজঃ কি ? সেই দ্রব্য হইতেছে যাহার উপর প্রণবদ্বারা ঘর্ষণ (?) করিলে উহাতে আত্মার স্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।" এখানেও ওজঃ কোন ধাতুবিশেষ কি ? তিনি আর একস্থলে লিখিয়াছেন,—"ওজঃ উপনিষদের "ভূমা" "ভূমি"। ওজঃ ধাতু হইলে ইহা কিরূপে "ভূমা" হইল তাহা বুঝা যায় না। ভূমা শব্দের উপর শ্রী ব্রহ্মসূত্রে একটী সূত্র দেখা যায়। তাহা এইরূপ,—

"ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ"—১ম অঃ, ৩য় পাদ, ৮ম সূত্র।

ভূমা, সম্প্রসাদাৎ—অধি-উপদেশাৎ, সম্যক প্রসীদতি অস্মিন্ ইতি সম্প্রসাদঃ সুষুপ্তং স্থানং ; তস্মাৎ অধি উপরি, তুরীয়ত্বেন উপদেশাৎ "ভূমা" শব্দবাচ্যো ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ।

আবার আমরা নিম্বার্কাচার্য্যের ভাষ্য দিতেছি,—

'পরমাচার্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্ গুরবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টো "ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য" ইত্যত্র ভূমা প্রাণোনভবতি, কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তমঃ কুতঃ ? "প্রাণাদুপরি ভূম উপদেশাৎ"।

"পরমাচার্য্য শ্রীসনৎকুমারাদি ঋষি আমার গুরুদেব শ্রীমন্নারদ ঋষিকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন বলিয়া, ছান্দোগ্যোপনিষদে উল্লিখিত আছে, যথা,—"ভূমাত্বেব জিজ্ঞাসিতব্য" (যাহা ভূমা, তাহা তুমি জ্ঞাত হও ; এই স্থলে ভূমা শব্দের বাচ্য প্রাণ নহে। কিন্তু, এই ভূমা শব্দের বাচ্য শ্রীপুরুষোত্তম ; কারণ, প্রাণের উপরে এই ভূমার স্থিতি ঐ শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। সম্প্রসাদ শব্দে সুষুপ্তি স্থান বুঝায়, সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাণই জাগরিত থাকে ; অতএব প্রাণই সুষুপ্তি স্থানীয়। সুতরাং শ্রুতির উপদিষ্ট ভূমাকে সম্প্রসাদের অতীত বলাতে তাঁহাকে প্রাণের অতীত বলা হইয়াছে।"

"ওজ—ধাতু" অর্থে কি তাহাই ? প্রকৃত প্রাণ কি,—তাহা স্বপ্নতত্ত্বের প্রাণ-সম্বন্ধিনী আলোচনার শেষাংশে দ্রষ্টব্য। সেখানে বলা হইয়াছে "প্রাণ" ব্রহ্মশক্তি।

ব্যারন ভন্ রিসন্‌ব্যাকের নাম অনেকেই অবগত আছেন। পণ্ডিত রিসনব্যাক বিশেষ গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, যাঁহাদের অনুভূতি-শক্তি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম তাঁহারা অন্ধকারে অয়স্কান্ত মণির দুই প্রান্তে দীপ শিখার মত আলোক দেখিতে পান, সেইরূপ অন্ধকারে নীলা, পোকরাজ, হীরক প্রভৃতির দানা হইতে এক প্রকার আলোক বহির্গত হইতে সূক্ষ্মদর্শীরা দেখিতে পান। রিসনব্যাক আরও প্রমাণ পাইয়াছেন যে, সূক্ষ্মানুভূতিযুক্ত শক্তিশালী ব্যক্তিগণ মানুষের মস্তকের ও দেহের চারিদিক হইতে সেই প্রকার আলোক বহির্গত হইতে দেখিতে পান। পণ্ডিত প্রবর রিসনব্যাক সেই দীপ্ত

পদার্থকে "ওদ" নাম দিয়াছেন। সেই পদার্থের "ওদ" নাম তিনি কোথা হইতে পাইলেন, তাহা কিছুই বলেন নাই। এই "ওদ" কথাটী কিন্তু তিব্বতীয় ভাষাতে আছে এবং আমাদিগের সংস্কৃত ভাষাতেও পাওয়া যায়। তিব্বতীয় ভাষাতে 'ওদ' শব্দের অর্থ দীপ্তিশালী পদার্থ। সংস্কৃত ভাষায় ওষ্মন্ শব্দের অর্থ ওষধি অর্থাৎ যে সকল লতা অন্ধকারে জ্বলে। ওদ পদার্থ ঐ সকল লতায় আছে বলিয়া ঐ লতার নাম. ওষ্মন্। শ্রীমতী ব্লাভাট্‌স্কী তাঁহার Secret Doctrine গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক অদ্ভুত জীবন-শক্তির দ্বারা ব্যাপ্ত; তাহা তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া মনে হয়। তিব্বতীয় ভাষায় এই তিন ভাগকে "ওদ" "অব" ও "অউর" বলা হয়। আমাদিগের সংস্কৃত ভাষায় উহাদিগের নাম "ওজঃ", "উষ্মা" এবং তিব্বতীয়েরা যাহাকে "অউর" বলে এবং যাহাতে পূর্ব্বোক্ত দুইটী অবস্থা সমন্বয়িত, তাহার নাম সংস্কৃত ভাষায় "উর্জ্জঃ"। "উষ্মা" পান করে বলিয়া অধম সূক্ষ্মদেহ-ধারী জীবগণকে উষ্মপা বলা হয়। মানব ওজঃ বা সোম দেবতারা পান করে। অন্নের চরম রস—যাহার অপর নাম অমৃত রস, তাহার নাম উর্জ্জঃ। যিনি এই উর্জ্জঃ লাভ করিতে পারেন, তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ উর্জ্জঃ-ধাতুময় হয়। তখন তিনি মহান্ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন। তাই ঋষিরা লিখিয়াছেন—

আপোহিষ্টা ময়োভূবস্তান উর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে॥

আমার মনে হয় অরাকে বায়ুমণ্ডল বলিয়া অনুবাদ করিলেও চলে, কারণ প্রাণ অর্থে মানবের দ্বারা আত্মকৃত প্রাণ-শক্তি বুঝায় এবং উপনিষদ্ বায়ু অর্থে বিশ্ব-প্রাণ বলিয়া কোথাও কোথাও প্রয়োগ করিয়াছেন।

শেষ কথা, স্বপ্নতত্ত্বের আর আর জটিল রহস্যের ফল ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। স্থানাভাব বশতঃ, এইবারের মত এইখানেই শেষ করিলাম।

ভৈরব।

প্রায় ১৮ বৎসর গত হইল, আমার মাতুলালয়ে নিম্নলিখিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল। আমার মাতুলবাটি গ্রামের মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ ও বৃহৎ বাটি; প্রায় ১৩।১৪ ঘর গৃহস্থ বাস করেন। এই বাটির এক গৃহস্থের একটি "ঘর জামাই" আছে, জামাইটি অতি সামান্য শিক্ষিত; বিশেষ বুদ্ধিমান্ নহে, ৺দুর্গাপূজার পর একদিন সে তাহার গৃহে তামাকু সেবন করিতে করিতে আপন মনে কি বলিতেছিল; এইরূপ ভাব দেখিয়া তাহার শাশুড়ী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহাকে দেখিয়া জামাই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ক্রোধকম্পিতস্বরে বলিতে লাগিল, "আমি যাই; আর আমি থাকিব না। আমার প্রতি এইরূপ অত্যাচার? আমাকে অবজ্ঞা? ইহার প্রতিশোধ লইব" ইত্যাদি। শাশুড়ী এইরূপ শুনিয়া "কি হইয়াছে, কেন এমন কথা বলিতেছ" এই প্রকার প্রশ্ন করায় সেও পূর্ব্বোক্তরূপে উহার উত্তর প্রদান করিল। তখন তাঁহার মনে ভয় হইল, বোধ হয় জামাতা পাগল হইল; সুতরাং তিনি বাটিস্থ অন্যান্য লোকসমূহকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহারা আসিয়া জামাতার মুখে এইরূপ প্রলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয়ার্থ তাহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল; কেহবা তিরস্কার করিল। কিন্তু সে আপন মনে পূর্ব্বোক্তরূপে কথা বলিতে লাগিল। অবশেষে "আমি যাই, আর থাকিব না; আমাকে তুচ্ছতাচ্ছল্য করা হয়, আমাকে কেহ মানে না, আমি আর থাকিব না"—এইরূপ বলিতে বলিতে হস্তস্থিত হুক্কা সজোরে ভুমিতলে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতবেগে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। অন্যান্য লোকজন তাহাকে ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। জামাতা বলবান্ নহে, কিন্তু সেই সময়

তাহার শরীরে এত বলাধিক্য হইয়াছিল যে, তাদপেক্ষা অধিক বলবান লোকগণ তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হয় নাই। অবশেষে তিন জন হিন্দুস্থানী চাকরের সাহায্যে অতি কষ্টে উহাকে ধৃত করা হইল। গৃহে আনিয়া উহাকে শয্যায় শয়ন করান হইল ও হস্তপদাদি সজোরে ধরিয়া রাখা হইল। সেই অবস্থায়ও তাহার মুখে সেই একই কথা। বহু লোক দেখিতে আসিল, কেহ বলেন উন্মাদের পূর্ব্বলক্ষণ; কেহ বলেন ভূতাবিষ্ট হইয়াছে; আবার কেহ বলেন, "ছোকরার বদমায়েসী" আমার মাতুল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, সুতরাং কুসংস্কার বর্জ্জিত অর্থাৎ ভূতপ্রেতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তিনি ব্যাপারটি কি দেখিবার জন্য আসিলেন তিনি উহার অস্বাভাবিক চেহারা দেখিয়া ও তাহার অস্বাভাবিক উক্তি শ্রবণ করিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং সকলকে স্থির হইতে বলিয়া উহাকে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার প্রতি কে দুর্ব্ব্যবহার করে; তোমাকে কে অবজ্ঞা করে?"

উত্তর। কেন এই বাটির সকলেই!

প্রশ্ন। কি রকমে অবজ্ঞা করা হয়?

উ। আমি তোমাদের ৺কালীবাড়ীতে আছি; আমাকে কেহ পূজা দেয় না, আর কি অবজ্ঞা করিবে বল?

এই কথা শুনিয়া আমার মাতুল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে যে তোমাকে পূজা দিব।"

উ। আমি "কাল ভৈরব"। আমাকে চেন না? আমরা তিন ভাই, বড় যিনি তাঁহার নাম "মহাকাল ভৈরব", মধ্যমের নাম "রুদ্রকাল ভৈরব", আমি ছোট আমার নাম "কাল ভৈরব"। আমি তোমাদের ৺কালীবাড়ীতে বহুদিন ধরিয়া বাস করিতেছি, কিন্তু কখনও কেহ আমাকে পূজা দেয় নাই।

প্র। আচ্ছা তুমি কালভৈরব, সুতরাং ভ[illegible]রের অনুচর;

তোমার বীজমন্ত্র জানা উচিত; তুমি বীজমন্ত্র জান? প্রকৃত পক্ষে ছোকরা বদমায়েসী করিতেছে কি না তাহা জানিবার জন্য এই প্রশ্ন করা হইয়াছিল।

উ। হ্যাঁ নিশ্চয়ই জানি।

প্র। তবে তুই একটি বীজমন্ত্র বল ত।

উ। তোমাকে বলিব কেন? ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যকে বীজমন্ত্র বলিতে নাই।

এই কথা শুনিয়া আমার মাতুল তাঁহারই দলের এক ব্রাহ্মণকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। তিনি আসিলে উহাকে নানারূপ বীজমন্ত্র জিজ্ঞাসা করা হইল। সেও যথাযথ উত্তর প্রদান করিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ জামাতা মন্ত্র-তন্ত্রাদি দূরে যাউক সংস্কৃত ভাষার নামও শুনে নাই। কারণ সে সামান্য বাঙ্গালা ভাষা জানে মাত্র। উহার মুখ হইতে এইরূপ বিশুদ্ধ বীজমন্ত্রাদি শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ একটু বিস্ময়াবিষ্ট ও একটু ভক্তিযুক্ত হইল। আমার মাতুল মহাশয় এইবার উহাকে "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করতঃ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

প্র। আপনি যে আমাদের ৺কালীবাড়ীতে আছেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই, সেইজন্য পূজাও দিতে পারি নাই।

উ। তাহা জানাইবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি।

প্র। আচ্ছা আপনি এই বালকের উপর "ভর" করিলেন কেন?

উ। এই বালক আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছিল। অমুক মাসে অমুক দিন এই বালক স্বগ্রাম হইতে এই গ্রামে আসিতেছিল, সেই দিন ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সে অমুক মাঠের মধ্যস্থ বটবৃক্ষতলে প্রথম আমার দৃষ্টিতে পতিত হয়। তারপর আর একদিন আমার বক্ষস্থলে মলমূত্র ত্যাগ করে, সেইদিন দ্বিতীয়বার আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

প্র। আপনি অশরীরী, কিরূপে এ আপনার বক্ষস্থলে মল-মূত্র ত্যাগ করিল বুঝিতে পারিলাম না।

উ। আমি তোমাদের ৺ কালী-মন্দিরের পশ্চাতে বৃক্ষসমূহে বাস করি। ঐ বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্যে ৺ জয়দুর্গার পূজাস্থান। সেই স্থানে শুষ্ক বিল্বপত্র পতিত আছে; এই বালক একদিন দ্বিপ্রহরের সময় সেই শুষ্ক বিল্বপত্রের উপর মল-মূত্র ত্যাগ করে। আমরা ঈশ্বরের অনুচর— বিল্বপত্রই আমাদের বক্ষস্থল।

প্র। আচ্ছা আপনার পূজা সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। কিরূপে বা কোন্ পদ্ধতিতে আপনার পূজা হইবে তাহা যদি অনুগ্রহ করিয়া বলেন তবে আমরা বিশেষ বাধিত থাকিব।

উ। আমার পূজাপদ্ধতি এই গ্রামের কোনও পুরোহিতই জানে না। অমুক গ্রামের একজন পুরোহিত জানে (সেই গ্রামের নাম ও সেই পুরোহিতের নাম আমার স্মরণ নাই)।

প্র। সেই গ্রাম বহুদূর, তথা হইতে সেই পুরোহিত আনয়ন করা সম্ভবপর নহে; অন্য কোনও প্রকার আজ্ঞা করুন।

উ। আচ্ছা তোমরা যেরূপ ভাবে ইচ্ছা ও যে কোনও পুরোহিত দ্বারা আমার পূজা করাইও, তাহা হইলেই আমি তৃপ্ত হইব।

প্র। তাহা হইলে এই বালককে আর কষ্ট দিয়া আপনার লাভ কি? আপনি দয়া করিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করুন।

উ। হাঁ আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি।

তৎক্ষণাৎ জামাতা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। জলসেচ দ্বারা তাহার মোহ অপনীত হইলে সে তাহার স্বাভাবিক ও পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল; তাহার কি হইয়াছিল এবং এত জনসমাগম কেন তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল। তাহাকে প্রশ্ন করা হইল যে, সেই ভৈরব-কথিত দিনে স্বগ্রাম হইতে আসিবার

কালে দুপহুরের সময়ে প্রান্তরমধ্যে কোনও বটবৃক্ষতলে সে উপস্থিত ছিল কিনা; আবার একদিন সে ৺ কালীবাড়ীতে কোনও বৃক্ষতলে মলত্যাগ করিয়াছিল কি না। এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলিয়াছিল যে উহা সত্য অর্থাৎ সে সেই সেই দিনে ঐরূপ করিয়াছিল।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে ভৈরব পূজার আয়োজন হইল। অপরাহ্ন। পূজা আরম্ভ হইবে—ঢোলক প্রভৃতি বাদ্য বাজিয়া উঠিল। এই সময় জামাতা গৃহে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল। বাদ্যধ্বনি শুনিয়াই বলিয়া উঠিল, "যাই যাই পূজা আরম্ভ হইয়াছে, আর এখানে থাকিব না।" এইরূপ বলিয়া হস্তস্থিত হুকা সজোরে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া পূজাস্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইল। গৃহস্থ স্ত্রীলোকগণের আর্ত্তনাদে সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া উহাকে বলপূর্ব্বক গৃহে লইয়া আসিল। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমার মাতুলও সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, উহার চক্ষু রক্তবর্ণ; চেহারা পূর্ব্বদিনের ন্যায় অস্বাভাবিক এবং "যাই যাই পূজা আরম্ভ হইয়াছে আর আমি থাকিব না" ইত্যাদি কথা বলিতেছে। তিনি পূর্ব্বদিনের ন্যায় আবার উহাকে প্রশ্ন করিলেন,—"আপনার পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে তবে পুনরায় এইরূপ করিতেছেন কেন?"

উ। আজ আমার দৃষ্টি শেষ হইল। আমি আর বেশীক্ষণ থাকিব না।

প্র। তবে আসিলেন কেন?

উ। আসিয়া যাই। দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণই ছিল। আজ শেষ তাই প্রকাশ পাইল।

প্র। তবে এখন চলিয়া যাউন, উহাকে আর কষ্ট দিবেন না।

উ। হাঁ, এই চলিলাম।

জামাতাও অজ্ঞান হইয়া পড়িল। জলসেচ দ্বারা তাহার চৈতন্য,

সম্পাদন করা হইল। সেইদিন সমারোহের সহিত পূজা শেষ হইল। সেই হইতে আর কেহই কখনও "ভৈরবাবিষ্ট" হয় নাই।

এই ঘটনার সম্পর্কিত সকল লোকই জীবিত আছেন। ইচ্ছাপূর্ব্বকই তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইল না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত।

পরলোকের পত্র।

আমার তিন কন্যা; তন্মধ্যে দ্বিতীয়া কন্যাকে আমি বড় ভালবাসিতাম। দ্বিতীয়া কন্যার নাম ভানুমতী। দেখিতে দেখিতে ভানুমতী বড় হইয়া উঠিল এবং আমি হিন্দুসমাজের নিয়মানুসারে একটী সৎপাত্রে কন্যা দান করিলাম। আমার বৈবাহিক একজন বিখ্যাত কবিরাজ। কবিরাজের বাটীতে কন্যাদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মনে করিলাম যে, বিবাহ দিয়া কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম এবং সেই সঙ্গে কন্যার পীড়ার দায় হইতেও নিশ্চিন্ত হইলাম। বৈবাহিক যখন একজন বিখ্যাত কবিরাজ, তখন কন্যার কোন পীড়া হইলে আর আমাকে পূর্ব্বের ন্যায় ডাক্তার বা কবিরাজের সাহায্য লইবার জন্য উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না। ভানুমতী শ্বশুরালয়ে প্রথম যাইয়াই ভয়ানক অম্লসূচক জ্বররোগে আক্রান্ত হইল। বৈবাহিক মহাশয় বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়াও তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিলেন না। অবশেষে নিরুপায় বিবেচনা করিয়া তাহার চিকিৎসার জন্য আমার নিকট লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অগত্যা আমি ভানুমতীকে জেলা সাহাবাঁদের অন্তর্গত নাসরিগঞ্জ নামক স্থানে লইয়া যাইতে বাধ্য হইলাম।

নাসরিগঞ্জ আমার চাকরী-স্থান। সেখানকার জলবায়ু তৎকালে বড় ভাল ছিল। আমি বাঁকীপুর হইতে একজন সুচিকিৎসক আনাইয়া তাঁহার দ্বারায় চিকিৎসা করাইতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হইল না, বরং দিন দিন ভানুমতীর পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

সেই সময়ে আমার ৺ পিতামহীর আদ্যশ্রাদ্ধ-উপলক্ষে আমাকে দশ দিবসের জন্য ছুটী লইয়া সপরিবারে বাটী আসিতে বাধ্য হইতে হইল। সুতরাং ভানুমতীকেও বাটী লইয়া আসিলাম। আদ্যশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে, বাটী হইতে পুনর্ব্বার চাকরী স্থানে যাইবার পূর্ব্বে আমি ভানুমতীকে দেখিতে গেলাম। তাহাকে দেখিয়া আমার মনে এইরূপ একটা ধারণা হইল যে, তাহার জীবনের আশা আর বেশীদিন নাই। সে বলিল, "বাবা আপনার কোন চিন্তা নাই, আমি ভাল হইয়া আপনাকে পত্র লিখিব।" আমি নাসরিগঞ্জে প্রস্থান করিলাম এবং প্রতিদিন পত্রে তাহার সংবাদ লইতে লাগিলাম। ৩।৪ দিবস এইরূপে পত্র আসিবার পরে পত্র পাইলাম না। রাত্রে নিদ্রা যাইবার সময় হইলে শয্যায় শয়ন করিলাম, কিন্তু নানা প্রকার চিন্তায় শীঘ্র নিদ্রা হইল না—পরে গভীর রাত্রে অনেক কষ্টে নিদ্রা হইল। নিদ্রা দেবীর সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেবী আমার দেহ অধিকার করিলেন।

স্বপ্নে আমি এক খানি পত্র পাইলাম। পাইয়া সমুৎসুক চিত্তে পত্রখানি খুলিয়া দেখিলাম, পত্র খানি লাল কালীতে ভানুর স্বহস্তের লেখা। ভানুর হাতের লেখা ও স্বাক্ষর দেখিয়া পরম পুলকে পরিপূর্ণ হইলাম—সেরূপ সুখ বোধ করি ইহজন্মে আমার আর ভোগ হইবে না। পত্রখানিতে এইরূপ লেখা ছিল :—

শ্রীচরণ কমলেষু—,

বাবা! আপনি শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ

আরোগ্য লাভ করিয়াছি। আমার শরীর পূর্ব্বের ন্যায় সুশ্রী ও সবল হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনার সহিত পৃথিবীতে আর আমার দেখা হইবে না, আমি এক্ষণে পরলোকে আসিয়াছি।

স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী—

শ্রীমতী ভানুমতী দেবী।

আমি পত্রখানি পড়িয়া বালিসের নিম্নে রাখিয়া পুনর্ব্বার নিদ্রা গেলাম। প্রত্যুষে উঠিয়া পত্রখানি খুঁজিতে লাগিলাম, কিন্তু ঐ পত্র খানি আর দেখিতে পাইলাম না। মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। তদবস্থায় প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া আপনার পোষাক পরিয়া বাহিরে গেলাম। বাহিরে যাইবামাত্র পোষ্ট পিয়ন একখানি পত্র আমার হস্তে দিল—পত্রখানি খুলিয়া পড়িয়া দেখি ভানুমতী তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গিয়াছে।

শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী (রায় সাহেব)।

বাহ্যবস্তুর প্রভাব।

মানুষ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে, ইহাই আমরা জানি; কিন্তু গাছপালা, ইট-কাট, মাটি-পাথর, কুকুর-বিড়াল, নদ-নদী—সকল বস্তুই যে ক্রমাগত আমাদের উপর অল্পাধিক শক্তি প্রয়োগ করিতেছে ইহা হয়ত অনেকেই জানেন না। আজ এ সম্বন্ধে ২.১টি কথা বলিব। প্রথমে মৃত্তিকার কথা। সকল ভূমির প্রভাব একরূপ নহে। পাথুরে জমীর একরূপ ক্রিয়া, বেলে মাটীর অন্যরূপ শক্তি, আবার ধাতব জমীর (mineral soilএর) প্রভাব আর এক রকম। কি দিন, কি রাত্রি, কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল সময়েই সকল ভূমিই

অধিবাসীদিগের উপর স্বীয় বিশিষ্ট শক্তি প্রয়োগ করিতেছে। এই শক্তিপ্রভাবে ব্যক্তিগত ও জাতিগত স্বভাবের কিছু কিছু পরিবর্ত্তনও ঘটিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞান ইহা এখনও জানিতে পারে নাই। এই রহস্য বুঝিয়ে ভবিষ্যতে ডাক্তারেরা বায়ু-পরিবর্ত্তনের ন্যায় ভূমি-পরিবর্ত্তনেরও ব্যবস্থা করিবেন। ভূমির ন্যায় বিশেষ বিশেষ জলেরও বিশেষ বিশেষ প্রভাব আছে। খাল, বিল, হ্রদ, নদী, সমুদ্র—প্রত্যেকেরই ক্রিয়া ভিন্নরূপ। কিন্তু সমুদ্রের প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

উদ্ভিদ্গণও আমাদের উপর কম শক্তি বিস্তার করে না। বৃক্ষ, লতা, তরু গুল্ম—প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে আমাদের দেহ ও মনের উপর ক্রিয়া করিতেছে। যাঁহারা জানেন না বা অনুসন্ধান করেন নাই, তাঁহারাই বৃক্ষাদির অনুভব-শক্তি, চৈতন্যশক্তি ও ক্রিয়া-শক্তির সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, প্রাচীন বৃক্ষগুলির এক একটি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে, এক একটি স্বতন্ত্র আত্মা আছে। মানবাত্মার ন্যায় এই আত্মাগুলি দেহান্তর গ্রহণ করে না বটে, কিন্তু ইহাদের যথেষ্ট জ্ঞান ও শক্তি বর্ত্তমান। ইহারা ভাল মন্দ বেশ বুঝিতে পারে। সূর্য্যের আলোক বা উত্তাপ পাইলে অথবা বর্ষার ধারা নিপতিত হইলে ইহারা কেমন প্রফুল্ল হয়, ইহাদের উজ্জ্বল রক্তিমাভাই তাহার প্রমাণ। এই সুন্দর বর্ণ অবশ্য চর্ম্মচক্ষুর অগোচর, কেবল দিব্যদর্শিগণই (clairvoyants) তাহা দেখিতে পান *

---

* ধাতু-বৃক্ষাদির যে জীবন ও অনুভব শক্তি আছে, ইহা আমাদের মুখোজ্জ্বলকারী স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় অনেক মৌলিক গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যাঁহার কৌতূহল হইবে, তিনি বসু মহাশয়ের প্রকাশিত পুস্তকাবলী পাঠ করিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

বৃহৎ প্রাচীন বৃক্ষগুলির এক একটি স্বতন্ত্র আত্মা আছে।• কোন কোন স্থলে এই আত্মাগুলি এতদূর বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, তাহারা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কোন একটি দেহ ধারণ করিয়া সময়ে সময়ে বৃক্ষের বাহিরে আবির্ভূত হয়। এরূপ স্থলে ইহারা প্রায়ই মানবের রূপ ধারণ করিতেই ভালবাসে; কারণ, পৃথিবীচারী জীবদিগের মধ্যে মানবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অসভ্যজাতির মধ্যে যে বৃক্ষপূজা প্রচলিত আছে, বোধ হয় তাহার উৎপত্তি এই। অজ্ঞ আদিম মানব যদি দেখে কোন বৃহদাকার মনুষ্য-মূর্ত্তি বৃক্ষ হইতে নির্গত হইয়া ক্ষণকাল পরে পুনরায় বৃক্ষে বিলীন হইল, তাহা হইলে সে যে বৃক্ষকে দেবতাবোধে পূজা করিবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সে যাহা হউক, বৃক্ষগণ মানবের অনুরাগ-বিরাগ, আদর-অনাদর যে বুঝিতে পারে এবং তাহার অনুরূপ প্রতিদান করে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এখন দেখা যাক বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী, প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি কি প্রকারে আমাদের উপর শক্তি বিস্তার করে। আমরা দেখিলাম, প্রত্যেক বস্তুরই জীবন আছে এবং এক প্রকার অনুভব-শক্তিও আছে। কিন্তু আর একটি কথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। তাহা এই। বস্তুমাত্রেরই এক একটি সূক্ষ্ম দেহ আছে এবং এই সূক্ষ্মদেহ অনবরত স্পন্দিত হইতেছে। এই স্পন্দন সূক্ষ্মজগতে নিয়তই তরঙ্গ তুলিতেছে এবং এই সকল তরঙ্গ ক্রমাগত আমাদের সূক্ষ্মদেহে আঘাত করিতেছে; সুতরাং আমাদের সূক্ষ্মদেহ এই সকল বাহ্য আঘাতে নানা ভাবে স্পন্দিত হইতেছে। মনে করুন, একটা কুকুরকে আপনি প্রহার করিলেন। কুকুরের বিষম ক্রোধ ও ভয়ের উদ্রেক হইল অর্থাৎ উহার সূক্ষ্ম দেহটা প্রতিহিংসা ও ক্রোধাদির স্পন্দনে স্পন্দিত হইতে লাগিল। ঐ স্পন্দন সূক্ষ্ম জগতে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল এবং বিশেষ ভাবে আপনার সূক্ষ্মদেহের উপর আঘাত করিল। ইহার ফল

কি হইল? আপনার সূক্ষ্মদেহ ঐ স্পন্দনে আলোড়িত হইল, অর্থাৎ আপনার মনে ক্রোধাদি প্রবৃত্তি সবল ও পরিপুষ্ট হইল। ঠিক এইরূপে অপরের স্নেহ ও দয়াদি আপনার চিত্তে স্নেহ ও দয়া উত্তেজিত ও বলবৎ করিবে। আমাদের চতুঃপার্শ্বস্থ পশুপক্ষী ও মানবগণ প্রধানতঃ এই প্রকারেই আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

কিন্তু প্রস্তর, মৃত্তিকা, জল, বায়ু, বৃক্ষলতা প্রভৃতি কিরূপে আমাদিগের উপর শক্তিবিস্তার করে, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের আর একটি কথা বুঝা প্রয়োজন। সকলেই জানেন, প্রকৃতিই আদি ভূত (root matter)। প্রকৃতি হইতেই সব উৎপন্ন। প্রকৃতিই ঘনীভূত হইয়া ক্ষিতি, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদির সৃষ্টি করে এবং অন্তিমে সমস্তই প্রকৃতিতে আবার লীন হয়। এই যে প্রকৃতি, ইহার তিনটি গুণ আছে—সত্ব, রজ ও তম। সুতরাং প্রকৃতিজাত সকল পদার্থেই এই তিনটি গুণ থাকিবেই থাকিবে। কিন্তু সকল পদার্থে এই তিনটি গুণ সমভাবে নাই; কোনটি সত্বপ্রধান, কোনটি রজঃপ্রধান, কোনটি তমঃপ্রধান। তাহা হইলে আমরা প্রথমে এই তিনটি শ্রেণী বা বিভাগ পাইলাম। ইহা ব্যতীত আরও ৪টি শ্রেণী পাওয়া যাইতে পারে, যথা;—(১) সত্ব ও রজ (দুইটিই) প্রধান, (২) সত্ব ও তম প্রধান, (৩) রজ ও তম প্রধান, (৪) সত্ব রজ ও তম (তিনটিই) প্রধান। তাহা হইলে আমরা মোট ৭টি বিভাগ পাই। একটি একটি করিয়া প্রধান—তিনটি, দুইটি দুইটি করিয়া প্রধান—তিনটি, তিনটিই প্রধান—একটি, এই মোট সাতটি। পূর্ব্বোক্ত সাতটি বিভাগ ব্যতীত আর কোন বিভাগ পাওয়া অসম্ভব। এইজন্যই জগতের যাবতীয় বস্তুরই সাতটি শ্রেণী—যেমন সপ্তলোক, সপ্ত পাতাল, সপ্ত ঋষি, সপ্ত অর্চ্চিঃ; সপ্ত জাতি ইত্যাদি। বাস্তবিক জগতের সকল পদার্থেরই সাতটি শ্রেণী আছে,—মানবের সাত শ্রেণী, পশুর

সাত শ্রেণী, বৃক্ষের সাত শ্রেণী, লতার সাত শ্রেণী, মৃত্তিকার সাত শ্রেণী, ধাতুর সাত শ্রেণী ইত্যাদি ইত্যাদি।

যে মানব যে শ্রেণীভুক্ত, তাঁহার উপর সেই শ্রেণীস্থ পদার্থেরই প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং অনুকূল এবং বিপরীত শ্রেণীস্থ পদার্থের প্রভাব প্রতিকূল বা অনিষ্টকর। মনে করুন, আপনি সত্ত্ব-প্রধান। যে সকল বৃক্ষ, লতা, মৃত্তিকা, প্রস্তর বা জল সত্ত্বপ্রধান, তাহারাই আপনার উপর অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিবে, কারণ তাহাদের aura বা সূক্ষ্মদেহের স্পন্দনের সহিত আপনার সূক্ষ্মদেহের স্পন্দনের মিল আছে। আর, যে সকল প্রস্তর-মৃত্তিকাদি তমঃপ্রধান, তাহারা আপনার অনিষ্ট করিবে, আপনার অশান্তি বা উদ্বেগ উৎপাদন করিবে, কারণ তাহাদের স্পন্দনের সহিত আপনার স্পন্দনের ঐক্য (harmony) নাই। এইজন্য কোন্ বৃক্ষ, বা কোন্ প্রস্তর একটি নির্দ্দিষ্ট মানবের উপযোগী হইবে ইহা জানিতে হইলে, ঐ মানব কোন্ শ্রেণীভুক্ত আগে জানা চাই, পরে তৎশ্রেণীস্থ বৃক্ষাদি নির্ণয় করিতে হয়। দিব্যদৃষ্টি ব্যতীত এরূপ করা অসম্ভব। *

মানব বহুকাল ধরিয়া পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা করিয়া আসিতেছে, সুতরাং গৃহপালিত পশু ব্যতীত অন্য পশু হইতে সে আর এখন উপকার পায় না। গৃহপালিত পশুগণ স্নেহ ও যত্ন পাইয়া প্রভুকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। তাহাদের ভালবাসার অন্য জিনিষ না থাকায়, তাহারা প্রভুর প্রতিই সব ভালবাসাটি ঢালিয়া দেয়। ইহা একটি বড় সাধারণ শক্তি নহে। ইহাদ্বারা প্রভু যে কত লাভবান্ হন,

* কোন্ ব্যক্তির কি অবস্থায় কিরূপ প্রস্তরাদি দ্বারা হিত বা অহিত হয়, জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায়—ঋষিগণ কোন্ প্রস্তর কোন্ শ্রেণীভুক্ত, এবং কোন্ লগ্নে বা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে কোন্ শ্রেণীর মানব উৎপন্ন হয়—ইত্যাদি সমস্তই দিব্যনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া জীবহিতার্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

স্নেহ ও দয়া ধনে কিরূপ ধনী হইতে থাকেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পক্ষান্তরে যাঁহারা পশুর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া তাহাদের ঘৃণা ও ক্রোধভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদের বড়ই দুর্ভাগ্য, কারণ তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহের উপর পশুদিগের ক্রোধবাণ (thought forms) তো নিয়ত বর্ষিত হয়ই, অধিকন্তু তাহাদিগকে মানবের এবং Nature spirits প্রভৃতি দেবযোনিরও অপ্রীতিভাজন হইতে হয়।

পশুগণই যখন আমাদের উপর এত শক্তি বিস্তার করে, তখন মানবগণ যে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তি প্রয়োগ করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? বাস্তবিক, আমরা সর্ব্বদা যাহাদের সহিত মিশি, একত্র বাস করি, তাহাদের প্রীতি ও ভালবাসার উপর আমাদের কল্যাণ যে কতদূর নির্ভর করে, সূক্ষ্মদর্শী ব্যতীত কেহই তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন না। শিক্ষক ছাত্রগণের, অধ্যক্ষ নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণের, গৃহস্বামী পরিবারবর্গের, সেনাপতি সৈন্যগণের ও রাজা প্রজাবৃন্দের প্রীতি ও ভক্তি লাভ করিলে সূক্ষ্মজগতে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। দেখা যায়—সেই শিক্ষক বা সেনাপতি কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আছেন এবং চতুর্দ্দিক্ হইতে অসংখ্য অনুকূল শক্তিস্রোত অবিশ্রান্ত সেই কেন্দ্রে নিপতিত হইতেছে। ইহাতে উক্ত ব্যক্তি যে পরম লাভবান্ হইতেছেন তাহাতে সন্দেহ আছে কি? তিনি যে কেবল স্বয়ং লাভবান্ হন তাহা নহে, ঐ অসংখ্য ব্যক্তির অধিকতর উপকার সাধনে সমর্থ ও প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তিনি যদি ইহাদের বিরাগ ও বিদ্বেষভাজন হন, তাহা হইলে ঠিক বিপরীত ঘটে। অসংখ্য প্রতিকূল শক্তি তাঁহার উপর নিয়ত বর্ষিত হয়, যেন সপ্তরথী মিলিয়া অভিমন্যুকে বাণবিদ্ধ করিতেছে।

একটা কথা, আছে "সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ"। ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমরা যেরূপ লোকের সঙ্গে সর্ব্বদা বাস করিব, অলক্ষ্যে আমাদের চরিত্র ও স্বভাব ঠিক তদনুরূপ হইয়া

যাইবে। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। যেমন দুইটি পাত্রের জলসমোচ্চ না থাকিলেও, একটি নল দ্বারা সংযোজিত হইলে সমোচ্চ হইয়া যায়, যেমন একটি উত্তপ্ত বস্তু শীতল বস্তুর সহবাসে শীতল হইয়া যায়, সেইরূপ দুইটি অসমান সূক্ষ্মদেহ একত্র আসিলেই ক্রমে সমস্পন্দী বা সমধর্ম্মী হইতে থাকে। যাঁহার সূক্ষ্মদেহে নিয়ত ক্রোধের স্পন্দন হইতেছে, তিনি যদি বহুকাল এক ক্ষমাশীল শক্তিশালী ব্যক্তির সহবাস করেন, তাহা হইলে ক্ষমার স্পন্দনের দ্বারা তাঁহার ক্রোধের স্পন্দন মন্দীভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রশমিত হইতে পারে। শক্তির এই নিয়মটি কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, সকল জগতেই খাটে। স্থূল জগতে ইহা নিউটনের দ্বিতীয় নিয়ম (Newton's Second Law of Motion) নামে পরিচিত।

প্রাচ্য দেশে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ঋষিগণ ইহা সম্যক্ বুঝিতেন বলিয়াই অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। শিষ্যকে গুরুগৃহে বাস করিতে হইত, সর্ব্বদা গুরুর সেবা করিতে হইত, গুরুর সঙ্গে থাকিতে হইত। ইহার উদ্দেশ্য কি ? গুরু অবশ্য শিষ্য অপেক্ষা অনেক উন্নত, সুতরাং তাঁহার সূক্ষ্ম দেহের স্পন্দন নিশ্চয়ই খুব নিয়মিত ও উচ্চ। শিষ্য সর্ব্বদা গুরুর এই পবিত্র Aura বা ছটার মধ্যে বাস করাতে, তাহার সূক্ষ্মদেহ ক্রমশঃ গুরুর স্পন্দনে স্পন্দিত হয়, সুতরাং পবিত্র ভাব ও পবিত্র চিন্তা তাহার অভ্যস্ত হইয়া যায়। শিষ্য স্বয়ং বা নিজের চেষ্টায় হয়ত যে স্পন্দনটি অধিকক্ষণ রাখিতে পারে না, শক্তিমান্ গুরুর সহবাসে সেই স্পন্দনটি বিনা আয়াসে তাহার সূক্ষ্মদেহে নিয়ত উত্থিত হয়। যেমন গান শিখিবার সময় কোন ব্যক্তি নিজে হয়ত একটি রাগিনী ঠিক বাহির করিতে পারে না, কিন্তু ওস্তাদজীর সঙ্গে গাহিলে উহা সহজেই আয়ত্ত হয়, ইহাও ঠিক সেইরূপ।

একজন উন্নত মহাত্মা যে পরিমাণে শক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন,

একজন সাধারণ ব্যক্তি তাহার শতাংশও পারে না সত্য। কিন্তু শত শত সাধারণ ব্যক্তির সমবেত শক্তি অনেক সময় খুবই প্রবল হয়। মানবসমাজে যে একটী জাতীয় বা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কার প্রায়ই দেখা যায়, তাহার মূলই এইখানে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা একই প্রকারের বা একই সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মিশেন, তাঁহার সূক্ষ্মদেহ ক্রমাগত একটি নির্দ্দিষ্ট স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া এরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত হয় যে অন্য প্রকার স্পন্দন উহা সহজে গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং অন্য ধর্ম্মের বা অন্য জাতির বা অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যা কিছু সত্য ও সৌন্দর্য্য আছে, তাহা তিনি দেখিতে পান না। ইহার একমাত্র প্রতীকার এই যে, স্বীয় ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, নানা ধর্ম্ম, নানা জাতি ও নানা সম্প্রদায়ের সহিত মেশামেশি করা ও ধীর ভাবে তাহাদের মতামত শ্রবণ করা ও বুঝিবার চেষ্টা করা। দেশ-ভ্রমণের দ্বারা ইহা সহজে সাধিত হয়। এইজন্যই একটা কথা আছে দেশভ্রমণ ব্যতীত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু ভ্রমণের সময় চিত্তকে অবারিত, মুক্ত রাখিতে হইবে এবং যে দেশে গমন করিবেন সেই দেশীয়দিগের সহিত মিশিতে হইবে, তাহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, পর্য্যবেক্ষণ ও চিন্তা করিতে হইবে। অনেকে বিদেশে গিয়া নিজের বন্ধু-বান্ধব বা নিজ সম্প্রদায় বা নিজ ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে খুঁজিয়া লন ও তাঁহাদের সহিতই বাস করেন অর্থাৎ ঘরে যে কূপমণ্ডুপ ছিলেন, বাহিরে গিয়াও তাহাই রহিলেন। ইহাতে ভ্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। আমাদের সঙ্কীর্ণতা বশতঃ আমরা একটি কথা সর্ব্বদাই ভুলিয়া যাই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, পৃথিবীতে যত বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন রীতিনীতি, বিভিন্ন আচারব্যবহার, বা বিভিন্ন ধর্ম্মমত প্রচলিত, সকলগুলিই উপকারী ও প্রয়োজনীয়, সকল গুলিতেই সত্য আছে, সকল গুলিরই সার্থকতা আছে। তাহা যদি না থাকিত,

তাহা হইলে তাহারা আবির্ভূত হইত না। যতকাল প্রয়োজনীয়তা থাকে, ততকাল সেগুলি টিকে, যখন প্রয়োজন থাকে না তাহারা বিলোপ পায়।

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য আমরা কখনও কখনও বিদেশে গিয়া থাকি। ইহাতে উপকারও হয়, আবার সময়ে সময়ে অপকারও হয়। এই উপকার বা অপকারের জন্য আমরা স্থূল জলবায়ুকেই একমাত্র দায়ী করি। অবশ্য স্থূল জলবায়ুর যে প্রভাব নাই ইহা আমি বলিতেছি না। আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের সূক্ষ্ম দেহের উপর নদী, গিরি, প্রস্রবণ, অরণ্য, ও ভূমি প্রভৃতির aura যে একটা অসাধারণ শক্তি সঞ্চার করে তাহা আমরা অনেকেই জানি না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়া অদ্যকার প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। যাঁহারা ক্রমাগত নগরে বাস করেন, তাঁহারা যদি অন্ততঃ ২।১ দিনের জন্যও কোন পল্লীগ্রামে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই একটা মানসিক ভাবান্তর অনুভব করিয়াছেন। ইহার সমগ্র কারণ তাঁহারা জানেন না। তাঁহারা মনে করেন, জলবায়ু ও সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যই এই ভাবান্তর আনিয়াছে। কিন্তু যাঁহার দিব্যদৃষ্টি আছে, তিনি দেখিতে পান নগরের সূক্ষ্মাকাশ সর্ব্বদাই কি ভীষণ, কি জঘন্য, কি মলিনতাময়, কি পূতিগন্ধময়! লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ধনতৃষ্ণা, ক্রোধ, ঈর্ষা ও প্রতিহিংসাদির স্পন্দনে সূক্ষ্মাকাশ নিয়ত ক্ষোভিত, আলোড়িত, তরঙ্গায়িত! ধূম্রবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, পাটলবর্ণ বীভৎসাকার নানাবিধ চিন্তা-মূর্ত্তি (Thought-forms) তাহাতে ক্রমাগত ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি করিতেছে! যে দিকেই দেখুন, কেবল স্বার্থ, স্বার্থ, স্বার্থ! এই নীচ ও জঘন্য স্পন্দনের মধ্যে নিয়ত নিমগ্ন থাকিয়া কয়জন ব্যক্তি স্বীয় সূক্ষ্ম দেহকে অক্ষুণ্ণ ও পবিত্র রাখিতে পারেন? এইজন্যই যখন আমরা পল্লীগ্রামের অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল স্পন্দনের মধ্যে গিয়া বাস করি,—আমরা আরাম পাই,

সুখ পাই, আনন্দ পাই। আর সমধর্ম্মী নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী প্রভৃতির অনুকূল স্পন্দন আমাদিগকে সতেজ ও সবল করে।

শ্রীমাখনলাল রায় চৌধুরী।

পাঞ্চজন্য-রহস্য।

(এক তরুণী স্ত্রী লইয়া দুই ব্রাহ্মণের বিবাদ বাধিয়াছে। বলা বাহুল্য, স্ত্রী একজনেরই, কিন্তু এক অপদেবতা ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া সেই স্ত্রীর উপর দাবী করিতেছে। এক্ষণে তাহারা দুই জনেই রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী। রাজার নিদেশমত অদ্য প্রাতেঃ তাহারা রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যথার্থ স্বামী রীতিমত শপথ গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত জবানবন্দী দিতেছে।—পূর্ব্বকথা।)

রাজা। স্ত্রীলোকটি কি আপনার বিবাহিতা পত্নী?

প্রঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা হাঁ।

রাজা। কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন?

প্রঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা, বিলাসপুর।

রাজা। কাহার কন্যার সহিত?

প্রঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা, শ্রীনবকুমার দেবশর্ম্মার কন্যার সহিত।

রাজা। আপনাদের ঝগড়া কি নিমিত্ত?

প্রঃ ব্রাহ্মণ। স্ত্রী লইয়া। আমার স্ত্রীকে আমার সঙ্গী ব্রাহ্মণ বলে তাহার স্ত্রী। কি আশ্চর্য্য কলির ধর্ম্মই কি এই প্রকার? কোথা থেকে উড়ে এসে যুড়ে ব'সে আমার স্ত্রীকে বলে তাহার স্ত্রী। ওঃ কি বিভ্রাট। মহারাজ আমি কি আর স্ত্রী পাইব? হায়, হায়, এমন বিপদেও কি মানুষ পড়ে? আমি কি হতভাগ্য। এ জীবনের পোষিত আশালতা একবারে উন্মূলিত হইল? আমি নরাধম, নারকী। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া এই স্ত্রী লাভ করিয়াছিলাম।

তাহাকেও এতদিন পরে হারাইলাম! মহারাজ নরনারায়ণ, ধর্ম্মাবতার, এবং দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা—দেখিবেন গরীব ব্রাহ্মণের যেন সদ্বিচার হয়। বলা বাহুল্য, আমি ঈশ্বর সাক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, স্ত্রী আমার। কারণ অগ্রেই আমি আস্তিক মন্ত্র পাঠ করিয়াছি।

রাজা। আচ্ছা, বিলাসপুর হইতে হরিপুর কতদূর ?

প্রঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা, আন্দাজ পাঁচ ক্রোশ হইবে।

রাজা। আপনি বিবাহের পর, আর কখন কি শ্বশুরালয় গিয়াছিলেন ?

প্রঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা কতবার গিয়াছি।

রাজা। আপনি আপনার স্ত্রীকে চিনিতে পারেন ?

প্রঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা, আমি আমার স্ত্রীকে চিনিব না ত কে চিনিবে ?

রাজা। স্ত্রীও আপনাকে চিনেন ?

প্রঃ ব্রাহ্মণ। নিশ্চয়ই। কে কবে আপন স্বামীকে না চিনিতে পারে ?

রাজা। স্ত্রীর বয়ঃক্রম কত ?

প্রঃ ব্রাহ্মণ। আন্দাজ চৌদ্দ পনের বৎসর হইবে। ঠিক কত বৎসর বলিতে পারি না। কারণ পাঁচ বৎসর হইল আমার বিবাহ হইয়াছে। যখন বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন তাহার বয়স্ নয় দশ বৎসর শুনিয়াছিলাম। সত্য মিথ্যা শ্বশুর শাশুড়ীই জানেন।

রাজা। বিবাহকালীন আপনাদের গণ-মিলন কি ঠিকুজী কুষ্ঠী দেখান হইয়াছিল ?

প্রঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা, না। আমার ঠিকুজী কুষ্ঠী ছিল না। পিতা অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ। গরিবের আবার গণা-গাঁথা! সন্তানাদির ঠিকুজী কুষ্ঠী ধনবানের ঘরেই হইয়া থাকে।

রাজা। আপনি সত্য বলিতেছেন আপনার জন্মপত্রিকা ছিল না?

প্রঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা, ইত্যগ্রেহ আপনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছেন। জ্ঞানতঃ যাহা আমি জানি এবং বলিতেছি সমস্তই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। একটি কথাও আমি মিথ্যা বলি নাই এবং এখনও বলিতেছি—"ছিল না।"

রাজা দ্বারবানের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ কোথায়?" প্রতিহারী দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিল। রাজা আজ্ঞা করিলেন, "ইহাকেও আস্তিক মন্ত্র পাঠ করাও।"

প্রতিহারী। আপনি কি লেখাপড়া জানেন?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। জানি বই কি।

প্রতিহারী। আপনি কি এই আস্তিক মন্ত্রটি সকলের সমক্ষে পাঠ করিবেন? না, আপনাকে পড়াইব?

দ্বি ব্রাহ্মণ। তুমি ভাষ খানি আমাকে দাও, আমি পাঠ করিতেছি।

এই বলিয়া সকলে শুনিতে পায় এইরূপ স্বরে পাঠ করিলেন। যথা—

অত্র ধর্ম্মাধিকরণে আমি ভগবানকে সাক্ষ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে এই মোকদ্দমায় আমি যাহা কহিব, সত্য ভিন্ন মিথ্যা কহিব না যদি কহি ভগবানের নিকট দণ্ডনীয় হইব।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবে পাঠ করিলেন যে শ্রোতৃবর্গ ব্রাহ্মণের পাঠ-চাতুর্য্য বুঝিতে পারিল না। তিনি না শব্দটি যদি শব্দের আনুসঙ্গিক করিয়া পাঠ সমাপ্তি করিলেন। সুতরাং যাহা কহিলেন, সমস্তই মিথ্যা কহিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

রাজা। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন আপনার নাম কি?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। শ্রীহৃদয়কালী দেবশর্ম্মা।

রাজা। পিতার নাম?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। শ্রীকালীপদ দেবশর্ম্মা।

রাজা। নিবাস কোথায় ?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। হরিপুর।

রাজা। আপনাদের ঝগড়া কি নিমিত্ত ?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। স্ত্রী লইয়া। আমার স্ত্রীকে উনি বলেন উহার। কি আশ্চর্য্য !

রাজা। আপনি আপনার স্ত্রী কি প্রমাণ করিতে পারেন ?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা হাঁ। বহুপ্রকার প্রমাণ আছে।

রাজা। কোথায় বিবাহ করিয়াছিলেন ?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা, বিলাসপুর।

রাজা। হরিপুর হইতে বিলাসপুর কতদূর ?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা হাঁটিয়া গেলে প্রায় পাঁচ ক্রোশ জমি হইবে। অদৃশ্যে এক নিমিষের পথ।

রাজা। অদৃশ্যে এক নিমিষের পথ কি প্রকার ?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা, যাহারা অদৃশ্যে যাইতে পারে তাহাদের পক্ষে।

রাজা। আপনি কি অদৃশ্যে যাইতে পারেন ?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা, আমার মত যাহারা কদাচিৎ হাঁটে, তাহারা পারে।

রাজা। আপনি কি তবে হাঁটেন না। উড়িয়া যান ?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা, একপ্রকার উড়িয়া যাওয়াই বটে।

রাজা। হাঁ ! মানুষ কি অদৃশ্যভাবে উড়িতে পারে ?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ ভ্রুকুটী করিয়া কহিল—কি আশ্চর্য্য মনুষ্য অদৃশ্যভাবে উড়িতে পারে এ ধারণা কি আপনার নাই ?

রাজা। মানুষ অদৃশ্যভাবে উড়িতে পারে আমি বিশ্বাস করি না। শুনিয়াছি, তান্ত্রিক মতে যাহারা গুটিকা সিদ্ধ করিয়াছে তাহারা পারে

অথবা "জুকি মন্ত্র" যাহারা জানে তাহারা পারে। এই দুই প্রকারের লোকই সন্ন্যাসী। তুমি ত সন্ন্যাসী নও। তুমি এ সব কথা বলিলে কি প্রকারে বিশ্বাস করিব?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আমি আপনাকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারি।

রাজা। কি প্রকার?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। কি প্রকার, দেখাইব।

রাজা। কখন্ দেখাইবেন প্রতিজ্ঞা করুন।

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। বিচার শেষে। হুঁঃ, উড়া ত সামান্য কার্য্য। এতদপেক্ষা অনেক অত্যাশ্চর্য্য বিষয় আছে; যাহা বলিলে আপনি একবারেই বিশ্বাস করিবেন না।

রাজা। এর অপেক্ষা আর কি অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আছে?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আছে বই কি?

রাজা। কি বলুন না।

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। অণু হওয়া। এই মানুষই অণু হইতে পারে। অণু হইলে আপনি আর উহাকে দেখিতে পাইবেন না। এই অণু একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া অনায়াসে কোন একটি দুষ্প্রবেশ্য স্থানে প্রবেশ করিতে পারে।

রাজা। উপহাস করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ তাহা কি কখন হয়?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। তাহা যদি না হইবে, সাধুরা অন্তর্দ্ধান হয় কি প্রকারে? আপনি বিশ্বাস করিতেছেন না, এই দুঃখ। ইহা ত প্রত্যক্ষ দেখান যাইতে পারে।

রাজা। বলেন কি? আপনি ত খুব ক্ষমতাশালী পুরুষ দেখিতেছি। সাধু পুরুষেরাই অনিমাদি সপ্তদশ সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। তবে আপনি কি একজন সাধুপুরুষ?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। কি করিয়া বলিব? আপনি না জানিয়াই আমাকে একজন ক্ষমতাশালী সাধুপুরুষ বলিতেছেন।

রাজা। তবে একবার দেখাইয়া আমার সর্ব্ব সংশয় দূরীভূত করুন।

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। নিশ্চয়ই দেখাইব। এখন আপনার হাতের বিষয়টি শেষ হইলে হয়।

রাজা। আচ্ছা, আপনি বলিলেন মনুষ্য অণু হইয়া অন্তর্দ্ধান হয়। কোন ছিদ্র দিয়া অগম্য স্থানে গমনাগমন করে। যদি ফিরিবার সময় ছিদ্র না পায়, তবে ছিদ্র করিয়া কি ফিরিতে পারে?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা না। তাহা পারে না। যতদিন ছিদ্র না পায়, সেই স্থানে বদ্ধ থাকে।

রাজা। সে যাহা হউক, কাহার বাটীতে বিবাহ করিয়াছিলেন।

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা চক্রবর্ত্তীদের বাড়ীতে।

রাজা। আপনার শ্বশুরের নাম?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। শ্রীনবকুমার দেবশর্ম্মা।

রাজা। তাহার কোন্ কন্যাকে বিবাহ করেন?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা তাঁহার একই কন্যা ছিল। তাহাকেই বিবাহ করি। তিনিই আপনার রাজবাড়ীতে নীত হইয়াছেন।

রাজা। কন্যার কত বয়ঃক্রমকালে বিবাহ হইয়াছিল?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। দশ বৎসর।

রাজা। এখন তাহার কত বয়স?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। ঠিক পনের বৎসর।

রাজা। বিবাহের সম্বন্ধ হইলে, ঠিকুজী কুষ্ঠী দেখিয়া কি আপনাদের গণ মিলন হইয়াছিল?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা হাঁ। আমার দেবগণ, কন্যারও দেবগণ। দেবগণ দেবগণে রাজজোটক মিল হইয়াছিল।

রাজা। তাইত, আপনি যে আপনার স্ত্রী প্রমাণ করিতে বিবাহের

অনেক পুরাণ কথা বিবৃত করিলেন। এ সব আপনার পরিজনবর্গ ভিন্ন অন্য কাহার জানিবার সম্ভাবনা নাই। আচ্ছা, বধূমাতার অঙ্গে কি এমন কোন চিহ্ন আছে, যাহা আপনি ভিন্ন অন্য কেহ জানে না। অথবা সকলেই দেখিয়াছে ও সকলেই জানে ?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা না। এমন কোন প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য চিহ্ন নাই। তবে এমন কোন গুণ আছে যাহা দেবতাদেরই হইয়া থাকে, অন্য কাহাকেও সম্ভবে না এবং যাহা আমি ভিন্ন অন্য কেহই জানে না। সে গুণটি পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন।

রাজা। ভাল, সে গুণটি কি ?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। মহারাজ সে গুণটি লোক চিনিবার ক্ষমতা।

রাজা। লোক চিনিবার ক্ষমতা কি প্রকার ?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আত্মজ্ঞপুরুষেরা যে প্রকার লোক চিনিতে পারেন, এও সেই প্রকারের।

রাজা। আমি বুঝিতে পারি না সে কি প্রকারের ?

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা, ইনি পূর্ব্ব জন্মে স্বরতত্ত্ব বিদ্যার আলোচনা করিতেন। স্বরোদয় শাস্ত্রে ইহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। এজন্য এ জন্মেও সেই বিদ্যার আভাস তাঁহাতে স্ফুরিত আছে। ইনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালেরই ঘটনা বলিতে পারিতেন। তবে এখন ততদূর বলিতে পারেন কি না অবগত নহি। কিছু না কিছু জন্মে জন্মে সপ্রকাশ থাকে। তপস্যা কখন ব্যর্থ হয় না।

রাজা। দেখিতেছি আপনি পূর্ব্ব জন্মের অনেক কথা বলিতে পারেন। পূর্ব্ব জন্মে কে কি ছিল, কে কি করিয়াছে, আপনার মুখে শুনিয়া কি প্রকারে বিশ্বাস করিব ? তাহার প্রমাণ কি ? আপনার স্ত্রীর ক্ষমতা আপনি সম্পূর্ণ জানেন না। এইটি বড় বিস্ময়কর।

আপনি কি ভূত ভবিষ্যৎ কিছু বলিতে পারেন? ভবিষ্যতে আপনার ও আমার কি ঘটিবে বলুন দেখি।

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা, না। ভবিষ্যৎ বলিতে পারা যায় না। সে জ্ঞান অবস্থাভেদে হইয়া থাকে।

রাজা। অবস্থাভেদে হইয়া থাকে এর মর্ম্ম কি? যাহা হউক আপনার ক্ষমতার কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম। এরূপ ক্ষমতা সচ-রাচর মানবে দৃষ্ট হয় না।

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা আমি যাহা কহিলাম, এই স্ত্রীলোককে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে সত্য মিথ্যা জানিতে পারিবেন।

রাজা তদনন্তর জনান্তিকে আদেশ করিলেন—"এই ব্রাহ্মণকে বহির্দ্দেশে রক্ষা কর। চিন্তা করিবার অবকাশ দিও না। সর্ব্বদা কথাবার্ত্তায় কালহরণ করিও। যতক্ষণ আমি পুনরায় না ডাকি, ততক্ষণ এরূপ ভাবে রাখিবে যে, স্বকীয় বিষয় চিন্তা না করিতে পারে।" এই বলিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর তাহার বিচার লিপিবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজার বিচারলিপি।

দেখিতেছি, ব্রাহ্মণদ্বয়ের রূপ প্রায়ই একপ্রকার। বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে প্রকৃতিগত অনেক ভেদ আছে বুঝিতে পারা যায়। প্রথম ব্রাহ্মণের মানবদেহ। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের মানবদেহ বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম। এই সূক্ষ্ম শরীরকে যোগীরা কামাভিরূপ বলে। যোগীদের কামাভিরূপে ও এই কামাভিরূপে যাহা কিছু পার্থক্য আছে, এ প্রস্তাবে তাহার বিশেষ উল্লেখ অপ্রয়োজন। এ কামাভিরূপে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি নাই। অজ্ঞানতায় পরিপূর্ণ। যাহারা ভূতযোনি, তাহাদের এ প্রকার শরীর স্বাভাবিক। এ শরীরপ্রাপ্তিসত্ত্বেও অন্যের অনুরূপ রূপকরণ

করা সম্ভবপর নহে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম ব্রাহ্মণের মত এ ব্রাহ্মণ ঠিক সাজ সাজিয়াছে। প্রথম ব্রাহ্মণ যাহা বলিয়াছে, দ্বিতীয় প্রায়ই তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়াছে। অথচ পরস্পরের সহিত পরস্পরের সাক্ষাৎ নাই। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের মনোযায়িত্ব ক্ষমতা আছে। মনোযায়িত্ব শক্তি না থাকিলে একজনের মনোভাব, অন্য জন জানিতে পারে না এবং বলিবারও ক্ষমতা থাকে না। যেমন আমরা; এক জনের মনের কথা জানিতে পারি না এবং বলিতেও পারি না। অনিমাদি সপ্তদশ সিদ্ধি মধ্যে মনোযায়িত্ব একটি প্রধান বিভূতি। ইহা যোগীরা যোগমার্গে বিশেষ উন্নত না হইলে প্রাপ্ত হয়েন না। সত্বগুণে মন বিধৌত না হইলে এ বিভূতি কোন ক্রমেই প্রকাশ পায় না। ভূতযোনিরা সত্বাংশরহিত, সুতরাং তাহাদের স্বাভাবিক সূক্ষ্মশরীর হইলেও, তাহার পরিবর্ত্তন অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ রূপধারণ সাধ্যায়ত্ত নহে।

দেখিতেছি প্রথম ব্রাহ্মণ সত্যবাদী, সরলচেতা ও অকপটভাষী। দ্বিতীয় মিথ্যাবাদী ও কপটভাষী। যদিও প্রথমাপেক্ষা দ্বিতীয়ের বুদ্ধি-প্রাখর্য্য আছে, সে প্রাখর্য্য যোনিভেদমূলক। ভূতযোনি আবহমান কাল জগতে বর্ত্তমান আছে। তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি সামান্য নর অপেক্ষা অধিক হইবে, তাহার বৈচিত্র্য কি? দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ মানব নহে। ভূতযোনি। ভূত না হইলে পাঁচ ক্রোশ পরিমাণ পথ কি প্রকারে এক নিমিষে গমন করিবে? ইত্যগ্রেই বলিয়াছি ভূতেরা সূক্ষ্মশরীর। সূক্ষ্মশরীর না হইলে ছিদ্র দিয়া কি প্রকারে প্রবেশ করিবে? প্রথম ও দ্বিতীয়ের এক প্রকার হইলেও ভিন্ন প্রকৃতি-বিশিষ্ট। পরিচয় এক হইলেও দ্বিতীয়ের পরিচয় রহস্যভেদক। সে রহস্য মানব সহজে বুঝিতে পারে না। বুদ্ধির অগম্য। কল্পনা দ্বারাও কেহ স্থির করিতে

পারে না। অধিকন্তু এ ভাবের কল্পনা কাহারও মনের মধ্যে উদিত হয় না। এ রহস্য বুঝিতে পারে এ প্রকার উন্নত সাধু দৃষ্টিগোচর হয় না অথবা যদিও দেখা যায় তিনি আত্মক্ষমতা অপরকে জানিতে দেন না। সর্ব্বদা আত্মগোপন করেন। তাঁহার ক্ষমতা সহচর বা শিষ্য না হইলে জানিবার উপায় নাই। এইরূপ সাধু পুরুষই জ্ঞানী মহাপুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ভূতেরা অতীত ও বর্ত্তমান দেখিতে পায়, ভবিষৎ পায় না। পাইলে অবস্থাভেদের কথা বলিত না অর্থাৎ স্থূল প্রপঞ্চ ভিন্ন সূক্ষ্ম দেহে হয় না এই মর্ম্ম। অতীতের জ্ঞান আছে বলিয়া অনেক অতীত ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছে। বর্ত্তমানের জ্ঞান আছে বলিয়া উপস্থিত কি প্রসঙ্গ হইতেছে, ইহারা বলিতে পারে। প্রমাণ ভূতাবেশ হইলে চণ্ড-প্রথা। যাহারা চণ্ড নামায়, তাহারা রোগীর অতীত ঘটনা বলে এবং বর্ত্তমানও বলিয়া থাকে। দুইকালের ঘটনা বলিয়া দর্শকমণ্ডলীর বিস্ময় জন্মাইয়া দেয় এবং ঔষধাদি দিয়া রোগমুক্ত করিয়া দেয়। ভবিষ্যৎ যাহা বলে তাহা বিশ্বাসজনক নহে।

বধূমাতা বাস্তবিকই স্বর শুনিয়া লোক চিনিতে পারেন। একথা আমি শুনিয়াছি ও বিশ্বাস করি। সুতরাং এ সম্পর্কে ব্রাহ্মণের কথা মিথ্যা নহে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ ভূতযোনি কিনা প্রত্যক্ষ প্রমাণ না করিতে পারিলে আমার বিচার্য্য বিষয় অবশ্য অসম্পূর্ণ রহিবে। এই প্রমাণ না করিয়াও আমি বিচার শেষ করিতে পারিতেছি না। এই বলিয়া দোবে ঠাকুরকে বলিলেন—'তোমাকে যাহা প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলাম, তাহা কি প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছ? দোবে বলিল, "আজ্ঞা হাঁ মহারাজ। প্রস্তুত করিয়া আনিয়া এই বিচারগৃহমধ্যেই ঐ দেখুন রক্ষা করিয়াছি। রাজা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, 'বাঃ ঠিক হইয়াছে। স্থালিকাটি কে প্রস্তুত করিল? আমার

রাজ্যমধ্যে ঐপ্রকার কারুকর কি আছে? দেখিতেছি যেরূপ আবশ্যক ঠিক সেইরূপই হইয়াছে। স্থালিকার মুখবিবর যেরূপ সংকীর্ণ হওয়া আবশ্যক, তদ্রূপই হইয়াছে এবং মুখ বন্ধ করিবারও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে'। তদনন্তর রাজা দোবে ঠাকুরকে বলিলেন, 'দেখ দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ যদি ঘটনা ক্রমে এই স্থালিকা মধ্যে প্রবেশ করে, তুমি স্থালিকার মুখ বন্ধ করিবার জন্য আয়োজন করিয়া রাখিও। বজ্রোপম লৌহ কীলক দ্বারা উহার মুখ এরূপ ভাবে বন্ধ করিবে যে, জল-বায়ু নিঃসরণের পথ না থাকে এবং ব্রাহ্মণও বাহিরে আসিতে না পারে। যদি কোন ক্রমে বাহিরে আইসে, আমাদের বিপদের সীমা থাকিবে না। প্রাণ রক্ষা করা দায় হইবে। বোধ করি তুমি বুঝিতে পারিয়াছ—এ ব্রাহ্মণ মনুষ্য নহে, ভূতযোনি—ব্রহ্মদৈত্য। ব্রহ্ম সত্ত্বণ উদ্ভূত বলিয়া অনেক ব্রহ্মবিভূতির কথা জানে'। দোবে ঠাকুর মহারাজের কথা সব পূর্ণ বুঝিল ও তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া রাখিল।

কিয়ৎকাল পরে মহারাজ দোবে ঠাকুরকে বলিলেন 'দোবেজী—দ্বিতীয় ব্রাহ্মণকে এইখানে আনয়ন কর।

দোবে তাহাই করিল।

রাজা দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—'আপনি যে বলিয়াছিলেন আমার বিচার শেষ হইলে আমাকে কিছু অলৌকিক ব্যাপার দেখাইবেন'।

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা, যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি অকপটে আপনার বিশ্বাসের জন্য তাহাই করিব। আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহা আপনার বিশ্বাস ও ধারণা করিয়া না দিতে পারিলে আমি স্ত্রী পাইতেছি না, বিশেষ জানি।

রাজা। নিশ্চয়ই।

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। মহারাজ, আজ্ঞা হইলে আমি বিলাসপুর হইতে এক

মুহূর্ত্ত মধ্যে আপনার কোন আদিষ্ট বস্তু আনিয়া দিতে পারি। আজ্ঞা হইলে আমি এই নিকটস্থ স্থালী মধ্যে প্রবেশ করিতে ও পারি।

রাজা। বেশ, অগ্রে এই স্থালী মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার কিয়দংশ সন্দেহের নিরাকরণ করুন। তবে, একটি কথা আছে, আপনি উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন কি না, জানিব কি প্রকারে? আপনি যেরূপ কথা কহিতেছেন ,তদবস্থায় থাকিয়া যদি বলেন আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম। আমি কি প্রকারে বিশ্বাস করিব। প্রবেশের প্রমাণ কি দেখাইবেন, বলুন।

দ্বিঃ ব্রাহ্মণ। আচ্ছা; আপনি এই স্থালিকাটি অর্দ্ধ জল পূর্ণ করিতে বলুন। আমি প্রবেশ করিলে সমস্ত জল উথলিয়া পড়িয়া যাইবে এবং আমি উহার ভিতর প্রবেশ করিয়া জগৎমাতা মহামায়া কালিকার নাম ঘন ঘন উচ্চারণ করিব। সকলেরই শ্রুতিগম্য হইবে। ইহাতে বোধ করি আর আপনার সন্দেহের কোন কারণ থাকিবে না।

রাজা। বেশ! তৎপরে আবশ্যক হইলে অন্য পরীক্ষা করা যাইবে।

রাজাজ্ঞায় স্থালিকার্দ্ধ জলপূর্ণ হইলে, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্থালিকামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কালী নাম গম্ভীর নাদে ঘন ঘন উচ্চারিত হইতে লাগিল।

সুশিক্ষিত চতুর দ্বারবান স্থালিকা-মুখোপযোগী একটি লৌহময় কীলক লইয়া স্থালিকামুখ বন্ধ করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে বদ্ধ রহিলেন।

রাজা সেই শব্দায়মান ঘটাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন।

রাজার এই অদ্ভুত বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা রাজ্যমধ্যে প্রচারিত হইল। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিতে প্রজাবর্গ দলে দলে উপস্থিত হইতে

লাগিল। রাজবাটী প্রজা সমূহে পরিপূর্ণ হইল এবং মঙ্গলসূচক জয়ধ্বনিতে আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল।

অনন্তর রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাজ্ঞী শশব্যস্ত হইয়া রাজার বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। শুনিয়া চকিত, স্থগিত ও স্তম্ভিত হইলেন।

পরিশেষে রাজা আপনার অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন। কল্য প্রত্যূষে বধূমাতা ঠাকুরাণীকে তাঁহার শ্বশুরালয়ে চারিজন বরকন্দাজ সহ প্রেরণ করা যাইবে। তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইতে কহিবে।

ব্রাহ্মণী রাজ্ঞীমুখে এই কথা শুনিবামাত্র আনন্দাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন এবং কায়মনোবাক্যে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

রাজা পরদিন প্রত্যূষে পঞ্চজন আগন্তুককে চারিজন বরকন্দাজসহ হরিপুরে প্রেরণ করিলেন।

শ্রীমতিলাল রায়।

পুনরাগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩৬)

পথের কষ্টের কথা আর তুলিব না। গোপালকে গৃহে ফিরাইবার অতি ঔৎসুক্যে আমি একদিনের একক্ষণের জন্য ঐশ্বর্য্যের অভিমান ত্যাগ করিয়াছিলাম, দীন গোপালের সম্মুখে দাঁড়াইতে দীনভাব অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। কাজেই যথেষ্ট পাথেয় সঙ্গে না লইয়াই গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছি। একজন ভৃত্যকেও সঙ্গে লই নাই।

বাল্যের দারিদ্র্য এখন আমার পক্ষে স্বপ্ন-কথা হইয়াছে। প্রতি দণ্ডেই এখন আমাকে ভৃত্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। এরূপ অবস্থায়

বাড়ী ছাড়িয়া আমি যে কি অর্ব্বাচীনের কার্য্য করিয়াছি, তাহা আমি কাহাকে বুঝাইব ? সে দিন বিজয়াদশমী—দেশবিদেশ হইতে লোক-সকল আপনার আপনার ঘরে ফিরিয়া আনন্দ-কোলাহলে গৃহসকল পরিপূর্ণ করিয়াছে। এই শুভদিনে মানুষে যে যাহার প্রতি শত্রুতা ভুলিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে। ঘর হইতে বাহির হইবার মধ্যে আমি ও আমাদের গৃহসুহৃৎ ডাক্তারবাবু। পালকীর বেহারাসকল যে কোন ভাগ্যবানের গৃহে দুর্গাপূজার তিনদিন অন্নপানে তৃপ্ত হইতে চলিয়া গিয়াছে। আমরা বহুচেষ্টায় একখানিও পালকী সংগ্রহ করিতে পারি নাই। একখানি গরুর গাড়ী চণ্ডীতলা-অভিমুখে যাইতেছিল,—তাহাতে আচ্ছাদনমাত্র ছিল না—পালকীর ভাড়া দিয়া তাহাতেই আমরা আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সুতরাং পথের কষ্টের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। পদে পদে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম, বাড়ীতে ফিরিয়া যাই। পূজার ছুটীর শেষে গোপালের সন্ধানে আসিব। ডাক্তারবাবু সঙ্গে না থাকিলে নিশ্চয়ই ঘরে ফিরিতাম। আমার প্রতিজ্ঞা আমার গৃহের পর্য্যঙ্কে দুগ্ধফেননিভ শয্যার মধ্যে সমাহিত হইত।

কিন্তু ধন্য ডাক্তারবাবু! তাঁহার এই একটী দিনের আচরণ চিরকালের জন্য আমার চিত্তে অঙ্কিত রহিয়া গিয়াছে। এমন ধীরতায়, এমন শান্তভাবে তিনি পথের সেই অকথ্য ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন যে, এখনও মনে পড়িলে আমার নিজের মনুষ্যত্বে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়।

গোশকটে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে দুইজনে চিত্তরক্ষার মত সামান্য মাত্র জলযোগ করিয়াছিলাম। সেই সামান্যমাত্র বল অবলম্বন করিয়া আমরা উভয়েই শরতের মেঘমুক্ত রৌদ্রতাপে দগ্ধ হইয়াছি। আমার জীবনে দুইচারিবার এরূপ গ্রাম্যপথে পর্য্যটন ঘটিয়াছে, কিন্তু ডাক্তার-বাবুর জীবনে ইহা সর্ব্বপ্রথম ঘটনা। কলিকাতাতেই তাঁহার জন্ম, জন্মের পর হইতে আজিও পর্য্যন্ত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া তাঁহার এরূপ

আরণ্য পল্লীতে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন হয় নাই। ব্যবসায়ে তিনি সহরের ভিতরে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতার ভিতরেই চলাচল করিতে বহুদিন হইতে তাঁহাকে মাটীতে পা দিতে হয় নাই। গরুর গাড়ীতে চড়িয়া তাঁহাকে যে দেশান্তরে যাইতে হইবে, ইহা কোনদিন তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। সেই তিনি আজ বন্ধুর গ্রাম্যপথে গরুর গাড়ীতে চাপিয়া চলিয়াছেন। দুই পার্শ্বের ঘনসন্নিবিষ্ট তরুদল অরণ্যের আকারে প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার বিভীষিকা উৎপন্ন করিতেছিল। কিন্তু এক ক্ষণের জন্যও তাঁহার মুখে ভয়-বিকার লক্ষিত হয় নাই। মাঝে মাঝে আমাকে চঞ্চল দেখিয়া তিনি এক একবার আমাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন এই মাত্র, নিজে যে বিন্দুমাত্রও কষ্ট পাইতেছেন এরূপ একটী কথাও তাঁহার মুখ হইতে বাহির হয় নাই। তাই এখনও বলিতেছি—সেই বহুকাল পূর্ব্বের স্থির মধুর মূর্ত্তি মানসচক্ষুর সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বলিতেছি—ধন্য তুমি ডাক্তারবাবু! তখন বুঝিতে পারি নাই যে, ভাগ্য তোমাকে বরণ করিবার জন্য প্রবল আকর্ষণে সমীপস্থ করিতেছে। আর তোমার এই বরণ কার্য্য সমাপিত করিবার জন্য বিধাতা এই চপলচিত্ত যুবককে ঘটক নিযুক্ত করিয়াছেন। যাক্ সে কথা পরে বলিব। এখন যাহা বলিবার তাহা বলিয়া যাই।

যেখানে পূর্ব্বোক্ত দস্যুটার সহিত দ্বিতীয়বার আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সেইস্থানে উপস্থিত হইতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। এই স্থান হইতেই আমাদিগকে সেই ব্রাহ্মণের গৃহ সন্ধান করিতে হইবে। এইস্থানে পৌঁছিয়াই আমি ডাক্তারবাবুকে ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাতের কথা শুনাইলাম। যে দিক হইতে ব্রাহ্মণ আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে দেখাইলাম। আর বলিলাম—"এখন হইতে সদর রাস্তা ছাড়িয়া এই গ্রাম্য পথে প্রবেশ করিতে হইবে।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"বেশ, কর।"

আমি বলিলাম—"কিন্তু সম্মুখে সন্ধ্যা।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ইহার পরেত রাত্রি হইবে।"

আমি—"এখনই বা রাত্রি হইতে বাকী কি ? অন্ধকার আগে হইতেই বাগানের ভিতরে বড় বড় গাছের তলায় তলায় থাবা পাতিয়া বসিয়াছে।"

ডা। অন্ধকার-শিশুগুলি এখনও পর্য্যন্ত পরস্পরে সংলগ্ন হইতে পারে নাই। এখনও পথ চিনিবার উপায় আছে, ইহার পরে তাহারা জড়াজড়ি করিয়া যখন তাল হইবে, তখন কেমন করিয়া যাইবে ?"

আমি। এখান হইতে আধক্রোশের মধ্যে চণ্ডীতলা, সেখানে চটী আছে—রাত্রিতে আশ্রয় লওয়া চলিবে।"

ডা। "কথাটা আমার মনে লাগিতেছে না।"

আমি গাড়োয়ানকে গাড়ী থামাইতে আদেশ করিলাম। আর বলিলাম, "এখন হইতে আমাদিগকে এই পথে যাইতে হইবে "

গাড়োয়ান বলিল, "আমি যাইতে পারিব না।"

আমি পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইলাম, তথাপি শকটচালক সম্মত হইল না। অবশ্য তাহাকে সেজন্য অপরাধী করিতে পারি না। কেন না চণ্ডীতলার নাম করিয়া আমি তাহার গাড়ী ভাড়া করিয়াছিলাম। তদতিরিক্ত পথ যাইব না বলায় সে আমাদিগকে গাড়ীতে লইতে স্বীকৃত হইয়াছিল। হাতে এমন কিছু পয়সা নাই যে, অতিরিক্ত পুরস্কারের প্রলোভনে তাহাকে সঙ্গে লই। সুতরাং এইস্থান হইতেই তাহাকে ভাড়া দিয়া বিদায় দিব স্থির করিলাম। মনে করিলাম যদি ডাক্তারবাবু গ্রামের অনুসন্ধানে খানিকটা পথ গিয়া আর অগ্রসর হইতে না চান, তাহা হইলে আমরা পদব্রজেই চণ্ডীতলায় উপস্থিত হইব।

আমি গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভাল, সঙ্গে যাইতে না চাস্, এইগ্রামে মুখুয্যেবাবু কে আছে বলিতে পারিস্।"

গাড়োয়ান উত্তর করিল—"মুখুয্যে কে আছে না আছে জানি না, তবে এখানে আগে অনেক ঠ্যাঙ্গাড়ে ছিল শুনিয়াছি।"

"এখন ?"

"এখনও মাঝে মাঝে দুই একটা খুন-খারাপির কথা শোনা যায়।

খুনের কথা শুনিয়াই আমি একবার ডাক্তারবাবুর মুখের পানে চাহিলাম। ভাবিলাম, ভয় পাইয়া যদি তিনি চণ্ডীতলায় যাইতে চান। তিনি একথায় কিঞ্চিন্মাত্রও ভীত না হইয়া, ঈষৎ রুক্ষস্বরে গাড়োয়ানকে বলিলেন—"খুন-খারাপির কথা রাখ্, তুই মুখুয্যেবাবুর বাড়ী চিনিস্ কিনা বল্।

গাড়োয়ান উত্তর করিল—"না বাবু।"

আমি ভাড়া দিয়া গাড়োয়ানকে বিদায় করিলাম। ডাক্তারবাবু বলিলেন—"এখানে যখন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহার বাড়ী এস্থান হইতে বেশী দূর হইবে না।"

আমি বলিলাম—"শুধু তাই নয়, তাঁহার দশমবর্ষীয়া নাতিনীও তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"তবে আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ কর।"

ডাক্তারবাবুর সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। পথে আসিতে আসিতে অনেকবার দূরস্থিত গ্রাম সকল হইতে শ্রীদুর্গার বিসর্জ্জনের বাজনা শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এখানে উপস্থিত হইতে না হইতে চারিদিক যেন নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। একটা ঢাকের শব্দ শুনিতে পাইলে সেই শব্দ লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে পারিতাম। কিন্তু হায় তৎ-পরিবর্ত্তে সমস্ত বনটা ঝিল্লীরবে মুখরিত হইয়াছে। পথে এমন একটা

লোক নাই যে, তাহাকেও গ্রামসম্বন্ধে এক আধটা কথা জিজ্ঞাসা করি। অতি অনিচ্ছায়, শুধু ডাক্তারবাবুর কাছে মুখরক্ষার জন্য তাঁহাকে মাত্র সঙ্গী করিয়া সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথে পদার্পণ করিলাম।

কিছুদুর অগ্রসর হইয়াই বুঝিলাম, যাহাকে গ্রাম মনে করিয়াছিলাম তাহা একটী বিশাল আম কাঁঠালের বন। তাহারই পার্শ্বে বিশাল ধান্যক্ষেত্র, গ্রাম যে কত দূরে তাহার ইয়ত্তা নাই। দশমীর শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। তথাপি বাগানের মধ্যে অন্ধকার দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া আসিল। মনে হইল, যেন অন্ধকার আমাদের পিছু লইয়াছে।

চলিতে চলিতে অনুমান একক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছি। বুঝিলাম, অবসর হইলে বিপদ, ফিরিতে গেলেও বিপদ মাথায় করিয়া ফিরিতে হয়। বিশ্রাম যে লইব, তাহারই বা উপায় কোথায়! এক পার্শ্বে কণ্টকাকীর্ণ অরণ্য, অপর পার্শ্বে যেন ধরণীর সীমান্তগামী শ্যাম-সাগর,—তাহা আবার চন্দ্রকিরণনিষেকে পীতবর্ণে জড়িত হইয়া গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন শত সহস্র সর্প ধান্যগুচ্ছে মুখ লুকাইয়া অবস্থান করিতেছে।

আমি ভীত হইয়াও ভীতির লক্ষণ প্রকাশ করিলাম না। ডাক্তার বাবুর প্রতি পদক্ষেপে পদস্খলিত হইতেছিল। তাই দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আর কি আমাদের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য ?"

ডাক্তারবাবু কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। বোধ হয়, কি উত্তর দিবেন, তাহা তিনি স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। অনেকক্ষণ নীরব থাকিবার পর তিনি বলিলেন—"আগুব কি পিছাইব, আমি স্থির করিয়া বলিতে পারিতেছি না। পল্লীগ্রামের পথঘাটের অবস্থা আমি কিছুই জানি না। এখন বুঝিতেছি, তোমার পরামর্শটা অগ্রাহ্য করা যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তবে কি জান গোপীনাথ! এক মহাপুরুষের

পুত্রের অন্বেষণে আসিয়াছি—আমাদের অনিষ্ট হইতেই পারে না। আমি সেই বিশ্বাসকেই আমার পথ প্রদর্শক করিয়া অগ্রসর হইয়াছি—" ডাক্তারবাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই বাগানের অন্ধকার ভেদ করিয়া, কিছুদূরে, একটী দীপালোক ফুটিয়া উঠিল।

দীপালোক চলিতে লাগিল। রাত্রি তখন অধিক হয় নাই। কিন্তু বনের ভিতরে অন্ধকারটা কিছু অধিক মাত্রায় বাড়িয়াছিল। সেটা বাস্তবিক, কিম্বা আমার ভয়াচ্ছাদিত দৃষ্টির জন্য—আজিও পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারি নাই।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"গোপীনাথ! এ সুবিধা ছাড়া কোনও মতে আমাদের কর্ত্তব্য নয়। এস উভয়ে আলোকের অনুসরণ করি।"

আমি কেমন একটা সন্দেহে চলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। ডাক্তারবাবু তাহা বুঝিলেন। বলিলেন—"বেশ, তুমি অগ্রসর হইতে সাহস না কর, আমি হইতেছি"। এই বলিয়া তিনি উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আলোক-অভিমুখে চলিলেন।

যাইতে যাইতে বলিলেন—"কোনও কারণে স্থানত্যাগ করিও না। আমি এখনই দীপধারীকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছি"।

আমি একস্থানে দাঁড়াইয়া তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। তিনি বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—"আলোক লইয়া কে যাইতেছ, দাঁড়াও। আমরা এখানে দুইজন বিদেশী অন্ধকারে পথ হারাইয়াছি।" আলোক কোনও উত্তর দিল না—চলিতে লাগিল। আলোক বলিলাম কেন, এখন পর্য্যন্ত আমি আলোকধারীকে দেখি নাই। ডাক্তারবাবু দেখিয়াছেন কি না বলিতে পারি না।

উত্তর না পাইয়াও তিনি অনুসরণে বিরত হইলেন না। তিনিও চলিতে লাগিলেন, আলোকও চলিতে লাগিল। কি বুঝিয়া একবার তিনি দাঁড়াইলেন, আলোকও দাঁড়াইল। একবার পিছাইলেন,

আলোকও সঙ্গে সঙ্গে পিছাইল। এইরূপ দুই একবার চলা, দাঁড়ান, পিছানর পর আলোক অদৃশ্য হইল, ডাক্তার বাবুর দেহও অন্ধকার মধ্যে বিলীন হইয়া গেল। আমি তাঁহাকে বিপন্ন বোধে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম—উত্তর পাইলাম না। আবার ডাকিলাম, উত্তর পাইলাম না—বাগানের মধ্যে কিছুদূর প্রবেশ করিয়া বারবার ডাকিলাম, তথাপি বনমধ্য হইতে কোনও উত্তর আসিল না।

ভয়ে আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। নিশ্চয় বুঝিলাম, ডাক্তার-বাবু দস্যু কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন। হত্যাকুশল ঘাতক ডাক্তারবাবুকে কথা কহিতে অবকাশ দেয় নাই, এইবার আমার পালা। নিজের মৃত্যুকথা মনে উদিত হইবামাত্র আমি আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। ডাক্তারবাবুকে ভুলিয়া গেলাম, বাগান ছাড়িয়া এক দৌড়ে রাস্তায় পড়িলাম। সদর রাস্তায় পড়িলে জীবন রক্ষা হইতে পারে ভাবিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া আবার ছুটিতে আরম্ভ করিলাম। প্রতি-পদক্ষেপেই বোধ হইতে লাগিল, কে যেন আমার পাছু লইয়াছে। এই পড়িলাম—এই মরিলাম! এই বুঝি ঘাতকের লাঠী আমার মাথায় পড়িল! এই বুঝি ঠগীর হাতের রুমাল আমার গলায় জড়াইল!

কিন্তু সদর রাস্তায় পা দিবার পূর্ব্বে আমার মৃত্যু আসিল না। রাস্তায় পড়িয়া দেখি,—আলোহাতে একজন পথিক আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই কাতরকণ্ঠে তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। পথিক অভয় দিতে দিতে আমার কাছে ছুটিয়া আসিল।

নিকটে আসিয়াই লোকটী বলিল—"কি হইয়াছে বাবু?"

"ডাকাতে আমার পিছু লইয়াছে।"

"ডাকাতে পিছু লইয়াছে! না বাবু, তুমি আর কিছু দেখিয়া ভয় পাইয়াছ।"

"আর কিছু নয়—দস্যু। সে আমার সঙ্গীকে হত্যা করিয়াছে "

"হত্যা করিয়াছে, তুমি নিজের চক্ষে দেখিয়াছ ? না বাবু আমার বিশ্বাস হইতেছে না। ভাল, চল দেখি, দেখিয়া আসি কোথায় তোমার সঙ্গী খুন হইয়াছে।"

"শপথ কর, আমাকে রক্ষা করিবে।"

"কি হইয়াছে, তা রক্ষা করিব! বাবু, তুমি জান না—এ কালু-সর্দ্দারের হদ্দ। আমার বিনা হুকুমে যম আসিয়া এখান হইতে কাহাকেও লইয়া যাইতে পারে না। এই বলিয়াই পথিক আলোকটা আমার মুখের কাছে ধরিল। ধরিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"কেও, বাবু! তুমি!"

ভয়ে আমি জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। সুতরাং নিকটে আসিলেও এতক্ষণ তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। এখন বুঝিতে পারিলাম সে কে, আপনারাও বুঝিয়াছেন সে কে। সেই অকুতোভয় বীরের নাম কেবল এতদিন জানিতে পারি নাই। আজ জানিলাম, তাহার নাম কালু সর্দ্দার।

কালু বলিল—"বাবু, তোমাকে পাইয়া আমোদ করিতে পাইতেছি না। আমার মনিব তোমার আসার কথা শুনিলে কিযে আহ্লাদ প্রকাশ করিবে, তা তুমি নিজে না দেখিলে বুঝিতে পারিবে না। আগে চল, তোমার সঙ্গীকে খুঁজিয়া বাহির করি।

আবার কালুর সঙ্গ লইয়া যে পথ হইতে আসিয়াছিলাম, সেই পথে ফিরিয়া চলিলাম।

কিয়দ্দূর আসিয়া দেখি, ডাক্তারবাবু যেস্থানে আমাকে দাঁড় করাইয়া গিয়াছিলেন, সেখানে আলোকটা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। তাই দেখিয়াই সভয়ে কালুকে বলিলাম—"সরদার ওই দেখ, ডাকাতটা আমার সঙ্গীকে হত্যা করিয়া আমার অনুসন্ধান করিতেছে।"

আমার কথা শুনিবামাত্র কালু উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল—"ঠাকুর! ডাকাত একটা ছোট প্রদীপ হাতে লইয়া ডাকাতি করে না। পথের ডাকাতি সে অন্ধকারেই সারে, গৃহস্থের বাড়ী লুট করিতে হইলে মশাল জ্বালে।" এই কথা বলিয়াই সে গম্ভীরস্বরে আলোক-ধারীকে সম্বোধন করিল—"আলোক লইয়া ওখানে কে?"

উত্তর হইল—"কালু! আমি।" একটী মধুর কোমল স্বর বিজয়া দশমীর জ্যোৎস্নাকে নাচাইতে নাচাইতে পথ-পার্শ্বস্থ প্রান্তরের শ্যাম আলিঙ্গন করিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

"আমি দুর্গা।

"তুমি এত রাত্রে এখানে কি করিতেছ।"

"কলিকাতা হইতে একটি বাবু আসিয়াছে, আমি তাহাকে খুঁজিতেছি।"

কালু আমার পানে চাহিয়া আর একবার উচ্চ হাসিল, আর বলিল "এস বাবু, ডাকাতনীটাকে পাকড়াও করি।"

লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইল। মুহূর্ত্তেই আলোকসমীপে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম আলোক হস্তে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট বালিকা।

দূরে—বহুদূরে—গ্রামান্তরে মায়ের বিসর্জ্জন দিয়া প্রত্যাগমনের বাদ্য বাজিয়া উঠিল। করুণার ক্ষীণ মর্ম্মালাপে সে ধ্বনি কাননভূমি স্পর্শ করিল। আমি দেখিলাম,—দুর্গা প্রাণময়ী পুত্তলিকারূপে অভয় দীপ করে লইয়া যেন জগদারণ্য মধ্যে বিচরণ করিতেছেন।

কালু বালিকার সমীপস্থ হইয়াই বলিল,—"মা দুর্গা! আমার সঙ্গে কে চিনিতে পার?"

দুর্গা বলিল—"আমার সন্তান।"

এক কথাতেই সমস্ত বুঝিলাম। অমনই আপনা আপনি তাঁহার চরণে মস্তক অবনত হইল। বলিলাম—"মা! সন্তানের প্রণাম গ্রহণ কর।"

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]

আমরা যাহাকে প্রাণশক্তি বলিয়া আসিয়াছি, তাহা একটা কোনও বিশিষ্ট শক্তি নহে। পাছে এই ভ্রম উদ্ভূত হয় তাই এই কথা বুঝা উচিত। বাহ্যদৃষ্টিতে আমাদিগের মনে হয় যেন শক্তি নানা জাতীয়, যথা,—গতি, (Motion), তাপ, (Heat), আলোক (Light), তাড়িত (Electricty), চৌম্বুক (Magnetism', রসায়ণ শক্তি (Chemical affinity), প্রাণ-শক্তি (Vital force , এবং জীবশক্তি (Psychic force).। প্রথম দৃষ্টিতে এই অষ্টবিধ শক্তি পরস্পর বিভিন্ন স্বতন্ত্র শক্তি বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে প্রতীচ্য বিজ্ঞানও তাহাই বলিত। ইহারা যে সকলেই এক মহাশক্তিরই ভাবান্তর, এ তত্ত্ব পূর্ব্বে বিজ্ঞানের পরিজ্ঞাত ছিল না· কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সার উইলিয়ম গ্রোভ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় স্থির করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোল্লিখিত শক্তির প্রথম ছয়প্রকারকে পরস্পর রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। তাড়িত হইতে তাপ, আলোক, চৌম্বুক সকল উৎপন্ন করা যায়, আবার তাপ আলোক প্রভৃতিকে তাড়িতে পরিণতঃ করা যায়। তিনি ইহার নাম দিয়াছেন,—"শক্তির সমাবর্ত্তন" (correlation of physical forces)। দার্শনিকগণের শীর্ষস্থানীয় মহামান্য হারবার্ট স্পেন্সার এই তত্ত্বকে সম্প্রসারণ করিয়া বলিয়াছেন যে, কেবলই যে ওই পূর্ব্বোক্ত ছয়প্রকার ভৌতিক শক্তি এই সমাবর্ত্তন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত, তাহা নহে,—প্রাণ-শক্তি ও জীবশক্তি ও এই বিধিবদ্ধ।*

প্রাণ-শক্তি সেই এক শক্তিই দৈবপ্রকৃতির নামান্তর।

---

* The power which manifests throughout the universe distinguished as material is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness. Herbert Spencer's Ecclesiastical Institutions, page 829 '

সকল প্রকারের শক্তিই অন্যপ্রকারের শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। বস্তুতঃ শক্তির উৎপত্তি নাই, তিরোধান নাই, তাহার উপচয় নাই, অপচয় নাই, তাহার ক্রম নাই, বৃদ্ধি নাই ; আছে কেবল তাহার রূপান্তর, তাহার ভাবান্তর। যেমন সমস্ত রাগরাগিণী কেবল সারে-গামাদি সপ্তস্বরের রূপান্তর এবং সারেগামাদি সপ্তস্বর এক স্বরেরই বিভিন্ন ভাব, ঠিক সেইরূপ বিশ্বের যাহা কিছু আমরা শক্তির খেলা দেখি ইহা এই অষ্টশক্তিময়াত্তিকা, আবার এই অষ্ট শক্তি এক মহাশক্তিরই রূপান্তর। এই মহাশক্তির নাম আর্য্য ঋষিরা দিয়াছেন "পুরুষ"। আর যাহাকে আমরা জড় প্রকৃতি বলি, তাহার নাম "প্রধান"। ইহাদিগকেই গীতায় শ্রীভগবানের পরা ও অপরা প্রকৃতি বলা হয়।

অপরেয়ামতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো ! যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ। ৭—৫

(আমারই অভিন্ন অংশস্বরূপ আর এক প্রকার শ্রেষ্ঠতম প্রকৃতি আছে, তাহা উক্ত অষ্টবিধ প্রকৃতি অপেক্ষায় বিশুদ্ধ, যে প্রকৃতি এই অনন্ত জগৎমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া জৈবনিক ক্ষমতা দ্বারা ইহাকে ধারণ করিয়া আছে, হে মহাবাহো ! সেই প্রকৃতিটিকে তুমি জীব বলিয়া জানিবে।) ইহার অপর নাম দৈবী প্রকৃতি। যাহা কিছু শক্তির কার্য্য আমরা দেখিতে পাই, তাহা ভগবানের দৈবীশক্তি। তাই গীতা বলিয়াছেন,—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলং।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধিমামকম্। ১৫—১২

(আদিত্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ আলোকরূপে দীপ্তি পায়, তাহা তাঁহারই তেজ।)

ক্রমশঃ।

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

অলৌকিক রহস্য।

৪র্থ সংখ্যা] তৃতীয় বর্ষ। [কার্ত্তিক, ১৩১৮।

সূক্ষ্ম শরীরের নূতন প্রমাণ।

ভাদ্র সংখ্যা "অলৌকিক রহস্যে" সূক্ষ্ম শরীরের প্রমাণ-প্রসঙ্গে আমি ডাক্তার কিল্‌নারের আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম শরীর প্রত্যক্ষ করিবার একটী অভিনব প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছি। ডাক্তার কিল্‌নার এক প্রকার আরক আবিষ্কার করিয়াছেন। উহার সাহায্যে কাচের মধ্য দিয়া সাধারণ ব্যক্তিও চর্ম্মচক্ষুর দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর প্রত্যক্ষ করিতে পারে। এবিষয় লইয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় বেশ আন্দোলন চলিতেছে। ডাক্তার কিল্‌নার এখন আরকের সাহায্য ভিন্নও সূক্ষ্মশরীর প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। ইহাতে মনে হয় যে, ডাক্তার সাহেবের অল্প অল্প দিব্য দৃষ্টির উন্মেষ হইয়াছে। তিনি বলেন যে, ব্যাপারটা সম্পূর্ণই স্থূল জগতের—ইহার সহিত অতীন্দ্রিয় শক্তির কোন সম্বন্ধ নাই।* এ মত কিন্তু ঠিক মনে হয় না। কারণ, ইহাতে যদি কিছুই অতীন্দ্রিয় না থাকিবে তবে সাধারণ চক্ষু ডাক্তার সাহেবের আবিষ্কৃত আরকের সাহায্য ভিন্ন এই সূক্ষ্ম শরীর প্রত্যক্ষ করে না কেন? অবশ্য তাঁহার আরকের সাহায্যে যে শরীর প্রত্যক্ষ গোচর হইতেছে, তাহা প্রকৃত সূক্ষ্ম শরীর নহে। সকলেই জানেন,

* The Phenomenan is entirely physical and that there is nothing occult or clairvoyant about it.

আর্য্যঋষিরা মানুষের শরীরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম শরীর ও কারণ শরীর। স্থূল জগতে আমরা যে দেহে বিচরণ করি তাহাই স্থূল শরীর, সূক্ষ্ম জগতে আমরা যে দেহে বিচরণ বা অবস্থান করি (যেমন প্রেতলোকে, পিতৃলোকে) তাহাই সূক্ষ্ম শরীর; এবং যে দেহের সাহায্যে আমরা কারণ জগতে (স্বর্গলোক প্রভৃতিতে) অবস্থান বা বিচরণ করি, তাহাই কারণ শরীর। স্থূল জগতের উপাদান রসায়ন বিজ্ঞানের Oxygen, Hydrogen স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, Sodium, Potassium প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ (elements)। কিন্তু এই সকল element ব্যতীত 'ইথর' (Ether) বলিয়া আর একটী পদার্থ আছে। ইহা আমাদিগের দর্শন শাস্ত্রের বায়ু বা আকাশের স্থানীয়। ইথর ও স্থূল জগতের একটী উপাদান অথচ ইহা আমাদিগের চর্ম্মচক্ষুর গোচর নহে। কিন্তু ইথরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা কোন সন্দেহ করেন না। যাহাকে আমরা স্থূলশরীর বলি, তাহার দুইটি অংশ আছে। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহাদিগকে ভাণ্ডদেহ ও পিণ্ডদেহ বলে। এই 'পিণ্ড'দেহ হইতে "সপিণ্ড" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। থিওসফির ভাষায় ভাণ্ডদেহের নাম gross body এবং পিণ্ডদেহের নাম etheric double বা etheric body। এই দেহ ইথারে গঠিত। সেইজন্য ইহাকে ইথিরীয় শরীর বলা হয়। ভাণ্ডদেহ কঠিন, জলীয় ও বাষ্পীয় উপাদানে গঠিত; বিজ্ঞানের ভাষায় যাহাকে solid, liquid এবং gas বলে।

আমাদের দেশে স্থূল শরীরকে পঞ্চভূতাত্মক বলা হয়। পঞ্চভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম। ক্ষিতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের solid, অপ্ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের liquid, তেজঃ—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের gas, এবং মরুৎ ও ব্যোম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ইথার (ether) স্থানীয়।

ভাণ্ডদেহ যখন ক্ষিতি, অপ্ ও তেজে গঠিত এবং পিণ্ডদেহ যখন মরুৎ ও ব্যোমে গঠিত, তখন স্থূল শরীরকে পাঞ্চভৌতিক বলা অসঙ্গত নহে। ডাক্তার কিল্‌নার এই পিণ্ডদেহ বা ইথিরীয় শরীরই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সম্প্রতি আমেরিকায় আর একজন (ইহার নাম ওডনেল্ ডাক্তার O'donnel) এই সূক্ষ্ম শরীর অর্থাৎ পিণ্ডদেহ লইয়া কয়েকটী পরীক্ষা করিয়াছেন। তাহাতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ঠিক মৃত্যুর সময় এই পিণ্ডদেহ ভাণ্ডদেহ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। ডাক্তার ওডনেল্ একজন খ্যাতিমান্ চিকিৎসক। তিনি X'ray সম্বন্ধে একজন বিশেষ পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞ। ডাক্তার ওডনেল কয়েকটী পরীক্ষা দ্বারা যখন স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন যে, স্থূল শরীর ছাড়া মানুষের একটা সূক্ষ্ম শরীরও আছে, তখন তিনি মৃত্যুর সময় কি ব্যাপার ঘটে, তাহা দেখিবার আয়োজন করিলেন। তাহার ফলে তিনি সূক্ষ্ম শরীরের উৎক্রমণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের উক্তি আমরা পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম * এবং এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত

---

* "I looked at the man through screen for almost half an hour. The aura was plainly distinguishable. The attending doctor said the patient was sinking rapidly. I did not take my eyes from the subject."

"Suddenly the physician announced that death had occurred. At the same instant the aura, which, as a bright light, had been radiated from the body at all points, began to spread from the body, and disappeared. Further observation of the corpse revealed no sign of the aura. I don't say that this aura is the soul or spirit—in fact no one seems to know just what it is. It is, in my opinion, some sort of radio-activity made visible by the use of a chemical screen. It undoubtedly is the guiding power or current of life, however, as my experiment would seem to prove."

অনুবাদ করিলাম। ডাক্তার ওডনেল্ লিখিতেছেন,—"এক মুমূর্ষু ব্যক্তির শরীরের প্রতি আমি সেই আরকের মধ্য দিয়া দৃষ্টি করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এইভাবে চাহিয়া রহিলাম। তাহার সূক্ষ্ম শরীর বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। যে ডাক্তার রোগীর তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন আর মৃত্যুর দেরী নাই। আমি বরাবর রোগীর প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিলাম। হঠাৎ চিকিৎসক বলিয়া উঠিলেন যে, রোগীর মৃত্যু হইয়াছে। সেই মুহূর্ত্তে দেখিলাম যে, এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে উজ্জ্বল ছটা রোগীর দেহ বেষ্টন করিয়াছিল, সেই ছটা রোগীর দেহ ছাড়িয়া অপসৃত হইল। রোগীর মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহাতে ঐ ছটার কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না।"* ডাক্তার ওডনেল্ বলিতেছেন যে, এই ছটা বা সূক্ষ্ম শরীর যে কি পদার্থ তাহা তিনি জানেন না। না জানাই সম্ভব। পাশ্চাত্যেরা পরীক্ষা করিতে সুদক্ষ, কিন্তু পরীক্ষার ফলে তত্ত্ব নির্ণয় করা তাঁহাদের ততটা আয়ত্ত নহে। এ বিষয়ের জন্য তাঁহাদিগকে আর্য্যঋষিদিগের শরণাপন্ন হইতে হইবে। যে ছটা বা সূক্ষ্ম শরীর লইয়া পাশ্চাত্যেরা এত আন্দোলন করিতেছেন, ইহা আমাদিগের সেই বহুদিনের সুপরিচিত পিণ্ডদেহ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

জাপানে প্রেতাত্মা বিশ্বাস।

[খেঁকশিয়ালের কৃতজ্ঞতা।]

একদা বসন্তকালে দুইজন বন্ধু একটী অনুচ্চ পাহাড়ের পাদদেশে একটী খেঁকশিয়ালকে তাহার শাবকের সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তাঁহারা দুইজন তথায় উপবেশন করিয়া সেই অদ্ভুত ক্রীড়া অবলোকন করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তিনজন বালক সেই শাবকটীকে ধরিতে উদ্যত হইল। শিয়ালটী প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে বালকেরা সহজেই শাবকটীকে ধৃত করিল। ইহা দেখিয়া বন্ধুদ্বয়ের একজন উহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, তোমরা এই শাবকটীকে লইয়া কি করিবে? উত্তরে জনৈক বালক বলিল, আমরা এই শাবকটীকে আমাদের গ্রামস্থ একজন যুবকের নিকট বিক্রয় করিব। তিনি ইহার মাংস অত্যন্ত ভালবাসেন। আমরা তাঁহার নিকট ইহার উচিত মূল্য পাইব। এই বলিয়া বালকগণ গমনোদ্যত হইলে, তিনিই তাহাদিগকে বাধা দিয়া বলিলেন, তোমরা এই শাবকটীকে আমার নিকট বিক্রয় কর, আমি ইহার উচিত মূল্যাপেক্ষা আরও কিছু বেশী দিতেছি। এই বলিয়া তিনি তাহাদের হস্তে একটী অর্দ্ধ 'বু' (পুরাতন জাপানী মুদ্রা, এক 'বু' এক শিলিং চারি পেন্সের সমান) প্রদান করিলে তাহারা হৃষ্টচিত্তে শাবকটীকে তাঁহাকে দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই সময়ে অপর বন্ধুটী বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি বাতুল হইয়াছ? এই শাবকটী লইয়া তুমি কি করিবে?"

বন্ধুর এই আশাতীত রূঢ়ভাষা তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিল। তিনি দারুণ হৃদয়াবেগ ধারণ করিতে না পারিয়া বলিলেন, "তোমার মুখে

এরূপ কথা শোভা পায় না; তুমি আমার মনের ভাব না জানিয়া আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিলে! তুমি জান একটী প্রাণীর জীবন রক্ষা করিবার জন্য যদি আমার সর্ব্বস্ব হারাইতে হয়, আমি তাহাতেও পশ্চাৎপদ নহি। আজ সামান্য অর্দ্ধ 'বু" খরচ করিয়া এই শাবকটীর জীবন রক্ষা করিলাম, ইহাতে আমার যে কি বিমল আনন্দ হইল তাহা তুমি বুঝিলে না? এখন বুঝিলাম, তুমি আমার বন্ধুত্বের সম্পূর্ণ অনুপযোগী।"

এই বাক্য শ্রবণমাত্র অপর বন্ধু করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, "আমাকে ক্ষমা কর, আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি এই শাবকটীর মাতা পিতাকে তোমার নিকট আনিবার জন্য ইহাকে ধরিয়া রাখিবে, পরে যখন তাহারা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে তখন তুমি তাহাদের নিকট সুখসমৃদ্ধির প্রার্থনা করিবে। কিন্তু তোমার হৃদয়ের কোমলতার পরিচয় পাইয়া আমি বাস্তবিকই লজ্জিত হইয়াছি। আশা করি, আমার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য আমাকে ক্ষমা করিবে।"

বন্ধুর আন্তরিক ভাব বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিলেন, "যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। আমিও তোমার প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। তজ্জন্য আমি বাস্তবিকই দুঃখিত। আশা করি, তুমিও আমাকে ক্ষমা করিবে।"

এইরূপে দুই বন্ধুর পুনর্মিলন হইলে, তাঁহারা উভয়ে শাবকটীর কোথাও আঘাত লাগিয়াছে কি না দেখিতে লাগিলেন। উহার পায়ে একটু আঘাত লাগিয়াছিল, তথায় একটী গাছের রস দেওয়ায় আঘাত-জনিত ব্যথা উপশমিত হইল। অতঃপর তাঁহারা শাবকটীকে কিছু খাইতে দিলেন; কিন্তু উহা তাহা স্পর্শও করিল না।

এই শাবকটী লইয়া দুই বন্ধু যাহা যাহা করিলেন, ইহার মাতা নিকটস্থ একটী বৃক্ষতলে বসিয়া অতি মনোযোগ সহকারে তাহা দেখিতে-

ছিল। হঠাৎ বন্ধুদ্বয়ের চক্ষু সেই দিকে পতিত হওয়ায় তাঁহারা দেখিলেন যে,শৃগালটী অতি উদ্বিগ্নচিত্তে শাবকের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্র তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল এবং শাবকটীকে তৎক্ষণাৎ বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন। শাবকটী অতি দ্রুতপদে দৌড়াইয়া মাতার সমীপে উপস্থিত হইয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া তাহার গা চাটিতে লাগিল। এই সময়ে বোধ হইল যেন শৃগালটী মস্তক অবনত করিল।

এই ঘটনার পর বন্ধুদ্বয় বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুত্বের পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বর্ণনাতীত সুখানুভব করিতে লাগিলেন।

যে বন্ধুটী শৃগাল-শাবকটীর জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি এক জন বিখ্যাত ধনী সওদাগর। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র ছিল। পুত্রটী দশ বৎসর বয়ক্রমকালে এক অতি কঠিন পীড়াক্রান্ত হয়। অনেক বৈদ্যকে চিকিৎসা করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল; কিন্তু কেহই রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে একজন খ্যাতনামা বৈদ্যকে আহ্বান করা হইল। ইনি রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, "ব্যারাম অতি কঠিন, ঔষধে কোনও ফল হইবে না, তবে যদি জীবিত খেঁক-শিয়ালের যকৃৎ (Liver) পাওয়া যায়, তাহা হইলে রোগীর বাঁচিবার অনেক সম্ভাবনা আছে, তাহা না পাইলে জগতে এমন কোনও ঔষধ নাই যদ্দারা রোগী এ যাত্রা ত্রাণ পাইতে পারে।"

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বালকের মাতা ও পিতা কিছুক্ষণের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া বসিয়া রহিলেন, পরে একজন পর্ব্বতবাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমাদের পুত্রের মৃত্যু হইলেও আমরা কোনও জীবের প্রাণ নষ্ট করিতে পারিব না; কিন্তু আপনি পর্ব্বতে বাস করেন, আপনার কোনও প্রতিবেশী যদি কখনও খেঁকশিয়াল হত্যা করে, তবে

আপনি উহার যকৃৎ আনিয়া আমাদিগকে দিলে আমরা বিশেষ অনু-গৃহীত এবং বাধিত হইব। অবশ্য যকৃতের উচিত মূল্য আমরা দিব।"

আগত ব্যক্তি তাঁহাদের কথায় স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেলেন। পরদিনই রাত্রিতে একজন লোক শৃগালের যকৃৎ লইয়া তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া বলিলেন, "আপনারা যে ব্যক্তির নিকট শৃগালের যকৃৎ চাহিয়াছিলেন, তিনি আমাকে এই যকৃৎটী দিয়া বলিলেন যে, তিনি শীঘ্রই আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং তখন ইহার মূল্য জানাইবেন।"

অনন্তর তাঁহারা অতি সাদরে যকৃৎটী গ্রহণ করিয়া আগত ব্যক্তিকে বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন; কিন্তু উক্ত আগন্তুক বলিলেন, "আমার উপযুক্ত পারিশ্রমিক আমি পাইয়াছি, আমি আর কিছুই লইব না।" তখন তাঁহারা অন্ততঃ রাত্রিটা তথায় যাপন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু তিনি ইহাতেও সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "নিকটে আমার কুটুম্ব আছেন, আমি তাঁহার বাটীতে রাত্রিযাপন করিব।" এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

যকৃৎ সংগৃহীত হইয়াছে শুনিয়া বৈদ্য পরদিন প্রভাতে রোগীকে দেখিতে আসিলেন এবং ঔষধের সহিত সেই যকৃৎ মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলেন। ঔষধের কি আশ্চর্য্য গুণ! এই বিচিত্র ঔষধ উদরে প্রবেশ করিবামাত্র রোগী আশাতীত ফললাভ করিল। মাতা পিতার আনন্দের সীমা রহিল না।

ইহার তিন দিন পরে পর্ব্বতবাসী সেই ব্যক্তি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র বালকের মাতা ও পিতা তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া অতীব বিনীতভাবে বলিলেন, "মহাশয় আপনি এত শীঘ্র যকৃৎ পাঠাইয়া আমাদিগকে

পরম উপকৃত করিয়াছেন। বালকটীর রোগ ইতিমধ্যেই আরোগ্য হইয়াছে।"

পর্ব্বতবাসী ক্ষণেক হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন, আপনারা কি বলিতেছেন আমি বুঝিতে পারিতেছি না; কারণ আমি শৃগালের যকৃৎ সংগ্রহ করিতে না পারায়, আজ আপনাদিগকে তাহাই জানাইতে আসিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে একস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কেন, আজ তিন দিন হইল, একজন লোক আপনার নিকট হইতে যকৃৎ আনিয়া আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে সেই রাত্রিতে এখানে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় তিনি তাঁহার কোনও নিকটস্থ এক আত্মীয়ের বাটীতে থাকিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন; আপনি কি ইহার কিছুই জানেন না?"

পর্ব্বতবাসী বলিলেন, "আমি বাস্তবিকই ইহার কিছুই জানি না। এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম, সি, ই

প্রায়শ্চিত্ত।

সংসারে নানা শ্রেণীর লোকের ভিতর দুই শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে একদল যেন মরুভূমিতে ফুল ফুটাইতে আসে, যেদিকে চায় সেদিকই যেন আনন্দশ্রীতে ভরিয়া উঠে, যেখান দিয়া চলিয়া যায়, সেইখানই যেন সরস-মধুর কোমলতায় ফুল্ল হইয়া পড়ে। যাহাতে হাত দেয় তাহাই পূর্ণ, সুন্দর ও জয়যুক্ত হয়, যেন লগ্নপত্রিকা একাদশ বৃহস্পতির ইজারা লইয়া, শিরোপরি বিজয়-কেতনের চিরপ্রতিষ্ঠা করিয়া তুলে।

অপর পক্ষের এভাবের সঙ্গে যেন জ্ঞাতিশত্রুতা; দৈন্য, পরাজয় ও হাহাকার যেন তাহাদের বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত দুকূল ডুবাইয়া ছুটিয়া যায়; অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকায়ে যায়, তাহারা সুখের লাগিয়া যেমন করিয়া যতবড় ঘরই বাঁধুক না কেন, তাহা যেন ব্রহ্মার অভিসম্পাতে জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়। শনি যেন রন্ধ্র গত থাকিয়া পূর্ণ দৃষ্টি করিতে থাকেন। ইহার উদাহরণের জন্য বেশী দূর যাইতে হইবে না—অর্থাৎ আমি নিজে। অন্ততঃ আমার কিশোরকাল পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলিয়াছিল। শাস্ত্রমতে আমার যোগভ্রষ্ট হওয়া উচিত ছিল, কেননা জন্মিয়াছিলাম—শুচিনাম্ শ্রীমতাং গেহে। কিন্তু বোধ হয়, যোগভ্রষ্ট না হইয়া বিয়োগভ্রষ্ট ছিলাম। এজীবনে প্রথম সূর্য্যালোক দেখিবার সময় আমার মস্তক যেস্থান প্রথম স্পর্শ করে, তাহা বহুমূল্য মার্ব্বেল প্রস্তরে মণ্ডিত। ইংরাজী ভাষায় বলিলে মুখে রূপার চমচা লইয়া সংসারে আসিয়াছিলাম; বহুমূল্য শয্যা ও গাত্রবস্ত্র, গাড়ী ঘুড়ি, বাগান বাড়ী ইত্যাদি কোনটীরই অভাব ছিল না। কিংখাপমণ্ডিত ল্যাণ্ডোর গদি কিম্বা রতনমণ্ডিত দাসদাসীর বুকের উপর ছাড়া, আমার চরণ-

যুগল বড় একটা মৃত্তিকা স্পর্শ করিবার সুযোগ পাইত না। কিন্তু আমার ছোট ভাই পঙ্কু জন্মিবার সময়, এ সকলের কিছুই ছিল না সে শুধু এই অতীত সমৃদ্ধির স্মৃতিটুকু লইয়া আসিয়াছিল।

আমাদের বংশ তৎকালে কলিকাতার মধ্যে ধনসম্পদে বিখ্যাত ছিল, এখন কিন্তু সে প্রাসাদতুল্য বাস্তু ভিটাটীর চিহ্নমাত্রও নাই। কঠোর কালের ছায়ায়, এখন সেখানে সরকারী রাস্তায় ও ট্রাম গাড়ীর দৌড়াদৌড়িতে পূর্ব্বচিহ্নের লেশমাত্রও নাই।

সবই ছিল, কিন্তু যেন আমূল পর্য্যন্ত কম্পমান। সরীকদের সহিত দাওয়ানী, ফৌজদারী প্রভৃতি ছোট বড় নানা মামলা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া শেষে হাইকোর্টে আসিয়া আসর জঁাকাইয়া বসিল। অর্থশ্রাদ্ধ, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, মিথ্যা সাক্ষী ও তদ্বির প্রভৃতি নানারূপ আনুসঙ্গিক উপদ্রবের সহিত, মামলা হারিয়া বাবা তখন বিলাত আপিল করিয়াছেন। যদিও তখন আশার উপর নির্ভর করিয়া পণ করিয়া মোকদ্দমা চলিতেছিল, কিন্তু তখনও বাহ্যিক অনুষ্ঠানের কোনরূপ সঙ্কোচ হয় নাই। এক সময়ে এমন অবস্থা আসে, যখন লক্ষ্মীঠাকুরুণ প্রায় মুখ ফুটিয়া স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া ফেলেন, "বাপু হয় আমায় ছাড়, না হয় তোমার বনিয়াদি চাল ছাড়," কিন্তু ধনীর সন্তান মানের কান্নায় প্রায়ই লক্ষ্মীঠাকুরুণকে বিসর্জ্জন দিয়া বনিয়াদি চালকেই আঁকড়াইয়া থাকে; বাবারও তখন ঠিক সেই অবস্থা; তখনও গৃহ-দেবতা গোবিন্দজীর মহাধুমধামে ভোগরাগ হইত, ব্রাহ্মণ ও অতিথি তখনও বিমুখ হইতেন না। কুটুম্ব, অভ্যাগত, পোষ্য ও কুপোষ্যগুলি তখনও যথারীতি ও যথাসময়ে নিয়মিতভাবে অকুণ্ঠিতচিত্তে অজরা-মরবৎ অন্নধ্বংস করিত।

এমন সময় বিলাত আপীলের হারের কথা বজ্রের মত আমাদের মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িল ও সঙ্গে সঙ্গেই যেন পৃথিবীর ভাবগতিকের পূর্ণ

পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। পোষ্য ও কুপোষ্যের দল গা ঢাকা দিল, আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের দল শুষ্ক সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, যাঁহারা পূর্ব্বাপর মামলায় উৎসাহ, এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের একত্র সংযোজনে তদ্বির করিতেছিলেন, তাঁহারা বিশেষ বিজ্ঞ সাজিয়া বাবাকে নেপথ্যে অর্ব্বাচীন, একজেদী, যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল ইত্যাদি সদুপদেশ বিনামূল্যে প্রদান করিতে লাগিলেন। যাহারা চিরজীবন বা বংশানুক্রমে উপকৃত, তাঁহাদের মস্তিষ্ক হইতে অকস্মাৎ কৃতজ্ঞতার স্মৃতিটী পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গেল। বৈঠকখানার জাজিমের উপর পাওনাদারের খাতা, জমাখরচের অঙ্ক বাদ দিয়া কেবল দেনার খাতে ফাজিলের পাতাগুলি উড়াইতে লাগিল। পরদিনের সৌরকরোজ্জ্বল প্রভাত ধনীর সন্তানকে নির্ম্মমভাবে বুঝাইয়া দিল যে, সে পথের ভিখারী অপেক্ষা অধিক পদস্থ ও সৌভাগ্যবান্ নহে।

যাক্, বাবা কিন্তু এ অবস্থাতেও বিচলিত না হইয়া সমস্ত এমন কি মার গায়ের স্বর্ণের চিহ্ন পর্য্যন্তও আধাকড়িতে বিক্রয় করিয়া কাহাকেও কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া, কাহারও সহিত আপোষ করিয়া সমস্ত দেনা শোধ করিলেন। কেবল রহিল মার নামের চাঁপাতলার বাড়ীটী, সেটী মার স্ত্রীধন; তার অর্দ্ধেক অংশ ভাড়া দিয়া অপরার্দ্ধে আমরা কায়-ক্লেশে বাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

এমন সময়ে একদিন অপরাহ্ণে পিসিমা টাকার তোড়া লইয়া গাড়ী করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিসিমা আসিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন, মাও স্ত্রীলোকসুলভ কান্নায় যোগ দিলেন। বাবা অধিকতর কাতর হইয়া গুড়গুড়ির নলে অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন; আমি কিয়ৎক্ষণের জন্য অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। অবোধ পঙ্কু তখন নিশ্চিন্তমনে দালানের উপর দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল।

কান্নার প্রথম উচ্ছ্বাস চলিয়া গেলে, পিসিমা প্রথমে মুখ ফুটিয়া

বাবাকে বলিলেন "দাদা এমন বিপদে পড়িয়াছ, কিন্তু আমাকে একবার খবরও দিলে না"।

বাবা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তামাক টানিতে টানিতে আস্তে আস্তে (বোধ হয় কণ্ঠস্বর জড়াইয়া যাইতেছিল) বলিলেন, "কি খবর দিব দিদি, এত সুখের খবর নয়"।

পিসি। তা হোক আমি কি তোমাদের কেউ নই। আজ না হয় মা নেই, কিন্তু একদিন ত তোমার কোলে পিঠে মানুষ হয়েছি আমাকে খবর দিলে যা হয় কিছু অন্ততঃ চেষ্টাও ত কর্‌তে পারতুম; সত্যি ত আর, এখনো বাপের বাড়ীর সম্পর্ক উঠে যায়নি।

সে কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ ও অভিমানের ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল।

পিসি। যাক্, এখন তোমার হাতে কি আছে বল ও কি ক'রে সংসার চালাবে ঠিক করেছ।

বাবা নীরবে উপরের দিক দেখাইয়া দিলেন, যেন উদ্দেশে উপরের অনন্ত নীলাভ শূন্য ও অনিশ্চিত ভগবানকে দেখাইলেন।

পিসি। দাদা, আমি তোমার ছোট বোন, তোমার স্নেহ আমি কখন ভুলতে পারব না, এ সময়ে মান অভিমান ত্যাগ করে আমার একটী অনুরোধ তোমায় রাখতেই হবে। আমি থাকতে যেন চারু, পঙ্কু কি তোমাদের অভাব না জানতে হয়।

এই বলিয়া টাকার তোড়াগুলি বাবার পায়ের কাছে রাখিয়া দিলেন।

বাবা। নলিনী, আমি সব করিয়াছি, যা কখনো ভাবিতে পারিনি তাও করেছি। বাড়ী বেচেছি, পাওনাদারের হাতে পায়ে ধরেছি, তোমার বৌদিদির গায়ের শেষ গহনা পর্য্যন্ত বিক্রি করেছি। আর কেন, এইবার কিছুদিন শান্তিতে থাক্‌তে দাও, তোমার বিধবার অর্থ ফাঁকি দিয়ে পাপের মাত্রা আর যেন বাড়াতে না হয়।

পিসি। দাদা, এটা কি ফাঁকি দেওয়া ; আমার দেব-সেবা, তীর্থ-ধর্ম্মের খরচ ত আছে, ও খরচ না হয় তোমাদের সেবায় হবে ও তাতেই আমার সব তীর্থধর্ম্ম হবে।

বাবা। নলিনী, তুমি যাই বল, দোহাই তোমার, আমাকে আর ঋণগ্রস্ত ক'র না, এ বড় জ্বালা। আমার আর বেশী দিন নয়, এসময় যেন অঋণী হয়েই যেতে পারি ; তবে দেখো যেন চারু কি পঞ্চু কষ্ট না পায়।

পিসিমা ও মা ব্যগ্র হইয়া কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'ওকি অকল্যাণের কথা তোমার ? ও সব কথা মুখে আনো কেন ? চারু ও পঞ্চু বেঁচে থাক্, একদিন না একদিন আবার সময় ফিরবে।'

পিসিমা অনেক অনুনয় করিলেন, বাবার পায়ে পর্য্যন্ত ধরিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। শেষে চলিয়া যাইবার সময় বাবাকে এই স্বীকার করাইয়া গেলেন যে, বিশেষ কষ্ট হইলে বা কোন বিপদ ঘটিলে যেন কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া তৎক্ষণাৎ সংবাদ দেন।

পিসিমা কিন্তু সংবাদ দিবার অবসর পর্য্যন্ত দেন নাই। তিনি প্রায়ই আসিতেন, আমাদের লইয়া গিয়া খাওয়াইতেন ও পোষাক কিনিয়া দিতেন এবং বাড়ীতে প্রায়ই কাপড়চোপড়, খাবার জিনিষ প্রভৃতি পাঠাইয়া দিয়া সাধ্যমত অভাব হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিতেন।

পিসিমা ছাড়া আরও কতকগুলি আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আমাদের গুরু রামতারণ ভট্টাচার্য্য, পুরোহিত গিরীশ ঠাকুর ও পিতামহের আমলের বৃদ্ধ খড়ু কবিরাজ।

ইহা ছাড়া প্রতিবেশী ও পূর্ব্ব উপকৃতদিগের মধ্যে দুইচার জন,—ইঁহারা যদিও পদস্থ ও সম্পন্ন ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাদের নীরব

সহানুভূতিতে একটা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সর্ব্বদাই ফুটিয়া উঠিত। আর একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারী ও তালুকের দুই একজন মণ্ডল ও দুই চারিঘর নিরক্ষর প্রজা ; ইহারা ধান চাল তরি তরকারী প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে সাধ্যমত ভেট প্রদান করিত এবং বিনিময়ে কোন জিনিস কিছুতেই লইত না।

এছাড়া আমাদের মামার বাড়ীর কালী ঝি ; সে মার বিবাহের সময় সঙ্গে আসিয়া, বেতন বা প্রতিদানের আশা না রাখিয়া সুখে দুঃখে আমাদের পরিবারস্থ এক জনের সামিল হইয়া গিয়াছিল।

যাহা হউক, অবস্থা-বিপর্য্যয়েও বিশেষ কষ্ট বা অশান্তি হয় নাই, কিন্তু শনিদেব রন্ধ্রগত থাকিয়া পুনরায় এই ক্ষণিক শান্তিরূপী গণেশের মুণ্ডটী উড়াইয়া দিলেন। অবস্থাবিপর্য্যয়ে, দুশ্চিন্তায় ও মনোকষ্টে বাবা শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন, প্রথমে তিনি তাচ্ছল্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু পিসিমা জোর করিয়া বড় বড় ডাক্তার আনাইয়া প্রাণপণে চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু একদিন আঁধারঘেরা শ্রাবণ-অপরাহ্নে, মর্ম্মভেদী হরিবোল ধ্বনির মধ্যে মা ও পিসিমার উচ্চ চীৎকারে আমাদের ক্ষুদ্র বাড়ীর বিষণ্ণতা আরও বিষাদময় হইয়া উঠিল।

প্রথমটা আমরা চারিদিক অন্ধকারময় দেখিলাম, বিশেষতঃ মার অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা কাতর হইয়া উঠিল। ধনবানের ঘরণী নববৈধব্যের সহিত ভীষণ দারিদ্র্যের তাড়নে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও ভগবান আর একবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, গুরু-দেবের আশা-ভরসা, আশীর্ব্বাদ ও সান্ত্বনায় এবং পিসিমার অগাধ ধন-সম্পত্তির উন্মুক্ত লৌহসিন্দুক এবং অবারিত ও অযাচিত স্নেহমমতার বন্ধনে আবার আমরা উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

অপুত্রক পিসিমার উদ্বেলিত স্নেহ যেন আমাদের দুই ভাইকে আরও অধিক আঁকড়াইয়া ধরিল।

পিসিমার সবই ছিল, কিন্তু ছিল না হিন্দুরমণীর সর্ব্বস্বধন, তিনি পতিপুত্রহীনা। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ঘরেই বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁর নিজের সম্পত্তির মূল্য প্রায় পনের লক্ষ টাকা। পিসা-মহাশয় তাঁর জীবদ্দশাতেই জ্যেষ্ঠভ্রাতা নবীনবাবুর সহিত সমস্ত বিষয় ও বসত বাটী পর্য্যন্ত বাঁটোয়ারা করিয়া পৃথক হইয়াছিলেন। অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যময়ী, শুভ্র-বসনা, অলঙ্কারহীনা, শুভ্রকান্তি, মৌনবতী পিতৃস্বসাকে যেন জীবিত মনুষ্য অপেক্ষা উদ্যানশোভিতা মর্ম্মরমূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত; কিন্তু তাঁহার হৃদয়, মর্ম্মর অপেক্ষা অধিকতর সুকোমল পদার্থে গঠিত ছিল। হিন্দুরমণীর সার আকাঙ্ক্ষার কোনটীও না থাকাতে তাঁহার হৃদয়-মন্দিরে আমাদের দুই ভাইয়ের স্থান সবিশেষ প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। উইলে পোষ্যপুত্র-গ্রহণের ব্যবস্থা থাকাতে পিসিমার চক্ষু পঞ্চুকেই ভাবী পোষ্যপুত্ররূপে দেখিত। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাঁর বিপদের পরিমাণ নিতান্ত লঘু ছিল না, নবীনবাবু অতবড় বিষয়ের প্রলোভন সামলা-ইতে না পারিয়া ছলে বলে কৌশলে তাঁহাকে বিপন্ন করিয়া তুলিতেন, কিন্তু পিসিমার ধীরতা ও দৃঢ়তায় বিশেষ কিছু করিতে পারিতেন না। অবশেষে লোকগঞ্জনায় কতকটা বাহ্যতঃ নিরস্ত হইলেও পোষ্যপুত্র-গ্রহণের পূর্ব্বে পিসিমার স্বর্গলোকপ্রাপ্তি তাঁহার পক্ষে নিতান্ত উপেক্ষণীয় বস্তু ছিল না।

মধ্যে একবার পিসিমার অসুখ হওয়াতে তাঁহাকে দুই বেলাই দেখিতে যাইতাম, রোগ তত গুরুতর ছিল না; কিন্তু ডাক্তারি ঔষধ খাইতেন না বলিয়া ও কতকটা নানা কারণে সন্দিগ্ধচিত্ত হওয়াতে, আমাদের শুভানুধ্যায়ী বয়োবৃদ্ধ ও নিষ্ঠাবান্ গৃহ-চিকিৎসক যদু কবিরাজের চিকিৎসাধীন ছিলেন।

যদু কবিরাজকে বাল্যকালে আমার পিতামহ দেশ হইতে কলিকাতায় আনাইয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। একালের মত প্রকাণ্ড সাইন

বোর্ড, পেটেণ্ট ঔষধ ও ডাকমাশুলে চিকিৎসার বন্দোবস্ত না থাকিলেও নাড়াজ্ঞান, হাতযশ, ও শাস্ত্রোক্ত ঔষধের জন্য সেকালে ধন্বন্তরি-তুল্য বিবেচিত হইতেন। বিশেষতঃ লোকটী তেজস্বী, নিষ্ঠাবান্ ও দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা-পরায়ণ বলিয়া সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতেন।

বাবা তাঁহাকে পিতৃতুল্য সম্মান করিতেন ও আমাদের দ্বারা প্রতি-পালিত বলিয়া চিরজীবন কৃতজ্ঞতার ঋণ কথঞ্চিৎ শোধ করিবার সুযোগ কখন পরিত্যাগ করিতেন না।

পিসিমার জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইল। রাত্রিতে দেখিয়া আসিয়া পরদিন প্রাতে যাইয়া দেখি, সমস্ত বাড়ী মৌন-গম্ভীর-বিষাদ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া বিভীষিকার সঞ্চার করিতেছে, বুকের ভিতর পর্য্যন্ত স্পন্দিত হইয়া উঠিল। দৌড়িয়া বাড়ীর ভিতর যাইবার সময় দেখি,—সমস্ত লোকজন নীরব, বিষাদযুক্ত ও অশ্রুপূর্ণ। বিস্ময়ে অশ্রুপূর্ণনয়নে কঠোর সত্যের নিকট শুনিলাম যে, হঠাৎ রোগ বৃদ্ধি পাইয়া, কাল রাত্রিতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে এবং রাত্রিতেই অন্তিম সৎকার শেষ হইয়াছে। শোকে ও ব্যস্ততায় আমাদের সংবাদ দিবার অবসর হয় নাই।

শুনিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে সেইখানে বসিয়া পড়িলাম। নবীন বাবু সযত্নে আমাকে বাটীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন, সেখানে তাঁহার স্ত্রী কোলে বসাইয়া, আদর করিয়া কত সান্ত্বনা দিলেন ও জলযোগ করাইতে চাহিলেন. কিন্তু আমার তখন যেন বাক্শক্তি ছিল না, তাঁহারা পিসিমার যত গুণের কথা বলিতে লাগিলেন, ততই আকুল হইয়া পড়িলাম। প্রাচীনাদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'আহা বাছারা যেন আমাদের ছোট বৌএর প্রাণস্বরূপ ছিল, আহা মারা যাবার সময়েও একবার বাছার ও পঞ্চুর নাম করিয়াছিল, কিন্তু তখন আর খবর দিয়া শেষ দেখার সময় ছিল না।'

আমার কিন্তু এ সব কথা ঠিক কাণেই পৌঁছিতেছিল না। স্নেহের

আগার, অসহায়ের সহায়, বিপদের ভরসা, এ বিশাল পৃথিবীতে একমাত্র প্রকৃত আত্মীয় পিসিমার সহিত এই সকল চিরবিচ্ছেদের কথা স্বপ্নকালীন অসম্ভব সত্যের মত নিষ্ঠুরভাবে আমাকে পীড়ন করিতেছিল। খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পলাইয়া আসিলাম—তাঁহারা আবার বাড়ী পর্য্যন্ত লোক সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন!

সেইদিন হইতে পিসিমার বৃহৎ অট্টালিকার সিংহদ্বার 'আমার নিকট চিররুদ্ধ হইয়া গেল। যে বাড়ীর আদর-যত্নের একমাত্র সর্ব্বময় বস্তু ছিলাম, এখন তাহার ফটকের মধ্যেও প্রবেশ করিতে হইলে চোরের ন্যায় প্রবেশ করিতে হইবে!'

বৃদ্ধ কবিরাজ মৃত্যু-সংবাদে বিস্ময়ে অবাক হইয়া বলিলেন, আমার যদি কিছু কবিরাজী বা নাড়ীজ্ঞান থাকে ত দৃঢ়স্বরে বলিতে পারি, এ রোগ মৃত্যুরোগ নহে, নাড়ীও মৃত্যুনাড়ী ছিল না।

কেহ কেহ বলিলেন, 'বোধ হয় heart fail করিয়াছিল'—শুনিয়া কবিরাজ বলিলেন, 'কখনই নয়, তোমাদের ডাক্তারিতে ধরা যায় না বটে, কিন্তু তাহা হইলে আমি পূর্ব্বাহ্নেই নাড়ীতে ধরিতে পারিতাম।'

মাকে প্রথমতঃ এ সংবাদ গোপন রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু আমার অবস্থা দেখিয়াই তিনি সব বুঝিতে পারিলেন ও সেই যে শয্যা লইলেন, দুই তিন দিন আর উঠিলেন না।

কৈশোর ও যৌবন-সঙ্গিনী, শ্বশুর-গৃহের সুখদুঃখের একমাত্র বয়স্যা, বিপদের ভরসা, ব্যথার ব্যথীকে অকালে হারাইয়া, তাঁহার অবস্থা যে কি কষ্টকর হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় ভুক্তভোগী ব্যতীত আর কেহ অনুমান করিতে পারিবেন না।

ভাঙ্গা বাঁধ ক্রমশঃ ভাঙ্গিতে লাগিল, কিন্তু এ অবস্থাতেও সহায় আবার অযাচিতভাবে উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধ কবিরাজ আসিয়া মাকে জানাইলেন যে, "মা! আমি তোমাদের অন্নে প্রতিপালিত ও তোমাদের নিকট চির উপকৃত, তোমরা যদিও আমাকে গুরুজনের তুল্য সমান-দৃষ্টিতে দেখিয়া থাক, কিন্তু আমি জানি যে, তোমাদের নেমকের ভৃত্য ভিন্ন আর কিছুই নই। তোমাদের কল্যাণে আমার আজ কোন অভাবই নাই! তাই মা আজ সব মানঅভিমান ত্যাগ করে এই বুড়ো বেটার শেষ অনুরোধ রাখ,—যেন আমি থাক্‌তে চারু ও পঞ্চুকে সংসার-ভাবনা ভাব্‌তে না হয়। মা ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া পুনরায় বলিলেন, 'মা একে দান বা ভিক্ষা মনে ক'র না, এ আমার গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা হবে, তোমাদের জিনিসেরই কতক অংশ তোমাদেরি কাছে গচ্ছিত রাখ্‌ছি।'

নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ও অবস্থা-বিপাকে বাধ্য হইয়া মা সম্মত হইলেন। সেইদিন হইতে কবিরাজ আমাদের পড়াশুনার সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন ও বাড়ী ভাড়া হইতে কালী ঝির গৃহিণীপণায় কোন এক প্রকারে সংসার চলিতে লাগিল।

কিন্তু রন্ধ্‌গত শনির তখনও পূর্ণ দৃষ্টি; বয়োধিক্যবশতঃ জরা কবিরাজ মহাশয়কে বিশেষরূপে পাইয়া বসিল। ইদানীন্তন তিনি ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া আর চিকিৎসায় বাহির হইতে পারিলেন না, শেষে একদিন নামিবার সময় সিঁড়ি হইতে গুরুতররূপে পড়িয়া গিয়া শয্যাশায়ী হইলেন। লোকে বলাবলি করিল, এযাত্রা তাঁর রক্ষা পাওয়া কঠিন।

তখন অদৃষ্ট হতাশভাবে বুঝাইয়া দিল যে, অভাগা যেদিকে যায়, সাগর শুকায়ে যায়,—ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে সত্য।

কবিরাজ মহাশয়কে প্রত্যহই দেখিতে যাইতাম এবং আমি যাইলে ও থাকিলে তিনি যেন অত্যধিক সুস্থতা অনুভব করিতেন ও রোগের যাতনা অনেকটা দূর হইয়া যাইত। সেদিন যখন স্কুল হইতে অপরাহ্নে

দেখিতে গিয়াছি, তখন রোগের যথেষ্ট বৃদ্ধি ও কালো মেঘ আকাশ ছাইয়া ঝুপ ঝুপ করিয়া জলধারাসিঞ্চনে রাজপথ পিচ্ছিল, কর্দ্দমময় ও অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন করিয়া তুলিয়াছিল।

কবিরাজ মহাশয়ের আদেশে সিঁড়ির দরজা বন্ধ করিয়া আসিলাম; এ দরজা বন্ধ করিলে বাহির মহলে কেহ আসিতে পারে না—লোকজন প্রায়ই সাক্ষাৎ করিতে আসিত বলিয়া তিনি বাহির মহলেই থাকিতেন।

যখন তাঁহাকে পাখা করিতেছিলাম, তখন তিনি সস্নেহে আমার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'চারু তোমার সহিত আমার এক বিশেষ গোপনীয় ও আবশ্যক কথা আছে, সেইজন্য দরজা বন্ধ করিতে বলিলাম। কথাটী যেমনই গুরুতর, তেমনই গোপনীয় ও এক হিসাবে তেমনই ভয়ানক। আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম।

কবি। প্রথমতঃ শপথ কর যে, একথা তোমার মাকে ছাড়া আর কাহাকেও বলিবে না। আর বিরক্ত, বিস্মিত বা ক্রুদ্ধ না হইয়া ধীর ভাবে শুনিয়া যাইবে। আমি সম্মত হইয়া শপথ করিলাম।

পুনরায় বলিলেন, 'আমার একটী কাতর ভিক্ষা আছে এটী আমার অন্তিম ভিক্ষা; স্বীকার কর, বৃদ্ধের এই শেষ ভিক্ষা রাখিবে।'

আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল; সঙ্কুচিত হইয়া ব্যগ্রভাবে বলিলাম, 'বলুন আমার সাধ্যমত চেষ্টা করিব।'

কবি। দেখ, আমার যাতনা যে কি ভীষণ তা ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না, আর তুমি ভিন্ন আমার এ মৃত্যুকালীন যন্ত্রণা আর কেহ লাঘব করিতে পারিবে না।

এই বলিয়া দুর্ব্বলহস্তে আমার হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, কিন্তু চঞ্চল বা অধৈর্য্য হইও না।"

কবিরাজ মহাশয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, সে কিছুক্ষণ যেন

আমার নিকট যুগের ন্যায় দীর্ঘ মনে হইতে লাগিল। দেওয়ালস্থিত ঘড়ির টুক্ টুক্ শব্দ ও বাহিরের বৃষ্টির ঝুপ ঝুপ শব্দ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া আমার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা আরও বাড়াইয়া তুলিল।

কবিরাজ মহাশয় বলিতে লাগিলেন, আজ প্রায় বৎসরাবধি নলিনীর (তোমার পিসিমার) চরিত্রের বিরুদ্ধে নানা কলঙ্ক ও অপবাদ নানা মুখে ও নানা ভাবে শুনিতে লাগিলাম। প্রথমতঃ তাঁহার কণ্ঠস্বর জড়াইয়া যাইতেছিল, পরে ধীরে ধীরে স্পষ্টভাবে বলিতে লাগিলেন ; আমি শিহরিয়া উঠিলাম।

কবিরাজ। প্রথমতঃ বড় একটা কাণ দিই নাই, কিন্তু ক্রমাগত শুনিতে শুনিতে আপনাকে বিরক্ত, উত্তেজিত, ও লজ্জিত বোধ করিতে লাগিলাম। প্রাণে বড় যাতনা পাইলাম, যে পরিবারের সহিত আবাল্য সংস্পৃষ্ট, তাহার কন্যার বিরুদ্ধে গ্লানি শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইতাম ; যাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি, তাহার কলঙ্কে তীব্র মর্ম্মপীড়া অনুভব করিতাম ; সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা ও সম্ভ্রান্ত গৃহের বধূর এইরূপ কলঙ্ক-কাহিনী শুনিয়া ঘৃণা অনুভব করিতাম। শেষে এমন পর্য্যন্ত শুনিলাম যে, অগাধ সম্পত্তির বিনিময়ে বিলাস-সাগরে ভাসিয়া কুলত্যাগিনী হইবার উদ্যোগ করিতেছে।

শেষে গোপনে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, যাহা শুনিতেছি তাহা প্রকৃত।

আমি স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাস্তবিকই কি সত্য ?"

কবিরাজ। শুনিয়া যাও।

"পরে একদিন নবীন আসিয়া নানা কথার পর বলিল, 'কবিরাজ মহাশয় আপনি আমাদের পিতৃতুল্য মাননীয় এবং আমাদের পরিবারের সহিত বহুকালাবধি ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ, সুতরাং প্রকাশ করিয়া বলিতে যদিও মাথা কাটা যাইতেছে, তথাপি আপনাকে না

জানাইয়া থাকিতে পারিতেছি না।' আমি বলিলাম, 'নিঃসঙ্কোচে বল।'

নবীন একটু আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিল, কথাটা আমাদের ছোট বৌমার সম্বন্ধে; আপনি বোধ হয় কতক কতক শুনিয়াছেন সুতরাং তখন আপনাকে অধিক বলাই বাহুল্য, কেন না; এই কথা লইয়া নানা দিকে অনেক প্রকার জল্পনা কল্পনা চলিতেছে।

আমার কথাটা বুঝিতে বেশী বিলম্ব হইল না। বলিলাম, 'হাঁ কতক কতক শুনিয়াছি।'

নবীন পুনরায় বলিল, কিছু ত উপায় দেখি না, মানুষ যখন পাপের পথে গড়াইয়া পড়িতে থাকে, তখন তাহাকে বুঝাইলেও বুঝে না; এখন শুনিতেছি কুলত্যাগিনী হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে, তা'হলে ত আমাদের বংশের মুখে চুণ-কালী ভালরূপে পড়িবে, এখনই ত সমাজে আমার মুখ দেখান ভার হইয়াছে। এ অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে বোধ হয় তাও মঙ্গল।

আমি পূর্ব্ব হইতেই ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত ছিলাম; সুতরাং অম্লানবদনে বলিলাম, 'হাঁ তা হলেই মঙ্গল।'

"হায় তখন যদি বুঝিতাম যে, এ সমস্তই মিথ্যা চক্রান্ত, অর্থলোভী পিশাচাধম নবীনের কারসাজি! তখন যদি বুঝিতাম যে, যে সমস্ত লোক আমার নিকট নলিনীর বিরুদ্ধে অপবাদের বোঝা বহিয়া আনিয়াছিল, তাহারা নবীনেরই লোক! যাহাদের নিকট গোপনে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কে জানিত তাহারা সকলেই নবীনের অর্থের ক্রীতদাস! হায়! যদি ঘুণাক্ষরেও তখন বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, এ অনর্থ ঘটিত না!"

আমি স্তম্ভিত হইয়া স্থির কর্ণে শুনিতে লাগিলাম। "তার পর নবীন আর একদিন আসিয়া দেখা করিল; নলিনীর তখন অসুখ

বাড়িয়াছে ও আমার চিকিৎসাধীনে আছে। নবীন বলিল, 'কবিরাজ মহাশয় আপনি আমাদের চিরসুহৃদ ও এ বিপদে আপনি ছাড়া বোধ হয় উদ্ধারকর্ত্তা আর কেহই নাই। এখন কোনরূপে ছোট বৌমার মৃত্যুসাধনই বোধ হয় শ্রেয়স্কর, এবং যদিও আমি স্পষ্ট বলিতে পারি না, কিন্তু এ বিষয়ে বোধ হয় আপনি ছাড়া আর গত্যন্তর নাই'।"

"আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, কি! তুমি আমাকে স্ত্রীহত্যা ও নরহত্যাকারী করিতে চাও? নবীন তাহার মনোভাব নীরবে রাখিয়া আরও স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিল।"

শেষে বলিল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে কিছুই করিতে হইবে না, আপনি কেবল আমাকে আপনার ইচ্ছামত কোন তীব্র বিষৌষধি দিন, আমিই সমস্ত করিব।'

"জানি না, কি করিয়া ক্ষণিক দুর্ব্বলতা আসিল, জানি না কেমন করিয়া ক্ষণিকের মধ্যে নরকের মধ্যে নামিয়া পড়িলাম, কোন্ পাপে বিধাতা এমন কুকর্ম্মের কর্ত্তা করিয়া এরূপ কুপ্রবৃত্তি জাগাইয়া দিলেন, কি করিয়া এ বিষম মোহে ও প্রলোভনে মজিলাম, চিরজীবন ন্যায় পথে থাকিয়া জানি না কোন্ পূর্ব্ব কর্ম্মফলে এ বিষময় কর্ম্মের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত হইলাম, যাক্ কিছুক্ষণ অন্যান্য কথাবার্ত্তার ফলে, নগদ লক্ষ টাকার বিনিময়ে চিরজীবন গুপ্ত রাখিবার অঙ্গীকারে, নারীহন্তা সাজিয়া, দেবীপ্রতিমা কন্যাস্বরূপিনীর তীব্র বিষের জ্বালায় অপঘাত মৃত্যুর কারণ হইয়া অনন্ত মহাপাপের নিকট আত্মবিক্রয় করিলাম। তার পর যাহা হইল, তাহা বোধ হয় এখন কতক কতক বুঝিতে পারিতেছ।"

কবিরাজ মহাশয় আর বলিতে পারিলেন না; কেবল আকুলভাবে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমিও অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষু লইয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ও চঞ্চল হইয়া উঠিলাম। আমাকে অধৈর্য্য দেখিয়া ধীরে

ধীরে আমার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "শুনে যাও, চঞ্চল হইও না, এখনো অনেক বাকী। সে স্পর্শে আমার সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া যেন তীব্র তড়িতের বিষময় প্রবাহ চলিয়া গেল।"

"কিন্তু তার পর তীব্র অনুশোচনা, সে যে কি ভীষণ তা ভাষায় বলিতে পারি না। সমস্ত জানি, সব বুঝি, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই, কেন না এই বিয়োগান্ত পাপজ নাট্যের আমি নিজেই প্রধান নেতা। আজীবন সৎপথে ছিলাম বলিয়া বুঝি এ আত্মগ্লানি আরো তীব্র হইয়া উঠিল। যাহাদের অন্নে পুষ্ট, যাহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ, তাহাদের একমাত্র পতিপুত্রহীনা নিষ্কলঙ্কা বিধবা—যে আমার উপর অসঙ্কোচে জীবন-মরণের ভার সমর্পণ করিয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহে আমাকে বিশ্বাস করিয়াছিল, সেই নিরীহ অবলাকে কৃতজ্ঞতার এইরূপ প্রতিদান দিয়া যে যাতনায় ভুগিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তার পর বিশ্বাসঘাতক, নারীহন্তা আমি, পূর্ব্বেরই ন্যায় সাধু সাজিয়া লোকসমাজের চক্ষে ধূল দিয়া চলা আমার পক্ষে নিতান্তই দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল।"

"অন্তর্দ্দাহে মরণ কামনা করিলাম; জীবনে বহুপাপ করি নাই বলিয়া শীঘ্র শিক্ষা দিবার জন্যই হউক, অথবা যে কোন কারণেই হউক, নারায়ণ বুঝি সদয় হইয়া আমার অন্তিম কামনাপূর্ণ করিলেন।"

আমি নিশ্চল হইয়া স্থিরকর্ণে শুনিতে লাগিলাম।

"এইবার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল। একদিন স্বপ্ন দেখিলাম—যেন নলিনী আমার মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া; সেই মর্ম্মর-শুভ্র মূর্ত্তি নির্ব্বাক নিষ্কম্প ইব প্রদীপম্ থাকিয়া, কাতর দৃষ্টিতে আমার প্রতি নীরব তিরস্কার বর্ষণ করিতেছিল; কাতরতাপূর্ণ, অভিমান ও যাতনা-ব্যথিত এবং অবিশ্বাস-ছায়া-মণ্ডিত, সে দৃষ্টি যেন আমার অন্তর প্রদেশ পর্য্যন্ত আলোড়িত ও মথিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

ক্রমে যতবারই নিদ্রা যাই, ততবারই ঐ মূর্ত্তি, ঐ করুণ দৃষ্টি জাগিয়া উঠে, শেষে এমন হইল যে, নিদ্রাভঙ্গে চাহিবার পরও মনে হইত যেন শিয়রে দাঁড়াইয়া।

ক্রমাগত, অনিদ্রা, দুশ্চিন্তা ও আত্মগ্লানিতে জর্জ্জরিত হইয়া শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, এবং আমি ও সকল যাতনার শীঘ্র নিবৃত্তির আশায় নিশ্চিন্ত হইতে লাগিলাম।

একদিন সন্ধ্যার সময় উপরে উঠিতেছি, দেখি সিঁড়ির উপর দীর্ঘাকার এক ভীষণ মূর্ত্তি ; দেখিয়া কথঞ্চিৎ ভীত ও বিহ্বল হইলাম। হিন্দুস্থানী ধরণের পালপাট্টা ও মালকোচা পরা, শ্যাম মূর্ত্তি, অঙ্গুলি সঙ্কেতে গৃহে আসিতে বলিল, আমিও যেন যন্ত্রচালিতবৎ অনুসরণ করিলাম। যেন যমদূত মরণের পরোয়ানা লইয়া নরক-যাত্রার আহ্বান করিতেছে।

দেওয়ালে দেখি—যেন জ্বলন্ত ভাষায় সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে "প্রায়শ্চিত্ত" ; বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিলাম কি প্রায়শ্চিত্ত ? ততোধিক বিস্মিত হইয়া দেখি, আমারও মনোভাব সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রকার জ্বলন্ত অক্ষরে দেওয়ালে প্রতিফলিত হইল। আর মুখের ভাষার প্রয়োজন হইল না, হয়ত তখন সে শক্তিও ছিল না—শুধু এইরূপে পঙ্‌ক্তি বাকে ভাষা বিনিময় হইতে লাগিল। সুবর্ণ অক্ষর প্রায়শ্চিত্তের তিনটী প্রস্তাব জানাইল। প্রথম—সমস্ত কথা অকপট ভাবে তোমাদের বলা ; দ্বিতীয়—পাপলব্ধ সমস্ত অর্থ তোমাদের প্রত্যর্পণ করা, তৃতীয়টী, তোমাকে বলিব না, সে অতি ভীষণ, তাহা পালন করিবার শক্তি, সামর্থ্য ও সময় আমার নাই।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, প্রথম প্রস্তাবে ইতস্ততঃ করিলাম, কেমনা নবীনের নিকট আজীবন গোপন রাখিবার জন্য অঙ্গীকার-বদ্ধ, তৃতীয় প্রস্তাবে জানাইলাম—অসম্ভব।

পঞ্চভূত বাক্ পুনরায় ফুটিয়া বলিল, 'তিন দিন সময়, কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লও'।

তাহার পর সব মিলাইয়া গেল; আমি ঘর্ম্মাক্তকলেবরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িলাম।

তিন দিন পরে রাত্রিতে শুইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে সেই মূর্ত্তি ও তাহার শব্দহীন ভাষা উজ্জ্বল হইয়া আমার অভিপ্রায় জানিতে চাহিল। তাহারই ভাষায় প্রথম প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, কিন্তু তৃতীয় প্রস্তাবে নীরব রহিলাম।

ভাষা জানাইল, আরও তিন দিন সময়।

তিন দিনের দিন সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে না থাকিয়া, জনপূর্ণ হরি বাবুর বৈঠকখানায় রহিলাম। কিন্তু অকস্মাৎ সেই মূর্ত্তি সেখানে যাইয়া অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আহ্বান করিল, আর আমিও যেন মন্ত্রবলে অবশ ভাবে যন্ত্রবৎ অনুসরণ করিলাম। অপর কেহ কিছু দেখিতে বা বুঝিতেও পারিল না; বাড়ীতে আসিয়া পুনরায় উপরে উঠিয়া তার উজ্জ্বল নীরব ভাষায় স্মরণ করাইয়া দিল—প্রায়শ্চিত্ত চাই। আমার উত্তর ছিল না, নীরবে কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইলাম, কেবল দেওয়ালে একটা কালো ছায়া দুলিতে লাগিল

যমদূত অপসারিত হইল, কিন্তু কে যেন সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ধাক্কা দিয়া আমাকে সিঁড়ি হইতে ফেলিয়া দিল এবং আমি গড়াইতে গড়াইতে অচৈতন্য হইলাম। তদবধি সে কালমূর্ত্তি আর দেখি নাই, কিন্তু আমারও বোধ হয় সব শেষ হইবার আর বিলম্ব নাই।"

কবিরাজ মহাশয় চুপ করিলেন, আমিও স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম।

কবিরাজ মহাশয় আবার আমার হাত দুটী ধরিয়া কাতরভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'বাবা এ পাপের অন্ত নাই, ক্ষমা নাই,

প্রায়শ্চিত্ত নাই, কিন্তু বাবা তোমরা এ বৃদ্ধের বহু উপকার করিয়াছ, তাই আজ ভরসা করিয়া শেষ নিবেদন করিতেছি যে, আমার অন্তিম কাতর প্রার্থনা পূর্ণ কর। নহিলে বড় জ্বালা—এ জ্বালা আমি ঠিক বুঝাইতে পারিতেছি না, কিন্তু যদি ইহার একাংশও অনুভব কর ত আমায় শান্তি দাও।'

আমি কিন্তু টাকা লইতে কিছুতেই সম্মত হইলাম না; এ সমস্ত ভুলিয়া তখন স্নেহময়ী পিসিমার জন্য প্রাণের ভিতর পর্য্যন্ত কাঁদিয়া উঠিতেছিল।

শেষে বৃদ্ধের কোটরগত কাতর চক্ষুর মুমূর্ষু দৃষ্টি ও ব্যাকুল চরম প্রার্থনায় ব্যথিত হইয়া, নোটের তাড়াগুলি তাঁহার সম্মুখেই লৌহ সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া লইয়া, উদ্ভ্রান্তচিত্তে ত্বরিতপদে বাড়ী চলিয়া গেলাম।

মা সমস্ত শুনিয়া উচ্চক্রন্দনে আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

* * * * *

প্রাতে উঠিয়া কবিরাজ মহাশয়কে দেখিতে যাইয়া দেখিলাম, বৃদ্ধের প্রাণহীন দেহ অন্তিম সৎকারের জন্য বাহির করা হইয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অদ্ভুত ভূতাবেশ।

আমার কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর নিকট একটী সত্য ভূতাবেশের ঘটনা শুনিয়া "অলৌকিক রহস্যে" প্রকাশ করিতেছি।

"সে আজ প্রায় ৪।৫ বছরের কথা। জেলা মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত নশীপুর গ্রামে জনৈক ভদ্রলোকের যুবতী স্ত্রী এক দিন সন্ধ্যার সময় সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া মলত্যাগ করিতে যান। পাইখানা হইতে

বাহির হইবার সময় তিনি চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পথে পড়িয়া যান। দেহের অবস্থা নিশ্চল, কিন্তু চক্ষু সম্পূর্ণ উন্মীলিত। তাঁহার স্বামী বালুচরের কোন খ্যাতনামা এম্, বি, ডাক্তার বাবুকে * আনিয়া স্ত্রীকে দেখাইলেন। তিনি তাঁহাদের শাস্ত্রমত ঔষধাদি দিলেন; কিন্তু রোগের কোন উপশম হইল না। পর দিন সন্ধ্যার সময় নশীপুরের একজন এল, এম্, এস্, ডাক্তারবাবুও আসিলেন। আমরা কয়জন লোক তখন বাটীর বাহিরে বসিয়া আছি। এমন সময় একটী দরিদ্র পথিক আমাদের নিকট আসিয়া তামাকু খাইতে চাহিল। আমরা তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া তামাকু খাইতে দিলাম। ধূমপান হইলে সে বলিল, "বাবু! বাড়ীতে কি হইয়াছে?" আমরা অজানিত বিশেষ হীনাবস্থা লোকের প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া কোন উত্তর দিলাম না।

এমন সময়ে ডাক্তারবাবুরা বাহিরে আসিলেন। পথিক তাঁহাদের গৃহস্বামীর বিপদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও প্রথমতঃ উত্তর দিতে অনিচ্ছুক হইলেন, কিন্তু ব্যগ্রতা দেখিয়া রোগিনীর রোগের অবস্থা সব বলিলেন। পথিক রোগিনীকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল, কিন্তু গৃহস্বামী প্রথমে রাজী হইলেন না। শেষে ডাক্তারবাবুরা আপত্তি নাই বলাতে পথিক গৃহমধ্যে যাইয়া রোগিনীকে দেখিল। বাহিরে আসিয়া সে ডাক্তারবাবুদের বলিল, এ রোগী আরাম করা আপনাদের কর্ম্ম নয়। এ রোগ আপনাদের বুদ্ধির ও লেখাপড়ার বাহিরে। ডাক্তারবাবুরা মনে মনে খুবই রুষ্ট হইলেন। কিন্তু কৌতুকচ্ছলে পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আরাম করিতে পার"। সে বলিল, "পারিব, তবে আজ আমার সময় নাই, কাল

---

* আবশ্যক হইলে নাম প্রকাশ করিতে পারি

সকালে আমি আসিয়া রোগ আরাম করিব। একে যুবতী তাহাতে ভাল করিয়া কাপড় না পরিয়া পাইখানায় যাইতেছিলেন, সে জন্য পুরুষ ভূতে ধরিয়াছে"। এই কথা বলিয়া লোকটী চলিয়া গেল। আমরা সকলেই ভাবিলাম, লোকটা প্রতারণা করিয়া চলিয়া গেল।

যাহা হউক, আমরা পরদিন প্রাতে রোগিনীকে দেখিতে যাইলাম। অবস্থা পূর্ব্ববৎ, চক্ষু সম্পূর্ণ উন্মীলিত। দেহ নিশ্চল, ঔষধে কোনই উপকার হয় নাই। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব দিনের অযাচিত পথিক একটী রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিয়া দক্ষিণ হস্তে একটী তাম্রকুণ্ড ও বামহস্তে একটী ধাতু পাত্রের উপর একটী সিন্দুর-রঞ্জিত পান, একটী জবাফুল, একটী পয়সা ও একটী সুপারী লইয়া উপস্থিত হইল। একটী ঘট চাহিয়া লইয়া রোগিনীকে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইতে বলিল। তাহা হইলে পর, রোগিনীকে বারান্দায় শয়ন করান হইল। পথিক সম্মুখের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। কি করিতে লাগিলেন, আমরা দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু মনে হইল যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। পাত্রের উপর পয়সাটীর ঠন্ ঠন্ শব্দ হইতেছিল। খানিকক্ষণ পরে পথিক সিন্দুর-রঞ্জিত পানপাত্রটী হস্তে করিয়া রোগিনীর নিকট বসিল। যে রোগিনী ব্যাধিগ্রস্তা হইয়া অবধি মৌনাবস্থায় ছিলেন, তাঁহাকে পথিক বলিলেন "আমি বল্‌ছি ছাড়, যাবি কিনা বল্? যা, নইলে এখনি তোর হাত কাটিয়া দিব।" রোগিনী উত্তর করিল "যাব বৈকি? সন্ধ্যার সময় অৰ্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় এমন সুন্দরী পাইয়াছি। যাব বৈ কি?"। পথিক কত তাড়না ও ভৎ'সনা করিল। কিন্তু রোগিনীর মুখ হইতে ঐ উত্তর বাহির হইল। তখন পথিক পান পাতার নীচের কিয়দংশ যেমন ছিঁড়িয়া ফেলিল, অমনি রোগিনী চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওগো আমাকে মারিয়া

ফেলিল গো, আমার পা কাটিয়া ফেলিল গো"। পথিক অবশিষ্ট পানপাতা হাতে করিয়া বলিল "তুই যা—তাহলে তোর আর কিছু করিব না—তুই চলিয়া যা"। রোগিনী বলিল "আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি চলিয়া যাইতেছি।" কিন্তু পথিক যেমন পানটী রাখিয়া দিলেন, রোগিনী অমনি বলিলেন "যাব বৈকি? সন্ধ্যার সময় অর্দ্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় এমন স্ত্রীলোক পাইয়াছি। যাব বৈকি?" তখন পথিক পানটার নিম্ন ও মধ্যস্থল চিরিয়া ফেলিলেন। রোগিনী চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমার পা গেল গো. আমার হাত গেল গো, আমার বুক গেল গো" ইত্যাদি। শেষে পথিক যখন পানটীর বোঁটা ধরিয়া বলিল, "তোর সমস্ত কাটিয়া দিয়াছি, এবার মাথা কাটিয়া দিব, তখন রোগিনী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, আমি যাচ্ছি"। পথিক বলিল, "তবে আমার সঙ্গে আয়। পাত্রের পয়সাটী মুখে করে নিয়ে আয়"। যে রোগিনী নিশ্চল অবস্থায় কয়দিন পড়িয়াছিলেন, তিনি উঠিয়া মুখে করিয়া পয়সাটি উঠাইলেন। নিকটে একটী শীল ছিল। পথিকের আদেশমত রোগিনী দাঁতে করিয়া ভারী শীলটা উঠাইলেন। রোগিনী যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, সেখানে ফিরিয়া গিয়া তাঁহার চৈতন্য হইল। রমণীসুলভ লজ্জায় অবগুণ্ঠনবতী হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারবাবুরা ও উপস্থিত ভদ্রলোকেরা এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। সেই অবধি রোগিনী রোগমুক্ত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।"

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

গোধূলি-সঙ্গমে।

৪ঠা বৈশাখ। অস্তায়মান তপনের কনক-কিরণ বট-শীর্ষকে স্বর্ণাভ করিয়া রাখিয়াছে। মন্দির-চূড়ায় প্রোথিত ত্রিশূল-শিরেও সে রশ্মি প্রতিফলিত হইয়াছে। নদীর পর পারে এক রাখাল বালক উচ্চকণ্ঠে গাইতেছিল—

"মন রে ভালবাস তারে,
যে ভবসিন্ধু-পারে তারে।
এই কর ধার্য্য কিবা কার্য্য অসার সংসারে॥
ধনে জনে আশা বৃথা, বিস্মৃত সে পূর্ব্ব কথা,—
তুমি ছিলে কোথা, এলে কোথা, যাবে কোথাকারে॥"

সান্ধ্য সমীরের প্রতি হিল্লোলের সঙ্গে সঙ্গে সেই সঙ্গীতের শব্দ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইতেছিল। বটমূলস্থ গোধূলি-সভায় সমবেত প্রাচীনগণের কর্ণেও সে সঙ্গীতের ধ্বনি প্রবেশ করিল। তাঁহারা তন্ময় হইয়া নীরবে সে সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, এইরূপ নিঃসম্বল অবস্থায় "ভবসিন্ধুপারে" যাইব কেমন করিয়া? কেমন করিয়া এই নিঃস্ব ও দীন অবস্থায় বিশাল ভব-বারিধি উত্তীর্ণ হইব? খেয়ার কড়িও যে সম্বল নাই! সকলেই নিজ নিজ পাথেয়ের দৈন্য স্মরণ করিয়া পরলোকের চিন্তায় একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন। সকলেই নীরব, মৌনী ও নিস্পন্দ। বস্তুতঃ রাখাল বালকের কণ্ঠনিঃসৃত দূরাগত সঙ্গীত-শব্দে সে দিবস 'গোধূলি-সভা'য় যে পবিত্র ভাব-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা সকলকেই একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ এইরূপ নীরবে অতিবাহিত হইবার পর অধ্যাপক মহাশয় সহসা হাই তুলিলেন এবং তৎপরে মুখে তিনবার দুর্গানাম

উচ্চারণ ও সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলিতে তুড়ি দিয়া বলিলেন, "পূর্ব্বদিনের প্রতিশ্রুতিমত অদ্য আমি আপনাদিগকে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার শুনাইব। এ ঘটনা আমার মাতুলালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী বাটীতে ঘটিয়াছিল।"

জমীদার পুত্র। অধ্যাপক মহাশয়, অদ্য আপনি অগ্রেই সেই কথা বলিতে থাকুন। অদ্য আর অন্য কথার প্রয়োজন নাই।

তখন নস্যদানী হইতে এক টিপ্ নস্য লইয়া অধ্যাপক মহাশয় বলিতে আরম্ভ করিলেন,—নন্দীপুরে আমার মাতুলালয়। আমার মাতুলালয়ের পার্শ্বেই এক সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-পরিবারের বাস। ইঁহাদের বিস্তর ভূ-সম্পত্তি, উহার বার্ষিক আয় প্রায় বিশ বাইশ হাজার টাকার কম হইত না। দানশীলতা, অতিথি-সেবা, জলাশয়-প্রতিষ্ঠা, দাতব্য ঔষধ-বিতরণ প্রভৃতি নানাবিধ সৎকার্য্য এই পরিবারের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। এইজন্য বহুদূর পর্য্যন্ত ইঁহাদের সুনাম ছিল।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন এই পরিবারের কর্ত্তা পরলোক-গমন করিয়াছেন। আমি তখন মাতুলালয়েই থাকিয়া তাঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত এক চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাভ্যাস করিতাম।

কর্ত্তার নাম ৺ মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দুইপুত্র এবং বিধবা পত্নীকে রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। মাধববাবুর মৃত্যুর দুইবৎসর পরেই তাঁহার এক পিতৃব্যপুত্র, মাধববাবুর পুত্রদ্বয়ের নামে এক মামলা রুজু করেন। বলা বাহুল্য, মাধববাবুর পুত্রদ্বয় প্রাপ্ত-বয়স্ক এবং বিষয়কর্ম্ম দেখিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইলেও মামলা-মকদ্দমার দিকে যাইতে ভয় করিতেন; কিন্তু মাধববাবুর পিতৃব্যপুত্র দেশে 'মামলা-বাজ' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। লোকের নামে মিথ্যা-মকদ্দমার সৃষ্টি করিতে, দরিদ্রকে আইনের নাগপাশে বদ্ধ করিয়া তাহার ভিটামাটী পর্য্যন্ত গ্রাস করিতে, নাবালকের এবং বিধবার সম্পত্তি অধিকার

করিতে তখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আর সে গ্রামে কেহ ছিল না। এ হেন লোকের সহিত মাধববাবুর পুত্রদ্বয়ের মামলা চলিতেছিল, সুতরাং উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় যে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত কাতর করিয়া তুলিয়াছিল, একথার উল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

এই মকদ্দমা ক্রমশঃ মুন্সেফী আদালত হইতে জেলা কোর্টে, তৎপরে জেলা কোর্ট হইতে হাইকোর্টে আসিল। হাইকোর্টে আসিয়া মকদ্দমার গতি কতকটা শিথিল হইল বটে, কিন্তু কতদিনে যে উহার নিষ্পত্তি হইবে, তাহা বুঝিতে পারা গেল না। যখন হাইকোর্টে এই মকদ্দমা এইরূপ মন্থরগতিতে চলিতেছিল, তখন মাধব বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র রমেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুর সদরে ওকালতি আরম্ভ করিয়াছেন। স্বর্গীয় মাধববাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শচীন্দ্রনাথ তখন বলিলেন, "ভাই রমেন্দ্র, তুমি এখন উকীল হইয়াছ, এবং যখন কলিকাতায় থাকিয়া ওকালতি করিতেছ, তখন তুমিই মামলার পরিচালন-ভার গ্রহণ কর। আমি এই দীর্ঘ তিন বৎসরকাল একাদিক্রমে মকদ্দমা তদ্বির করিতে করিতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। বিশেষ আমার শরীরও যেন ভগ্নপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এক্ষেত্রে তুমি ইহার তদ্বির না করিলে আর উপায় দেখিতেছি না। তোমার পঠদ্দশায় পাছে তোমার পাঠে বিঘ্ন ঘটে, এইজন্য তোমাকে এতদিন এ সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই।" রমেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই কথায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন, "আপনার শরীর বহিতেছে না, এ কথা আমায় পূর্ব্বে বলেন নাই কেন? আমি ইতিপূর্ব্বেই এ ভার গ্রহণ করিতে পারিতাম। আমার পড়া আগে, না আপনার শরীর আগে? আপনি চিকিৎসক-গণের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া না হয় একবার বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া আসুন।" জ্যেষ্ঠ

শচীন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, রমেন্দ্র, আমি কিছুদিন নিশ্চিন্তমনে নন্দীপুরে থাকিতে ইচ্ছা করি। আমার বিশ্বাস, কিছুদিন বিশ্রাম করিতে পারিলেই আমার শরীর অনেকটা ভাল হইয়া আসিবে।" রমেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এই কথার উত্তরে আর কোন কথা বলিলেন না, শচীন্দ্র-নাথ বুঝিলেন, রমেন্দ্রের মৌনীভাবই এ বিষয়ে তাহার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছে।

এই ঘটনার পর ছয়মাস অতিবাহিত হইয়াছে. শচীন্দ্রনাথ এখন রোগ-শয্যায়। তাঁহার ভীষণ হৃদ্রোগ হইয়াছে। পীড়ার প্রশমন হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধিই পাইতেছে। রমেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। কলিকাতার বড় বড় চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। পরিশেষে রোগ ক্রমশঃ ভয়াবহমূর্ত্তি ধারণ করিল। রমেন্দ্রনাথ সবিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসকেরা বলিলেন, "আর আশা নাই।" রমেন্দ্রনাথ তবুও নিরাশ হইলেন না। তিনি মনে করিলেন, দাদা অবশ্যই সারিয়া উঠিবেন।

অবশেষে একদিন বর্ষার মেঘমন্দ্রিত প্রদোষে অকস্মাৎ শচীন্দ্রনাথের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল; মৃত্যুকালে তিনি বিষয় সম্পত্তি-সম্বন্ধীয় বহু জটিল কথা রমেন্দ্রনাথকে বলিয়া যাইতে পারিলেন না। সুখের বিষয়, শচীন্দ্রনাথের পরিচালনগুণে সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত হয় নাই এবং সেজন্য রমেন্দ্রনাথের কোন ভাবনাই ছিল না। কিন্তু জ্যেষ্ঠের এই আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে রমেন্দ্রনাথের মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তিনি যেন অকূল সমুদ্রে পড়িলেন।

শচীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তিনবৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এখনও সেই সর্ব্বনাশকর মামলার শেষ হয় নাই। তবে হাইকোর্টের বিচার-পতিগণ আশ্বাস দিয়াছেন যে, একমাসের মধ্যেই এই মামলার নিষ্পত্তি হইবে।

রমেন্দ্রনাথ নিজে উকীল; তিনি এই মামলার জন্য প্রাণপণে লড়িতেছেন। মামলায় জয়ী হইবার বিশেষ সম্ভাবনা হইয়াছে। মামলা শেষ হয়-হয় হইয়া আসিয়াছে; এমন সময় বিপক্ষ পক্ষের উকীলের অনুরোধক্রমে বিচারপতিগণ আদেশ করিলেন, "রমেন্দ্রবাবু আপনি আপনার পিতামহের যে একখানি দলিল আছে, তাহা পরবর্ত্তী মামলার দিন আদালতে দাখিল করিবেন।" রমেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যে আজ্ঞা হুজুর।"

আর এক সপ্তাহ পরে মকদ্দমা। রমেন্দ্রনাথ হাসিমুখে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, কাল প্রাতেই দলিলখানি বাহির করিয়া কলিকাতায় রওনা হইব। এই দলিল দাখিল করিলেই আমরা নিঃসন্দেহ জয়লাভ করিব। কিন্তু লোকে যাহা ভাবে, সকল সময়ে যাহা ঘটিয়া উঠে না; অথবা ঘটিয়া উঠিলেও অতি সহজে তাহা ঘটিতে বড় একটা দেখা যায় না। এক্ষেত্রেও ঘটিল তাহাই। পরদিন প্রাতে রমেন্দ্র বাড়ীর সকল ঘর তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়াও সেই দলিল পাইলেন না। অবসাদ ও নৈরাশ্যে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি ভাবিলেন, হায়! এতদিনের পরিশ্রম, এতদিনের অর্থব্যয় সমস্তই বুঝিবা পণ্ড হয়। দাদা চলিয়া গেলেন, আমাদিগকে ডুবাইয়া গেলেন। আর আশা নাই, মামলায় ত হারিবই; সঙ্গে সঙ্গে পথের ভিখারী হইব।

রমেন্দ্রনাথ প্রতিদিনই অবসন্নহৃদয়ে বাটীতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই দলিলখানির অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু উহা পাওয়া ত দূরের কথা, রমেন্দ্র আরও নিরাশ হইয়া পড়িলেন। মকদ্দমার আর মাত্র তিনদিন বাকী। রমেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, দাদা অকস্মাৎ চলিয়া গেলেন, হায় হায় আমাদিগকে ডুবাইয়া গেলেন! নৈরাশ্যের ঘোর অন্ধকার আসিয়া তাঁহার সমস্ত হৃদয়দেশ অধিকার করিয়া বসিল। তিনি

বুঝিলেন আর আশা নাই, আর ভরসা নাই। মকদ্দমায় হার নিশ্চিত। তিনি তাহার জন্যই প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ভাগ্যে যাহা থাকে ঘটিবে, ভাবিয়া আর করিব কি এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে দিনও চলিয়া গেল; রমেন্দ্রনাথ সেইদিন নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন; দলিল আর খুঁজিলেন না। বুঝিলেন, দলিলের অনুসন্ধান বৃথা; উহা আর পাওয়াই যাইবে না।

তৎপর দিন দশমী তিথি। রমেন্দ্রনাথ সেই দিন রজনীতে আর একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক, মনে করিয়া বাতি জ্বালিয়া, সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন; বাক্স, আলমারি, দেরাজ, ড্রয়ার কিছুই বাকী রাখিলেন না। অবশেষে শচীন্দ্রনাথের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার শয্যা পর্য্যন্ত উল্টাইয়া দেখিলেন, পাতি পাতি করিয়া তাঁহার গৃহের সকল দ্রব্য অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু দলিলের চিহ্ন পর্য্যন্ত কোথাও মিলিল না। তখন রমেন্দ্রনাথ দাদার গৃহপ্রাচীরে সংলগ্ন প্রতিমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সে দীর্ঘশ্বাসে নৈরাশ্য ও অবসাদ যেন ওতঃপ্রোতভাবে মিশাইয়া ছিল।

রমেন্দ্রনাথ তাহার পর নিজের ঘরে চলিয়া আসিলেন এবং বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। শয্যা তাঁহার নিকট আজ কণ্টকাকীর্ণ বোধ হইতে লাগিল। নিদ্রা দূরের কথা, চক্ষুই নিমীলিত হইল না। চিন্তা যেন আজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে পীড়া দিতে লাগিল। এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর, রমেন্দ্রনাথ শয্যা হইতে উঠিলেন এবং গৃহতলে মাদুর বিছাইয়া শয়ন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই রমেন্দ্রনাথ তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন। তন্দ্রাভঙ্গে শুনিতে পাইলেন, গৃহের ঘড়িতে টং টং করিয়া দুইটা বাজিল। তখনও তাঁহার চক্ষু হইতে তন্দ্রার আবেশ সম্পূর্ণ অপসৃত হয় নাই; গবাক্ষপথ দিয়া দ্বাদশীর ম্লান কৌমুদী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। চারিদিক

নীরব; মধ্যে মধ্যে কচিৎ দু'একটা নিশাচর বিহঙ্গের স্বর সে নৈশ-নীরবতা ভঙ্গ করিতেছিল। রমেন্দ্রনাথের মস্তিষ্ক যেন উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মনে করিলেন, একবার বাহিরে গিয়া মুখে হাতে জল দিয়া আসি, শরীর শীতল হইবে। এই ভাবিয়া রমেন্দ্রনাথ গৃহদ্বার উন্মোচন করিয়া বাহিরে আসিলেন। তাহার গৃহের সম্মুখেই এক প্রশস্ত অনাবৃত চত্বর; চত্বরের চারিপার্শ্বে নানাজাতীয় পুষ্প বৃক্ষ; কোনটি প্রস্ফুটিত ফুলভারে আনতশীর্ষ, কোনটি বা অপুষ্প। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে সেগুলিকে কেমন এক মলিন সৌন্দর্য্যমণ্ডিত দেখাইতেছিল।

রমেন্দ্রনাথ অগ্রসর হইলেন। অগ্রসর হইয়া চত্বরে পদার্পণ করিলেন। সহসা সম্মুখ-ভাগে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল। তিনি দেখিলেন, অদূরে—অস্ফুট চন্দ্রালোকে স্থির, ধীর, অচলভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দণ্ডায়মান। রমেন্দ্রনাথ ভাবিলেন,—তাঁহার দৃষ্টি-বিভ্রম হইয়াছে; সমস্ত রাত্রি দাদার কথা চিন্তা করিয়াছি, তাই বোধ হইতেছে, তিনি যেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। পরলোকে অবিশ্বাসী রমেন্দ্রনাথ তন্দ্রাবিষ্ট নেত্রযুগল একবার ঘর্ষণ করিয়া লইয়াই পুনরায় সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং দৃষ্টিপাত করিয়াই সবিস্ময়ে দেখিলেন, শচীন্দ্রনাথের ছায়ামূর্ত্তি যেন তাঁহার নিকটে আরও অগ্রসর হইয়াছে; সে মূর্ত্তি যেন আরও সুস্পষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মাথার উপরে চন্দ্র মেঘাবরণ-মুক্ত হইল, জ্যোৎস্না অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই প্রোজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে বিস্ময়-বিমূঢ়, নির্ব্বাক্, নিশ্চল রমেন্দ্রনাথ স্পষ্টই দেখিতে পাইলেন, শচীন্দ্রনাথের ছায়ামূর্ত্তি এবার আর শুধু নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া নাই,—সে মূর্ত্তি দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী সঞ্চালন করিয়া তাঁহাকে কি যেন ইঙ্গিত করিতেছে। সে ইঙ্গিতে যেন সহস্র আশ্বাস, সহস্র ভরসা বিদ্যমান ছিল। কেবল

তাহাই নহে, ছায়ামূর্ত্তি গম্ভীরভাবে তাঁহাকে ইঙ্গিতে * তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে বলিতেছে।

বিস্মিত রমেন্দ্রনাথ আর কোন কিছু করিলেন না। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মত ছায়ামূর্ত্তির অনুগমন করিলেন। ছায়ামূর্ত্তি চত্বর ছাড়িয়া সোপানাবলী অবরোহণ করিয়া চলিল। রমেন্দ্রনাথও সঙ্গে চলিলেন; ছায়ামূর্ত্তি যে ভাবে চলিতেছিল, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইল, যেন এই গৃহ, এই চত্বর, এই সোপানাবলী,—যেন এই বাড়ীর প্রত্যেক অংশ তাহার বহুদিনের পরিচিত। ক্রমে ছায়ামূর্ত্তি অন্দর অতিক্রম করিয়া, প্রাঙ্গণ পার হইয়া বহির্ব্বাটীতে প্রবেশ করিল, রমেন্দ্রনাথ তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিয়াছেন। এইবার ছায়ামূর্ত্তি নিম্নতলের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল এবং ইঙ্গিতে রমেন্দ্রনাথকে সেই ঘরে প্রবেশ করিতে বলিল। রমেন্দ্রনাথও তাহার ইঙ্গিতমত সেইঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া ছায়ামূর্ত্তি মৃদু হাসিয়া তর্জ্জনী-সঙ্কেতে ভূমিতলস্থ এক অর্দ্ধভগ্ন কাষ্ঠপেটিকা দেখাইয়া দিলেন এবং মুখের ভাবে যেন প্রকাশ করিলেন, এই কাঠের বাক্সটি খুঁজিয়া দেখ। অতি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ রমেন্দ্রনাথ যন্ত্রচালিত পুত্তলীর মত সেই ভগ্ন ও উপেক্ষিত কাষ্ঠপেটিকায় হস্তক্ষেপ করিলেন, ধীরে তাহা উন্মোচন করিলেন। পেটিকাটি ছিন্নভিন্ন কাগজের টুকরায় পরিপূর্ণ; ঐ সকল কাগজের টুকরা একে একে অপসারিত করিয়া রমেন্দ্রনাথ মলিন বস্ত্রখণ্ডে বিজড়িত একগোছা কাগজ বাহির করিলেন এবং কৌতুহলপরবশ হইয়া যেমন উহা খুলিলেন, অমনই সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন,—এই কাগজগুলিই তাঁহার ঈপ্সিত ধন, তাঁহার আশা-ভরসা, বল-বুদ্ধি,—বলিতে হইবে কি এই কাগজগুলিই তাঁহার সেই পিতামহের পুরাতন দলিল? এতক্ষণ কেমন এক অস্পষ্ট ম্লান আলোকে তিনি সমগ্র বাটী আলোকিত দেখিয়াছিলেন, সেই আলোকেই তিনি ত ছায়ামূর্ত্তির

অনুসরণ করিয়াছিলেন। আবার সেই আলোকেই ত এই দলিল দেখিতে পাইলেন।

দলিল পাইয়াই রমেন্দ্রনাথ হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া যেমন সেই ছায়ামূর্ত্তির দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, অমনই দেখিলেন, সে ছায়ামূর্ত্তি নাই; তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সে অন্ধকারে আর কিছুই দেখা যাইতেছে না। ভয়ে, বিস্ময়ে রমেন্দ্রনাথ উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কে আছ? শীঘ্র আলো জ্বাল।"

রমেন্দ্রনাথের সে চীৎকারে শঙ্করের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শঙ্কর তাঁহার পিতার আমলের বিশ্বস্ত ভৃত্য। বৈঠকখানার পাশের ঘরেই শয়ন করিত। সে রমেন্দ্রনাথের চীৎকারে শীঘ্র লণ্ঠন জ্বালিয়া ছুটিয়া আসিল। রমেন্দ্রনাথ পাগলের মত লাফাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "শঙ্কর শঙ্কর দলিল পেয়েছি, দলিল পেয়েছি।"

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছোটবাবু ছোটবাবু অন্ধকারে একলা এ ঘরে কি কর্‌ছিলেন, অন্ধকারে দলিল পেলেন কি ক'রে?"

রমেন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "শঙ্কর! দাদা এসেছিলেন, এসে আমায় দলিল দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর পুণ্যপ্রভায় সমস্ত বাড়ী যেন আলোকিত হয়ে উঠেছিল, সেই আলোকেই ত আমি এ ঘরে এসেছিলাম। এখন দাদাও অন্তর্ধান করেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আবার এই বাড়ী অন্ধকারে ডুবে গেছে।

শঙ্কর। হ্যাঁ বলেন কি! বড়বাবু এসেছিলেন! বড়বাবু আপনাকেও দেখা দিয়েছিলেন! কাল ঠিক সন্ধ্যার সময় আমি বড় বাবুকে এই বৈঠকখানা ঘরের ভিতরে বসে থাক্‌তে দেখেছি। আর দেখেছি, তাঁর দৃষ্টি ঐ ভাঙ্গা কাঠের বাক্সটির দিকে রয়েছে।

রমেন্দ্রনাথ। বলিস্ কি! পরলোকে অবিশ্বাসী আমি, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসহীন আমি,—আজ আমার চক্ষুর সম্মুখ হ'তে একটা আজন্ম সংশয়ের আবরণ অপসৃত হ'ল। পরলোক যে আছে, তা' আজ দিব্য চক্ষুতে দেখ্‌তে পেয়েছি, মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌তে পেরেছি। আরও বুঝ্‌তে পেরেছি, ইহজীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সকল বাসনা, সকল কামনা, স্নেহ, বিরাগ প্রভৃতির শেষ হয় না; ইহলোকে এবং পরলোকে যে একটা অচ্ছেদ্য বন্ধন আছে, তা' আজ স্পষ্টই বুঝ্‌তে পেরেছি।

শঙ্কর। বড়বাবু ত মানুষ ছিলেন না; তিনি দেবতা। ম'রেও তাঁর বিরাম নেই, এখনও লোকের উপকার কর্‌ছেন। যান্ ছোট বাবু, এখনও রাত্রি অনেক আছে, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শয়ন করুনগে; কালই আবার কলিকাতায় রওনা হ'তে হবে।

বিশ্বস্ত ভৃত্য শঙ্করের কথায় রমেন্দ্রনাথ শয়নকক্ষে আসিয়া শয্যা-গ্রহণ করিলেন। নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন, গবাক্ষ দিয়া গৃহপ্রাচীরের স্থানে স্থানে প্রভাত-অরুণের কনক-কিরণ নিপতিত হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, সেই প্রাচীন দলিলখানির সাহায্যে রমেন্দ্রনাথ মকদ্দমায় জয়লাভ করিয়াছিলেন।"

এতক্ষণ সকলে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত নীরব, নিশ্চলভাবে অধ্যাপক মহাশয়ের মুখে এই গল্প শুনিতেছিলেন; এক্ষণে গল্প শেষ হইল দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় বলিলেন, "নিশ্চয়ই শচীন্দ্রনাথের ছায়ামূর্ত্তি বিনষ্ট দলিলখানা দেখাইয়া দিবার জন্য রমেন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল, এ বিষয়ে বোধ হয় কোন সন্দেহ নাই।"

কবিরাজ। শচীন্দ্রনাথের তিন বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল, এতদিন পরে তাঁহার প্রেতমূর্ত্তি কেমন করিয়া রমেন্দ্রকে দেখা দিল? আমার বোধ হয়, কোন পরোপকারী অদৃশ্য আত্মা

শচীন্দ্রনাথের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ঐ বিনষ্ট দলিলখানি দেখাইয়া দিয়াছিল।

পুরোহিত। শচীন্দ্রের তিনবৎসর মৃত্যু হইয়াছিল বটে; কিন্তু এই তিন বৎসরেই কি শচীন্দ্রনাথের সকল শেষ হইয়াছিল! না—কখনই নহে। শচীন্দ্রের ভাণ্ড ও পিণ্ডদেহ লয়প্রাপ্ত হইতে পারে, উহার মনোময় শরীর তখনও ত বিনষ্ট হয় নাই। রমেন্দ্রনাথ বিনষ্ট দলিলের জন্য তাঁহার দাদার কথা ভাবিতেছিলেন, তাঁহার এই চিন্তা-তরঙ্গ শচীন্দ্রের মনোময় দেহে যাইয়া আঘাত করিতে করিতে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিতেছিল। শচীন্দ্রনাথ বুঝিল, রমেন্দ্রের এই চিন্তা অহেতুকী নয়; আমার পরিজনবর্গ এই বিনষ্ট দলিলখানার জন্য চিরকালই আমাকে স্মরণ করিবে, আমার বিষয় চিন্তা করিবে। আর তাঁহাদের চিন্তা-তরঙ্গ আসিয়া আমার মনোময় শরীরে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিবে, আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না। সর্ব্বদাই মন সেইদিকে পড়িয়া থাকিবে, আমার উর্দ্ধগতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। কাজেই শচীন্দ্রনাথ প্রেতমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রমেন্দ্রকে দলিলখানি দেখাইয়া দিয়াছিল।

জ্যোতিষী। পুরোহিত মহাশয় যাহা বলিলেন, একথা যুক্তিযুক্ত বটে।

নায়েব মহাশয় এবং ডাক্তারবাবুও জ্যোতিষীর কথার পরিপোষকতা করিলেন।

জমীদার-পুত্র বলিলেন,—'অধ্যাপক মহাশয়ের এই সুদীর্ঘ কাহিনী বলিতে আজ অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে। মন্দিরের আরতিও আজ শেষ হইয়া গিয়াছে। আজকার মত বৈঠক ভাঙ্গিয়া ফেলাই ভাল।'

সম্মুখের ক্ষুদ্রা স্রোতস্বিনীর বক্ষ দিয়া একখানা ক্ষুদ্র নৌকা চলিয়া যাইতেছিল। দুইজন মাঝি দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে গাইতেছিল,—

"ভবের বাঁধন খুলে ফেল রে মন
আর নাইক কিছু আকিঞ্চন"—

সঙ্গীতের শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল। সেই ক্ষীণ দূরাগত সঙ্গীতধ্বনি সান্ধ্যরজনীর নীরবতায় একেবারে বিলীন হইয়া যাইবার পূর্ব্বেই সেইদিনকার মত "গোধূলি সভা" ভাঙ্গিয়া গেল।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

পুনরাগমন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

বলা বাহুল্য, আমি বালিকার অনুসরণ করিলাম। বালিকা আলোকহস্তে সম্মুখে, আমি মধ্যে, কালু পশ্চাতে চলিতে লাগিল। আমরা এবারে বাগানে প্রবেশ করিলাম না। বাগানের পার্শ্বস্থ একটু সরু পথ ধরিয়া, শস্যপূর্ণ প্রান্তরকে বামে রাখিয়া বালিকা বাগানকে বেষ্টিত করিয়া চলিতে লাগিল।

কিছুদূর চলিবার পর কালু বলিল,—"হাঁ দুর্গা, তুই একা এ পথে কি করিতে আসিয়াছিলি? আর তোকে একাই বা কে ছাড়িয়া দিল?"

দুর্গা বলিল,—"আমি একা আসি নাই। দাদা মহাশয়ের সঙ্গে আসিয়াছিলাম।"

"দাদা কোথায়?"

"দিঘীর ঘাটে বসিয়া আমাদের আসার অপেক্ষা করিতেছেন।"

"আমরা আসিতেছি, তোরা কেমন করিয়া জানিলি?"

"কেন, এই একটু আগে একজন লোক যে আসিল! সেই বলিল। বলিল—"আর একটী বাবু আমার সঙ্গে আসিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া আইস।" তাহাতেই জানিলাম।"

আমি বলিলাম,—"বাগানের মধ্যে আলোক লইয়া তুমিই কি ঘুরিতেছিলে ?"

দুর্গা বলিল,—"ঘুরিব কেন ? আলো লইয়া সেই বাবুকে খুঁজিতেছিলাম।"

"সেই বাবু যে আসিতেছেন, তুমি কেমন করিয়া জানিলে ?"

"আমাকে বলিল।"

উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে বলিল ?" দুর্গা উত্তর করিল না। আমি বলিলাম, "বলিতে কি বাধা আছে ?" বালিকা উত্তর করিল না।

এ কি বিড়ম্বনা! আমরা আসিতেছি, একথা আগে হইতে কে জানিল ? আর কেমন করিয়াই বা জানিল!

কালু অন্তর্য্যামীর ন্যায় আমার আগ্রহের সূত্র ধরিয়া দুর্গাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"তোর দাদা কি জানিয়াছে ?"

দুর্গা বলিল—"না।"

"তবে কে দুর্গা ?

"কালু আমি বলিব না।"

আমিও একটা কথা কহিতে যাইতেছিলাম। একটা কথাই বা কেন, জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছিলাম, "তবে কি গোপাল আমাদের আসিবার কথা তোমাকে বলিয়াছে ?" বালিকার দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বর শুনিয়া তাহাকে আমার আর প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। তৎপরিবর্ত্তে কালুকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কালু! তোমার মনিবের গৃহ আর কতদুর ?"

কালু উত্তর করিল,—"বাবু! আমরা ত সে পথে যাইতেছি না। সে পথে যাইলে আমরা এতক্ষণ বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইতাম। এ আমরা গ্রামের শেষে চলিয়াছি। সেখানে মা বিশালাক্ষীর অধিষ্ঠান

আছে। তারই সম্মুখে প্রকাণ্ড দিঘী। সে দিঘী বাবুর পূর্ব্বপুরুষেরা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।"

"সেখানে আমার যাইবার প্রয়োজন?"

"তা আমি কেমন করিয়া বলিব বাবু? তোমার সঙ্গে কে আসিয়াছে, তাহাকে দেখি নাই। তোমার সঙ্গে পথে দেখা হইল, তোমার সঙ্গে চলিয়াছি। আবার দিদিমণির সঙ্গে দেখা হইল, তাহার সঙ্গে চলিতেছি।"

আমি বালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম,—"দুর্গা! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি যদি জান, উত্তর দিবে? যে তোমাকে আমাদের খবর দিয়াছিল, তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিব না। তুমি বলিতে পার, গোপাল বলিয়া কোন লোক এই তিনদিনের মধ্যে তোমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল কিনা?"

কালু বলিল—"সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর, আমি উত্তর করিতেছি।"

"বেশ, তুমি যদি জান—বল।"

"আসিয়াছিল।"

"এখন কি নাই?"

"না। ঠাকুর আজ চলিয়া গিয়াছে।"

"চলিয়া গিয়াছে!"

"গিয়াছে, আমি তাকে পথ আগাইয়া দিতে গিয়াছিলাম।"

"কোথায় গেল, জান?"

"ঠাকুরের নিজের দেশে। আমি তাকে গ্রামের পথ ধরাইয়া ফিরিতেছি।"

বৃথা আসিলাম ভাবিয়া, আমার মনঃক্ষোভের সীমা রহিল না। রাত্রি না হইলে, এবং ডাক্তারবাবু সঙ্গে থাকিলে আমি আর অগ্রসর

হইতাম না। সেইস্থান হইতেই ফিরিতাম। কিন্তু তখন আর ফিরিবার উপায় ছিল না। গোপালকে ধরিয়াও ধরিতে পারিলাম না! কেন? সেকি আগে হইতে আমার আগমন-সংবাদ পাইয়াছে! সংবাদ পাইয়া দেখা দিবে না বলিয়া কি আমার আসিবার পূর্ব্বেই সেস্থান ত্যাগ করিয়াছে! এক মুহূর্ত্তে সহস্র চিন্তায় আমার হৃদয় মথিত হইয়া উঠিল। এখন একটী কথা জানিলে কতকটা নিশ্চিন্ত হই। সেটা গোপালের বিবাহের কথা। কথাটা খুল্লপিতামহের মুখে না শুনিলে জানিবার প্রয়োজন হইত না। একেত আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আমাদের দেশে বিবাহকর্ম্মের বড় একটা প্রচলন নাই, তাহার উপর দুর্গাপূজার দিন। এ দবসত্রয়মধ্যে বঙ্গে কখনও কি কোন হিন্দু বিবাহের কথা মুখেও আনিতে সাহস করে!

লক্ষণেও বুঝিতেছি বালিকার সহিত গোপালের বিবাহ হয় নাই। তথাপি মনে করিলাম, কালুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু প্রশ্নটা একটু কৌশলে করিতে হইবে। এইটী স্থির করিয়া, কেমন করিয়া কথা পাড়িব ভাবিতেছি, এমন সময় শব্দ উঠিল—"দুর্গা!"

দুর্গা বলিল,—"এই যে দাদা আসিয়াছি।"

"বাবুটীকে পাইয়াছ?"

"বাবু সঙ্গে আসিতেছে।"

গুল্মান্তরাল হইতে পূর্ব্বদৃষ্ট ব্রাহ্মণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। আমাদের তিনজনকে আসিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সঙ্গে আর কে?"

কালু বলিল—"আমি কালু।"

"তুমি যে এরই মধ্যে ফিরিলে?"

"ঠাকুর আমাকে বিদায় দিল! মসাট পর্য্যন্ত তাহাকে পথ দেখাইয়াছি।"

"বেশ করিয়াছ। তুমি তাহা হইলে বাবুকে ঘরে লইয়া চল। আমি দুর্গাকে লইয়া পশ্চাতে যাইতেছি। সারাদিন রৌদ্রতাপে বাবু বড়ই কষ্ট পাইয়াছেন। তুমি সঙ্গে লইয়া শীঘ্র উহার শুশ্রূষার বন্দোবস্ত কর।"

ক্লান্তির কথা উত্থাপনমাত্রেই আমি আপনাকে অবসন্ন বোধ করিলাম। বলিলাম—"আপনার গৃহ এখান হইতে কতদূর?"

"একটু দূর বটে। তবে বাবু, আমি তোমাকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।" এই বলিয়া কিছুদূরের একটী বটবৃক্ষ দেখাইয়া ব্রাহ্মণ কালুকে বলিলেন—"ঐ খানে পালকী আছে, বেহারা আছে।"

বালিকা দাদার কাছে গেল, আমি কালুর অনুসরণ করিলাম।

(ক্রমশঃ)

প্রেতাত্মা দর্শন।

সুরেশবাবু কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায় করিয়া অনেক ধন উপার্জ্জন করেন। তারপর তাঁহার হৃদ্‌রোগ হয়। এইজন্য ডাক্তারেরা তাঁহাকে বায়ু পরিবর্ত্তনের আদেশ দেন। তিনি * * * ষ্টেশনের নিকট বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে থাকেন। বাড়ীটি দেখিতে সুন্দর ও সাহেবীধরণে নির্ম্মিত। আট দশ বৎসরের পর কোন্ কারণে যে তিনি বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন, তাহা প্রতি-বাসীরা জানিতে পারিল না। যাইবার সময় তিনি সেই স্থানের ষ্টেশনমাষ্টার কৃষ্ণবাবুর উপর বাড়ী ভাড়া দিবার ভার দিয়া যান। জল বায়ু উত্তম বলিয়া অনেকে রোগী লইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এস্থানে আসিত। এজন্য সুরেশবাবুর বাড়ী খালি থাকিত না। কিন্তু যে বাড়ী ভাড়া লইত, সে দুইদিন পরেই এ বাড়ী হইতে চলিয়া যাইত, বেশী দিন থাকিতে পারিত না। কৃষ্ণবাবু বাড়ীর ভাড়া যথাসম্ভব অল্প করিলেন, তবুও সে বাড়ীতে কেহই থাকিতে পারিল না। তিনি কিছুতেই ইহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

ইহাতে তিনি বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। এ বিষয়ে তিনি সুরেশবাবুকে পত্র লিখিলেন। দুই চারি খানি চিঠি লেখার পর যদিও

উত্তর আসিত, তাহাতে সুরেশবাবুকে কিছু ব্যস্ত বলিয়া মনে হইত না। প্রতিবাসী যুবকেরা মনে করিল, একদিন রাত্রিতে ঐ বাড়ীতে বাস করিয়া ইহার কারণ স্থির করিতেই হইবে।

তাহারা কৃষ্ণবাবুর নিকট একদিন রাত্রি বাসের নিমিত্ত তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিল। যদি কোন বিপদ ঘটে এই মনে করিয়া প্রথমে তিনি সম্মত হইলেন না। অবশেষে তাহাদের জেদ দেখিয়া সম্মত হইলেন।

তাহারা রাত্র জাগরণ করিয়া তাস খেলিবে এই সঙ্কল্প করিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাত্রিতে আহারাদি করিয়া দশ বারটি আলো লইয়া সুরেশবাবুর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। শ্যামবাবুর নিকট দুই জোড়া ও অপর এক প্রতিবেশীর নিকট হইতে আর দুই জোড়া তাস সংগ্রহ করিল। নিজেদের জন্য তিন চারিটি আলো রাখিয়া বাড়ীর চতুর্দ্দিকে অপর আলোগুলি জ্বালিয়া রাখিল তারপর বাড়ীর সদর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। রাত্র নয়টার সময় কৃষ্ণবাবু ষ্টেশন হইতে ফিরিয়া যাইবার সময় দেখিয়া যাইলেন, সমস্ত বাড়ী আলোকিত ও কোলাহলে পরিপূর্ণ।

(২)

তাহারা সকলেই একটা গৃহ ঠিক করিয়া লইয়া তাস খেলিতে লাগিল। খেলিতে খেলিতে চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কেহ কোথায় দিয়া আসে কি না? রাত্রি নয়টা, দশটা, এগারটা, বারটা বাজিয়া গেল। কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাওয়া গেল না। রাত্র যখন একটা তখন আর কেহ থাকিতে পারিল না। কেহ বা ঢুলিতে লাগিল, কেহ বা শয়নের উদ্যোগ করিতে লাগিল, এমন সময়ে তাহারা স্পষ্ট দেখিল যে দুইটি পা ছাদের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। এই দেখিয়াই সকলেই চীৎকার করিয়া, যে যেস্থানে ছিল, সে সেইস্থানে পড়িয়া গিয়া অজ্ঞান হইয়া গেল। তাহাদের মধ্যে কেবল একজন সাহসী যুবক ছিল। সে দেওয়ালে ঠেশ দিয়া খেলা দেখিতেছিল। সে তৎক্ষণাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া দেখিতে লাগিল, কোন মনুষ্য নামে কি না। ক্রমে ক্রমে একটি স্ত্রীলোক বাহির হইল। সে সাহস করিয়া এইমাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?" এই বলিয়াই সে

কটমট করিয়া চাহিয়া যেস্থানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেইস্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল, পড়িয়া গেল না। সেই অবস্থাতেই তাহার মূর্চ্ছা হইল।

চীৎকার শুনিয়া কৃষ্ণবাবুর নিদ্রা ভঙ্গ করিল। মনে হইল, চীৎকার যেন সুরেশবাবুর বাড়ী হইতে আসিল। তাহাদের কিছু বিপদ ঘটিল? তিনি তৎক্ষণাৎ ষ্টেশন হইতে লোকজন লইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রাচীর টপকাইয়া দ্বার খুলিলেন। উপরেই গিয়া দেখিলেন সকলেই অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কেবল একজন কটমট করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তারপরে তাহাকে শোয়াইলেন ও তাহাদের মুখে জল দিয়া তাহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গে তাহারা আনুপূর্ব্বিক সকল বিবরণ তাহাকে বলিল। সেই যুবকটি বলিল, আমি যে স্ত্রীলোকটিকে দেখিলাম, দেখিতে অনেকটা সুরেশবাবুর স্ত্রীর ন্যায়।

(৩)

কি কারণে যে তাহার বাড়ীর ভাড়া হয় না তাহা সুরেশবাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন। সুরেশবাবু নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিখিলেন, "আমি এখন মৃত্যুশয্যায়, এখন যদি আমার দোষ প্রকাশ না করিয়া যাই, তাহা হইলে ভগবান বোধ হয় আমাকে ক্ষমা করিবেন না। আমার স্ত্রী অবিশ্বাসিনী হওয়াতে তাহাকে নিজহস্তে হত্যা করিয়া আমার বাড়ীর উত্তর দিকের খালি জমীতে পুঁতিয়া ফেলি। সেই দিন রাত্রি হইতে প্রতিদিন রাত্রে আমি ঐরূপ দেখিতাম। তাহাতেই ভয় পাই ও পুলিশের ভয়ে আমি বাড়ী ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসি। এইজন্য বাড়ী ভাড়া দিবার জন্য আমি সেরূপ ব্যস্ত হই নাই।" ইহার দুই দিন পরে সংবাদ আসিল, হৃদ্‌রোগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

তৎপরে প্রতিবাসীরা লোক লাগাইয়া সুরেশবাবুর বাড়ীর উত্তর দিকের জমী খোঁড়াইয়া একটি বাক্স পাইল। বাক্স খুলিয়া দেখিল, মৃতদেহের কোন অংশই পচিয়া গলিয়া যায় নাই। মৃতদেহের সৎকার করা হইলেও সে বাড়ী হইতে ভূতের উপদ্রব গেল না। সেই হইতে কেহই সে বাড়ীতে থাকিতে পারিল না। এখন সে বাড়ী ভগ্ন, বনজঙ্গলে পরিণত ও বন্যজন্তুদিগের আবাসস্থান।

অলৌকিক রহস্য।

৫ম সংখ্যা] তৃতীয় বর্ষ। [অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

দান প্রতিদান।

ছেলেবেলায় একটা গান শুনিয়াছিলাম, তাহার একটা ছত্র এখনো মনে আছে, 'আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মন-মিলন'। বাস্তবিক মনের মিলই প্রকৃত মিল, আঁখির মিলন মিলনই নয় এবং যদিও হয় তাহা অধিকাংশ সময়েই রূপজ ও ক্ষণবিধ্বংশী, হয়ত প্রথম দর্শনেই এক জনের উপর কেমন এক মায়া জন্মিল, কেমন একটা ভিতর থেকে আকর্ষণ অনুভব করিলাম, যেন কত দিনের কত পুরাতন পরিচয়ের স্মৃতি, তাহার মুখের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিল, আর তাহাকে ভুলিতে বা ছাড়িতে পারিলাম না, তাহার সঙ্গলিপ্সা প্রিয় হইতে প্রিয়তর হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু কালের কষ্টি পাথরে সে প্রণয় উজ্জল না হইয়া বরং ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুৎছটার ন্যায় চকিতের ম্লান হাসি হাসিয়া নিভিয়া গেল। বুঝিলাম, এ আত্মীয়তা মোহজ, যেই সে মোহ আবরণ খসিয়া গেল, অমনি ঘনিষ্টতাও শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল, তখন শুধু কেবল চোখের পরিচয়, একটা মৌখিক কুটুম্বিতায় পরিণত হইয়া যায়। অবশ্য লয়লার চক্ষু মজনুকে প্রথমে যে ভাবে দেখিয়াছিল, শেষ পর্য্যন্ত তাহা অবিচলিত ছিল কিন্তু সংসারে সে চির অক্ষুণ্ণ ভাব সে অচ্ছেদ্য আঁখির মিল বড়ই বিরল। কিন্তু মনমিলন এত চঞ্চল ক্ষণভঙ্গুর নহে, বড় একটা ত এ সংসারে হয়ই না, বরং হইলে তাহা যেন মরণ

পর্য্যন্ত সঙ্গী হইয়া থাকে, এবং যদিও কোন কারণে চিরবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়, তবুও তাহাতে আজীবন তার মান অভিমানের সুখ দুঃখের ছায়া, অতীত স্মৃতির ছাপ এমন ভাবে জড়াইয়া থাকে, যে তাহার পূর্ণ উচ্ছেদ বুঝি কখন হয় না।

প্রথম দর্শনে হয়ত সেরূপ কোন একটা নাটকীয় আকর্ষণের তীব্রতা অনুভূত হয় না, কিন্তু কি জানি ঘটনাচক্রে হয়ত ধীরে ধীরে ভাব ও চিত্ত-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা অজ্ঞাত বন্ধনে জড়িত হইয়া যাইতে হয় যে কিছু দিন পরে দেখা যায় সে একজন বিশেষ অন্তরঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, যেন উভয়ের সম্পূর্ণ সহধর্ম্মী, এক যাত্রার যাত্রী। কচিৎ মান অভিমানে বা তুচ্ছ মতভেদে সে আলোক কিছু দিনের জন্য ঢাকা পড়ে বটে, কিন্তু আবার মেঘাপসারিত শরৎ আকাশের মত নির্ম্মল ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

কিন্তু আঁখির মিলনও নিতান্ত উপেক্ষার বস্তু নহে; সকল সময়েই যে রূপজ মোহে প্রতারিত হয় এমন নহে। কখন কখন ভিতরের অজানা গভীর ভাব চোখের উপর ভাসিয়া উঠে; প্রথম দর্শনেই মনে হয় যেন কত পরিচিত, কতক নিকট, কেবল কালের ব্যবধানেই যেন একটা কাল্পনিক দূরত্ব সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে,—পরে সংসারের অনুকূল প্রতিকূল ঘাতপ্রতিঘাতের কঠোর আঘাতেও সে বন্ধন অটুট থাকে।

কিন্তু আঁখিতেই হউক আর মনেতেই হউক, এ জীবনে এক এক জনের সঙ্গে এমন সৌহার্দ্দ জন্মিয়া যায় যে, তাহা কিছুতেই মুছিতে চাহে না। হয় ত সে আমার প্রতিবেশী, তাহার সহিত আবাল্য একই বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীতে পড়িয়াছি, কিন্তু উভয়ে এমনই ভিন্নধর্ম্মী যে, কখন কোন মনোবিবাদ হইল না বটে, তথায় অন্তরের বিনিময় কখন ঘটিল না, আর এক জন হয়ত দূরাগত আগন্তুকের মত আমাদের মধ্যে

আসিয়া পড়িল, কিন্তু কি জানি কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে চিত্ত বিনিময় হইয়া গেল যে, তাহার নিকট অন্তরের নিভৃততম প্রদেশের দ্বার পর্য্যন্ত অনায়াসে খুলিয়া দিলাম।

আমরা তখনই বারাণসীর হিন্দুকলেজে পড়িতাম। বাণীতীর্থের এই বিশাল সরস্বতী-ভবন, শত শত বিদ্যাযাত্রীর মধ্যে প্রায় সর্ব্ব-প্রদেশের সর্ব্ব সম্প্রদায়ের, নানাভাষী নানাবেশী বহুছাত্রে মুখরিত; ল্যাঙ্গাশির বাঙ্গালী, সুন্দরকায় কাশ্মিরী, ক্ষুদ্র চক্ষু, ক্ষুদ্র নাসা স্বাধীন নেপালী, সুদূরপ্রবাসী শ্যামকায় লাঞ্ছিত নেটালবাসী, তিলক-শোভিত-মুণ্ডিত মস্তকে শিখাগুচ্ছধারী নিষ্ঠাবান্ মাদ্রাজী, বিশালবপু পঞ্জাবী, যবচূর্ণভোজী হিন্দুস্থানী, পশ্চিমের মারহাট্টা, দক্ষিণের সিংহলী ও প্রত্যন্তরবাসী আহোমের একত্র সম্মিলনের বিরাট বিদ্যামন্দিরে আমরা অনেকেই একত্র আহার বিহার, ক্রীড়াকৌতুক, পাঠ ও কথোপকথন করিতাম, অনেকেরই সহিত ঘনিষ্ঠসূত্রে মিশিতাম, কিন্তু অন্তরের তীব্র আকর্ষণ কি সকলের সহিত হইত? কখনই নয়। আমরা কত বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া একই শ্রেণীতে পড়িতাম, একই মাঠে এক সঙ্গে খেলিতাম, ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয় প্রতিবেশী ও বাল্যাবধি পরিচিত, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ভিতরের পরিচয় ত সকলের সহিত হয় নাই, কেন হয় নাই, তা কেমন করিয়া বলিব, সে যেন আমার নিকট এক প্রচ্ছন্ন প্রহেলিকা বা দুর্জ্জেয় রহস্য। আমরা যে কয়জন ঘনিষ্ঠতম সূত্রে মিশিয়াছিলাম, তন্মধ্যে আমি, আমাদের প্রতিবেশীর জামাতা বিনোদ, আমাদের ক্লাসের ভগবতী দয়াল, নীচের ক্লাসের হরিভূষণ, গণেশ রাও, নাথুস্বামী ও পিয়ারী শঙ্কর এই সাতজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবশ্য আমরা সকলে যে সমবয়স্ক, সমপদস্থ, একশ্রেণীর বা সমান মেধাবী ছিলাম তাহা নয়; কিন্তু কি জানি কেমন একটা ভাব ছিল,—যাহার আকর্ষণে আমাদের মনের বাঁধন এত বড় ও

দৃঢ়তর ছিল, যে আমাদের মধ্যে প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে হইলে অনেক সময় নিভৃত স্থানের প্রয়োজন হইত।

আমাদের মধ্যে কেবল বিনোদ ও ভগবতীদয়াল বিবাহিত ছিল; তখন হিন্দু কলেজে বিবাহিত ছাত্র সম্বন্ধে এত কঠোর নিয়ম ছিল না।

আমাদের বাড়ী সোনারপুরায়; বিনোদ ও ঐ মহল্লায় শ্বশুর বাড়ীতে, পিয়ারীশঙ্কর জঙ্গমবাড়ীতে থাকিত, ও অন্য সকলে বোর্ডিংএ থাকিত।

সে বড় সুখের দিন ছিল, কত দিন কত সময় যে কত আনন্দে কাটাইয়াছি তাহা ভাষায় বলা যায় না, কখন সন্ধ্যার সময় কলেজের মাঠে ও হাওয়াখানায় বসিতাম, কখনো দাওজীর প্রাঙ্গণে, কখনো বেণীমাধবের ধ্বজায় উঠিয়া, কখনো জ্যোৎস্না প্লাবিত অহল্যাবাইএর ঘাটে গান গাহিয়া, কখনো শান্তিময়ী প্রসন্নসলিলা জাহ্নবীবক্ষে সাঁতার কাটিয়া, আনন্দের তুফান তুলিয়া প্রাণের হিল্লোল ছুটাইয়া হাসিতে হাসিতে দিন কাটাইতাম। কত সুখদুঃখজড়িত বাল্যজীবনের অতীত-কাহিনী ও কত ভবিষ্যতের আশা, ভরসা ও কল্পনার কথায় কত দিন কাটিয়া যাইত। কাহারো সঙ্গে হয়ত কোন কারণে দু এক দিন দেখা না হইলে প্রাণের ভিতর দিয়া কি যে ব্যাকুলতা ছুটিত, অন্তরের মধ্যে কি যেন হারাই হারাই, কি যেন খুঁজে না পাই মনে হইত আবার দেখা হইলে যেন কত কালের কত আদরের পুরাণ জিনিসকে ঘরে পাইয়া মনে হইত, 'কত নিশি কেঁদে পেয়েছিরে চাঁদে, চাঁদ আর ফিরে যাস্‌নেরে'।

কত দিনের পর দিন, কত সকাল সন্ধ্যা রজনী একত্র কাটাইতাম, কখন দেশের কথা, কখন দর্শন, কখন বিজ্ঞান, কখন শুধু আনন্দ কল্লোলময় কৌতুক, কত সম্ভব অসম্ভবের জল্পনা হইত—কখন কথা উঠিত এত লোক থাকিতে আমাদের কয়টী প্রাণীর মধ্যে কোন্

আকর্ষণে, কোন্ কর্ম্মসূত্রে, কোন্ ভবিষ্যৎ ব্রত উদ্‌যাপনসঙ্কল্পে একত্র মিলন ঘটিয়াছে! বলা বাহুল্য ইহার, কখন বা বেশ সুমীমাংসা হইত, কখন বা কোন সিদ্ধান্তই হইত না।

এমন সময় আর একটি সঙ্গী অভাবনীয় ভাবে জুটিয়া আমাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর বন্ধনকে আরো প্রিয়, মধুর করিয়া তুলিল। ইনি আমাদের নবীন অধ্যাপক অরুণবাবু; কলেজের নিকটেই এক বাসা লইয়া অল্প-দিনের মধ্যে আমাদের পক্ষে এক নেসার বস্তু হইয়া পড়িলেন এবং আমরাও এই দীপ্তিমান সূর্য্যকে কেন্দ্রস্বরূপ রাখিয়া গ্রহ উপগ্রহের ন্যায় অলক্ষ্য শক্তির সঞ্চারে ঘুরিতে লাগিলাম। অরুণ বাবু এখানকার সকলের পক্ষে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য ছিলেন, কেহই তাঁহার বিষয় ভালরূপ জানিত না। তিনি যেন একাধারে দ্বৈত ও অদ্বৈত, পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবরাশির একত্র সম্মিলনের গঙ্গা যমুনা বা মণিকাঞ্চণসংযোগ। কখনো মৌন, গম্ভীর সংযতবাক্, কখনো বা প্রফুল্ল সদালাপী নবীন যুবক; অরুণবাবু আমাদের অপেক্ষা ৭।৮ বছরের বড়। যথাসময়ে আসিয়া অধ্যাপনা শেষ করিয়া বাসায় গিয়া নিভৃতে থাকিতেন এবং বড় একটা কাহারো সহিত মিশিতেন না। এমন কি তাঁহার আদি বাসস্থান ও বংশ পরিচয়সম্বন্ধে বিশেষ কেহ জানিতেন বলিয়া বোধ হয় না, আমরাও জানিতাম না এবং জানিবার বিশেষ চেষ্টা বা অবসরও হয় নাই; তবে একবার তাঁহারি মুখে শুনেছিলাম যে, কলিকাতা অঞ্চলে তাঁহার বাসস্থান।

কেমন করিয়া ধীরে ধীরে তাঁর প্রতি আমরা বা তিনি আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হন তাহা স্মরণ হয় না, তবে যতদূর মনে হয়, প্রথমে আমরা তাঁর সরল উদাস চাহনি ও সরস গম্ভীর আলাপে মুগ্ধ হই।

একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁর বাসায় যাইয়া দেখি, হরিবোল! হরি! তার কোনখানটাই অধ্যাপকের গৃহ ছিল না, সম্বলের মধ্যে,

দুইখানি কম্বল, একটা লোটা, একটা পিতলের হাঁড়ী, খানকয়েক পুঁথি ও কিছু কিছু নিত্য নৈমিত্তিক পূজার সরঞ্জাম। অবশিষ্ট ধূলিময় শূন্য কক্ষগুলি, কখন কখন বালকভৃত্য রামভরসার কলরবে মুখরিত হইত। কলেজ সীমানা ছাড়া আমরা যেখানেই তাঁর সঙ্গে মিশিতাম, হয় তাহা উন্মুক্ত আকাশতল, নয় তাঁর নির্জ্জন গৃহ।

ছুটীর দিন কখনো তাঁর সঙ্গে ভক্ত-কোলাহল মুখরিত, বিশ্বনাথ-মন্দিরে, চণ্ডীস্তোত্রনিনাদিত অন্নপূর্ণাভবনে, কখনো স্তবস্তুতিমুখরিত, শান্তিপ্রভাবিত মানব-কাকলী-ক্ষুব্ধ ভাগিরথীতটে, আবার যখন অরুণ আভায় সুপ্তোত্থিত হিন্দুধর্ম্মাধীন উৎসব ফুল্ল হইয়া উঠিত, তখন হয়ত আমরা জনবিরল নগরপ্রান্তে, বরুণাতটে আদি-কেশবের শান্তিময় প্রাঙ্গণে, আবার যখন নানা যান-ঝঞ্ঝনায় রৌদ্রতাপে রাজপথ উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, তখন হয়ত বটুকজীর পার্শ্ব দিয়া, তড়াগ বিটপী স্নিগ্ধ শস্যপূর্ণা শ্যামল প্রান্তরবেষ্টিত পল্লীগ্রামগুলির মধ্য দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে রামনগরের সম্মুখে আম্রক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। আবার যখন সান্ধ্য ধূসরতা সারা ধরণীকে মণ্ডিত করিত, আকাশভরা নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠিত ও বেলফুলওয়ালার ডাক চাপা দিয়া, বড়লোকের জুড়ি সশব্দে কামাচ্ছার পথে ধূলি উড়াইয়া ছুটিয়া যাইত, তখন আমরা ক্রীড়া শেষ করিয়া অরুণবাবুর বাসায় গিয়া জমিতাম।

কখন তিনি সাংখ্যের পুরুষের ন্যায় সাক্ষীমাত্র থাকিয়া আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া যাইতেন, কখন বা গীতায় আমির মত ভিতরে অথচ বাহিরে রহিয়া নির্লিপ্ত ভোক্তারূপে সকল বিষয়েই যোগ দিতেন, কখন আমাদের ভাবরাশি ও চিত্তবিক্ষেপ স্তম্ভিত করিয়া অপূর্ব্ব ভাষায় ভাব প্লাবিত করিয়া দিতেন, আর আমরা নির্ব্বাক নিস্পন্দ থাকিয়া শব্দলহরী-স্পন্দনে পুলকিত হইয়া উঠিতাম। কখন জটিল কর্ম্মসূত্রের তত্ত্ব তুলিয়া প্রেম ও ভক্তির আনন্দ-প্রস্রবণ খুলিয়া, কখন পুরাণ ইতিহাসের শিক্ষা

ও চমকপ্রদ সরস ব্যাখ্যায় মোহিত করিয়া, যোগরাজ্যের অদ্ভুত নিভৃত দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া, কখন স্বদেশপ্রীতির উন্মাদনায় মাতাইয়া বা জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম ও সাংখ্য বেদান্ত পাতঞ্জলের অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়া আমাদের যেন এক সুদূর স্বপ্নলোকে লইয়া যাইতেন। যেন এক অজানা অন্য লোকের জীব ভ্রমক্রমে পথ ভুলিয়া আমাদের মধ্যে খাপ খাইবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মায়াপাশমুক্ত প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষের প্রত্যেক শব্দ, প্রত্যেক বাক্য আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা-ভূষিত হইয়া আমাদের অন্তরে অন্তরে সংশিক্ষা প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিত। তখন হইতে আমরা আবাল্য ভয়ের বস্তু গুরুজনসহবাসের মধুরতা ও উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম।

একদিন সেই পুরাণো কথার চর্ব্বিত চর্ব্বণ হইতেছিল; আমাদের আলোচনা চলিতেছিল, জীবনের প্রতিমুহূর্ত্তেই ত বহু পরিচিত ও অপরিচিতের সহিত আঁখি বিনিময় হইতেছে, কিন্তু কাহারো সঙ্গে চিত্ত বিনিময় হয় না কেন? মনের মধ্যে, আমাদের ভিতরে এমন কি চুম্বক আছে যে, যাহার আকর্ষণে সমধর্ম্মী বা সমকর্ম্মী ঠিকটী আকৃষ্ট হইয়া অন্তর স্পর্শ করে, কতদূরের কত অপরিচিত, অসম্ভাবিত ভাবে নিকটে আসিয়া পড়ে, কোন্ প্রয়োজনে কোন্ অলক্ষ্য কর্ম্মসূত্রবলে মানস-মাধবী নিজ সহকারকে চিনিয়া লইয়া বেড়িয়া ধরে?

এই আকর্ষণতত্ত্বের আলোচনায় যোগ দিয়া অরুণবাবু বলিলেন "এইরূপ মিলন আকস্মিক নহে, বহুপূর্ব্বে ইহার বীজ বপন হইয়া থাকে, পরে কখন দ্রুত ভাবে, কখন জন্ম জন্মান্তর ব্যাপিয়া, এই বীজ অঙ্কুরে ও লতায় গজাইয়া, তাহারি ফুলের মালা কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত হইয়া আমাদের কণ্ঠে শোভিত হয়। সাধারণতঃ সহধর্ম্মী ও সহকর্ম্মী ও সমভাবের ভাবুকের সহিতই মিলন হয়, আবার কখনো ইহার বিপরীত ভাবেও হয়, কেননা আমাদের মিলন হয়, সখ্য ভাবে নয় বৈর ভাবে;

হয় রাগ বা অনুরাগে, নয় দ্বেষ বা বিরক্তিতে ; উভয়েতেই মিলন হয় সত্য কিন্তু সখ্যভাব না থাকিলে মিশ্রণ হয় না—আর এই মিশ্রণের পূর্ব্বরাগই আকর্ষণ। বৈরভাবেও দৃঢ়মিলন হয় সত্য এবং তাহাতে হয়ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সূত্রেও আসিতে হয় এবং হয়ত তার ঘাত প্রতিঘাত খুব তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয় ও তাহার ছাপ সময়ে সময়ে আজীবন অঙ্কিত রহিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না, কিন্তু সখ্য ভাবের বিনিময় যদিও কখন কখন উদ্দাম ধীর তথাপি তাহা স্থায়ী। প্রতি চিন্তায় ও কার্য্যে আমাদের মুহুর্মুহু ভাব বিনিময় ঘটিতেছে, কর্ম্মজ ফলের দান প্রতিদান ঘটিতেছে কিন্তু তার কোনটী দুদিনেই লয় পাইতেছে, আবার কোনটী অনুকূল বা প্রতিকূল কর্ম্মের ডোরে বাঁধন বাঁধিয়া দিতেছে। কর্ম্মের অলংঘ্য নিয়মে দূরদুরান্তরের জীবকে নিকটে আনিয়া ফেলিতেছে আবার কর্ম্মাবসানে ছিন্ন তুষারের ন্যায় দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া নূতন বাঁধনে জড়াইয়া যাইতেছে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে কি সূত্রে কাহার কর্ম্মের বীজ কোথায় রোপিত হইয়া, কি করিয়া কোথায় মুকুলিত হয় তাহা কর্ম্মসূত্র দৃষ্টি ব্যতিরেকে বুঝিয়া উঠা দুষ্কর, তাই কবি বলিয়াছেন,

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে
কে কোথা পড়ে ধরা কে জানে।

ইহারই ব্যাপক অর্থে, ভগবান বলিয়াছেন 'কর্ম্মনা গহনো গতি' জটিল মানবধর্ম্ম এই জটিলতম কর্ম্মসূত্রে গ্রথিত বলিয়াই ঋষি বলেন 'ধর্ম্মস্য তত্ত্বম্ নিহিতম্ গুহায়াম্'।

যে যত গভীর ও বিস্তৃতভাবে কর্ম্মের ডোর ছড়াইয়াছে, তাহার কার্য্যক্ষেত্রও তত গভীর ও ব্যাপক, তার শত্রু-মিত্রের সংখ্যাও সেই অনুপাতে অধিক, এই সকল কারণে লোকনায়ক ও বিখ্যাত জনগণের

কার্য্যক্ষেত্র বহুপ্রসারিত। এইজন্য কর্ম্মমুক্ত মহাপুরুষগণের কার্য্য কখনো সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে না, তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রও অনন্ত ও জগৎব্যাপ্ত, যখনই কোন মহাপুরুষ আসিয়াছেন, তাঁহারা তখনকার ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গত গণ্ডীর অতীতে রহিয়া গেছেন। রাগদ্বেষে কর্ম্মবন্ধন বিস্তৃত হয়, কিন্তু রাগদ্বেষের অতীত বলিয়া তাঁহাদের নিকট শত্রুমিত্র সকলই সমান। মহাপ্রভু যখন আসিয়াছিলেন, তখন দুর্দ্দান্ত জগাই মাধাইকে যে ভাবে কোল দিয়াছিলেন আবার সামান্য হরিতকী সঞ্চয়ের জন্য প্রিয়তম অনুচরকে তেমনি অনুযোগ করিয়াছিলেন। এই যে আমরা এতগুলি বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন ভাবাপন্নের মধ্যে একতার আবেগ অনুভব করিতেছি, তাহা কর্ম্মজ ; জন্ম জন্মান্তর কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে পরিচালিত হইতেছি। বিগত জন্মেও আমরা মিশিয়াছিলাম, কাহারো সহিত গুরুশিষ্য ভাবে, কাহারো সহিত ছাত্রশিক্ষকরূপে, কেহ বা এক সংসারে ভ্রাতৃভাবে বা একই কালে বয়স্যরূপে কতকটা এমনই মিশিয়াছিলাম। কর্ম্ম-বন্ধন যে অচ্ছেদ্য তাহা জানিলে বিস্মিত হইতে হয়, আমি গত জন্মে এমন এক কর্ম্মসূত্রে জড়িত হইয়াছিলাম যে, তাহার ঋণ পরিশোধ করিতেই হইবে। তোমরা শুনিলে হয়ত সব কথা বিশ্বাস করিবে না, কিন্তু তবু বলিতেছি,—

সেবারে আমি তাম্র মঠান্তর্গত দীক্ষিত সন্ন্যাসী ছিলাম। প্রয়াগে আমার আশ্রম, তথায় ১০।১২টী শিষ্য ছিল ; তন্মধ্যে এক জনের নাম কালীচরণ। কালীচরণ যুবক।

একদিন কালীচরণের মুখে বিশেষ ভাবান্তর লক্ষ্য করিলাম—সে, মধ্যে যেন কতকটা অন্যমনস্ক হইয়াছিল কিন্তু প্রথমটা তত মনোযোগ দিই নাই। অন্তর্দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম সে ভাবান্তর প্রণয়সম্ভূত কিন্তু যুবক ব্রহ্মচারী তথাপি প্রাণপণে আত্মসংযমের চেষ্টা পাইতেছে। দেখিয়া শঙ্কিত,, বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম।

শঙ্কিত ও বিস্মিত হইলাম ব্রহ্মচারীহৃদয়ে প্রণয়সঞ্চারে, আর আনন্দিত হইলাম তাঁর আত্মদমনের আন্তরিক চেষ্টায়।

অবশেষে অপর দুই জন শিষ্যকে কারণানুসন্ধানে নিযুক্ত করিলাম; তাহারা সংবাদ দিল যে, আমাদের আশ্রমের অনতিদূরে, সমৃদ্ধ নাগরিক গিরিধারী সিংহের বালিকা কন্যার প্রতি সে আসক্ত হইয়াছে। অনেক সময় কালীচরণকে, গিরিধারী সিংহের উন্নত অট্টালিকার দ্বিতলস্থ ক্ষুদ্র বাতায়নের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্কভাবে থাকিতে দেখা গিয়াছে। বালিকাও বোধ হয় অনুরাগিনী হইয়াছিল।

আত্মসংযমের চেষ্টা পাইতেছিল বলিয়া নবীন সাধকের বিশেষ কিছু দোষ দেখিলাম না, কেন না মানবচিত্ত সাধারণতঃ দুর্ব্বল ও প্রবৃত্তির দাস, অথবা ইহা তখন তাহার পক্ষে বিধিলিপি। কিন্তু এ অবস্থায় কি করা উচিত তাহা ঠিক করিতে পারিলাম না, যতবার তার ভবিষ্যৎ দেখিবার চেষ্টা পাইলাম, ততবারই আকাশতত্ত্ব জাগিয়া উঠিল। তখন দুইটী মাত্র উপায় ছিল :—এক উপায়, দার-পরিগ্রহের অনুমতি দিয়া পুনরায় সংসারে পাঠান, কিন্তু সামান্য প্রবৃত্তির সম্মুখে এত শীঘ্র বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা যুক্তিযুক্ত মনে হইল না। দ্বিতীয় উপায় প্রাণপণ চেষ্টায় ভগবানকৃপা দ্বারা হৃদয় হইতে প্রণয়ের বীজ একেবারে উন্মূলিত করা; ইহাই সদ্‌গুরুর কার্য্য। বিশেষতঃ জন্মাজন্মান্তরীণ কর্ম্মসাফল্যে যে জীব একবার ব্রহ্মচর্য্যের পথিক হইয়াছে, সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া সন্ন্যাসাশ্রমের প্রতি উৎসুক হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় সংসার গতাগতি-পথে ফিরিতে দেওয়া অনুচিত। এইরূপ ভাবিয়া তাহাকে লইয়া কিছু দিনের জন্য দূরযাত্রা করিয়া বিঠুরের জঙ্গলে এক পরিত্যক্ত কুটীরে আশ্রয় লইলাম। উদ্দেশ্য, এই নির্জ্জনতায় ও প্রাকৃতিক গাম্ভীর্য্যে, ক্রমাগত ধ্যান, ধারণা ও স্তবস্তুতিতে বৈরাগ্যের দ্রুত বিকাশ হইবে। আমিও যথাসাধ্য আত্মশক্তির প্রয়োগ করিলাম।

এক দিন সন্ধ্যার সময় তাহাকে বলিলাম, আমি আজ চারি প্রহর পূজায় থাকিব, দেখিও যেন কোন বিঘ্ন না হয়। কিন্তু প্রথমেই বাধা; বহু চেষ্টার পর আসন শুদ্ধি করিয়া পূজায় বসিয়া বারম্বার চিত্তবিক্ষেপ হইতে লাগিল, আমিও বারম্বার দৃঢ়প্রযত্নে আত্ম-নিবেদনের চেষ্টা পাইতে লাগিলাম, কিন্তু বারম্বার চিত্তচঞ্চল হইতে লাগিল; অবশেষে মধ্যরাত্রে অসমাপ্ত অবস্থায় উঠিয়া পড়িয়া দেখিলাম, কুটীর দ্বার উন্মুক্ত। কিন্তু কালীচরণকে দেখিতে পাইলাম না, বারম্বার ডাকিয়াও সাড়া না পাওয়ায় কুটীরের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, কালীচরণ বহুপূর্ব্বে গতাসু হইয়াছে, তাহার বিষজর্জ্জরিত নীলাভ স্থূলবাস, একটী মৃতপ্রায় বিষধর সর্পকে বজ্র মুষ্টিতে ধরিয়া, চিরশায়িত রহিয়াছে।

সমস্ত বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম পূজার সময়, গৃহমধ্যে কোন উপায়ে এই বিষধরের আগমন হইয়াছিল, কিন্তু গুরুর ধ্যানভঙ্গের আশঙ্কায় ব্যাকুল ভক্ত শিষ্য সাহস করিয়া তাহাকে তাড়াইতে পারে নাই, যদি আমার উপর লাফাইয়া পড়ে, অথচ আশ্রমে জীবহিংসা করিতেও প্রবৃত্তি হয় নাই। অবশেষে তাহাকে ধরিয়া কুটীরে বাহিরে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা পায়, কিন্তু প্রেমজ চিত্তবিক্ষেপে পূর্ব্বেই তার ব্রহ্মচর্য্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, কাজেই বিষধর নিস্তেজ না হইয়া প্রাণপণে তাহাকে দংশন করিয়াছিল। পাছে তার মৃত্যু-যাতনায় আমার ধ্যানভঙ্গ হয় এই ভয়ে দূরে চলিয়া গিয়া সমস্ত জ্বালা নীরবে সহ্য করিয়াছিল; বোধ হয় মনে মনে মৃত্যু-কামনাও করিয়াছিল। অবিমৃষ্যকারিতার জন্য নিজেকে শতধিক্কার দিতে লাগিলাম। যদি ব্যক্তিগত সাধনার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতাম, তাহা হইলে পূর্ব্বাহ্নে কিছু না কিছু আভাস পাইয়া হয়ত কোন প্রতিবিধান করিতে পারিতাম, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না। বুঝিলাম স্বার্থপর আমি, এখনো মায়ামোহজড়িত,

সন্ন্যাসে প্রকৃত অধিকার হয় নাই কিম্বা গুরুর কার্য্যও করিতে পারি নাই।

প্রণয়সঞ্চারযুক্ত যুবক-যুবতীর অকাল চিরবিচ্ছেদ ঘটাইয়া নিজ অবিমৃষ্যকারিতায় যে ঋণ অর্জ্জন করিলাম, ইহার একদিন কড়ার গণ্ডায় হিসাব করিয়া পরিশোধ করিতে হইবে। আজিও তাহার শোধ হয় নাই। আমরা এতক্ষণ স্তব্ধ রহিয়া নীরবে এই অপূর্ব্ব করুণ কাহিনী শুনিতেছিলাম। অন্য সময়ে বা অন্য কেহ বলিলে ইহাকে গাঁজাখুরি, আজগুবি বা থিয়সফি বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম, কিন্তু জিতেন্দ্রিয়, নির্ম্মলচরিত্র, সত্যবাক্, যশোলিপ্সাহীন অধ্যাপকের একটা কাল্পনিক গল্পকে সত্য বলিয়া প্রচারিত করায় কোন উদ্দেশ্যই দেখিতে পাইলাম না।

ভগবতী দয়াল প্রশ্ন করিল 'ইহজন্মে কালীচরণের কোন সন্ধান পাইয়াছেন কি ?

অরুণ। সে কথা শুনিয়া কি হইবে। তবে জানিয়া রাখো যে আমাদের এ সম্মিলন জন্মান্তরব্যাপী।

সে রাত্রিতে মস্তিষ্কে এক অভাবনীয় চিন্তা তরঙ্গ লইয়া আমরা বাড়ী ফিরিলাম,—পথে কাহারো সহিত কাহারো বাক্যালাপ হইল না।

সে বৎসর বারাণসী-ধামে যখন কলেরার প্রকোপ চাগিয়া উঠিল, তখন গ্রীষ্মাবকাশ। বিশ্বনাথের এলাকায় কালভৈরবের অকাল তাণ্ডব নৃত্যে ও দণ্ডপাণির তাড়নায়, প্রবাসী মাত্রই যথাসম্ভব দেশে ফিরিয়াছে, বিশাল বোর্ডিং হাউস জনশূন্য।

এক দিন সকালে আমাদের বাড়ীতে, আমি হীরানন্দ, পঙ্কজকুমার প্রভৃতি কলিকাতা যাইবার ও তথাকার অন্যান্য programme ঠিক করিতেছি, এমন সময় সংবাদ আসিল যে শেষ রাত্রে বিনোদের কলেরা হইয়াছে, রোগ গুরুতর।

আমরা তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গেলাম, আরো দু একজন সহাধ্যায়ী আসিয়া উপস্থিত হইল, স্থানীয় রামকৃষ্ণ মিশন হইতে দুই জন দক্ষ শুশ্রূষাকারী আসিল; সুতরাং সেবা, যত্ন ও ঔষধ কিছুরই ক্রটী হইল না। রোগ তখন পূর্ণবলে সমগ্র দেহকে আক্রমণ করিয়াছে, বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথী ডাক্তার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁর ঔষধেও উপকার হইতেছিল, কিন্তু কিছুতেই কোন উপসর্গের স্থায়ী উপশম হইল না। তিনি চিন্তিত হইয়া বলিলেন, জেন গিরিরাজ! সোমবারের ভোরের কলেরা, ইহাতে রক্ষা পাওয়া দুর্ঘট। যদিও ইহা এক প্রকার কুসংস্কার ও মূলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই, কিন্তু সোম শুক্রের ভোরের কলেরায় একটীও বাঁচিতে দেখি নাই। ডাক্তার বাবুর আর্সেনিক, ভেরেট্রম প্রভৃতি চলিতে লাগিল; প্রাচীনা পল্লীমহিলা-সংগৃহীত পঞ্চক্রোশী কাশীর আপ, উপ, প্রভৃতি উপসর্গসমেত সমস্ত দেবদেবীর চরণামৃত, পূজায় পুষ্প ও বিল্বপত্র, প্রাচীনগণ কর্তৃক সংগৃহীত যজ্ঞের ভস্ম, সাধুর কবর, প্রভৃতি সম্ভব অসম্ভব, অপ্রাপ্য, সুপ্রাপ্য ও দুষ্প্রাপ্য যাহা কিছু যথারীতি ক্রমোবিকাশ পদ্ধতিতে রোগীর অধর, বক্ষ ও মস্তক স্পর্শ করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইতেছিল না, 'তরী টলমল করে, যেন অশান্ত মাতাল।'

দাস্ত, বমন, অন্তর্দ্দাহ, তৃষ্ণা ও ছটফটানিতে ক্রমাগত অধিকতর কাতর ও দুর্ব্বল করিয়া দিতে লাগিল।

এক একবার যখন, তাহার বিশীর্ণ, শুষ্ক মুখ ও কোটরগত নিস্তেজ চক্ষু দিয়া আভ্যন্তরিক যাতনা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, দারুণ তৃষ্ণা ও অন্তর্দ্দাহে ছটফট করিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে খাল ধরাইয়া, নিরক্ত অস্থিচর্ম্মসার শরীরের উপর মরণের খেলা খেলাইতেছিল এবং হয়ত সে নিজেই অপূর্ণ লালসা, অতৃপ্ত পিয়াসা বুকে লইয়া নবীন যৌবনে আসন্নমৃত্যুর কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল, তখন সে

ঘরে স্থির চিত্তে থাকা আমাদের কষ্টকর হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই, আবার বলপূর্ব্বক মনকে সান্ত্বনা দিয়া নিজ নিজ কার্য্য করিতে লাগিলাম।

বিনোদের শ্বশুর চিন্তাকুল বিরস বদনে বাহিরে বসিয়াছিলেন ও মধ্যে মধ্যে ঘরে আসিয়া রোগীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইতেছিলেন; তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী ও অন্যান্য মহিলা দরজার ফাঁক দিয়া মধ্যে মধ্যে একবার করিয়া দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত দেবতার উদ্দেশ্যে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। আর দুইটী তৃষিত সজল চক্ষুও বোধ হয় দূর হইতে গৃহমধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছিল।

আমাদের অভিভাবকেরা আসিলেন ও আমাদের বিরলে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন 'আহা ভগবান এমনও করেন, আমরা শুনিয়া অবধি যে কি পর্য্যন্ত চিন্তিত হইয়াছি তাহা একমাত্র অন্তর্য্যামীই জানেন। আহা বিনোদ ছেলেটী সকলেরই প্রিয়, সকলেই আমরা এজন্য বাবা বিশ্বনাথকে কাতরভাবে জানাইতেছি, বাবা কি এত লোকের প্রার্থনায় মুখ তুলিয়া চাহিবেন না। আর তোমরাও সাধ্যমত বন্ধুর কার্য্য করিতেছ, বিপদের সময় উপকার করাই ত মহত্ত্ব। করিবে বই কি আমরাও আমাদের সময় ঐরূপ করিতাম।

তবে কি জান, কলেরা রোগটা বড়ই খারাপ, তোমাদের নিজেদের শরীরও ত দেখা চাই, তোমাদের হইলে আবার কে দেখিবে, একটু তফাতে ও সাবধানে থাকা ভাল তা ছাড়া লোকেরও ত অভাব নাই।' ইত্যাদি।

অবশ্য এইরূপ নিঃস্বার্থ দুর্লভ উপদেশের বহুমূল্যতা অবধারণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, কাজেই কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া আবার রোগীর শিয়রে আসিয়া বসিলাম।

অপরাহ্নে হিক্কা দেখা দিল, তখন ডাক্তার ও অরুণবাবুর সহিত

পরামর্শ করিয়া চিকিৎসার পরিবর্ত্তন করা হইল। ডাক্তার কিন্তু বলিলেন চব্বিশ ঘণ্টার সময় অর্থাৎ রাত্রি ৩।৪ টার সময় ক্রাইসিস (crisis) আসিবে, তখন রক্ষা হওয়া দুষ্কর।

অ্যালোপ্যাথী ডাক্তারেরা উপর্য্যুপরি দুইবার injection করিয়া যখন রাত্রি দশটার সময় hopeless বলিয়া চলিয়া গেলেন, তখন কবিরাজ ডাকা হইল।

কবিরাজ আসিয়া নাড়ী দেখিয়া ও বচন শুনাইয়া, রোগ উপসর্গ, লক্ষণ ও রোগীর অবস্থা হুবহু মিলাইয়া দিলেন, কিন্তু ঔষধগুলি যে বচনের ন্যায় হুবহু মিলিয়া গিয়া ক্রিয়া করিবে, সে বিষয়ে নিজেই সন্দিহান। ঔষধ দিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে প্রথম চারিটী বটিকা যেন যথা সময়ে খাওয়ান হয়, এবং হইাতেও উপশম না হইলে শেযোক্ত বিষৌষধি যেন পান করান হয়। আমাদের ঔষধ একবার ধরে ত আধঘণ্টার মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিবে, নহিলে শেষ রাত্রে অবস্থা বিশেষ সঙ্কটাপন্ন হইবে।

কবিরাজ চলিয়া গেলেন। এমন সময় হঠাৎ পার্শ্বস্থ দরজা খুলিয়া একটা যুবতী বসন ভূষণের প্রতি কিছুমাত্র দৃকপাত না করিয়া আলুলায়িত কেশে ছুটিয়া আসিয়া অরুণবাবুর পা দুটী সবলে জড়াইয়া ধরিল।

মুহূর্ত্তসঞ্জাত এই আকস্মিক কার্য্যে আমরা প্রথমতঃ কতকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলাম, পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া বুঝিলাম, সে কমলা, বিনোদের স্ত্রী।

বিহ্বল, সংত্রস্ত অরুণ বাবু ধীরে ধীরে পা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টায় বিফল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে মা তুমি? এখানে অসেছ কেন? তোমার যদি কিছু বলবার থাকে ত বাড়ীর ভিতর গিয়ে বলে পাঠাও, আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

বালিকা কোন উত্তরই দিতে পারিল না, কেবল পা দুটী ধরিয়া নীরবে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অরুণবাবু পুনরায় বলিলেন, 'কিমা ? তোমার কি বলবার আছে বল, তাতে কিছু মাত্র লজ্জা করো না।' বালিকা কম্পিত কণ্ঠে জড়িত স্বরে বলিল 'বাবা আপনি ভিন্ন এ বিপদ হতে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না, আপনাকে রক্ষা করিতেই হবে।'

সঙ্কুচিত অরুণবাবু বলিলেন 'মা! জীবন মরণের উপর সামান্য মানুষের কি হাত আছে, দেবতারাও বোধ হয় সব সময় রোধ করিতে পারেন না, আমার মত সামান্য লোক ত কোন ছার। পুরাণে সতী সাবিত্রীর কথা ত পড়েছ, যে একমাত্র সতী স্ত্রীই চেষ্টা করলে বাঁচাতে পারেন। তোমার যদি যথার্থ স্বামীভক্তি থাকে ভগবানকে ব্যাকুল হয়ে আন্তরিক ভাবে ডাকতে পার, তাহলেই ভগবান মুখ রক্ষা করবেন, নহিলে অন্য উপায় নাই, তাছাড়া যখন প্রাণপণে চিকিৎসা চলছে তখন এত উতলা হচ্ছ কেন ?

কমলা। কেন বাবা, বৃথা স্তোক দিচ্ছেন, এখন বেশ বুঝছি যে চিকিৎসায় আর আশা নেই ; সমস্তদিন ভগবানকে ডেকেছি কিন্তু কই তিনি ত দয়া করলেন না—আর যে কোন ভরসা পাচ্ছি না!

বালিকা পুনরায় ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অরুণ। ভুল বুঝছ মা! আসল জিনিস ভগবানকে ছেড়ে সামান্য নকল মানুষকে ধরে কি উপকার হবে ?

কমলা। না বাবা আমি শুনেছি আপনি একজন মহাপুরুষ, আপনি ভিন্ন আর কাহারো দ্বারা কোন উপায় হবে না ; আপনি দয়া করে অভয় না দিলে আমি কিছুতেই ছাড়ব না, নহিলে আত্মহত্যা করব।

নিরুপায় অরুণবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে

বলিলেন, যাও মা নিশ্চিন্ত থাক, আমি অভয় দিচ্ছি, বিনোদের কোনরূপ প্রাণের আশঙ্কা নাই।

বালিকা আশ্বস্ত হইয়া, অরুণ বাবুকে প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি লইয়া, রোগীর দিকে একবার চকিত কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল।

এতক্ষণ আমরা চিত্রার্পিতের মত যেন অভিনয় দর্শন করিতে ছিলাম। জনপূর্ণ কক্ষ যেন নিশীথ রাত্রির অরণ্যানীর মত নির্জ্জনতাময় হইয়াছিল, রোগ ও যেন এই সময়ের জন্য তাহার দানবীয় অত্যাচার ভুলিয়া এ দৃশ্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল।

বাসায় যাইবার সময় অরুণ বাবু বলিয়া গেলেন যে, আমার বোধ হয় এখন বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যাইবে, তাহা হইলে বিষৌষধি সেবনের কোন প্রয়োজনই হইবে না। তবে যদি বাড়াবাড়ি দেখ ত আমাকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দিতে কিছুমাত্র আলস্য করিও না।

রোগীর পরমায়ু ছিল বলিয়াই হৌক, কিম্বা কবিরাজের ঔষধে বা অরুণ বাবুর আশীর্ব্বাদেই হৌক, রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হইতে লাগিল ও রাত্রি নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

সুন্দর সৌরকরোজ্জ্বল প্রভাত পূর্ব্বদিনেরি মত হাসিতে হাসিতে উদয় হইল। পূর্ব্বদিনেরি মত আমরাও হাসিতে হাসিতে দিবালোক সন্দর্শন করিলাম, কিন্তু পূর্ব্ব দিনেরি মত, বিধাতার কি যে অভিসম্পাত গোপনে লুকাইয়াছিলেন, তাহা তখনো বুঝিতে পারি নাই—প্রভাত হইতে না হইতে সংবাদ আসিল শেষ রাত্রে অরুণ বাবুর কলেরা হইয়াছে; অবস্থা সঙ্কটাপন্ন!

উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাইয়া দেখি, তাঁর অন্যান্য বন্ধু বান্ধব আসিবার ও চিকিৎসার সাহায্য প্রাপ্তির পূর্ব্বেই মহাপুরুষ হেলায় তাঁহার পার্থিব স্থূলবাস পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের জন্মের মত

কাঁদাইয়া সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। কেবল তাঁহার সুকোমল স্থূলশরীর চিরশয়ান রহিয়াছে। দেহে কোথাও অন্তিম যাতনার চিহ্ন, কোন বিকৃতি নাই, গৃহে দুর্গন্ধ নাই, যেন সুষুপ্তির শান্তিতে নিমিলিত নেত্র।

* * * *

যখন তাঁহার অগুরু চন্দন ঘৃত সজ্জিত চিতার লেলিহমান অগ্নি-শিখা পূতগন্ধ বিস্তার করিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছিল, তখন কত কথাই মনের মধ্যে জাগিতেছিল। কত পুরাতন কথা, কত সুখময় পুরাণ-স্মৃতি, সেই আন্তরিক সহৃদয়তা পূর্ণ শিক্ষারাশি সকলেই এক সঙ্গে ছুটিয়া আসিয়া বিদ্রোহী মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল মহাপুরুষ বুঝি এই চিতারই ন্যায় উজ্জ্বল, পবিত্র ও তেজোময় ছিলেন, বুঝিবা এই চিতারই ন্যায় ধুপের মত নিজে জ্বলিয়া পুণ্য-সৌরভ বিলাইয়া গেলেন। এত ভাবিতেছিলাম, কিন্তু কাহারো সহিত একবারও মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারি নাই। তখন চিতা যেন কাণের কাছে হু হু করিয়া বলিতেছিল,—

পার যদি এইরূপ হেসে চলে যাও
ধুপেরি মত পূত সৌরভ বিলায়ে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

চক্রাবেশ।

হাওড়া জেলায় বালীগ্রামে শ্রীযুক্ত বিভূতিরঞ্জন গোস্বামী মহাশয়ের বাটীতে একটী ১৪।১৫ বৎসর বয়স্ক বালককে মাধ্যমিক (Medium) করিয়া ১০।১২টী আত্মা আহ্বান করি। তন্মধ্য হইতে মাত্র পাঁচটী আত্মার কথাই সংগ্রহ করা হইয়াছিল। বিভূতিবাবুর কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুবোধরঞ্জন গোস্বামী মহাশয় ঐ সব কথা লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কয়েকটী আত্মা আহ্বান করিবার পর ভক্ত কবি স্বর্গীয় রামপ্রসাদ সেন মহাশয়ের আত্মা আহ্বান করি। মাধ্যমিকের অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। তখন প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলাম।

প্রঃ। আপনি রামপ্রসাদ সেন ?

উঃ। হাঁ।

প্রঃ। একটা মায়ের গান ক'রবেন ?

উঃ। বাধা কি ! কোন্ গানটা গাইব ?

প্রঃ। যেটা আপনার ইচ্ছা !

উঃ। বেশী নয়, নূতন একটা গান গাইব। খুব ছোট গান, চার লাইন মাত্র।

প্রঃ। তা হউক।

তখন দেহাশ্রিত আত্মা ভক্তি গদগদ কণ্ঠে, অশ্রুজলে গণ্ড ভাসাইয়া গান ধরিলেন। জীবনে পাঁচ শতেরও অধিক আত্মা আহ্বান করিয়াছি, কিন্তু এমন শান্তি ও এমন আনন্দ কাহারও আগমনেই পাই নাই। মহাপুরুষের ক্ষণিক অবস্থানেই কত আনন্দ পাইলাম, যদি তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় চখের সম্মুখে দেখিতে পাইতাম ও তাহার ভক্তিভরা

সঙ্গীত লহরী কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত, জানি না সে দিনের অবস্থা কেমন হইত। আমরা ১০।১২ জন লোক সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সকলেই যেন কেমন একটা নূতনতর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, আত্ম-হারা হইয়া গেলাম। আমাদের মধ্যে অনেকেরই নয়ন কোণে অশ্রু দেখা দিল। আর মহাপুরুষ প্রাণের ব্যাকুলতায় গাহিতে লাগিলেন।

আমার মা যে মুক্তকেশী।
আমি সদাই ও তাঁর চরণে দোষী॥
নবীনানন্দে গৃহে বন্দী,
বল মা কিসে হই গো সুখী,
ও সেই উষার কোলে শরৎ চন্দ্র,
হাস্‌ছে সে যে দিবা নিশি॥
(রামপ্রসাদী সুর)

প্রঃ। ব'ল্‌তে পারেন মাকে লাভ ক'র্ত্তে পারব কি না ?

উঃ। তা' কি বল্‌তে পারি, আপনার ভক্তি থাকে ত পারবেন!

প্রঃ। আপনি ত' মাকে পেয়ে বসে আছেন ?

উঃ। পেয়েছি সামান্য, তবে পাব।

প্রঃ। কত দিনে পাবেন ?

উঃ। ঢের দেরী।

প্রঃ। আপনার আর জন্ম হবে ?

উঃ। আমি আর যাব না! সংসারে ঢের জ্বালা।

প্রঃ। আমি কি আর না এসে পারব ?

উঃ। মায়া কি কাটাতে পারবেন, বড়ই মায়াতে জড়িত হ'য়ে আছেন।

প্রঃ। আপনাকে আর কখনো পাব ?

উঃ। অনুগ্রহ ক'রে ভাবলেই পাবেন। তা হ'লে এখন আসি। মাপ ক'রবেন, নমস্কার।

এই বলিয়াই আত্মা প্রস্থান করিলেন। আমরাও সে দিনকার মত সভাভঙ্গ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা করিলাম।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী।

মৃতের আগমন।

আমাদের গ্রামের দক্ষিণে সুলতানপুর নামক একটী গ্রাম আছে। উক্ত গ্রামের সমস্ত অধিবাসীই মুসলমান। তন্মধ্যে কয়েকঘর ভদ্র। সেখ হেরাজতুল্লা খোন্দকার তাহাদের অন্যতম। কিন্তু অবস্থাহীনতা প্রযুক্ত সে পরিবার একেবারে অশিক্ষিত। সেই জন্য তাহাদের আচার ব্যবহারে ও কথা বার্ত্তায় সম্পূর্ণ অসভ্যতা বর্ত্তমান। গত আষাঢ় মাসের ১৫ই তারিখ রাত্রে জ্বর বিকারে হেরাজের মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র নাই; স্ত্রী, একমাত্র কন্যা ও কন্যার ২টী সন্তান লইয়া তাহার পরিবার। হেরাজের মৃত্যুর পরে তাহারা সকলে এক ঘরের মধ্যে শয়ন করিত। এইরূপে আট দিন গত হইল; অষ্টম দিনের রাত্রিতে প্রায় ২টার সময় হেরাজের স্ত্রী শৌচাদি কার্য্যের উদ্দেশ্যে গৃহের বাহির হয়; বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে নামিবার সময় দ্বারের দক্ষিণ দিকে তাহার দৃষ্টি পড়ে। সে দেখিল যে, তাহার স্বামী দেওয়াল ঠেস দিয়া পশ্চিম মুখ হইয়া বসিয়া আছে, তাহার গায়ে একখানি সুচ্‌নী। এ প্রদেশে মুসলমান সাধারণ কাঁথা কে সুচ্‌নী বলিয়া থাকে। পীড়ার সময়ে হেরাজের গায়ে ঐ প্রকার এক খানি সুচ্‌নী ছিল।

স্ত্রীলোকটী ঐ প্রকার দেখিয়া গৃহমধ্যস্থ তাহার নিদ্রিতা কন্যাকে আহ্বান করিল। সে আসিলে তাহার মাতা তাহাকে বলিল, "হাদে ভাখ তোর জামাই বসে রয়েছে"। এদেশীয় অশিক্ষিতা স্ত্রী লোকে সন্তান সন্ততির নিকট স্বামীর কোন প্রকার পরিচয় দিতে হইলে "তোদের জামাই" বলিয়া থাকে। মাতার কথা শুনিয়া কন্যা সেই দিকে তাকাইয়া তাহার পিতাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাব্‌জি ভাল'ত" ?

মৃত। হ্যাঁ, ভাল, আমার জন্নি তোরা কিছু পড়ান শুনান কচ্ছিস।

কন্যা। হ্যাঁ, ছোটামিয়ার দ্বারা কোরাণ পড়ান হচ্ছে, ও জুম্মায় মুছাল্লির দিয়া লাখ (লক্ষ) কল্‌মা পড়ান হচ্ছে।

এখানকার মুসলমানগণ মৃত্যুর পরে সদ্গতির জন্য কোরাণ পাঠ ও জুম্মায় কলমা পাঠ ইত্যাদি করে. তদ্ভিন্ন অন্য প্রকার শ্রাদ্ধ, কি কোন অশৌচগ্রহণ করে না। ইহার ভাল মন্দের দায়ী আমি নহি, যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিলাম। জীবিত কালে হেরাজের হস্তে একপ্রকার ক্ষত হয়, সে ক্ষত আরোগ্য হইয়াছিল। কিন্তু একটী কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন ছিল, হস্তের সেই চিহ্নের দিকে দৃষ্টি পড়ায় কন্যা জিজ্ঞাসা করিল, বাব্‌জী তোর হাতে কি ?

মৃত। না, কিছু না।

কন্যা। না, ঐ যে হাতে কি দাগ মত দেখ্‌ছি ?

এই কথা শুনিয়া মৃতব্যক্তি হাত খানি সুচ্‌নীর মধ্যে লুকাইয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে—তাহার মৃতদেহ কবর দিবার সময়, কবরের নিকট যে একটী কুলতলায় স্নান করাইয়া ছিল—সেই কুল-তলায় গিয়া কুলগাছ ঠেস দিয়া বসিল। মাতা ও কন্যা মুগ্ধবৎ তৎসহ গমন করিয়াছিল। তাহারা সেইখানে গিয়া যখন দাঁড়াইল, সেই সময়

উত্তর দিকে বাঁশ বন হইতে একটী ভয়ানক শব্দ হইল। মাতা ও কন্যা সেই শব্দে চমকিত হইয়া সেই দিকে লক্ষ করিল। তার পরমুহূর্ত্তে দেখিল, কুলতলা শূন্য, কোন স্থানে কেহ নাই, রাত্রি নিস্তব্ধ, তাহারা ভীত হইয়া গৃহমধ্যে গমন করিল। তাহারা বলে যে, প্রথম যে সময় মৃত ব্যক্তিকে দেখিয়াছিল, তখন যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে, ইহা তাহাদের আদৌ মনে হয় নাই। কিন্তু বাঁশ বনের ভীষণ শব্দ ও কুল তলা শূন্য দেখিয়া তাহাদের স্মরণ হইল যে, হেরাজের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর কথা স্মরণ হইবামাত্র মাতা ও কন্যা উভয়ে অতিশয় ভীত হইয়াছিল। সেই দিনের পরে আজ পর্য্যন্ত আর কেহ কিছু দেখিতে পায় নাই।

শ্রীপতিতপাবন রায়।

অপূর্ণ বাসনা।

স্বপ্নে প্রেত দর্শন।

আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে ক্রান্স নামে এক মহিলা বাস করিতেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁহার এক যুবতী কন্যার মৃত্যু হয়। পরবর্ত্তী এপ্রিলে অর্থাৎ প্রায় পাঁচ মাস পরে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। তৎকালে তাঁহার জামাতা বহুদূরে দাকোটা নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন। বৃত্তান্তটি তিনি এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন :—

শয়ন করিবার পর বোধ হইল যেন আমার দেহ হইতে আমি বাহির হইয়া যাইতেছি। আমার চক্ষু মুদ্রিত ছিল। আমি ঠিক বুঝিলাম, আমি যেন দ্রুতবেগে কোথায় যাইতেছি। চতুর্দ্দিক অন্ধকার, হঠাৎ দেখিলাম আমি একটি ঘরের মধ্যে আসিয়াছি। ঐ ঘরে একটি

শয্যার উপর আমার জামাতা চার্লি নিদ্রা যাইতেছে। তখন ঘরের আস্‌বাবগুলির প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলাম। সকলগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম। শয্যার শিরোভাগে যে চেয়ারখানি ছিল তাহার এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র অংশ ভগ্ন হইয়াছিল—তাহাও স্পষ্ট নয়নগোচর হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে দরজাটি খুলিয়া গেল এবং আমার প্রিয়তম কন্যা আলি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আস্তে আস্তে শয্যার উপর উঠিল, নিদ্রিত স্বামীর পার্শ্বে বসিল, এবং মুখটি অবনত করিয়া তাহাকে একবার চুম্বন করিল। ইহা চার্লি জানিতে পারিল এবং স্নেহভরে তাহাকে ধরিতে গেল। তখন আলি একেবারে তীরবেগে বাহিরে সরিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সে পুনরায় ঘরে আসিল (এইরূপ অনেক গুলি কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে)। অতঃপর আমার ইচ্ছা হইল যে, চক্ষুটি খুলি। কিন্তু ইহা এরূপ ভারি বোধ হইল যে, খুলিতে একটা প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইল। যাহা হউক অতি কষ্টে যেমন চক্ষু খুলিয়া ফেলিলাম, অমনি বোধ হইল যেন আমি একটা ভয়ানক আছাড় খাইলাম, যেন ছাত হইতে নীচে পড়িয়া গেলাম। এই ঘটনা বৃত্তান্ত বাটীর সকলকে বলিলাম এবং পর রবিবারই আমার জামাতাকে এই সম্বন্ধে এক পত্র লিখিলাম।

আমি যে দিন পত্র লিখিলাম ঠিক সেই দিনই চার্লিও আমাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্র পাঠ করিয়া আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। সে লিখিয়াছিল ঠিক ঐ রাত্রে ঐ ভাবে ঐরূপে সে আলিকে স্বপ্নাবস্থায় দেখিয়াছে। আলি আসিয়া শয্যায় বসিল, তাহাকে চুম্বন করিল, সে ধরিতে গেল, আলি পলাইল ইত্যাদি সমস্তই আমার অনুভূতির অবিকল অনুরূপ। ইহার পর সে লিখিল, "আপনি আমার শয়নকক্ষ ও আস্‌বাবের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে ঠিক মিলিয়াছে।"

নিদ্রাবস্থায় সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া প্রেতলোকে বিচরণ করিতে পারে এবং বহুদূরে গমন করিয়া অনেক বিষয় অবগত হইতে পারে—পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্ত হইতে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে।

বালক ভূত।

গোর বুথ নামে এক পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা লিখিয়াছেন "১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল বেলা সাড়ে নয়টার সময় আমার ছোট ভাই ও আমি রান্নাঘরে যাইবার জন্য সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলাম। সিঁড়ি হইতে নামিয়া একটা সরু গলি দিয়া রান্নাঘরে যাইতে হয়। আমরা যখন সিঁড়ির মাঝামাঝি আসিয়াছি, ছোট ভাই চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "দিদি, ঐ দেখ জন ব্লানি আসিয়াছে।" জন ব্লানি আমাদের একটি ছোকরা চাকর। কয়েক মাস পূর্ব্বে তাহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় সে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং সে যে হঠাৎ আসিবে আমার বিশ্বাস হইল না। আমি বলিলাম, "তুমি বোধ হয় আর কাহাকে দেখিয়াছ।" বালক উত্তর করিল "না, না। সেই ঐ দিকে ছুটিয়া গেল"—এই বলিয়া গলিটি দেখাইল। আমরা তাড়াতাড়ি নামিয়া গলি ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু ব্লানিকে পাইলাম না। দরজা বন্ধ ছিল সুতরাং বাহিরে যাইবারও কোন উপায় ছিল না। সে যাহা হউক রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আমরা পুনরায় উপরে আসিলাম। ছোট ভাই বলিল, "ব্লানিকে বড়ই রুগ্ন ও মলিন দেখিলাম। সে আমার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়াছিল কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্লানি কি করিতেছিল ?" বালক বলিল, "তাহার জামার হাতা গুটান ছিল এবং গায়ে একটা সবুজ চাপ্‌কান।"

দু'এক ঘণ্টা পরে আমাদের চাক্‌রাণী আসিলে আমি তাহাকে বলিলাম, "ব্লানি কতক্ষণ এখানে আসিয়াছে?" সে বিস্মিত হইয়া

বলিল, "সে কি? আপনি কি শুনেন নাই সে আজ প্রাতে মারা গিয়াছে?" আমরা অনুসন্ধানে জানিলাম যে, সেই দিন বেলা আন্দাজ ৭টার সময় রানি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিল।"

দিদিমার ঘড়ী।

জড্ নাম্নী এক ইংরাজ রমণী ১৮৮৫ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে লিখিয়াছেন:—

"আমার দিদিমার একটি ধর্ম্মঘড়ী (clock) ছিল। ইহা তিনি বিবাহের সময় উপহার পাইয়াছিলেন। স্বর্ণ রৌপ্য অপেক্ষা ইহা তাঁহার নিকট অধিক মূল্যবান্ ছিল—ইহাকে তিনি প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন। তাঁহার শয়নকক্ষে অধিক স্থান না থাকায় তিনি ঘড়ীটি আমাদের শয়নঘরে রাখিয়াছিলেন। দুই ঘর পাশাপাশি, মধ্যে এক দরজা ছিল। তাঁহার অনুরোধে আমরা এই দরজাটি সর্ব্বদা খুলিয়া রাখিতাম। তিনি রাত্রিকালে মধ্যে মধ্যে এবং প্রত্যহ ভোরে এই ঘড়ীটি দেখিয়া যাইতেন। অনেক দিন ভোর ৪টার সময় হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখিয়াছি, দিদিমা ঘড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

সে যাহা হউক, তিনি ৮৪ বৎসর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় তিন সপ্তাহ পরে অক্টোবর মাসে এক দিন অতি প্রত্যূষে আমার হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমার ভগিনীও আমার সহিত শয়ন করিত। সে যাক্, নিদ্রাভঙ্গে দেখি,—দিদিমা ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় ঘড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া ঘড়ী দেখিতেছেন। তাঁহার সেই দীর্ঘ শরীর, সেই স্থির গম্ভীর চেহারা, সেই কৃষ্ণবর্ণ বড় বড় চক্ষু—সমস্তই স্পষ্ট দেখিলাম। ভয়ে কয়েক সেকেণ্ড চক্ষু মুদিয়া রহিলাম। চক্ষু খুলিয়া দেখি তিনি ঠিক দাঁড়াইয়া আছেন। পুনরায় চক্ষু

বুঝাইলাম। এবার চক্ষু খুলিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। উপহাসাস্পদ হইবার ভয়ে একথা আর কাহাকেও বলিলাম না।

রাত্রিকালে যখন ঐ ঘরে শয়ন করিতে গেলাম, আমার ভগিনী আমাকে চুপে চুপে বলিল, "দেখ, একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। হাসিও না, কারণ ইহা প্রকৃত। আজ ভোরে দিদি-মাকে দেখিয়াছি" আমি বিস্মিত হইলাম। কোথায়, কিরূপে, কতক্ষণ সে দেখিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তখন সে যাহা যাহা বলিল, আমার অনুভূতির সহিত তাহার কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না।

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরী।

প্রেতের বাকশক্তি।

প্রেত অর্থে যাহারা স্থূল জগৎ হইতে প্রেরিত হইয়াছে তাহাদের বুঝায়, স্থূল জগৎ ত্যাগ করিতে হইলে স্থূল দেহ ত্যাগ করিতে হয়, ইহাকেই আমরা মৃত্যু বলিয়া থাকি। ভূত অর্থেও সেইরূপ যাহারা পৃথিবীতে আর বর্ত্তমান নাই, এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহাদের বুঝায়। ভূত মানে অতীত কাল, তাহা হইতে এই ভূত শব্দ মৃতব্যক্তি-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, মরিলে এই স্থূল দেহ আর থাকে না। তখন সূক্ষ্মদেহ হয়। সূক্ষ্মদেহে বাক্ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ কথা কহিবার উপযোগী স্বরযন্ত্র থাকে না, একারণ যেসকল প্রেত সাধারণতঃ স্থূল জগতে দৃশ্য হইয়া থাকে, তাহারা কেহই কথা কহিতে পারে না। কথা কহিতে পারে, এরূপ প্রেত অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম দেহধারী প্রেতকে, স্থূল দেহধারী মানবের দৃষ্টি গোচর হয় এরূপ দেহ ধারণ করিতে হইলে, তাহার সূক্ষ্মদেহে পৃথিবীর স্থূল জড়পদার্থের কণা-সকলের সংগ্রহ করিয়া একটি আবরণ মত দিতে হয়, এই জড় আবরণে

তাহাদের সূক্ষ্ম দেহ অপেক্ষাকৃত স্থূল হয় এবং মানবের স্থূল দৃষ্টিশক্তির গোচরে আসে। এই কার্য্যকে ইংরাজিতে মেটিরিয়ালাইজেশন (materialisation) কহে। সেইরূপ কথা বলিবার শক্তি প্রেতের আবশ্যক হইলে তাহার সেই প্রেতদেহে পার্থিব কণায় গঠিত স্বরযন্ত্র করিয়া লইতে হয়, অথবা কোন স্থূলদেহধারী জীবের উপর আবিষ্ট হইয়া তাহার স্বরযন্ত্রসাহায্যে কথা বলিতে হয়। কাজেই প্রেতকে কেবল দৃষ্টিগোচর হওয়া ব্যতীত কথা কহিতে হইলে অনেকটা দুরূহ কার্য্য করিতে হয়। এইরূপ করা কোনরূপ শিক্ষার বলে যে হয় তাহা নহে, অদম্য ইচ্ছাশক্তির বলে উহাদের ক্রিয়া শক্তির বিকাশ হইয়া এইরূপ ঘটিয়া যায় মাত্র। আমরা নিম্নে দুইটি ভূতের কথা বলা সংক্রান্ত ঘটনা বিবৃত করিতেছি। প্রথম ঘটনাটি আমার কোন উকিল বন্ধুর আত্মীয়ের মধ্যে ঘটে, ইহার সত্যতার জন্য উক্ত উকিলবাবু দায়ী। দ্বিতীয় ঘটনাটি আমার হাবড়ার বাটীর নিকটে হওয়ায় আমি নিজে অবগত আছি।

(১) উকিল বাবুর জনৈক আত্মীয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাহার দেহের সৎকার জন্য শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বাটীতে বড় লোকজন নাই, মৃতের স্ত্রী শোকাভিভূতা হইয়া ধূলায় পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে তাঁহার মৃত স্বামী উপস্থিত হইয়াছেন এবং বলিতেছেন "কাঁদিবার ঢের সময় আছে কাঁদিস, এখন উঠিয়া যে টাকা কড়ি বাক্সে আছে তাহা সরাইয়া রাখ, শ্মশান হইতে উহারা আসিলে আর কি তোকে কিছু দিবে? চিরকাল হাহা করিতে হইবে, এই বেলা নিজের অন্নের সংস্থান করিয়া রাখ। বলা বাহুল্য এই কথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী উঠিয়া তাড়াতাড়ি স্বামীর বাক্সে কয়েকশত টাকার নোট আছে দেখিল এবং তাহার নিজের আয়ত্তমত করিয়া রাখিল।

(২) হাবড়ায় কাসুন্দে রোডের মধ্যে একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে

একটি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী পরিবার ভাড়া আসেন। এই বাটী অনেকদিন খালি পড়িয়া ছিল একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কোথা হইতে পীড়িত হইয়া ঐ বাটীতে চারি পাঁচ দিন থাকিয়া মারা পড়ে। সে অতি কষ্টে বাটীতে কয়েকদিন ছিল। ক্ষুধায় অস্থির,—পাড়ার কেহ দয়া করিয়া রোগীর পথ্য দিয়া আসিলেই তবে খাইত, নচেৎ ক্ষুধায় মারা গেলাম এইরূপ চীৎকার করিত। বোধ হয় স্ত্রীলোকটী খাইতে না পাইয়াই পীড়িত হইয়া মারা পড়িয়াছে। ইহা আজ চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার ঘটনা। তদবধি বাটীতে কোন ভাড়াটিয়া থাকে নাই। এক্ষণে এই ভাড়াটিয়াদের আসা অবধি প্রত্যহ রাত্রি দশটার পর ভূতের আবির্ভাব হইতেছে। একটা ঝাঁকড়া মাথা মত লোক অস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়, ও সেই সময় ভয়ানক বিষ্ঠার গন্ধ ছাড়ে। কেহ খাইতে থাকিলে "আমাকে দিবি না" এইরূপ কথা বলে। ভূতকে অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। রাত্রে বাটীতে ইট ফেলা, ঘরের মধ্যে কেহ নাই অথচ ঘরের কপাট এত জোরে চাপা আছে যে কেহ খুলিতে পারিবে না—এই সকল উপদ্রব হইতে থাকে। পরে উহারা গির্জা হইতে মন্ত্রপূতঃ জল আনিয়া চতুর্দ্দিকে ছিটা দেওয়ায়; যে যে স্থানে ঐরূপ ছিটা দেওয়া হইত, তন্মধ্যে উহার অত্যাচার হইত না দেখা গেল। বোধহয় সেই মৃত বৃদ্ধাই ভূত হইয়া বাটীতে রহিয়াছে। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত খাইতে না পাওয়ায় তাহার খাইবার ইচ্ছা ও খাদ্যদ্রব্যে গুরুতর লোভ থাকিয়া যাওয়ায় খাদ্যদ্রব্য দেখিলেই খাইবার গুরুতর বাসনা হইত ও এই বাসনার বলে তাহার বাকশক্তি পর্য্যন্ত আসিত। তাহার সূক্ষ্মদেহের মেটিরিয়ালাইজেসনও বেশ হইত না, আবছাওয়া মত দেখা যাইত, এবং বাকশক্তি ঐ এক কথা ব্যতীত অন্য কোন কথায় প্রকাশ পাইত না।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুলিখোর প্রেতাত্মার সহিত কথোপকথন

এবং

হিষ্টিরিক ফিট বা ভৌতিক মুর্চ্ছা।

অলৌকিক রহস্যের ২য় ভাগের ৭ম সংখ্যার ৩২৮ পৃষ্ঠায় শ্রীসুরেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় "প্রেততত্ত্ব" অর্থাৎ মানবদেহে প্রেতাত্মার আবির্ভাব সম্বন্ধে কয়েকটী প্রত্যক্ষ ঘটনার বিবরণ এবং হিষ্টিরিক ফিট ভুতাবেশ দ্বারা হইয়া থাকে বলিয়া তৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমি তাঁহার কথায় সম্পুর্ণ অনুমোদন করি; যেহেতু আমি তদ্রূপ কএকটী ঘটনা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমি এই বিষয়টী তাঁহার লিখিবার কএক মাস পূর্ব্বে লিখিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। কথাটী শুনিয়া অনেকে উপহাস করিবেন এজন্য আমি লিখিতে সাহস করি নাই। সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রবন্ধটী বাহির হওয়ায় এখন লিখিতে সাহস করিলাম।

দেবদেবী বা প্রেতাত্মা সম্বন্ধে আমি স্বয়ং যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। সম্প্রতি একটী গুলিখোর প্রেতাত্মার সহিত আমার যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা যথাযথ নিম্নে লিখিলাম!

প্রায় দুই বৎসর হইল, আমার বাড়ীর সন্নিকটে আমার একটী বাগানবাড়ীর ফসল রক্ষার জন্য একটী স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তাহার ৭।৮ বৎসরের একটী ছেলে তাহার সহিত থাকিত। তাহাদের থাকিবার জন্য একটী কুঁড়েঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম। ঐ স্ত্রীলোকটীর পিত্রালয় আমাদেরই গ্রামে। উহার পিতা আমার প্রজা ছিল। আজ পাঁচ সাত বৎসর হইল তাহার মৃত্যু হইয়াছে। ঐ

ব্যক্তির দুই বিবাহ ছিল, প্রথম পরিবারটীর বহুদিন সন্তান না হওয়ায় দ্বিতীয় বিবাহ হয়। দ্বিতীয় স্ত্রীর তিনটী মেয়ে, তন্মধ্যে একটী বড়। উহার পিতা অন্য দুই কন্যা অপেক্ষা এই কন্যাটীকে প্রাণাধিক ভাল বাসিত, কিন্তু উহার মাতা উহাকে দেখিতে পারিত না, অন্য দুই কন্যাকে সমধিক ভাল বাসিত। কিছুদিন পরে কন্যাটীর পিতার মৃত্যু হয়। পিতা ভিক্ষাজীবী ছিল, আর প্রথম মেয়েটী পিতার স্নেহকে একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। মেয়েটীর বিবাহ হইলেও স্বামীর অন্যাসক্তি হেতু তদীয় ভালবাসায় বঞ্চিত হইয়া পিত্রালয়েই অধিকাংশ সময় থাকিত এবং সর্ব্বদা পিতৃসেবা করিত। পিতা তাহার অন্যায় আচরণ দেখিলেও কিছু বলিত না। পিতা গুলিখোর ছিল; অতিথি সাজিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিত, গুলিতেই তাহার অধিকাংশ ব্যয়িত হইত, অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত অর্থে কষ্টেসৃষ্টে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিত। কিছুদিন পরে ঐ ব্যক্তি গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। শেষাবস্থায় অর্থাভাব বশতঃ পত্নীদ্বয় তাহার শীঘ্র মৃত্যু কামনা করিত; কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যাটী সর্ব্বদা তাহার সেবা শুশ্রূষা করিত। বৃদ্ধ ক্রমে অশক্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়।

পিতার মৃত্যু হইলেও কন্যাটী তাহার স্নেহ ভুলিতে পারে নাই। যখন কষ্টে পড়িত অথবা মনে বিশেষ ক্লেশানুভব হইত, তখন পিতার স্নেহে বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া, তাহারই আনুসঙ্গিক হইবার জন্য মৃত্যু কামনা করিত; এবং পিতার স্নেহ যত্নাদি যতই মনে হইত, ততই সে সেই সমস্ত কথাগুলি বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে থাকিত। রাত্রিতে নিদ্রাবস্থায় উহার পিতা শিয়রে বসিয়া নানাপ্রকার আশ্বাস বাক্যে এবং গায়ে হাত বুলাইয়া সান্তনা করিয়া যাইত।

গত সন ১৩১৭ সালের আশ্বিন মাহায় একদিন রাত্রিতে সেই স্ত্রীলোক ছেলেটীকে লইয়া উক্ত গৃহে শুইয়া থাকে। ঘোর অন্ধকার,

চতুর্দ্দিকে নিকটবর্ত্তী কোন প্রতিবেশীর ঘর নাই বলিয়া সে মনে মনে সদাই ভীত থাকিত। সেদিন ভয় কিছু বেশী হওয়াতে এবং একাকিনী সেরূপভাবে রাত্রিযাপন মহা কষ্টকর বোধ হওয়াতে, উনুন জ্বালিয়া ধান্য সিদ্ধ করিতে বসাইল। পিতৃস্নেহ মনে উদিত হইয়া উহার হৃদয়কে কাঁদাইতে লাগিল। ক্রন্দন মনে মনে চাপিয়া হইলে বোধ হয় দুঃখে সম্যক্ শান্তিলাভ হয় না, এজন্য সে করুণস্বরে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ধান্য সিদ্ধ কার্য্যটী শেষ হইলেও রাত্রি শেষ হয় না, তখন শুইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিদ্রার আবেশ হইল। তদবস্থায় তাহার পিতা শিয়রে বসিয়া আশ্বাস করিয়া বলিতে লাগিল, "দেখ্ বাপ্! তোর এ করুণ ক্রন্দনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তোর ক্রন্দন শুনিলে আর কোথাও তিষ্ঠিতে পারি না। আর তুই যখন কোন রকমে শান্তি পাইতেছিস্ না, তখন এইবার আমি তোকে সঙ্গে লইয়া যাইতে আসিয়াছি। কল্য বাবুকে বলিয়া এখান হইতে তোকে লইয়া যাইব।"

পরদিবস বেলা প্রায় একঘণ্টা আন্দাজ আছে, এমন সময় আমি ও অন্য একজন উক্ত বাগানের দিকে বেড়াইতে গেলাম, দেখিলাম স্ত্রীলোকটী দুয়ারে উদাসভাবে বসিয়া আছে। চক্ষু দুইটী বিস্ফারিত করিয়া সে যেভাবে আমার দিকে অবলোকন করিল, সেই বিস্ফারিত নেত্রের ঘূর্ণায়মান উর্দ্ধগত তারা দর্শনে স্বতঃই ভীতি জন্মে। দেখিবা-মাত্র হঠাৎ আমার মনে হইল যেন কি আবেশ হইয়াছে। আমি ভূতাবিষ্ট রোগী অনেক দেখিয়াছি এজন্য এতৎ সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা জন্মিয়াছে। আবিষ্ট রোগীর চক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে বুঝিতে পারি এলোকটা আবিষ্ট কিনা। স্ত্রীলোকটীর চক্ষু দেখিয়া আমার সন্দেহ হইল। আমি নিকটবর্ত্তী হইলে, স্ত্রীলোকটী বলিতে লাগিল, "বাবু! আমার শরীরটা আজ কেমন একরকম হইয়া

আসিতেছে"। এই বলিতে বলিতে সে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার ছেলেটী তাহার মায়ের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমি মহাবিপদ ভাবিয়া আমার সঙ্গের লোকটীকে বলিলাম, "দেখদেখি, এরূপভাবে কেন ঢলিয়া পড়িল।" সে দেখিয়া বলিল, "মহাশয়! মূর্চ্ছিত হইয়াছে"। তখন চক্ষুতে জল দিয়া তাহার দাঁতের খিল খুলিয়া দেওয়া হইল। দেখিলাম সে নিস্তব্ধভাবে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

ঐ স্থানের কিছু দূরে একব্যক্তি বাস করিত। সে এই ঘটনা শুনিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহাকে দেখিয়া বলিল, "বাবু! উহাকে "উপর বা" লাগিয়াছে।" তখন আমি তাহাকে বলিলাম, তুই ইহার কিছু জানিস্, সে বলিল আচ্ছা দেখি। এই বলিয়া একটা গাছের পাতা সন্ধান করিয়া তাহা হাতে দলিতে দলিতে ফিরিয়া আসিল। সেই লোকটী উপস্থিত হইবামাত্র স্ত্রীলোকটী বলিল—এ কেন? লোকটী বলিল, তোমাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছি। এই বলিয়া সে দলিত পত্রগুলি উহার নাসিকার নিকট ধরিল। সে কোনমতেই তাহা মুখের নিকট আনিতে দিবে না দেখিয়া একজন জোরে উহাকে ধরিলে সেইপত্র তাহার নাসিকার নিকটে ধরা হইল। স্ত্রীলোকটী বলিয়া উঠিল, ছাড়্ ছাড়্ আমি চলিয়া যাইতেছি। ঔষধদাতা বলিল, তুই কে না বলিলে ছাড়িব না। তখন সে পুনরায় উহা নাসিকার নিকট ধরিলে বলিল, আমি "অমুক"।

প্রশ্ন। অমুক নামে ত অনেক লোক আছে, তার মধ্যে কে?

উত্তর। আমি উহার পিতা।

প্রশ্ন। তুই কেন উহাকে ধরিলি?

উত্তর। মেয়েটী মনের কষ্টে বিস্তর ব্যাকুল হইয়া কাঁদে, আমি আর উহা সহ্য করিতে পারি না। অনেকবার সান্ত্বনা করিয়াছি, তথাপি

যখন এরূপ করে, তখন মনে করিলাম আর কেন, উহাঁকে লইয়া আসি, নিকটে থাকিবে। এইজন্য লইতে আসিয়াছি। এই বলিয়াই পুনর্মূর্চ্ছিত হইল। মূর্চ্ছা ছাড়াইয়া পুনরায় ঐ পাতা নাসিকার নিকট ধরাতে বলিল, "চল্ যাই, আর থাকিব না, এরা আমায় থাকিতে দিবে না।" এই বলিয়া উঠিয়া পড়িল এবং প্রায় একবিঘা আন্দাজ গিয়া পড়িয়া গেল। তৎপরে তাহাকে উঠাইতে সহজ শরীরের ন্যায় চলিয়া আসিল, তাহার শরীরে কোন বিকার আছে বলিয়া বোধ হইল না।

পরদিবস বেলা প্রায় ৪টার সময় পুনরায় আবেশ হইয়াছে। পূর্ব্বদিন এইরূপ কাণ্ড দেখিয়া, নানা কথা জিজ্ঞাসা করিবার অভিলাষ স্বত্বেও পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছা দেখিয়া, যাহাতে আবেশ শীঘ্র ছাড়িয়া যায়, এই কথাই মনে হইতে লাগিল। আর জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল না। পরদিন পুনরায় বাগানবাড়ীতে ৪টার পর বেড়াইতে গেলাম, দেখি স্ত্রীলোকটী একাকী বসিয়া আছে এবং ছেলেটী নিকটে খেলিতেছে। চক্ষু দেখিয়া বোধ হইল আবেশ হইয়াছে। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন ভাল আছিস্ ত?" আমার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই সে হাসিয়া বলিল, কি ভাল? কাল তোমরা নিতান্ত পীড়াপীড়ি করাতে একবার ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আমি এখান হইতে একবারে চলিয়া যাই নাই, ফিরিয়া পিছে পিছে আসিয়া চাল্‌তা গাছটিতে ছিলাম। আজ আমার মেয়ে বানরগুলি তাড়িয়ে চকিত হয়ে যেই চাল্‌তাগাছটী ঠেসিয়ে দাঁড়াইয়াছে, সেই আমি তাহাকে ধরিয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুই পুনরায় কেন ধরিলি? সে বলিল, আমি উহার কষ্ট দেখিতে পারি না, সঙ্গে লইয়া যাইব সেইজন্য আসিয়াছি। মেয়েটা যখন ব্যাকুল হয়ে কাঁদে তখন আর থাকৃতে পারি না।

প্রশ্ন। উহার কিসের কষ্ট, আমার বাগানবাড়ীতে আছে। দুই-জনকে খেতে পর্‌তে দিচ্ছি, উহাদের আর কষ্ট কিসের।

উত্তর। হেঁ, তা-ত দিচ্ছেন; আপনাকে আর আমি কি জানি না, আমি আপনার প্রজাগিরি করে কতদিন কাটিয়েছি। তবে উহার মনের কষ্ট কি জানেন? সর্ব্বদাও মনে করে যে, পরের ঘরে পরের বাড়ীতে আছি, কাল চলে যা বল্লে চলে যেতে হবে। ছেলেটী আছে, এরই বা পরে কি গতি হবে, কিসে দিন নির্ব্বাহ হবে। এই ভাবনা-তেই ও অস্থির হয়।

প্রঃ। তুই যদি ওকে নিয়ে যাস্ তবে ছেলেটীর দশা কি হবে? এখন তার মা আছে বলে ও ছেলেটা বেঁচে আছে; তার মা গেলে ছেলেটা কিসে রক্ষা হবে?

উঃ। দেখ্‌ব যদি কোন রকম গোছ না লাগে, ওকেও নিয়ে যাব।

প্রঃ। আচ্ছা তুইত নিয়ে যাবি; বলদেখি ওদিকে নিয়ে কোথায় রাখ্‌বি, আর তুই বা কোথায় আছিস্!

উঃ। আমার ঘরের পিছনের দিকে যে সেওড়া গাছ আছে, আমি তাহাতেই আছি, ওরাও সেইখানে থাক্‌বে।

প্রঃ। তুই কি আহার করিস্ এবং রোজ কোথা হতে আহার সংগ্রহ করিস্।

উঃ। সকলই খাই, কাহারও খাওয়া দেখলে তাহাতেই আমার আহারের তৃপ্তি হয়।

প্রঃ। তুই যে 'গুলি' খেতিস্ এখন সে সব কোথা পাস্?

উঃ। যেখানে যেখানে গুলির আড্ডা আছে সেখানে যাই, তাহাদের খাওয়া দেখে আমারও খাওয়ার তৃপ্তি হয়।

প্রঃ। আচ্ছা তুই সব দেখতে পাচ্ছিস্?

উঃ। হাঁ।

প্রঃ। বল্ দেখি তোর মত আর কতগুলি ভূত আমাদের গ্রামে কোন্ কোন্ জায়গায় আছে ?

উঃ। হ্যাঁ সব বল্‌তে পারি, আমার ঘরের কাছ হতে বলে যাই, আপনি শুনুন। আমার ঘরের পূর্ব্ব পার্শ্বে যে জেলেপাড়া, সেই জেলে পাড়াতে (অমুক) ভূত হয়ে তাহার ঘরের তেঁতুল গাছে আছে, ওখানে আরও ৩।৪টী আছে, তাহারা অমুক অমুক ও অমুক জায়গায় আছে। আর তাঁতি পাড়ার "অমুক" সে অমুক স্থানে আছে। আপনি যে পথে এখানে এসেন সেই পথের মধ্যস্থলে যে আমগাছ আছে, তাহাতে ৪টী আছে। একটী ব্রাহ্মণ একটী ব্রাহ্মণী ; একটী বৈষ্ণব ও একটী বৈষ্ণবী। আর এই আপনার বাগানের পূর্ব্ব পার্শ্বে যে বৃহৎ অশ্বথ গাছ দেখিতেছেন, ইহাতে বহু দিন হইতে একটী ব্রহ্মদৈত্য আছে। এই বৃক্ষের তল্‌দিয়া রাত্রি দিন ছেলে পিলে লোক জন যাতায়াত করিতেছে বটে, কিন্তু সে কখন কাহাকেও কিছু বলে না। এইরূপে গ্রামের মধ্যে যেখানে যে যে আছে তৎসমস্ত বলিয়া গেল।

প্রঃ। আচ্ছা পিশাচ এখানে কোথাও আছে, বলিতে পারিস্ ? তোর সঙ্গে তাহাদের কথা বার্ত্তা হয়।

উঃ। পিশাচ এ গ্রামে নাই। এই গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে প্রায় আধ ক্রোশ অন্তরে যে নন্দী পুষ্করণী রহিয়াছে, তাহার বায়ু কোণে যে বট গাছটী আছে, তাহাতে একটী পিশাচ আছে। আমাদের সহিত তাহাদের কোন কথাবার্ত্তা হয় না।

প্রঃ। আমি যে পথে আসি, সে পথের ধারে অশ্বথ গাছে যে ভূত ও ভূতিনী রহিয়াছে বা আমার বাড়ীর নিকট যে রহিয়াছে, তাহারা আমার কোন অনিষ্ট করিবে কি ?

উঃ! (হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল) বাবুজী 'আপনার অনিষ্ট

কর্‌বে এমন কেহ এখানে নাই, আপনার ধারুকে উহারা আসিবে না। যে প্রতিবেশীটী উহাকে ছাড়াইয়াছিল, সে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল আমার বাড়ীর নিকট যে ব্রহ্মদৈত্যটির কথা বলিলি সে আমার কোনও অনিষ্ট করিবে কি ? তদুত্তরে তাহার কানে কানে কি বলিল শোনা গেল না।

যে প্রতিবেশীটি পূর্ব্বদিবস উহাকে ছাড়াইয়াছিল, সে বলিল, কি, আজ পুনর্ব্বার আসিয়াছিস্ !

উঃ। বাবু ! অনেক দিনের পর আসিয়াছি ; মেয়ে ছেলেটাকে অনেক দিন দেখি নাই, দেখ্‌লে বড় স্নেহ হয়, ছেড়ে যেতে আদৌ ইচ্ছা হয় না। এজন্য কাল যাব বলে গেলাম, কিন্তু যেতে পারি নাই, এইখানে চাল্‌তাগাছে ছিলাম। বাবু তোরা ছেড়ে দে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে চলে যাই।

প্রঃ। কেন লইয়া যাইবি ? বাবুর কথা ঠেলে তুই নিয়ে যাবি ?

উঃ। না না আচ্ছা বাবু যদি বলেন যে ও আর কখন মনে কষ্ট করবে না, তাহলে আমি চলে যাই। কিন্তু বাবু বলিতেছি যদি পুনরায় ও ওরূপ করে ডাকে, তাহলে আমি এমন নিয়ে যাব যে কেউ জান্‌তেও পার্ব্বে না।

এই বলামাত্রেই মেয়েটী মূর্চ্ছিত হইল। প্রতিবেশী লোকটী তাহার মূর্চ্ছা ছাড়াইয়া আমায় বলিল, "বাবু ! আর কেন, উহাকে এইবার ছাড়াইয়া দি। তখন সে বলিল, হায় হায় ! তোর মত কত গুণিন্‌কে আমি পুড়িয়ে জল খেতে পারি তুই আবার আমাকে ছাড়াবি।

"আচ্ছা দেখ্" বলিয়া প্রতিবেশী পূর্ব্বদিনের মত পাতা আনিয়া তাহার নাসিকার নিকট ধরিল। প্রথম এদিক্ ওদিক্ দুই একবার মাথা নাড়িয়াছিল, পরে আর মাথা নাড়িল না, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। তখন প্রতিবেশী কিঞ্চিৎ হিং আনিয়া তাহার ধুব

দিবার উদ্যোগ করাতে বলিল, "কেন বাবু আমায় বিরক্ত কচ্ছিস্, আমি আপনা হতে চলিয়া যাইব। আর একটুকু থাকি, সন্ধ্যা হলেই চলে যাব"। প্রতিবেশী না শুনিয়া হিঙ্গের ধূম নাসিকাতে দিল। সে দুই একবার মাথা নাড়িয়া পরে চুপ করিয়া শ্বাস বন্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। পরে শ্বাস টানিয়া বলিল, ছাড় ছাড়, আমি যাইতেছি"। তখন ছাড়িয়া দেওয়াতে পূর্ব্ব দিবস যতখানি গিয়াছিল ততখানি গিয়া হঠাৎ পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইল। তাহার ছেলেটীর কান্নার সীমা নাই; সে তাহার মাতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তাহার মাতা উঠিয়া ভাল মানুষের মত আসিয়া দুয়ারে বসিল। আমরা মনে করিলাম ছাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ছেলেটী যেই মা! মা! করিয়া ডাকিতে লাগিল, তখন সে বলিল, "কে তোর মা রে শালা, আমি কি তোর মা, আমি তোর আজা। তোর মা ত তোর ঘরের ভিতর আছে।" দেখিলাম যতক্ষণ তাহার পিতা তাহার শরীর অধিকার করিয়া রহিল, ততক্ষণ তাহার সম্বন্ধের বৈলক্ষণ্য হইল না। একবার ছাড়িয়া গিয়া পুনরায় যখন উপস্থিত হইল, তখন প্রতিবেশীর ছাড়াইবার বিদ্যা লোপ হইয়া গেল। তখন প্রতিবেশী বলিল, "আমার সাধ্য হইবে না; এই গ্রামে আর একজন ভাল গুণিন্ রহিয়াছে, সে না হইলে উহাকে ছাড়াইতে কেহ পারিবে না।" আমিও শেষ ফল দেখিবার জন্য সেই গুণিনকে আনিতে পাঠাইলাম এবং পুনরায় তাহার সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলাম।

প্রঃ। তুই কি সহজে যাবি না?

উঃ। হাঁ। হুজুর আমি শীঘ্রই যাব। তবে কি, অনেক দিনের পর আসিয়াছি আর একটুকু থাকি, সন্ধ্যা হলেই আমার গুলি খাইবার সময় হইবে, এই নেশার সময় হইয়া আইল, সন্ধ্যার সময়েই চলিয়া যাইব।

প্রঃ। তুই কোন্ পথ দিয়া যাইবি? আর আসিয়াছিস্ কোন্ পথ দিয়া?

উঃ। হুজুর আমি জেলেপাড়ার নিকট আপনার নূতন পুষ্করিণির পাড়ের উপর দিয়া গড়খাই পার হইয়া গড়খাইএর আড়াতে উঠিলাম। পরে মাঠের আইলে আইলে চলিয়া আসিয়া সরে রাস্তায় পঁহুছিলাম, তৎপরে সরাসর চলিয়া আসিয়াছি। এই পথ দিয়াই পুনরায় যাইব।

প্রঃ। তুই এখানে গুলি খাবি?

উঃ। দেন্ না বাবু, এইখানে ছিটে কএক খেয়ে নিই।

প্রঃ। চাট্ কিছু আবশ্যক হবে, না কেবল গুলিই হবে।

উঃ। আজ্ঞা তাহলে আর কিছু বলতে হয় না, বড় ভালই হয়।

তখন আমি একটী লোককে বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম, যদি কিছু খাবার থাকে আনিবে; কিছুক্ষণ পরে লোকটী বাড়ী হইতে মোহনভোগ কিঞ্চিৎ আনিয়া দিল। আমি বলিলাম, "এইনে, এবার হবে ত"?

উঃ। হ্যাঁ এইবার গুলিটা খেয়ে নিই, শীঘ্র যেতে হবে।

মুখে নল লাগিয়ে টান্ দিলে যেমন মুখটা কাকচঞ্চুর মত হয়; মুখখানাকে তদ্রূপ ভাব করে মুখ দিয়ে শ্বাসটাকে সজোরে টেনে নিয়ে কুম্ভকের মত খানিক রেখে, পরে মুখ দিয়ে (ফুৎ) শব্দ করিয়া ছাড়িয়া দিল। আর দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা মোহনভোগের উপর দুই চারিবার চাপিয়া টানিয়া টানিয়া জিহ্বাতে দুই একবার লাগাইল; এবং পরমানন্দ উপভোগ প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রায় ২০ মিনিট পর্য্যন্ত এইরূপ করিল। তৎপরে তাহাকে বলা হইল এইবার তুই যা।

উঃ। হ্যাঁ যাইব; অনেক দিনের পর এসেছি, মেয়েটার মায়া ছাড়তে পারিনি। এই বলে উভু হয়ে বসে দুই হাঁঠুর উপর দুই করপৃষ্ঠ রাখিয়া অর্থাৎ যেমন ছেলেকে করতলের উপর রাখিয়া,

তাহার মুখখানি নিজ মুখের অভিমুখে রাখিয়া সোহাগ করে, তদ্রূপ করিয়া সোহাগ করিতে লাগিল এবং হস্তে চুম্বন করিয়া এবং হস্ত নাচাইয়া অনেক রকম বুঝাইতে লাগিল। যেন তাহার হাতের উপর একটী ছেলে আছে।

অনন্তর যে গুণিন্‌টীকে আনিতে পাঠান হইয়াছিল, সে আসিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শ্রবণ করত বলিল, আর উহাকে অধিকক্ষণ থাকিতে দিলে সহজে ঝাড়ান কঠিন হইবে। গুণিন্ প্রথমতঃ কতকগুলি সরিষা লইয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিল। তৎপরে ধুনা গুঁড়াইয়া একটী ল্যাম্প বাম হাতে ধরিয়া উহাকে রোগীর মুখের নিকট ধরিয়া এমন ভাবে ধুনা মারিতে লাগিল যে, সেই ধুনা ল্যাম্পের আলোর মধ্য দিয়া প্রজ্জলিত অবস্থায় আবিষ্টার মুখে চলিতে লাগিল। তখন সে বলিল, "আর আমি থাকিব না। নিশ্চয়ই যাইতেছি ছাড় ছাড়। গুণিন্ বলিল, বল, কত দূরে গিয়ে ছাড়বি।

উঃ। বামুন ঘরের নিকট।

প্রঃ। গুণিন্ বলিল, "না। আরও দূর যাইতে হইবে। তখন তাহার ত্রিগুণ দূরে যাইতে স্বীকার করিল, এবং আর আসিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। পিছে পিছে দুই তিন জন লোক গেল। পূর্ব্বে যে অশ্বত্থ বৃক্ষে ব্রাহ্মণ ভূত প্রেতিনী ও বৈষ্ণবী ভূত ভূতিনী আছে বলিয়াছিল, সেই গাছের সন্নিকটে পতিত হইল। পশ্চাৎস্থিত ব্যক্তি তাহাকে তুলিয়া উঠাইতে স্বাভাবিক মনুষ্যের ন্যায় ঘরে চলিয়া আসিল। রাত্রিতে আর কোন উৎপাত হয় নাই।

শ্রীচৌধুরী ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র।

পুনরাগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার দশবৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই গ্রাম সকলের এক অনির্ব্বচনীয় সৌষ্ঠব ছিল। সে সময়ের পল্লীবাসীর কেহই গৃহ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে ইচ্ছুক ছিল না। কেননা তখনও কলিকাতা এক একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রামের তুলনায় শ্রীহীন। লোকের তখনও পর্য্যন্ত চাকুরী করিবার বড় প্রয়োজন হয় নাই। সমস্ত আহার্য্যই সুলভ, আকাঙ্ক্ষার অস্থিরতা তখন গ্রামপ্রান্তস্থ শস্যপূর্ণ ভূমিতে প্রতিহত হইয়া শান্ত প্রভাতের সুমন্দ সমীরণে মিলাইয়া যাইত। এখন যেমন ধনীর আলোকপূর্ণ সৌধ হইতে দরিদ্রের অন্ধকারময় কুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র—সর্ব্বগৃহ অবিরাম অনিশ্চিত ভবিষ্যতের নির্ম্মম চিন্তার ফুৎকারে আন্দোলিত হইতেছে, তখন তাহার সামান্যমাত্র নিদর্শনও গ্রামমধ্যে লক্ষিত হইত না। নগ্ন-দেহ, নগ্নপদ, স্বাস্থ্যের প্রতিবিম্ব-স্বরূপ অশীতিপর অগণ্য বৃদ্ধের প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে গ্রামসকলের শ্রী সূচিত হইত। কিন্তু দশ বৎসরের মধ্যেই গ্রামে গ্রামে শ্রী হীনতা লক্ষিত হইতে লাগিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামের এরূপ দুরবস্থা আর কখনও কোথাও ঘটিয়াছে কিনা সন্দেহ।

যে গ্রামে আমি প্রবেশ করিলাম, ধ্বংসকারিণী শক্তি তখন ধীরে ধীরে তার অঙ্গে অঙ্গুলি স্পর্শ করিতেছিল। ধীরে ধীরে গুল্ম বহুলা কাননশ্রী গ্রামাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। তবে দশ বৎসরের মধ্যে আমাদের গ্রাম যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, এ গ্রামটী সেরূপ হয় নাই। গ্রামমধ্যে প্রবেশকালে আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম। তখনও গৃহে

গৃহে উল্লাসের ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল। পথের প্রশস্ততা তখনও পর্য্যন্ত লোক চলাচলের চিহ্ন মাথায় করিয়া চন্দ্রকিরণে নিজের রূপ প্রতিফলিত করিতেছিল। সেই প্রশস্ত পথ অবলম্বনে আমি অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রাহ্মণগৃহে উপস্থিত হইলাম। গৃহ দেখিয়া মনে হইল যে, তাহা এক সময়ের ক্ষুধিতা অলক্ষ্মীর রসনা-পরিত্যক্ত ভুক্তাবশেষ। এক সময়ে সেটী একটী বিশাল অট্টালিকা ছিল। তাহার সমস্তই ভগ্ন ও স্তূপীকৃত হইয়া তাহার একটী ক্ষুদ্রাংশের পশ্চাতে অবস্থান করিতেছে। দেখিলাম ব্রাহ্মণ সেই ক্ষুদ্রাংশই বাসযোগ্য করিয়া লইয়াছেন। ব্রাহ্মণের পূর্ব্বপুরুষ যে সমৃদ্ধিশালী জমিদার ছিলেন, তাহা সে ভগ্ন অট্টালিকা দেখিয়া অনুমান করিলাম। তাহারই বহির্ভাগের একটী প্রকোষ্ঠে কালু আমাকে স্থান দিল এবং সত্বর আমার বিশ্রামের ও সুশ্রূষার ব্যবস্থা করিল।

কিন্তু সেখানে ডাক্তার বাবুকে না দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ডাক্তার বাবু যে তৎপূর্ব্বে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার কিছু মাত্র নিদর্শনও আমি অনুভব করিতে পারিলাম না। সেবার্থ নিযুক্ত ভৃত্য কিছু বলিতে পারিল না। বিজয়ার অভিবাদনে দলে দলে লোক "মুখুজ্যে ম'শায়ে"র ঘরে আসিতে লাগিল, আমি তাহাদের প্রত্যেকের ভিতরে ডাক্তার বাবুকে দেখিবার আশা করিলাম। কিন্তু দেখা দূরে থাক্, কেহ তাহার আগমন সংবাদের একটী কথাও কহিয়া আমাকে নিশ্চিন্ত করিল না। লাভের মধ্যে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসার অত্যাচারে আমি জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলাম। তাহা হইতে নিস্তার পাইবার জন্য একটা তাকিয়াতে ভর দিয়া চক্ষু মুদিলাম—চক্ষু মুদ্রনের সঙ্গে সঙ্গে ঘোর নিদ্রা আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

* * * *

মুখুজ্যে মহাশয়ের স্বরে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রার গাঢ়তায়,

কোথায় আসিয়াছি কেন আসিয়াছি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আহারের জন্য ব্রাহ্মণ আমার ঘুম ভাঙ্গাইতেছিলেন। সারাদিনের ক্লেশ হইতে মুক্তি দিবার জন্য নিদ্রা স্নেহপরবশা জননীর মত আমাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিল। উপবিষ্ট হইয়াও কিছুক্ষণের জন্য তাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিলাম না। নিজের বাড়ীতে আছি এই অনুমানে, এবং ব্রাহ্মণকে নিজ ভৃত্যবোধে, অসময়ে ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য আমি তিরস্কার করিলাম। বারবার তিরস্কারেও যখন ভৃত্যটা আমাকে বিরক্ত করিতে নিরস্ত হইল না, তখন তাহাকে অবস্থোচিত ন্যায্য প্রাপ্য দিবার জন্য পাদুকার অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে কালু আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং বলিল—"বাবু! আপনি বাড়ীতে নাই!"

কালুর এক কথাতে জাগ্রত হইলাম। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিলাম, আমি ব্রাহ্মণের যথেষ্ট অমর্য্যাদা করিয়াছি। তাহাতে কাহারও ক্রোধ হইবার কারণ না থাকিলেও আমি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলাম, এবং ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"তুমি কিছুই কর নাই, অপ্রতিভ হইতেছ কেন? আমি বরং তোমার সুনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দুঃখিত হইয়াছি। কিন্তু কি করিব? যখন দেখিলাম, তোমাকে না জাগাইলে উপায় নাই, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া যায়, তোমাকে অভুক্ত থাকিতে হয়, তখন বাধ্য হইয়া আমাকে তোমার নিদ্রাভঙ্গ করিতে হইয়াছে।"

কালু বলিল,—"জলযোগের জন্য আমরা তোমাকে দুই একবার তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু হার মানিয়াছি। তবে আমাদের ভাগ্য আমাদের মনিবের চেয়ে ভাল। বাবু! যে গালি তাহাকে দিয়াছ!"

আমি। আমি তার জন্য বারবার ক্ষমা চাহিতেছি।

ব্রাহ্মণ কালুকে তিরস্কার করিলেন। আবার আমাকে সস্নেহ সম্ভাষণে আশ্বস্ত করিলেন। আমাকে মুখ প্রক্ষালনাদি কার্য্যে অনুরোধ করিয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তিনি প্রস্থান করিলে, আমি কালুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কালু! আমি কি বলিয়াছি?"

কালু বলিল—"আর সে কথা তুলিয়া কাজ নাই।"

আমি তথাপি তাহাকে বলিতে অনুরোধ করিলাম। কালু বলিল —"বাবু! আমরা তোমার কথা শুনিয়া হাসিয়াছি। কেননা বুঝিয়াছি, আমার মনিবকে তোমার চাকর মনে করিয়া তিরস্কার করিতেছ কিন্তু সেইসঙ্গে বুঝিয়াছি, অনেক গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা যে করিয়াছে, সেই তোমার বাড়ীতে চাকর হইয়াছে।"

কালুর কথায় আমার মস্তক অবনত হইল। কালু বলিতে লাগিল —"যা বুঝিলাম, তাহা হইতেই আমার এই ধারণা হইয়াছে। আমি ত তোমার বাড়ীতে এক লহমার জন্যও চাকুরী করিতে পারিতাম না। তবু ও ইডবিডগুলো আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। সেগুলো নাজানি আরও কি!"

সময়ে সময়ে ভৃত্যগুলাকে যে মধুর বাক্যের উপহার দিতাম, সেটা আমার অবিদিত ছিল না। সুতরাং ব্রাহ্মণকে ভৃত্যবোধে যাহা বলিয়াছি, তাহা অনুমান করিয়া চিত্ত আমার ব্যথিত হইয়া উঠিল। সহরে ও পল্লীগ্রামে ভৃত্যদিগের প্রতি তিরস্কারের প্রথা বিভিন্ন। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সহর পল্লীগ্রামের ভাষার কাছে পরাস্ত হইলেও আমার আলাপন যে কালুর শ্রুতিতে একেবারেই অনভ্যস্ত তাহা বুঝিয়া প্রতিকারের একটা উপায় স্থির করিতে লাগিলাম।

ইংরাজী শিক্ষার পর হইতে গুরুজনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম প্রথা-বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ যদি গুরুজন ধুলিধূসরিত নগ্নপদ

লইয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন প্রণামের পরিবর্ত্তে তাহার গলদেশের কোমলতা অনুভবের জন্যই হস্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। এ ব্রাহ্মণও তাই। গায়ে আচ্ছাদন নাই, পায়ে জুতা যে কখন উঠিয়াছে তাহার লক্ষণ পর্য্যন্ত নাই—কাপড় হাঁটুর নিম্নে নামিতে কখনও পাইয়াছে কিনা সন্দেহ—এরূপ ব্রাহ্মণের শ্রীপদপঙ্কজে হস্তপ্রয়োগ পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান কোনকালে অনুমোদন করিতে পারে না। তাইত, কেমন করিয়া ব্রাহ্মণকে বিনয়প্রদর্শনে তুষ্ট করি!

হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া ব্রাহ্মণের বাহিরে আসার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, আর ভাবিতে লাগিলাম! এতক্ষণ ডাক্তার বাবুর কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি। সহসা তাঁহার কথা স্মরণে আসিল। স্মরণমাত্রেই অন্য কথা ভুলিয়া কালুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কালু! আমার সঙ্গী? কই তাঁহার আগমনের চিহ্ন পর্য্যন্তও দেখি-তেছি না।"

কালু এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারিল না। কেবল বলিল—"আমি বরাবর তোমার কাছেই আছি। তবে শুনিয়াছি, সে বাবুও আসিয়াছে। কিন্তু কোথায় আছে, জানি না।"

আমি বলিলাম—"ওসব কথা আমি শুনিতে চাহি না। শুন কালু, তোমার প্রভুকে বল যদি তাঁহাকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে এখানে জলস্পর্শও করিব না।"

কালু বলিল—"বেশ, হুজুর আসিলে বলিব।"

কালুর কথা শেষ হইবামাত্র ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলেন। কালু তাঁহাকে আমার কথা বলিল। ব্রাহ্মণ শুনিয়া বলিলেন—"তা হইলেত তোমার আহারে বিলম্ব হইবে।"

"আমার সঙ্গী কোথায়?"

"তিনি দীক্ষা লইতেছেন?"

"দীক্ষা! সেকি ?"

"ব্রাহ্মণের হাতে একটা আলো ছিল। তিনি সেই আলোটা আমার মুখের কাছে ধরিলেন।

তাঁহার আচরণে আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম—"মুখে কি দেখিতেছেন ?"

"দেখিতেছি, তুমি রামনিধি শিরোমণির পৌত্র কিনা! এমন পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ. তুমি দীক্ষা কি জাননা! বিশ্বাস হইল না—তাই মুখখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইতেছি।"

ইংরাজীবিদ্যার প্রচণ্ড দণ্ড থাকিলেও, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিদ্যা বুদ্ধির উপর আস্থাশূন্য হইলেও আমি ব্রাহ্মণের কাছে পরাভব স্বীকার করিলাম। বলিলাম—"বাল্যকাল হইতে ইংরাজীভাষা চর্চ্চা করিয়া আসিতেছি। সেইজন্য এই সকল বিষয় জানিবার অবকাশ পাই নাই।"

ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ সরল বলিয়াই আমার প্রতীতি হইল। কেননা আমার উত্তর শুনিয়াই আমার মনে কষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া তিনি সস্নেহ-বচনে বলিলেন—"না বাবা, তোমার অপরাধ কি! তুমি বালক শৈশব হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছ, তাহাই তোমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। অপরাধ তোমার পিতার। শুনিয়াছি, তিনি একজন রাজার পরিচিত পণ্ডিত। তাঁহার তোমাকে এসব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। তবে একটু অপেক্ষা কর। সে বাবুর কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। আমি হোমানল প্রজ্বলিত হইতে দেখিয়াছি। তিনি আসিলে তাঁহার কাছে বুঝিও। আমি বুঝাইতে পারিব না।"

দীক্ষা! শিক্ষাইত চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি। পাড়াগাঁয়ে আসিয়া একি অদ্ভুত কথা শুনিলাম! যাই হ'ক দীক্ষাটা যে একটা অপরিচিত পদার্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। আর যখন একজনে তাহা

গ্রহণ করিতেছে, তখন অবশ্য আর একজনে তাহা দিতেছে। দাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দীক্ষা দান করিতেছেন কে?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"বাবু ভাগ্যবান। এক সাধুর কৃপাদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন।"

"আমি সেই সাধুকে দেখিতে ইচ্ছা করি।"

"চক্ষু থাকিলে ত দেখিবে বাবু!"

"এতবড় চক্ষুদুটা থাকিতেও আমার চক্ষু নাই!"

"ওত চর্ম্মচক্ষু—ওতো শুধু মাটী দেখিবার জন্য।"

"আপনি দেখিয়াছেন?"

"আমিও তোমার মতন। আজন্ম পুরীষমাত্র দেখিয়া আসিয়াছি। প্রাতঃকালে আমি তোমাকে আমাদের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য দেখাইব। তাহাকেই একমাত্র প্রাপ্তব্য বোধে চিরকাল সেই অসার বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট করিয়াছি। সে ঐশ্বর্য্য গিয়াছে, পুত্র-পরিজন সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। অবশিষ্ট আছে এক পৌত্রী—"বাবু! তথাপি আমার চোখ খুলে নাই। আমারও সাধু দেখিবার শক্তি কই!"

"বুঝিলাম চর্ম্মচক্ষু ছাড়া আর একজাতীয় চক্ষু আছে। তা সেটা কবি কল্পনায় অবস্থিত, কিম্বা কোন চশমা ব্যবসায়ীর দোকানে গোপনে সংরক্ষিত, তা বুঝিলাম না। বলিলাম—"সে চক্ষু ইহার পরে সন্ধান করিব। এখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই চক্ষু দিয়াই তাঁহাকে দেখাইয়া দিন।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"এ চক্ষু দিয়াত তাঁহাকে অনেক বার দেখিয়াছ।"

"কে তিনি?

তোমার খুল্ল-পিতামহ—সাধু রমানাথ।

ঠিক এই সময়ে বালিকা দুর্গা সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিল—"দাদা! বাবু আসিতেছে।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"তবে আর কি। আমি তোমাদের একত্র আহারের ব্যবস্থা করি।" বলিয়াই ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলেন। দুর্গাও পিতামহের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গেল। তাহাকেও একটা প্রশ্ন করিবার অবকাশ পাইলাম না। খুল্লপিতামহের নাম শুনিবামাত্র অন্তরে যে কি একটা আলোড়ন উপস্থিত হইল, তাহা আমি ভাষায় প্রকাশিত করিতে অক্ষম। তবে সেই সময় মনে করিয়াছিলাম, যে চক্ষু দিয়া সাধু সন্দর্শন হয়, তাহা যদি কোথাও পাই, তাহা হইলে আমার এই চর্ম্মচক্ষু দুটা সমূলে উৎপাটিত করিয়া চক্ষুগোলকে সেই আঁখি দুইটী বসাইয়া দিই।

(ক্রমশঃ)

অলৌকিক রহস্য।

৬ষ্ঠ সংখ্যা] তৃতীয় বর্ষ। [পৌষ, ১৩১৮।

কর্ম্ম।

জন্মের পর জন্ম গ্রহণ করিয়া জীব ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া থাকে। জন্মান্তর গ্রহণ আবার জীবের কর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত। কর্ম্ম বুঝিতে হইলে—কর্ম্ম ও তাহার ফল দুই বুঝিতে হইবে। এই কর্ম্ম ও তাহার ফল যেরূপ জীবের জন্ম সকল এক অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে! একটী জন্ম কর্ম্মানুসারে, পূর্ব্বেই হউক বা পরেই হউক, যে কোন জন্মের সঙ্গে এরূপ অপূর্ব্ব সম্বন্ধ বিশিষ্ট যে, একটী জন্মের পৃথক অস্তিত্ব উপলব্ধি করিবার উপায় আমাদের আদৌ নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের কারণ পরম্পরা না অনুমিত করিলে আমরা জীবের বর্ত্তমান জন্মের ঘটনাবলীর সমস্যা মীমাংসা করিতে পারি না! যখনই দেখি মূর্খ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি সমাজ মধ্যে মানের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, আর সদ্বিবেচক পণ্ডিত লোকের কাছে যোগ্য সমাদর পাইতেছেনা, যখন দেখি নিষ্ক্রিয় অলস বিনা আয়াসে সুখ সম্ভোগ করিতেছে, আর কার্য্যকুশল ও শ্রমশীল প্রাণপাত করিয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে পারিতেছে না—তখনি আমরা প্রত্যেকের জন্মান্তরের কার্য্যাবলীই এরূপ অবস্থাবৈচিত্র্যের কারণ অনুমান করি।

যেরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনের কর্ম্ম হইতে বর্ত্তমান জীবনের ফল সংগ্রহ হয়, সেইরূপ সেইফল স্বরূপ বর্ত্তমান জন্মের কর্ম্ম হইতে পরবর্ত্তী জন্ম

সকলের ফল উৎপন্ন হয়। এইরূপে কর্ম্ম ও কর্ম্মফল জন্ত-জনকভাবে পরস্পরের মুখাপেক্ষী এক বিরাট ক্রিয়া।

লোকে কথায় কথায় বলিয়া থাকে ইহা আমার কর্ম্ম। অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মের কোনও নির্দ্দিষ্ট ফল, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুবর্ত্তী হইয়া লাভ করিতেছি। এইরূপ কর্ম্মজাত বহুজন্মের সমষ্টিতে জীবের বিশাল জীবন গঠিত হইয়া থাকে। জীবের এই সকল জন্মজন্মান্তরের একটীকেও পৃথক করিবার উপায় নাই। সুতরাং কোনও একটী ঘটনার কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেও, আমরা তাহাকে আকস্মিক বলিতে পারি না। ইহা কোন না কোন পূর্ব্বানুষ্ঠিত কারণের ফল। যে কোন চিন্তা—যে কোন কার্য্য, যে কোন অবস্থা ভূতজীবনের ফল। তাহাই আবার ভবিষ্যৎ জীবনের কারণ। অজ্ঞ বলিয়া আমাদের দৃষ্টিশক্তি আবদ্ধ, তাই আমরা কোনও ঘটনার কারণানুসন্ধানে অসমর্থ হইয়া তাহাকে আকস্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করি।

অসভ্য বর্ব্বর যেমন কোনও প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ নির্ণয়ে অসমর্থ বলিয়া তাহাকে দৈব অভিধান দিয়া থাকে, সেইরূপ মানসিক ও নৈতিক কারণসমূহের অজ্ঞতাবশতঃ আমরা যে কোন কর্ম্মফল শুভ কিম্বা অশুভ অদৃষ্ট বলিয়া থাকি।

যখন আমরা বুঝিতে পারি, জীবনের সুখ দুঃখাদি ঘটনা আকস্মিক নয়, কিন্তু এক নির্দ্দিষ্ট বিধির বশবর্ত্তী হইয়া সংঘটিত হইতেছে, যখন মনে হয়, জীবমাত্রেই সেই অপরিবর্ত্তনীয় বিধির বশবর্ত্তী, তখনই আমাদিগকে জীবন সম্বন্ধে হতাশ হইতে হয়—মনে হয় আমরা যেন প্রকৃতির খেলানার স্বরূপ—তাহার ইচ্ছাতেই আমাদের সুখ, তাহার ইচ্ছাতেই আমাদের দুঃখ, তাহার ইচ্ছাতেই আমাদের জীবন, তাহার ইচ্ছাতেই আমাদের মৃত্যু—আমাদের সমস্ত অস্তিত্ব তাহার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিতেছে। স্রোতে পতিত তৃণের ন্যায়, নিরালম্ব

নিঃসহায়ভাবে আমরা কোন অকূল সাগরে ভাসিয়া যাইতেছি। তীরে উঠিবার জন্য আমাদের স্বতন্ত্র আয়াসের ফল নাই। নিজের পথানুসারী করিবার জন্য বজ্রমুষ্টির দ্বারা নিয়তি যেন আমাদিগকে ধরিয়া বসিয়াছে। আমরা ইহাকে বলি অদৃষ্ট, মুসলমান বলেন "কিস্‌মৎ," কৃশ্চান বলেন "ফেট"।

প্রাকৃতিক নিয়মের বিস্ময়কর ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিবামাত্র অসভ্য বর্ব্বরের মনেও ঐরূপ হতাশভাব জাগিয়া উঠে। তখন তাহার মনে হয়, তাহার শরীর সম্বন্ধীয় যে কোন কার্য্য অথবা প্রাকৃতিক যে কোন কার্য্য স্বতঃ ও স্বাধীনভাবে হইবার উপায় নাই। জীবনটাকে বুঝি চিরদিনই বিধির দাস করিয়া চলিতে হইবে। মানবের শত চেষ্টাতেও এই নিয়তির বিরুদ্ধে কার্য্য করা অসম্ভব।

ক্রমে ক্রমে সে বুঝিতে পারে যে, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ঘটনা সংঘটিত করিতে হইলে; যেরূপ অবস্থায় তাহা সংঘটিত হইতে পারে, প্রাকৃতিক বিধি কেবল সেই অবস্থার আভাস দেয় মাত্র। এক একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থা উপস্থিত হইলে এক একটা নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক কার্য্য সংঘটিত হয়। সেই অবস্থা উপস্থিত করা না করা মানুষের হাত। তুমি অগ্নিতে হস্ত দিলে হস্ত দগ্ধ হইবে—অগ্নিতে হস্ত দেওয়া না দেওয়া তোমার হাত।

মনুষ্য শরীর জল হইতে লঘু—জলে পড়িলে তাহার কিয়দংশ ভাসিয়া থাকিবেই থাকিবে। এদিকে পাঁচমিনিটকাল যদি মানুষের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলেই তাহার মৃত্যু সংঘটিত হয়। সন্তরণে অনভিজ্ঞ তুমি দৈবদুর্ব্বিপাকে যদি কখন জলে পড় তখন আত্মহারা না হইয়া উক্ত প্রাকৃতিক নিয়ম স্মরণ করিয়া যদি বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা তদনুযায়ী কার্য্য কর, তাহা হইলে তুমি, সাহায্য পাইতে বিলম্ব হইলেও, জীবন রক্ষা করিতে পার। কেমন করিয়া পার, বলিতেছি—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, শরীর জলে পড়িলে তাহার সামান্য অংশ জলের উপরে ভাসিয়া থাকে। যদি উপুড় হইয়া থাক, তাহা হইলে পিঠ ভাসিয়া থাকিবে—যদি সাহায্য প্রার্থনার জন্য হাত তুলিতে যাও, তাহা হইলে শরীরের অপরাংশ সমস্ত মগ্ন হইয়া হস্তের শেষভাগটী মাত্র জলের উপরে থাকিবে, সাহায্য না আসা পর্য্যন্ত যদি স্থিরভাবে চিত হইয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে নাসিকার ছিদ্র দুইটি জলের উপরে থাকিবেই থাকিবে। সুতরাং দমবন্ধ হইবার ভয় থাকিবে না। শ্বাস প্রশ্বাসক্রিয়া সম্পাদিত হয় বলিয়া সেই একমাত্র অবস্থায় জলমগ্নের জীবন রক্ষা হয়। তখন আত্মস্থ থাকিলেই জীবন। আত্মহারা হইলেই মৃত্যু। এরূপ অবস্থায় পতিত হওয়া না হওয়া তোমার হাত।

এইরূপ নানাবিধ উদাহরণ দেখাইয়া আমরা বুঝাইতে পারি যে, অবস্থাকে আয়ত্তে আনিবার কৌশল জানিলে, প্রকৃতির দাস না হইয়া আমরা নিজেই বরং তাহার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। প্রকৃতির রহস্য অবগত হইয়া বৈজ্ঞানিক যে উপায়ে বাহ্যজগতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে—সৌদামিনীকে বশে আনিয়াছে, বিহঙ্গমের ন্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক আকাশগামী হইতেছে—প্রচণ্ড জলপ্রপাতকে মানুষের সেবায় নিযুক্ত করিতেছে—অধ্যাত্ম জগতের নিয়ম জানিলে অন্তর্জগতেও আমরা সেইরূপ আধিপত্য লাভ করিতে পারি। জন্ম-জন্মান্তরকে ইচ্ছানুযায়ী আয়ত্তে আনিতে পারি।

যতদিন না কেহ প্রাকৃতিক বিধি সম্যক্ বুঝিতে সমর্থ হয়, ততদিন সে বিধির দাস। যেই সে বিধি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তখনই সে বিধির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। সংগ্রামে জয়ী হইয়া অবশেষে সে তাহার উপর আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হয়। আগে যে বিধির দাস ছিল, এমন বিধি তাহার দাস ও প্রধান সহায়।

স্থূলজগতের নিয়মাবলী অলঙ্ঘনীয় ও অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়াই বিজ্ঞানের অস্তিত্ব। এইরূপ প্রাকৃতিক বিধি না থাকিলে, বিজ্ঞান থাকিতে পারে না। পরীক্ষা দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রাকৃতিক বিধি সমুদায় অবগত হন—বুঝিতে চেষ্টা করেন প্রকৃতি কি ভাবে কার্য্য করিতেছে। এই সমস্ত যখন তিনি জানেন, তখন তিনি তাহার সাহায্যে অভিমত ফল প্রাপ্তির আশা করেন। যদি তিনি অক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি বিধির পরিবর্ত্তন হইয়াছে মনে না করিয়া সমস্যার কোন না কোন ভ্রম হইয়াছে বিশ্বাস করেন। তিনি মনে করেন, হয় তাহার জ্ঞান অসম্পূর্ণ, কিম্বা পরীক্ষায় কোন হিসাবের ভুল হইয়াছে। তখন তিনি জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা দূর করিবার অথবা ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করেন। তাহার ধ্রুব ও পূর্ণ বিশ্বাস প্রকৃতিকে প্রশ্ন করিতে ভুল না করিলে, তিনি নিশ্চয়ই তাহার সদুত্তর প্রদান করিবেন।

হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরস্পরে সম্মিলিত হইলে, এক দিন জল, অপর দিন প্রুসিক এসিড হইবে না। অর্থাৎ এক দিন জীবের জীবন স্বরূপ, অপর দিন ভীষণ বিষে পরিণত হইবে না। যে আগুন আজ হাত পুড়াইয়াছে, কাল যে সেই আগুন আবার হাত শীতল করিবে, তাহা বৈজ্ঞানিক মনেও স্থান দেয় না।

তবে যে আমরা জলকে কখন তরল কখন বা কঠিন হইতে দেখি, তাহার কারণ অবস্থাভেদ। শীতাধিক্যে জল কঠিন তুষার রূপে পরিণত হয়, আবার যোগ্য উষ্ণতা প্রাপ্ত হইলেই সেই তুষার তরল আকার ধারণ করে। অর্থাৎ পরিবর্ত্তনে আমরা জলকে বরফ আবার বরফকে জল করিতে পারি। সেইরূপ প্রকৃতির রহস্যাভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি যদি অগ্নির দাহন রহস্য বিদিত হইয়া, অবস্থার পরিবর্ত্তনে সক্ষম হন, তাহা হইলে অগ্নিতে হাত দিয়াও তিনি দাহনের হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারেন। য়্যাস্‌বেস্‌টস্ বলিয়া একরূপ সূতা আছে,

তাহা হাতে ধরিয়া উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড ধরিলেও হাতে তাপ লাগে না।

প্রাকৃতিক বিধি সম্বন্ধে যেমন আমরা নূতন নূতন রহস্য অবগত হইতে থাকি, তেমনি আমরা প্রকৃতির উপর উত্তরোত্তর আধিপত্য লাভ করিতে থাকি। প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়কে তখন আমরা আপনাদের ব্যবহারে প্রয়োগ করিতে পারি। এই জন্যই আমরা বলিয়া থাকি, জ্ঞানই বল। যেহেতু জ্ঞানের অনুযায়ীই আমরা বলের ব্যবহারে সমর্থ হই।

কোন্ কোন্ শক্তি কার্য্যের সহায়তা করে, অথবা কাহার দ্বারা কার্য্যের বিঘ্ন উপস্থিত হয়, বৈজ্ঞানিক আগে তাহা স্থির করিয়া লন। যে উপায়ে পরস্পর বিরোধী শক্তি সকলকে পরস্পরের প্রতিকূলে প্রয়োগ করিলে পরস্পরের শক্তিহীনতা উপস্থিত হয়—বৈজ্ঞানিক সেই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব হইতেই পরীক্ষার ফল অবগত হইতে সমর্থ হন—এবং কার্য্য করিয়া পূর্ব্বানুমিত ফলপ্রাপ্ত হ'ন। কারণ-পরম্পরা সম্যক বিদিত হইয়া, এবং তাহাদের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই ফল কি হইবে বলিয়া দিতে পারেন। এইরূপে প্রাকৃতিক কঠোর বিধি হইতে মানবের নিষ্ক্রিয়তা না ঘটিয়া বিবিধ অসংখ্য ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতির শক্তি অসংখ্য এবং বিভিন্নমুখী। সেই শক্তির কতকগুলির সাহায্যে একরূপ ফল, অপর কতকগুলির সাহায্যে আর একরূপ ফল। পরীক্ষায় সেই সমস্ত ফল মীমাংসিত হয়। সুতরাং প্রকৃতির সেই অসংখ্য শক্তি হইতে প্রয়োজন মত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট শক্তির সাহায্য গ্রহণ করিলে অভিমত ফল প্রাপ্তিতে আর সন্দেহ থাকে না। কিরূপ ফলের প্রয়োজন পূর্ব্বে ঠীক করিয়া লও। কোন কোন শক্তি সাহায্যে সেইরূপ ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা সেই গুলি বাছিয়া লও। কিরূপ ভাবে সেই সকল শক্তি

প্রয়োগ করিলে তুমি অভিলষিত ফল পাইতে পার, তাহা যদি তোমার জানা থাকে, তাহা হইলে সে ফল তোমার আয়ত্তে আনয়নে সংশয়ের লেশমাত্রও থাকিতে পারে না।

বিজ্ঞান না জানিলে উক্তরূপ ফল প্রাপ্তি অসম্ভব। প্রকৃতির শক্তি কর্ত্তৃক ব্যাহত হইয়া জ্ঞানহীন যে পথে প্রতিপদে ভূপতিত হয়, জ্ঞানী সেই পথে নিশ্চিন্ত ভাবে যথেচ্ছা গমন করিতে পারেন। তিনি পূর্ব্ব হইতেই গন্তব্য স্থান স্থির করিয়া লন। পূর্ব্ব হইতেই দেখিয়া, কখন বা শক্তির প্রয়োগ করিয়া, কখন বা শক্তিতে বাধা দিয়া, কখন বা শক্তি সকলের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া, অভিলষিত বিষয় লাভে সমর্থ হন। তাঁহার শুভাদৃষ্টের জন্য এ প্রাপ্তি নয়, প্রাপ্তি তাঁহার জ্ঞানের জন্য। একজন প্রকৃতির ক্রীড়নক—দাস, অন্য জন তাহার প্রভু—ইচ্ছামত প্রাকৃতিক শক্তি নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করিতে সক্ষম।

স্থূল জগত সম্বন্ধে যাহা সত্য, নৈতিক ও মানসিক জগতে তাহা সেই রূপই সত্য। স্থূল জগতের কর্ম্ম যেমন স্থূল কর্ম্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া আবার নূতন স্থুল জাগতিক কর্ম্মের কারণ হয়, সূক্ষ্ম জগত সমূহেও তদ্রূপ। এখানেও অজ্ঞ ব্যক্তি তত্তৎ জগতের বিধির দাস। জ্ঞানী সেখানে রাজত্ব করেন। এখানেও অলঙ্ঘনীয়ও অপরিবর্ত্তনীয় বিধান সমুহ, কার্য্যের বিঘ্ন স্বরূপ বোধ হইলেও, বাস্তবিক উন্নতির ও ভবিষ্যতের গতি নির্দ্দেশের উপায় স্বরূপ। মানবের অদৃষ্ট বিধির বশে নিয়মিত হয় বলিয়া মানব নিজের অদৃষ্টকে আয়ত্তাধীন করিতে পারেন। এই বিধির পরিজ্ঞান হইতেই, আত্মবিজ্ঞান উদ্ভূত হয় ইহাই মানবকে তাহার ভবিষ্যৎ আয়ত্ত করিবার শক্তি প্রদান করে। তিনি এই প্রকারে আপনার ভবিষ্যতের অবস্থা ও স্বভাব মনোমত করিয়া গড়িয়া লইতে পারেন। যদিও কর্ম্ম-বিজ্ঞান প্রথম প্রথম মানুষের মনে

কার্য্যহানির বিভীষিকা উৎপন্ন করে বটে, কিন্তু একটু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই, আমরা ইহা হইতে ভাবোদ্দীপক, সহায়ক ও উন্নতি বিধায়ক শক্তি লাভ করিয়া থাকি।

তাহা হইলে কর্ম্ম অর্থে আমরা কার্য্য কারণ বিধান বুঝিয়া থাকি। কর্ম্মের প্রকৃত অর্থ কর্ম্ম ও কর্ম্মফল। কেন না ফল হইতে যে বীজ উৎপন্ন হয়, তাহা আবার তদুৎপাদিত বৃক্ষ ও ফলের কারণ স্বরূপ।

সেণ্টপল বলিয়াছেন—কর্ম্মফল রোধে বিধাতার অভিপ্রায় ক্ষুণ্ণ হইবে, এরূপ কখনও মনে করিও না। মানুষ যেরূপ বীজ বপন করিবে, সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হইবে।

কি স্থুল জগত কি সূক্ষ্ম জগতে মানব অবিরাম চিন্তাশক্তির প্রয়োগ করিয়া আসিতেছে। এই সকল চিন্তাশক্তি তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফল। এই সকল চিন্তা ও তজ্জাত ক্রিয়া সকল গুণ ভেদে ও পরিমাণ ভেদে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। স্থুল জগজ্জাত শক্তি স্থুল জগতে কার্য্য করে, সূক্ষ্ম জগতের শক্তি সমূহ সূক্ষ্ম জগতে কার্য্য করে। যে লোকে শক্তির উৎপত্তি, সেই লোকেই তাহার কাজ।

এই সকল শক্তি শুধু যে কর্ম্মীকে আশ্রয় করে তাহা নয়, মানব তাহার চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য লোকেও এই শক্তির দ্বারা অভিহত হয়। কেন্দ্র হইতে কিরণমালা ক্রমশঃ বিস্ফারিত হইয়া যেমন চারি দিকে বিকীর্ণ হয়, শক্তি সমূহ সেইরূপে কর্ম্মীর নিকট হইতে পরিমাণানুযায়ী চারি দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত ক্রিয়াফলের জন্য কর্ম্মীই দায়ী। চুম্বকের আকর্ষণের একটা গণ্ডী আছে। এই গণ্ডীর ভিতরে লৌহ পড়িলেই তাহা চুম্বক কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়—ইহার বাহিরে চুম্বকের আর শক্তি থাকে না। চুম্বকের বলের উপর এই গণ্ডীর আকার নির্ভর করে। চুম্বক বড় হইলে গণ্ডী বড় হয়, ছোট হইলে

গণ্ডী ছোট হয়। মানবের কর্ম্মজ শক্তির ও সেইরূপ একটা গণ্ডী আছে। মানবের মানসিক বলের উপর এই গণ্ডীর আয়তন নির্ভর করে। সমধর্ম্মী বস্তু পরস্পরের উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, লৌহও সেইরূপ চুম্বককে টানিয়া থাকে। বিষম ধর্ম্মাক্রান্ত তড়িত পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সমধর্ম্মী পরস্পরকে ব্যাহত করিয়া থাকে। মানবের ক্রিয়া শক্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ। মানবের শক্তি এক দিকে যেমন কেন্দ্র হইতে বৃত্তের অভিমুখে ধাবিত হয়, অপর দিকে তেমনি বৃত্ত হইতে কেন্দ্রাভিমুখী হইয়া থাকে। এক দিকে যেমন চারি দিকের মানব তাহার শক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, সেই ব্যক্তিই তদ্রূপ আবার তাহাদের প্রতি-প্রেরিত শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহার সামগ্রী আমার আবার তাহারই কাছে ফিরিয়া আসে।

সাধারণতঃ মনুষ্য তিন প্রকারে শক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ মনোময় জগতে মানসিক শক্তি। ইহা হইতে চিন্তার উৎপত্তি। ভুবর্জগতে বাসনাশক্তি। ইহা হইতে বাসনা সকলের উৎপত্তি হয়। স্থূল জগতের শক্তি দ্বারা দৃশ্য জগতের কার্য্য কলাপ সাধিত হইয়া থাকে। আমরা ইহার প্রত্যেকের কি কি কার্য্য, এই সমস্ত কার্য্যের সমবায়ে কেমন করিয়া জটিল সমস্যাময় 'কর্ম্মের' সৃষ্টি হয়, তাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। যখন কোনও ব্যক্তি সাধারণ মানবের অপেক্ষা অধিকতর বেগে উন্নতির পথে ধাবিত হয়, এবং উচ্চতর লোক সকলে কার্য্য করিবার যোগ্যতা লাভ করেন, তখন তিনি তত্তৎজগতের শক্তি সমূহের কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া থাকেন।

পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের শক্তি বুঝিতে হইলে, পূর্ব্বেই আমাদের বুঝিতে হইবে যে ব্যক্তি শক্তির প্রয়োগ করে, এবং যে সেই শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে যে ফল উৎপন্ন হয়, এই

উভয় ফলের পার্থক্য কি। এই বিষয়টী সম্যক বুঝিতে না পারিলে, শিক্ষার্থীর এই বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ হইয়া উঠে।

আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে, প্রতিশক্তি প্রধানতঃ তাহার অনুরূপ জগতে কার্য্য করে। তৎপরে প্রতিফলিত হইয়া তন্নিমগ্ন জগতে শক্তির অনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে। যে ক্ষেত্রে ইহার উদ্ভব হয়, শক্তি সেই ক্ষেত্রের বিশেষগুণ সকল লাভ করিয়া থাকে। নিম্নের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হইলে, ইহা আপনার উপযোগিতামত সেই ক্ষেত্রের সূক্ষ্ম ও স্থুল পদার্থ সকলে স্পন্দন উৎপন্ন করে। যে কারণ দ্বারা শক্তির উদ্ভব, সেই কারণই শক্তির উপযোগী ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

কর্ম্ম তিন ভাগে বিভক্ত—প্রারব্ধ, সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ। প্রারব্ধ কর্ম্ম—ইহার ফল অবশ্যম্ভাবী। ইহা পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ইহজন্মে আমাদের ভোগের উপযোগী হইয়াছে। এই কর্ম্মফল রোধ করা আমাদের অসাধ্য। এক কথায় ইহাকে আমরা নিয়তি বলিয়া থাকি।

দ্বিতীয়—সঞ্চিত কর্ম্ম। এমন কতকগুলি কর্ম্ম আছে, যাহা পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত হইলেও পরিপক্কতা লাভ করিতে পারে নাই। এই সকল কর্ম্ম আমরা বিভিন্ন মুখ ক্রিয়াশক্তিদ্বারা রোধ করিতে পারি। এ জন্মের সৎকর্ম্মে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সঞ্চিত অসৎকর্ম্মের ক্ষয় হয়, আবার অসৎকর্ম্মে সৎকর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এমন বহু লোক আছেন, যাঁহারা কর্ম্মফলে সচ্চরিত্রতা, সদ্‌বুদ্ধি লাভ করিয়াও ইহজন্মের কর্ম্মে তাহা নিস্ফল করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার কত লোক অসৎপ্রবৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও, সৎকর্ম্মের গুণে নিজের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনে সমর্থ হইয়াছেন। কত প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে কর্ম্মদোষে আমরা জড়ত্ব প্রাপ্ত লইতে দেখিয়াছি। এ সকল ঘটনা সংসারে বিরল নহে

একটু মনোযোগসহকারে, একটু ধীরভাবে সংসারের দিকে লক্ষ্য করিলে, অনেকেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন। যে জীবাত্মা হইতে এই সঞ্চিত কর্ম্মের উদ্ভব, সেই জীবাত্মাই ইহার বিলোপসাধনে সমর্থ।

তৃতীয়—ক্রিয়মান কর্ম্ম। ইহা বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্ম। ইহা আমরা নিত্য করিয়া আসিতেছি। ইহা হইতে ভাবী জীবনের ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এইবার বুঝা কর্ত্তব্য—আমরা যে সকল কার্য্য করি, তাহা শুধু আমাদেরই ফলাফল লইয়া আমাদেরই সঙ্গে আবদ্ধ থাকে না। একটী গতিশীল গোলক যদি অপর একটী গোলককে আঘাত করে, তাহা হইলে সেই গোলক গতিশীলতা লাভ করিয়া অনেক বস্তুকে আঘাত করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং একটী কর্ম্ম হইতে নানা বস্তুতে নানা ভাবের কর্ম্ম সৃষ্ট হইতে পারে। মনে কর একটী গোলা কামান হইতে বাহির হইয়া একটী বারুদাধারে আঘাত করিল—তাহাতে বারুদ জ্বলিয়া উঠিল—তাহা হইতে যে ভীমশক্তির উদ্ভব হইল, তদ্দ্বারা আমরা নানাজাতীয় ক্রিয়ার উদ্ভব অনুমান করিয়া লইতে পারি।

এইরূপে একজনের কর্ম্ম হইতে বহু লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া সমষ্টি ক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। সেই সম্বন্ধ ফলেই আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে, নির্দ্দিষ্ট পরিবারে, নির্দ্দিষ্ট জাতি মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকি; এবং সেই স্থানের, সেই পরিবারের এবং সেই জাতির সমষ্টি কার্য্যের ব্যক্তিগত অংশ গ্রহণ করিয়া থাকি।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কর্ম্মকে বিশদভাবে বুঝান কঠিন কথা। তবে ইহার প্রধান ও প্রয়োজনীয় বিষয় সকল আয়ত্ত করিয়া আমরা অনায়াসে মোটামুটি কর্ম্ম যে কি ব্যাপার তাহাই বুঝিয়া লইতে পারি। খুঁটাইয়া বুঝা সময় সাপেক্ষ তবে সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারি আর নাই

পারি, এইটী বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমরা নিজে নিজেই আপন আপন কর্ম্মের উৎপত্তি করিয়াছি। নিজের কর্ম্মের গুণে, তুমি আপনাকে ইহজন্মে শক্তিশালী করিয়াছ, অথবা কর্ম্মদোষে আপনাকে শক্তিহীন করিয়াছ। কিন্তু এই স্বকৃত কর্ম্মের ভিতরেও তোমার পৃথক সত্তা বিদ্যমান আছে। অর্থাৎ ক্ষমতাবান হইলেও তুমি তুমি, ক্ষমতাহীন হইলেও তুমি তুমি। কর্ম্মফলে কাল তুমি রাজা, আজ তুমি দরিদ্র—রাজত্ব ও দরিদ্রতা তোমার হইলেও তুমি যে জীবাত্মা তাহা ঠিক আছ; রাজা ও দরিদ্র হওয়া তোমার নিজকৃত অবস্থা। একদিন রাজা ছিলে, ইচ্ছা করিয়া আজ দরিদ্র হইয়াছ। যদি ইচ্ছা হয়, কাল আবার রাজা হইতে পার। শক্তির প্রসার ও সঙ্কোচ তোমারই ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

যে শৃঙ্খলে তুমি আবদ্ধ তুমিই তাহার কর্ম্মকার। তুমি ইচ্ছা করিলে তাহাকে আরও দৃঢ় করিতে পার, ইচ্ছা করিলে শিথিল করিতে পার। যে ঘরে তোমার বাস তাহারও কারিকর তুমি। সেই ঘরকে বড় করা, ভাঙ্গা কিম্বা পুনর্গঠিত করা তোমার ইচ্ছা।

কুম্ভকারের ন্যায় আমরা চিরদিনই নরম মাটি লইয়া মনের মত ঘট গড়িতেছি। গড়া হইয়া গেলে সেই ঘট লৌহবৎ কঠিন হয়, তখন তাহাকে আমরা আর সহজে অন্য আকারে পরিণত করিতে পারি না। কবি বলিয়াছেন ঃ—

একবার শুকাইলে মাটী, লৌহমত হয় সুকঠিন।
মাটী হতে ছাঁচে তোলা কুম্ভকারের ইচ্ছার অধীন॥
অদৃষ্ট আমার প্রভু—বশে তার আসিয়াছি আমি।
কিন্তু হায় কর্ম্মদোষ! কাল তার আমি ছিনু স্বামী॥

স্বপ্নে অপদেবতার খেলা ও দেবতা দর্শন।

গভীর নিশীথ। প্রায় রাত্রি দেড়টা আন্দাজ আমাকে এক স্বপ্ন এই প্রকৃতির গুণত্রয়ের মধ্যে দুইটি গুণ—তম ও সত্বের খেলা দেখাইয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিয়া বর্ণনা করিব। এই স্বপ্নটি সম্পূর্ণ সত্যরূপে আমার স্মরণ রহিয়াছে।

আমি দৈনিক কর্ম্মগুলি সাধারণতঃ যেরূপ ভাবে সম্পন্ন করিয়া রাত্রির কর্ম্মগুলিও সমাধান করিয়া নিজ শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রামগ্ন হই, অদ্যও সেইরূপ কর্ম্মগুলি সমাধান করিয়া নিদ্রাক্রোড়ে অভিভূত হইলাম। সেই নিদ্রাবস্থাতেই এই নিম্নলিখিত স্তোত্রটি উচ্চারণ করিলাম :—

"আধারভূতা জগতস্তমেকা মহীস্বরূপেন যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদা প্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘবীর্য্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসিমায়া।
সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতত্ত্বং বৈ প্রসন্নাভূবি মুক্তিহেতুঃ॥

এই পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে করিতে আমি এক অপরিচিত বৃহৎ প্রকারের একটি পূজার দালানের ভিতরে আনীত হইলাম। সে স্থান অতি বিভীষিকাময়। সেরূপ স্থান আমি জীবনে কখনও দেখি নাই। সেই দালানটি অতিশয় উচ্চ ও বৃহৎ এবং অত্যন্ত পুরাতন। স্থানে স্থানে ভগ্ন। নিম্নে জঙ্গলাদি পূর্ণমাত্রায় থাকায় স্থানটিকে গভীর নির্জ্জন ভাবে রাখিয়াছে। অনতিদূরে নিবিড় অরণ্য দৃষ্ট হইতেছে। ঐ অরণ্যটিতে যে ভয়ানক হিংস্র জন্তুগণের গম্ভীর নিনাদে বিকট ধ্বনি হইতেছে, তাহাই মধ্যে মধ্যে শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। প্রকৃত

স্থানটি বড়ই নির্জ্জন, অন্ধকারময় ও ভয়াবহ। সে স্থানে যে কোন জন-সমাগম আছে এরূপ বোধ হয় না। দালানটি বড়ই অপরিষ্কার। একটি পক্ষীরও বাসস্থান নাই। এতই নির্জ্জন যেন দালানটি খাঁ খাঁ করিতেছে। আমার বড়ই ভয় হইতে লাগিল।

এমন সময় আমার জনৈক সুপরিচিত বন্ধুকে নিকটস্থ হইতে দেখিলাম। বন্ধুটি আমার বড়ই অন্তরঙ্গ ও আমি তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান ও স্নেহ করিয়া থাকি। আমি তাঁহাকে সেই স্থানে দেখিতে পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। তখন তিনি নির্ভীকচিত্তে আমাকে যথেষ্ট আদর সম্ভাষণ করিয়া একটি আসনে উপবেশন করিতে বলিলেন। আমি তাঁহার কথামত আসনে উপবেশন করিলাম। তিনি আমাকে কোন কথা কহিবার সময় না দিয়া সে স্থান হইতে চকিতের ন্যায় অন্তরালে চলিয়া গেলেন। আমি আসনোপরি উপবেশন করিয়া সম্মুখস্থ সোপানগুলির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম যে, আমার আরও পাঁচটি পরিচিত বন্ধু সেই সোপানোপরি উপবেশন করিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত কথোপোকথন করিতেছেন। তদ্দর্শনে বোধ হইল, যেন এই স্থানটি ইহাঁদের সকলেরই পরিচিত। কেবল আমারই এই ভয়াবহ স্থানে কখনও আসা হয় নাই, এই প্রথম আগমন। আমি কিরূপে এখানে আসিলাম তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময়ে আমার পূর্ব্ব বন্ধু একটি খাদ্যপাত্র স্বহস্তে আনিয়া আমার সম্মুখে রাখিয়া আমাকে বিশেষরূপে আহার করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আমি তাহাকে বলিলাম, "আপনি অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন।" তিনি পুনশ্চ বিশেষ সাদর সম্ভাষণে আমাকে অনুরোধ করিয়া, 'তা হউক' বলিয়া আমার নিকট নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন।

তচ্ছ্রবণে আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমাকে লইয়া আপনি এত

ব্যতিব্যস্ত হইতেছেন কেন? আরও পাঁচটি বন্ধু রহিয়াছেন, তাঁহাদের কিছু অভ্যর্থনা করুন। এ কিরূপ আপনার অভ্যর্থনা হইতেছে? আমি বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হইতেছি যে, আপনার প্রকৃতিতে এরূপ ভাব দৃশ্য হইবে। আমার পূর্ব্বে ইহা জানা ছিল না। আপনি যে ধীর প্রকৃতির ব্যক্তি, কার্য্যতঃ সেইরূপ অদ্য দেখিতে পাইতেছি না, এ আপনার ঘোর পরিবর্ত্তন। একি আপনার থাকিবার স্থান? এ আমি কোথায় আসিলাম, আপনি বা এখানে কেন? আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এই ঘোর পরিবর্ত্তনদর্শনে আমি ভীত ভাবে আপনাকে অনেকগুলি প্রশ্ন করিলাম। কিছুই মনে—"

বন্ধু বাধা দিয়া বলিলেন,—"না! আপনি আগে কিছু খান, তারপর সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিবেন। আমি পরে বলছি—উহাদের অভ্যর্থনা পরে হইবে।"

আমি—না, আমি কিছুই খাইব না। এ সমস্ত—

বন্ধু—দেখুন খান, আমি দেবতা তা জানেন, ইহা খাইলে আপনার উপকার হইবে।

আমি বলিলাম, পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। বাস্তবিক আমার সেই বন্ধুটিকে সে রাত্রিতে যেন কিরূপ—ভাবভঙ্গিপরিবর্ত্তনে—কেমন কেমন বোধ হইল! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম।—

আমি—আপনি স্বহস্তে এই খাদ্য দ্রব্য পাক করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। স্বহস্তেই বা আনিলেন কেন?

বলিতে কি বন্ধুটি ধনী ব্যক্তি। খাদ্যদ্রব্য লইয়া তিনি নিজে আনয়ন করিয়া যে একজন বিনয়ী ব্যক্তির স্বভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বোধ হইল না। বরং সে খাদ্যাদি দেখিয়া অন্যভাব আসিয়া গেল অর্থাৎ এক অলৌকিক ভাব আসিয়া পড়িল। তজ্জন্যই আমি তাঁহাকে উক্ত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম।

বন্ধু—"আমার পাচক ব্রাহ্মণের অসুখ করিয়াছে, আমিই সমস্ত পাক করিয়াছি—"এই বলিয়া গম্ভীর বদনে—উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন। পুনশ্চ আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটা কি বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িলেন, এবং বলিলেন, "আমি গায়ত্রী।" আমি তাহার সেই গম্ভীর বদনের অসন্তোষ নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তদুত্তরে বলিলাম "তুমি ভুত।"

আমি বুঝিলাম যে, একটা ভুত আমার পরম বন্ধুর আকার ধারণ করিয়া আমার নিকট তাহার স্বার্থ সাধনের জন্য ভুতের খেলা করিতেছে। এইরূপ ভাবিতেছি, এমন সময় সে দালানের বহুসংখ্যক সোপানগুলিতে কি সব সাদা সাদা গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া বলিল,—"তুই এক কোমর নীচে যা। যা তোরা সব চলে যা—"। শুনিলাম বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, আর তাহার বিড় বিড় করিয়া মন্ত্রপড়া ও কিছু বুঝিলাম না। তৎক্ষণাৎ সে চলিয়া গিয়া একটা থামের গায়ে ঠেস্ দিয়া থামের তলদেশের অগ্রভাগে বসিয়া রহিল। আমি উঠিয়া চলিয়া যাইব স্থির করিলাম। যেমন দণ্ডায়মান হইলাম, অমনি আমার পার্শ্বের দিক হইতে একটি অপরিচিত ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিল আমি তাহাকে বলিলাম "কে তুমি? আমি তোমাকে চিনি না।" সে বলিল, "আমাকে বাবু বলিলেন যে, আপনি বসুন, যাবেন না।"

আমি—না আমি এখানে আর একটুও বসিব না। তোমরা আমাকে বিরক্ত করিও না; তোমাদের সংসর্গে আর আমি থাকিব না।

এই বলিয়া আমি পশ্চাতে ফিরিলাম। হঠাৎ পশ্চাৎ ভাগে এক অতি বিকট চীৎকারে অট্টহাস্যের রোল উঠিয়া দালানটিকে স্তম্ভিত করিয়া দিল, এবং বলিল "যাও কোথা?" আমি বিস্মিত হইলাম।

শব্দটি যেন শত লোকের বিদ্রূপ হাস্যধ্বনি অপেক্ষাও বেশী হইল। কিন্তু সে আমার কোন অনিষ্ট করিবে না, এইটি মনে উদয় হইতে না হইতেই, আমি যেন সোপান হইতে অবতীর্ণ হইতে লাগিলাম। দুই একটি সোপান অতিক্রম করিতে না করিতেই অনতিবিলম্বেই আমার জানু ভঙ্গ হইয়া যাইতে লাগিল। আরও সোপান অবতীর্ণ হইতে আমার কটিদেশ উত্থানরহিত হইবার যোগাড় হইল। আমি অমনি সোপান সাহায্যে না নামিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত সোপানপার্শ্বভাগ দিয়া লম্ফ প্রদান করিলাম। যেমন পার্শ্ব দিয়া যাইতে উদ্যত হইব, অমনি আমি শূন্যাকাশে উড্ডীয়মান হইতে লাগিলাম। পূর্ব্বে অতি নিম্নে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি অতি ঊর্দ্ধে, সেই বৃহৎ উন্নত দালান হইতে অনেক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলাম, এত ঊর্দ্ধে যে আর সেই উন্নত দালানটি দৃষ্ট হইল না।

এইরূপে উড্ডীয়মান হইতে হইতে অতি দূরদেশে নীত হইয়া একটি রম্য উদ্যান মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই সুরম্য উদ্যান মধ্যে আসিয়া একটু স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া একটু হাঁফ্ ছাড়িয়া বিশ্রাম করিলাম। দেখিলাম যে, আমার পদদ্বয় ও কটিদেশ সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

উদ্যানটি মনোরম। ইহাই স্বর্গীয় নন্দনকানন বলিয়া বোধ হইল। স্বর্গীয় নন্দনকাননের স্নিগ্ধ নির্ম্মল বায়ুসেবনে আমার প্রাণটি বেশ আনন্দানুভব করিতে লাগিল এবং এক স্থানে বসিয়া শান্ত ভাবে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলাম। এই জপ কার্য্য আমি বরাবরই করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে আরও নিবিষ্টচিত্তে কার্য্য করিতে লাগিলাম এবং আরও শান্তিসুখ উপভোগ করিতে লাগিলাম। এ একটি পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দ। ক্ষণেক পরে একটি কুণ্ডলাকার-বেষ্টিত এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ স্থিরনেত্রে ধীর ভাবে আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন 'ওঁ'

এই মন্ত্র শ্রবণমাত্র আমি বলিলাম—"তৎ সৎ"! পুরুষ বলিলেন—আমি গায়ত্রী।

আমি—না, আধেয়—গায়ত্রী আপনার আধার।

জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ—(মৃদুহাস্য পূর্ব্বক) তুমি চিনেছ; কে দেবতা, এবং কে অপদেবতা।"

আমি—"আপনার কৃপা-কণা-মাত্র। পুরুষ মৃদুহাস্যে সস্নেহ ইঙ্গিত করিলেন মাত্র। কিছু বলিলেন না। আমি বলিলাম:—

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেন যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপ স্থিতয়াত্বয়ৈতদা প্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥

এই বলিয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি প্রতি নমস্কার করিয়া বলিলেন,—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥

আমি—তুমি মহাজন। তুমি ভূঃ, তুমি ভূবঃ, তুমি স্বঃ, তুমি মহঃ, তুমি জনঃ, তুমি তপঃ, তুমি সত্যং। তুমিই তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধীয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ।

পুরুষ—ওঁ।

আমি—সৎ। আমি বুঝিলাম, যিনিই আধেয়, তিনিই আধার; সবই একাকার। আমি যথেষ্ট শান্তিসুখভোগ করিতে লাগিলাম।

ক্ষণিক পরে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখি, আমি আমার গৃহমধ্যে শয্যায় শয়ান। আমি এইরূপ জাগ্রতভাবে শয়ন করিয়া স্বপ্নের বিষয়টিতে দেবতা ও অপদেবতার পার্থক্যভাব অনেকক্ষণ ভাবিতে লাগিলাম। কতই চিন্তা, মনে আসিয়া মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল। আমি বুঝিলাম অপদেবতা স্বার্থ-সুখাম্বেষী, অন্যের অনিষ্টকারী। দেবতা শান্তিদায়ক পরোপকারী।

আমি একটু ভীত হইলাম। তখন শয়ন করিয়াই ভক্তিভাবে সর্ব্ব-মঙ্গলময়ী শান্তিদেবীকে প্রণাম করিতে লাগিলাম।

ওঁ সর্ব্ব মঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে।

এই মন্ত্রে প্রণাম করিলাম। রজনী তখনও গভীর, নীরব এবং নির্জ্জন। এ দৃশ্যটি প্রকৃতিকে বেশ গাঢ় অন্ধকারময় করিয়াছে। অগত্যা আমি ভীতমনে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া পুনশ্চ নিদ্রামগ্ন হইলাম। প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বপ্ন-বিষয়টি বেশ করিয়া লিখিয়া রাখিলাম।

যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম তাহাই এক্ষণে প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বালী।

গোধূলি-সঙ্গমে।

৫ই বৈশাখ। মন্দিরের অনতিদূরবর্ত্তী ঘাটে আজ বহুলোকসমাগম হইয়াছে। সকলেই খেয়ার নৌকায় চড়িবার জন্য ব্যস্ত নদীর পরপারে—রামবিলাসপুরের মাঠে একটা মেলা বসিয়াছে। এই মেলা দেখিবার জন্য দলে দলে নর-নারী মন্দিরের সম্মুখস্থ পথ দিয়া 'খেয়া ঘাট' অভিমুখে চলিয়াছে। তাহাদের মুখে একটা জীবন্ত উৎসাহের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা দলে দলে কোলাহল করিতে করিতে পথ চলিতেছে, আর চারিদিক যেন সজীব হইয়া উঠিতেছে। মেলাযাত্রীগণের এই সজীবতা ও গতিশীলতা হইতে আমাদের 'গোধূলি সভা'র স্থবিরমণ্ডলী যেন কত বিচ্ছিন্নভাবে দূরে বসিয়া রহিয়াছেন। গতি নাই, সঞ্চরণ নাই, জীবন নাই—স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলতা তাঁহা-

দিগকে আশ্রয় করিয়াছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন,—এই সকল মেলা-যাত্রীর মত এমনই আনন্দ-কোলাহলে চারিদিক মুখরিত করিতে করিতে আমরা ভব-পারের খেয়াঘাট অভিমুখে চলিতে পারিব কি? না, এমনই করিয়া স্থির, ধীর, নির্ব্বাক্, নিশ্চলভাবে খেয়াঘাটের অদূরে বসিয়া আমাদিগকে ভব-পয়োধির লহরী গণনা করিতে হইবে? মেলার যাত্রীদিগকে দেখিয়া বস্তুতই 'গোধূলি সভা'র বৃদ্ধগণের মনে এইরূপই ভাবেরই উদয় হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই তন্ময় হইয়া খেয়াঘাটের পানে চাহিয়াছিলেন।

তখনও পশ্চিমগগনে অস্তগত রবির হেমকিরণছটা সম্পূর্ণরূপে মিলাইয়া যায় নাই; কুলায়াভিমুখী বিহগ-বৃন্দ প্রাণ খুলিয়া তেমন করিয়া সান্ধ্যকাকলী তুলে নাই।

এমন সময়ে সহসা ডাক্তারবাবু 'গোধূলি সভা'র নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "আর এরূপভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ভাল দেখায় না। একদৃষ্টিতে খেয়াঘাটের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া লাভ কি? চুপ করিয়া সময় কাটান ভাল নয়।"

জমীদার-পুত্র। তবে আজ আপনিই না হয় একটা কিছু বলুন।

ডাক্তারবাবু। আমি আর কি বলিব? আমার নিজের ও সব বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই। কারণ পরলোক হইতে মৃত-আত্মার পুনরাগমন সম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেও আমার জীবনে সেইরূপ আত্মা বা প্রেতমূর্ত্তির দর্শন ঘটে নাই।

জমীদার পুত্র। আপনি কি কখনও কাহারও নিকট এরূপ কোন ঘটনা শুনেন নাই?

ডাক্তার। ভাল মনে করিয়াছ? হাঁ, আমার এক সহৃদয় শ্বেতাঙ্গ বন্ধুর নিকট আমি অনেকদিন পূর্ব্বে এক আশ্চর্য্য ঘটনা শুনিয়াছিলাম।

সেই ঘটনার যিনি প্রধান নায়ক, তিনি একজন বেশ দক্ষ দাবা খেলোয়াড়। আমার শ্বেতাঙ্গ বন্ধুর সহিত আবার তাঁহারও অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব। এই অদ্ভুত ঘটনা তাঁহার জীবনেই ঘটিয়াছিল।

তখন সমবেত সকলেই ডাক্তারবাবুকে সেই বিস্ময়কর ঘটনার বিষয় বলিতে অনুরোধ করিলেন।

ডাক্তার বাবুও সকলের অনুরোধরক্ষার্থ সেই বিদেশীয় ঘটনাটি তাঁহার শ্বেতাঙ্গ বন্ধুর বন্ধুটির নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন, সেইরূপই বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

"মানুষের জীবনে এমন এক একটি ঘটনা ঘটে, যাহার স্মৃতি আজীবন জাগরূক থাকিয়া যায়। শত শোক-তাপ-ব্যথার মাঝে, অশ্রান্ত কর্ম্মময় জীবনের ক্ষণিক অবসরের মধ্যে আমার জীবনে তেমনই একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল;—আজিও এই মর-জীবনের অন্তিম দশায় তাহার স্মৃতি ভুলিতে পারি নাই।

আমার পিতা কালিফর্ণিয়ার একজন বিখ্যাত রাসয়নিক বিশ্লেষক (Chemical Analyser) ছিলেন এবং তাঁহার উপার্জ্জনের মাত্রাও অত্যন্ত অধিক ছিল। সুতরাং জন্মকাল হইতে দ্বাবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আমি অতুল বিভব ও সম্পদের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন আদর ও স্নেহভোগ আমার এই দগ্ধ অদৃষ্টে ছিল না। বোধ হয়, সেই জন্য আমার পরম স্নেহময়ী জননী আমাকে হঠাৎ ত্যাগ করিয়া লোকান্তর-প্রস্থিতা হইলেন,—আমার বয়স তখন পাঁচ বৎসরের বেশী হইবে না।

আমার বেশ স্মরণ আছে, মাতার শোকে পিতা অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজকর্ম্মে তাঁহার আদৌ মনোযোগ ছিল না। এই দারুণ দুঃখের সময় তিনি সকলের সহবাস ত্যাগ করিয়াছিলেন। কেবল তাঁহার শৈশব-বন্ধু সহপাঠী জোসেফ্ কটনের সঙ্গ ছাড়েন নাই।

জোসেফ্ কটন কোন খনির ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং খনির অভ্যন্তরে কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার কালে ডিনামাইটের আকস্মিক বিস্ফোরণে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন হইয়া যায়। তিনি যখন হাঁসপাতাল হইতে এই অকর্ম্মণ্য জীবন লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন আমার পিতা অতি যত্নে তাঁহার বাল্যসুহৃদকে গৃহে স্থান দেন এবং তাঁহাকে অতি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন, যেন তিনি অনুগ্রহ করিয়া এই মাতৃহীন শিশুর—অর্থাৎ আমার শিক্ষা-ভার গ্রহণ করেন।

সুতরাং জোসেফ্ কটন একদিকে যেমন আমার পিতৃ-সুহৃদ্, অপর দিকে তেমনই আমার গৃহ-শিক্ষক ছিলেন ; তেমন স্নেহময় হৃদয় আমি আর ইহজগতে দেখিতে পাইব না।

জোসেফ কটনের এক ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল—তাহার নাম মেরী। অতি শৈশবেই মেরীর পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হয় ; সেজন্য আমার শিক্ষক মহাশয়ই তাঁহাকে লালন-পালন করিবার ভার গ্রহণ করেন। মেরী ভিন্ন তাঁহার আপনার বলিবার আর কেহ ছিল না। তিনি নিজে চির-কুমার ছিলেন।

মেরীর বয়স তখন তিন বৎসর এবং আমার বয়স পাঁচ বৎসর। আমরা দু'জনে একত্র খেলা করিতাম, খাইতাম বেড়াইতাম। মেরী দোলায় চড়িত, আমি দোলা টানিয়া তাহাকে 'দোল' খাওয়াইতাম। প্রতি প্রাতে ও সন্ধ্যায় মেরীর 'পেরাম্বুলেটর' ঠেলিতে না দিলে আমি রাগ করিতাম। কখনও মাঠের ধারে গাছের তলায় গাড়ী দাঁড় করাইয়া মেরীকে ফুল কুড়াইয়া দিতাম,—মেরী সুশুভ্র কুন্দদন্ত বিকাশ করিয়া মধুর হাসি হাসিত, আমিও আনন্দে নৃত্য করিতাম।

মানসিক প্রফুল্লতার একেবারে হ্রাস হওয়াতে আমার পিতার মস্তিষ্কের রোগ জন্মিল এবং তিনি চিকিৎসকগণের পরামর্শে সহর

ছাড়িয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য একটী পার্ব্বত্য স্বাস্থ্যাবাসে আসিলেন। সঙ্গে রহিলাম আমি, আমার গৃহশিক্ষক জোসেফ্ কটন, মেরী এবং মেরীর গভার্ণেস (Governess)।

আমরা যে বাটী ভাড়া লইয়াছিলাম, তাহার পশ্চাদ্দেশে একটী বাগান ছিল। প্রতিদিন প্রভাতে দেখিতাম, একজন মালী গাছের গোড়ার মাটী কাটিয়া দিতেছে, গাছগুলির পাতা "কেয়ারী" করিতেছে, ফলগুলিতে পাতলা ক্যাম্বিসের আবরণ দিতেছে। আমি এই সকল দেখিতে দেখিতে কোনও কোনও দিন তন্ময় হইয়া যাইতাম। আমার গৃহশিক্ষক ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই সুশিক্ষার ইঙ্গিতে উত্তরকালে আমার হৃদয় কৃষিবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল।

দুই বৎসর সেখানে থাকিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। আমার পিতা এখন বেশ সারিয়াছেন এবং নিজকার্য্যেও যথাযোগ্য মনোযোগ দিতে পারিয়াছেন।

তারপর নিরবচ্ছিন্ন সুখে প্রায় পনের বৎসর জলস্রোতের মত কাটিয়া গেল। আমি এখন গৃহ ছাড়িয়া "কর্ণেল" বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছি এবং মেরী চিকাগোর কোন কালেজে ধর্ম্ম-শাস্ত্রপাঠে নিয়োজিত আছে।

অকস্মাৎ একদিনের প্রবল ভূমিকম্পে আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বিকম্পিত হইয়া উঠিল। সেই সর্ব্বগ্রাসী ভূমিকম্পে আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। আমাদের বাসগৃহ ও পিতার বিস্তৃত ও বহুমূল্য রাসায়নিক পরীক্ষাগার ভূমিসাৎ হইল। আমার পিতা তখন পরীক্ষাগারে কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। দৈবক্রমে আমার গৃহশিক্ষক জোসেফ কটনের জীবন রক্ষা পাইয়াছিল। এই ভূমিকম্পে আমাদের সর্ব্বস্ব গেল, আমরা পথের ভিখারী হইলাম।

এই আকস্মিক জীবনচক্রের পরিবর্ত্তনে আমরাও দেশান্তরিত হইলাম। চিকাগো নগরীর প্রান্তভাগে আমার গৃহ শিক্ষকের কোন পুরাতন বন্ধুর একটি স্থুলবাটী ছিল, তিনি অনুগ্রহ করিয়া মিষ্টার কটনের কথায় তাহা ছাড়িয়া দিলেন। আমরা তিনজনে মেরী, মিঃ কটন ও আমি—সেখানে অতি কষ্টে বাস করিতে লাগিলাম।

মিঃ কটন আমাদের উভয়কে অতিশয় ভাল বাসিতেন। মেরী গৃহকর্ম্ম করিত, আর আমি সারাদিন কর্ম্মের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম। মিঃ কটন রাত্রে আমায় লইয়া বসিতেন, এবং পূর্ত্ত-বিদ্যাবিষয়ক প্রবন্ধ তিনি বলিয়া যাইতেন আর আমি লিখিতাম। এই প্রবন্ধ লিখিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, আমাদের তিন জনের তাহাতে কোনরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত।

ক্রমাগত চারি পাঁচ মাস কাল অবিশ্রান্ত চেষ্টার পর আমি কোন একটি নৈশ বিদ্যালয়ে কৃষি-বিজ্ঞানের অস্থায়ী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলাম। বেতন অতি সামান্য, কিন্তু কি করিব এই কর্ম্ম গ্রহণ করা ভিন্ন আমার গত্যন্তর ছিল না।

এখন সারাদিনমানটা বাড়ীতে বসিয়া থাকি। কোন কাজ কর্ম্ম নাই, মেরী ও আমি দুজনে বসিয়া বসিয়া সতরঞ্চ খেলি। আমার গৃহ-শিক্ষক মিষ্টার কটন সতরঞ্চ খেলায় বিশেষ দক্ষ। তিনি দুই-জনকেই 'চাল' শিখাইয়া দেন। এই দাবা খেলা আমার এখন একটা নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ক্রমাগত এক বৎসরের অভ্যাসে দাবা খেলায় আমার এরূপ নিপুণতা জন্মিয়াছে, যে এখন বাহিরে বন্ধুগণের গৃহে খেলিয়া জয়ী হইয়া আসিতাম। কচিৎ যে দিন হারিতাম, সেই 'চালের' বিষয় মিঃ কটনকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে নানা রকমের চাল শিখাইয়া দিতেন। আমি সেগুলি বেশ যত্নপূর্ব্বক মনে রাখিতাম।

আমার দুরদৃষ্টক্রমে আমার পিতৃপ্রতিম স্নেহাধার গৃহ-শিক্ষকের মৃত্যু হইল—মেরী মৃতদেহের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি মেরীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম।

মৃত্যুর পূর্ব্বে মিঃ কটন তাঁহার বন্ধু চার্লস্‌কে একখানি লিখিত কাগজ দিয়াছিলেন, আমি তাঁহার মর্ম্ম জানিতাম না। তবে তাঁহার মৃত্যুর পরও যে আমরা মিষ্টার চার্লসের বাটীতে থাকিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম, তাহা নিশ্চিতই আমার স্বর্গগত গৃহ-শিক্ষকের অনুরোধে।

এইরূপে আরও তিন মাস অতি কষ্টে কাটিল,—আর দিন চলে না। আমি সারাদিন দাবা খেলি, আর রাত্রিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান করি। একদিন শুনিলাম, আমার কর্ম্ম আর একমাস অবধি থাকিবে, তারপর থাকিবে না। আমি বিষম প্রমাদ গণিলাম। সেই দিনই মেরীকে এ কথা শুনাইলাম। মেরী বলিল, "ভাবিলে কি হইবে? ভগবান্ একটা উপায় অবশ্যই করিবেন।"

আমরা যে পল্লীতে ছিলাম, সে পল্লীর রাস্তাগুলি খুব সরু সরু ছিল। একদিন বাটীতে বসিয়া আছি, একজন মিউনিসিপালিটীর লোক আসিয়া একটা 'নোটীস' দিয়া গেল। তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল—"আর দেড় মাস পরে যে প্রশস্ত পথ এই পল্লীতে প্রস্তুত হইবে, তাহা আপনার বাটীর উপর দিয়া যাইবে। সুতরাং আপনি অনূ্ন ৩৫ দিনের মধ্যে এই বাটী খালি করিয়া দিবেন এবং এই 'নোটীস' এ বাটীর অধিকারীকে দিবেন।"

বিপদের উপর বিপদ। আমাদের সম্মুখে অভাব, দৈন্য ও নৈরাশ্যের কি মর্ম্মভেদী ছবি! মেরীর চিরপ্রফুল্ল মুখেও যেন চিন্তার ছায়া নিপতিত হইয়াছিল।

আর তিন দিন পরে আমার বিদ্যালয়ের চাকরী যাইবে—সকালে

উঠিয়া তাহাই ভাবিতেছি। মেরীর ও আমার অবস্থা কিরূপ হইবে, সেই চিন্তায় আকুল হইয়াছি। এমন সময় পিয়ন আসিয়া আমার হাতে একখানি খবরের কাগজ দিয়া গেল। সেই কাগজের একস্থলে একটী বিজ্ঞাপনের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়িল। তাহাতে এই লেখা ছিল যে—"নিউইয়র্কের কোন ধনবান ব্যক্তি মৃত্যুকালে সেখানকার একটী দাবা খেলার সভায় (Chess Institute) এককালীন বহুমুদ্রা, একটী বাটী এবং কিছু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন, এবং তাঁহারই প্রস্তাব অনুসারে একটী সতরঞ্চ ক্রীড়ার সর্ব্বজনীন প্রতিযোগিতা পরীক্ষা হইবে। যিনি এই পরীক্ষায় সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন, তাঁহাকে এককালে সহস্র পাউণ্ড পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং তিনি এই সতরঞ্চ-সভার সম্পাদক হইবেন। আরও বার্ষিক ৪০০ পাউণ্ড বেতন ও সভা-সংলগ্ন একটি বাটীও থাকিবার জন্য দেওয়া হইবে। যাঁহারা প্রতিযোগিতায় নাম দিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এক সপ্তাহের মধ্যে নিজ নিজ নাম ধাম পাঠাইবেন।" শুনিলাম, এই বিজ্ঞাপন তিন মাসেরও অধিককাল বাহির হইতেছে—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় একদিনও ইহা আমার নজরে পড়ে নাই। আর দিন নাই; আমি তাড়াতাড়ি আমার নাম ও ঠিকানা পাঠাইয়া দিলাম। তারপর পত্র পাইলাম, ১৫ই জুন আমাকে নিউইয়র্কে উপস্থিত হইতে হইবে। সেই দিন হইতে প্রতিযোগিতা-ক্রীড়ার আরম্ভ হইবে।

যাহা হউক নির্দ্দিষ্ট দিনে পরীক্ষা-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, গ্যালারি দর্শকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দুই দিকে দুই প্রস্থে খেলা আরম্ভ হইয়াছে। ক্রমে আমার পালা আসিল। সেইদিন যাহাদের সহিত খেলিলাম, প্রতিযোগিতায় তাহারা সকলে হারিয়া গেল। দ্বিতীয় দিবসেও সকলে হারিল। অপর প্রস্থেও একজন কানাডাবাসী সকল ক্রীড়ার্থীকে হারাইয়া দিয়াছিল। এইবার

তাঁহার ও আমার দুইজনের পালা। আজ তৃতীয় দিন; এইবার আমার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মানস-চক্ষে আমার স্বর্গীয় গৃহ-শিক্ষকের প্রতিমূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল,—মনে মনে ভাবিলাম হায়! আজ আপনি কোথা? আপনার স্নেহের ছাত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন, সে যেন পরীক্ষায় জয়লাভ করে!

আমার প্রতিযোগী প্রৌঢ়, আর আমি যুবক। দর্শকমণ্ডলীর সহানুভূতি আমারই দিকে বেশী। খেলা আরম্ভ হইল, চালের পর চাল, চালের পর চাল চলিতে লাগিল। ক্রমে আমার খেলা খারাপ হইয়া আসিল, বলও অনেক কমিয়া গেল। আমি প্রমাদ গণিলাম। অবশেষে আমার প্রতিযোগী আমাকে হারাইলেন, আমি "মাৎ" হইলাম। তিনি আনন্দের অত্যধিক আবেগে মুহূর্ত্তের মধ্যে ছক্ ভাঙ্গিয়া দিলেন। তাহাতে দর্শকগণের মধ্যে ও বিচারকগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। স্থির হইল, প্রথম পারিতোষিক দুইভাগে বিভক্ত করা হউক। কানাডাবাসী না হয় সেক্রেটারী হউন। কিন্তু পুরস্কারের অর্দ্ধেক টাকা এই যুবকের প্রাপ্য। আমার প্রতিযোগী তাহা শুনিলেন না, তিনি বলিলেন, "দাতার প্রস্তাব মতে প্রথম পুরস্কার সম্পূর্ণই আমার প্রাপ্য, আমি কাহাকেও অংশ দিব না। কাল পুনরায় খেলা আরম্ভ হউক, আমি বাজি নিশ্চয় জিতিব। আর ছক ভাঙ্গিয়া দিব না।" বিচারকগণের মতে তাহাই ঠিক হইল।

সেইদিন রাত্রিতে যখন নিরাশহৃদয়ে শয্যায় শয়ন করিলাম, তখন গুরুদেবের মূর্ত্তি মনে পড়িতেছিল। যখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত, তখন স্বপ্ন দেখিলাম, যেন আমার স্বর্গীয় গৃহ-শিক্ষক মিষ্টার কটন আসিয়াছেন এবং কাল খেলিতে যাইবার জন্য আমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন। আরও বলিতেছেন, ভয় নাই, কল্যকার খেলায় তুমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে। তোমার পিতা আমাকে ও

মেরীকে যেরূপ নিঃস্বার্থভাবে প্রতিপালন করিয়াছিলেন এবং তুমিও যেরূপ অকৃত্রিম ভালবাসার সহিত মেরীর ভার গ্রহণ করিয়াছ, কাল আমি তা'র একটা তুচ্ছ প্রতিদান করিব। খেলিতে যাইও, ভয় পাইও না। তিনি যাইবার সময় সেই মারাত্মক চাল বাঁচাইবার চালও যেন বলিয়া দিলেন, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

তারপর দিন আবার খেলা সুরু হইল। আবার 'ছক্' সাজান হইল। আমরা চালিতে আরম্ভ করিলাম। আমি ধীরে ধীরে খুব সাবধানে চালিতে লাগিলাম। পরিশেষে সেই ভয়ঙ্কর সন্ধিস্থানে আসিয়া পৌছিলাম, আমার প্রতিযোগী কালিকার সেই মারাত্মক চাল চালিলেন, আমাকে তাহার বিপরীতে চালিতে হইবে। আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী একটি বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। আর কত বিলম্ব করিব?—চারিদিকে অন্ধকার দেখিলাম। এই বিপদের সময় চতুঃপার্শ্বে দর্শকেরা "ভাবিয়া খেলুন", "ভাবিয়া খেলুন" বলিয়া চীৎকার করিতেছিলেন। আমার হৃদয়ে কেবল গুরুদেবের মূর্ত্তি জাগিয়াছিল।

হঠাৎ আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই চাহিয়া দেখি, আমার গুরুদেবের ছায়া-শরীর সকলের অদৃশ্যভাবে আমার দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান। তিনি বাম হস্ত প্রসারিত করিয়া ঘোড়াকে মন্ত্রীর গজের পঞ্চম ঘরে চকিতে বসাইয়া দিলেন। যেন চক্ষুর পলক ফেলিতে না ফেলিতে এই কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। আমার সর্ব্বশরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পার্শ্বে চাহিয়া দেখি, ছায়ামূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছে।

চালটি দেখিয়া প্রথমে আমার প্রতিযোগী উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। পরে যখন তাহার গুরুত্ব বুঝিতে পারিলেন, তখন তাহার

মুখ অতীব বিমর্ষ হইয়া উঠিল। তাহার পর আর পাঁচ-ছয় চাল পরেই তিনি 'মাৎ' হইলেন এবং পরাজয় স্বীকার করিলেন।

চারিদিকে দর্শকমণ্ডলী আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল।

আমি তাড়াতাড়ি মেরীকে টেলিগ্রাম করিলাম, "আমি প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়া এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পাইয়াছি। তুমি যত শীঘ্র পার, নিউইয়র্কে আসিবার জন্য প্রস্তুত হও।"

প্রেতাত্মার এ প্রতিদান, এ প্রত্যুপকার আমার অদৃষ্টের গতি ফিরাইয়া দিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—দেখুন, মরণের পরপারেও—স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের শত ব্যবধানের মধ্যেও স্নেহের আকর্ষণ কত প্রবল, প্রীতির বন্ধন কত সুদৃঢ়!

জ্যোতিষী। আপনি যেরূপ তন্ময়ভাবে 'অস্মৎ' শব্দের প্রয়োগ করিলেন, আমাদের মনে হইল, যেন এ ঘটনাটী আপনাকে লইয়াই ঘটিয়াছিল। যাক্, স্নেহের আকর্ষণ অথবা বৈরনির্য্যাতনের স্পৃহা মরিবার পরেও বর্ত্তমান থাকে। জোসেফ কটন তাহার প্রিয়তম ছাত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর দুরবস্থা দর্শনে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার প্রয়োজন দেখিতেছিল, সর্ব্বদাই এইজন্য সে চিন্তিত ছিল, কিন্তু সহায়তা করিবার একটুও সূত্র পাইতেছিল না। এখন দাবাখেলার সেই সূত্র পাইয়া কটনের মৃত আত্মা তাহার ছাত্রকে সাহায্য করিতে সমর্থ হইল।

নায়েব। জোসেফ কটনই যে আসিয়াছিলেন, তাহারই বা প্রমাণ কি? অন্য সাহায্যকারী আত্মাও তো আসিতে পারে।

জ্যোতিষী। অন্য সাহায্যকারী আত্মা কেন আসিবে? তাহার স্বার্থ কি? সে কি আকর্ষণে আসিবে?

নায়েব। না আসিবে, তাহারই বা প্রমাণ কি।

জ্যোতিষী। কখনই অপর আত্মা আসিতে পারে না। আপনি

বেশ বুঝিতেছেন, প্রতিযোগী ক্রীড়ায় একজনকে অন্যায়রূপে সাহায্য করিতে অন্য আত্মার প্রবৃত্তি হইবে কেন? স্বার্থ বা আকর্ষণ না থাকিলে এরূপ অন্যায় সাহায্য অপর কোন আত্মা করিতে পারে কি? সেইজন্যই বলিতেছি, ছাত্রের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য জোসেফ কটনের মৃত আত্মা যে আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষেত্রে তো স্নেহের আকর্ষণে মৃত আত্মার আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু আমি জানি একবার বৈরনির্য্যাতনের উদ্দেশ্যে ও তাহার প্রভুকন্যার ইষ্ট সাধনের জন্যও প্রেতের পুনরাগমন হইয়াছিল। আমি সে ঘটনার কথা কল্য বলিব।

পুরোহিত। জ্যোতিষী মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। অদ্যকারমত সভা ভঙ্গ হউক।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

জাপানের প্রেতাত্মা বিশ্বাস।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই বলিয়া পর্ব্বতবাসী তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। সেই রাত্রিতে একটী থেকশিয়ালী বত্রিশ বৎসর বয়স্কা রমণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৃহস্বামীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলিল, "গত বৎসর বসন্তের সময় আপনি অনুগ্রহ করিয়া যে শৃগালশাবকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি তাহার মাতা। আপনার নিকট আমরা এতদিন ঋণী ছিলাম। জীবিত শৃগালের যকৃৎ ব্যতীত আপনার পুত্রের ব্যারাম আরোগ্য হইবে না শুনিয়া আমি আমার সেই শাবকটীকে হত্যা করিয়া তাহার

যকৃৎটী আমার স্বামীর দ্বারা আপনার বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনদিন পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আপনাদিগকে যকৃৎ দিতে আসিয়াছিলেন তিনি আমার স্বামী। আজ আমরা আপনার ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম। এই বলিতে বলিতে সেই রমণীর গণ্ডস্থল অশ্রুজলে প্লাবিত হইয়া গেল। গৃহস্বামী ধন্যবাদ দিবার জন্য উঠিয়া বসিতে উদ্যত হইলে তাহার গাত্র সংস্পর্শে তাঁহার স্ত্রীও জাগরিত হইলেন। অনন্তর তাঁহার স্বামীকে সজলনয়নে পর্য্যাপরি উপবিষ্ট দেখিয়া তিনি ব্যস্ত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামী সমস্ত ঘটনা আমূল বর্ণনা করিলে, সতী আর ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলেন না। পশুর এই কৃতজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়া রহিলেন। পরে উভয়ে মৃত শাবকের আত্মার মঙ্গলার্থে সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরের নিকট কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে এই কথা সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িল এবং খেঁকশিয়ালিকে এইরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন।

পীড়িত বালক আরোগ্যলাভ করিয়া তাহাদের বাটীর এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থানে খেঁকশিয়ালের দেবতা "ইনারী সামা"র জন্য এক সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রবাদ আছে যে এই "ইনারী সামা", সর্ব্বপ্রথম ধানগাছের আবিষ্কার করেন। জাপানীরা "ইনারী সামা"কে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। প্রায় প্রত্যেক জাপ-গৃহে ইহার একটী মন্দির আছে। প্রত্যেক নূতন বৎসরের দ্বিতীয় মাসে নানাপ্রকার বাদ্য বাজাইয়া ইঁহার পূজা দেওয়া হয়। বালক বালিকাগণ বিশেষভাবে এই পূজা যোগদান করে।

জাপানীরা যত অর্থলোলুপ হইতেছে, "ইনারী সামা"র পূজার সরঞ্জাম তত বৃদ্ধি পাইতেছে। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম, সি, ই।

—— ————

"অলৌকিক বার্ত্তা।"

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার সন্নিকটে একটী গ্রামে শ্রীমান্—বাস করে। সে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এড্ওয়ার্ড স্কুলে আমার ছাত্র ছিল। তখন তাহার প্রশান্ত মধুর মূর্ত্তি—তাহার সরল ধার্ম্মিক ভাব দেখিয়া কত আনন্দ পাইতাম। তারপর জীবনের উপর দিয়া কত ঘটনা প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে—কত দেশ দেশান্তর ঘুরিয়াছি, তবু তাহার স্মৃতি মানসপট হইতে মুছিয়া যায় নাই। সম্প্রতি আমি ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গিয়াছিলাম। সেখানে একখানি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত দেখিয়া মালিকের নাম জিজ্ঞাসায় জানিলাম, পুস্তকখানা শ্রীমানের। তখন শ্রীমান্কে দেখিতে বড় বাসনা হইল—কারণ ধর্ম্মভাবের ভাবুক আদর্শ হিন্দু সন্তান দেখিবার সাধ কিছুদিন যাবৎ প্রাণে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাই শ্রীমান্কে দেখিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিলাম। সেই দিনই তাহার বাড়ীতে গমন করিলাম, সেখানে যাইয়া শ্রীমানের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পাঁচ বৎসরের পর শ্রীমানকে দেখিলাম। তাহার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। শরীরের রঙ অনেকটা কালো হইয়া গিয়াছে। শ্রীমান্কে তাহার ধর্ম্মজীবনের তাবৎ ঘটনা বিবৃত করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। সে যাহা বলিল তাহার সার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশ করিলাম ঃ—

সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। তখন বালক মৌলবী বাজার প্রবেশিকা বিদ্যালয়ে পাঠ করিত। সেই সময়ে মৌলবী বাজার কালী বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী শুভাগমন করেন। সন্ন্যাসীর বয়স ষোড়শ বর্ষ। ইন্দু-রেখার মত ললাটে ঘন কৃষ্ণ কেশদাম মণ্ডলাকারে ঝুলিয়া পড়িয়াছে—বাল-কন্দর্পবৎ মনোহর মূর্ত্তি। সন্ন্যাসীর পরনে গৈরিক বর্ণের ধুতি,

ও গায়ে জামা ছিল। তিনি কিন্নর কণ্ঠে গান গাইতে পারিতেন—যতদূর জানা গিয়াছিল, তাঁহার বাড়ী হুগলী জেলায়। সেই সন্ন্যাসীর কাছে শ্রীমান্ সর্ব্বদাই যাতায়াত করিত। একদিন সন্ন্যাসী তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া লইয়া এক অলৌকিক দৃশ্য দেখাইলেন। সে তাহার চক্ষুর সমক্ষে সহসা এক অপরিচিত রম্য পার্ব্বত্য প্রদেশ দেখিতে পাইল। নিজকে অপরিচিত দেহে তথায় দণ্ডায়মান দেখিল। তাহার পার্শ্বে কুটীর সম্মুখে অন্য একটি যুবককে দেখিল—সেই অপর ব্যক্তিকে তাহার ভ্রাতা বলিয়া বোধ হইল। ক্ষণেক পরে সেই স্থানে একজন সন্ন্যাসী আগমন করিলেন। সন্ন্যাসী আসিয়া অতি রূঢ় ভাষায় তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাহাতে শ্রীমান্ তাঁহাকে যষ্টির দ্বারা তাড়ন করিল, প্রহারের ফলে সন্ন্যাসীর শেষ দশা উপস্থিত হইল। তাহার মরণ সময়ে শ্রীমানের অনুতাপ হইল। সে তখন তাহার কৃতকার্য্যের জন্য অনুতাপ করিয়া সন্ন্যাসীর কাছে বর চাহিল—"আমার দুষ্কার্য্যের জন্য যে শাস্তি বিহিত হয়, পরলোকে যেন আমাকে তাহাই ভোগ করিতে হয়—কিন্তু এই বর দান কর, যাহাতে আমি পরজন্মে ধর্ম্মভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি"। সন্ন্যাসী বর প্রদান করিলেন। সহসা স্বপ্নের মত সমস্ত দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। শ্রীমান্ দেখিতে পাইল, সে কালীবাড়ীতে তরুণ সন্ন্যাসীর সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। সন্ন্যাসী কহিলেন "তুই তোর পূর্ব্ব জন্মের ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিস্। সময়ান্তরে সমস্ত বুঝিতে পারিবি"। তার পর দিবস সন্ন্যাসী শ্রীমান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই ঈশ্বর মানিস্?" সে কহিল, "নিশ্চয়ই মানি"। তখন সেই সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুই কখনও ঈশ্বরকে দেখিস্ নাই, তবু বলিতেছিস্ তাঁহাকে মানি। ঈশ্বর মানি না এই কথা তোর দ্বারা মিনিটে মিনিটে কহাইব।"

কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া

গেলেন, "আমি হিমাচলে আমার আশ্রমে যাইতেছি—সময়ে দেখা হইবে।" কিছুদিন পরে শ্রীমান্ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া চলিয়া আইসে। সেখানে হঠাৎ সূক্ষ্মদেহে সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হন ও মুহূর্ত্তের মধ্যে সূক্ষ্মদেহে তাহাকে সঙ্গে লইয়া হিমাচলের আশ্রমে গমন করেন। আশ্রমটি অতি মনোহর স্থানে অবস্থিত—নানাবিধ ফল-ভারাবনত নয়নাভিরাম পাদপরাজি আশ্রমের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। অযুত তরুতে অযুত বর্ণের সুগন্ধ পুষ্প প্রস্ফুটিত রহিয়াছে! পুষ্পোদ্যানে মাতৃমন্দির শোভা পাইতেছে। মন্দির হইতে এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে। মন্দিরে কালী মা বিরাজ করিতেছেন। মার প্রতিমা জীয়ন্ত —তিনি হাসিতেছেন—গাইতেছেন—ক্রীড়ারঙ্গ করিতেছেন। তরুণ সন্ন্যাসী ও তাহার একটি সুকুমার দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক শিষ্য মায়ের কাছে গান গাইতেছেন। সে স্বর্গীয় সঙ্গীতের প্রতি ঝঙ্কারে অমিয় উথলিয়া পড়িতেছে। কত কৃষ্ণসার বিচরণ করিতেছে, কত পক্ষী কলরবে গাইতেছে, কত আরতির ধূম উড়িতেছে। আশ্রমের পার্শ্বে একটি আঁকা বাঁকা চারু পথে একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র শুইয়া রহিয়াছে। অদূরে এক মহাশ্মশান বিরাজ করিতেছে। উপরে দোলমঞ্চের আকারে একটি রমণীয় শৈল শোভা পাইতেছে। নিম্নে রজত-সূত্রের মত একটি তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছে, এমন আশ্রমশোভা অমরাবতীতেও দুর্লভ! এই ঘটনার পর হইতে শ্রীমান্ ছয় বৎসর যাবৎ সূক্ষ্ম দেহে সেই আশ্রমে গমন করিতেছে। সেখানে সে সন্ন্যাসী ও তাহার বালক শিষ্যের সহিত মিলিত হইয়া মায়ের অর্চ্চনায় যোগদান দিয়া আসিতেছে। একদিন সন্ন্যাসী শ্রীমান্‌কে স্বহস্তে একটি কালিকা মূর্ত্তি গঠিত করিয়া পূজা করিতে আদেশ দেন। সন্ন্যাসী প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে পূজা করিবা মাত্র মৃণ্ময়ী মা চিণ্ময়ী হইয়া জীবন্ত হইয়া উঠিলেন, নৈবেদ্য আহার করিলেন, অমিয় মধুর স্বরে কত কথা

কহিলেন। বহু পুণ্যফলে শ্রীমান্ এমন ভাবে মায়ের পূজা করিয়াছেন। মৃণ্ময়ী মা চিণ্ময়ী বাঙ্‌ময়ী প্রাণময়ী হইয়া শ্রীমানের পূজা গ্রহণ করিয়াছেন।

*　　*　　*　　*

শ্রীমানের মুখে আরও অনেক অদ্ভুত কথা শুনিয়াছি। প্রাগুক্ত মহা-শ্মশান নাকি লোকপরীক্ষার স্থান। কাহার মনে কোনও দুরভিসন্ধি আছে কিনা, কেহ হাসির বিজলীর অন্তরালে অশনি লুকাইয়া রাখিয়াছেন কিনা—শ্যামবর্ণ শষ্পের ভিতর সর্প প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন কিনা, তাহার পরীক্ষার স্থান সেই শ্মশানভূমি। কেহ বিগত জীবনে কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়া থাকিলে, কিম্বা ভবিষ্যৎ জীবনে কাহার দ্বারা কোন গ্লানিজনক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবার হইলে সেই শ্মশানভূমিতে সেই সেই ঘটনার অভিনয় হয়।

এক দিবস ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নিকটবর্ত্তী কোনও গ্রামের একজন প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের বিষয় জানিতে কৌতূহলী হইয়া শ্রীমানের কয়েকজন বন্ধু শ্মশানে তাহার প্রকৃত স্বরূপ দর্শনের জন্য শ্রীমান্‌কে অনুরোধ করেন। শ্রীমান্ পরদিন সেই শ্মশানে সেই মহাপুরুষকে দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই বিজন শ্মশানে রক্ত বস্ত্র পরিহিত সেই মহাপুরুষ বিচরণ করিতেছেন দেখিতে পাইলেন। তাহার হাতে একটি ধুনি ছিল—তাহা হইতে সুগন্ধি ধূম উথিত হইয়া বায়ুমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতেছিল। শ্রীমান্ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও সেই মহাপুরুষকে দেখেন নাই। অল্পদিন পরে অন্যত্র তাহাকে দেখিয়া সেই শ্মশান-দৃষ্ট মহাপুরুষের সহিত অভিন্ন বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। একবার শ্রীমান্ তাহার তিনজন বন্ধুকে তাহার সাধনপ্রণালী শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছিল। তাহার গুরু এই কথা অবগত হইয়া শ্রীমান্‌কে বলিলেন "ইহারা খারাপ লোক, এদের

কখনও সাধন প্রণালী দিতে নাই”। তখনি তিনি শ্রীমান্‌কে লইয়া আশ্রমনিয়ে নদীতীরে উপনীত হইলেন। সেখানে যাইয়া একখানা অতি ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিলেন। শ্রীমান্ সবিস্ময়ে দেখিতে পাইলেন তাহার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুত্রয়ও তীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সন্ন্যাসী সকলকেই নৌকায় উঠিতে আহ্বান করিলেন। শ্রীমান্ তাহাদিগকে নৌকায় উঠিতে বলিল, তাহারা উঠিতে চাহিল না, কহিল “তুই কি পাগল হইয়াছিস্ যে, এই বেটার কথায় কর্ণপাত করিয়া এমন ক্ষুদ্র নৌকায় উঠিব! এখনি যে ডুবিয়া মরিবি। আমরা কোন মতেই এই প্রতারকের কথায় বিশ্বাস করিয়া প্রাণ দিতে পারিব না”। শ্রীমানের সমস্ত অনুরোধ, অনুনয় নিষ্ফল হইল। তখন সন্ন্যাসী নৌকা হইতে নামিয়া শ্রীমান্‌কে কহিলেন, তুই তাহাদিগকে নিয়া ওপারে যা। এরা তোর বন্ধু, তোর কথায় নিশ্চয় প্রত্যয় করিবে”। শ্রীমান্‌ও তাদের অনেক সাধিল, তাহাতেও ফল হইল না। শ্রীমান্ নিরুপায় হইয়া তরণী হইতে অবতরণ করিল। তখন সন্ন্যাসী কহিলেন, “দেখিলে এরা কেমন লোক. এমন লোক ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না।” সন্ন্যাসীর একটা বড় বিশেষত্ব তিনি যাহা বলেন, তাহাই তখন কার্য্য দ্বারা প্রমাণ করিয়া দেন। এক দিবস শ্রীমান্ জিজ্ঞাসা করিল “গুরুর আবশ্যকতা কি? দীক্ষা গ্রহণ না করিলে কি মানুষ অগ্রসর হইতে পারে না? সন্ন্যাসী তন্মুহূর্ত্তে তাহাকে নদী তীরে লইয়া গেলেন। নদীর উপর একটী কাষ্ঠময় সেতু ছিল। সমান্তরালভাবে সজ্জিত কাষ্ঠশ্রেণীর মাঝে মাঝে অনেকটা ব্যবধান ছিল। সন্ন্যাসী অপর তীরে গমন করিয়া শ্রীমান্‌কে সেইখানে যাইতে আদেশ করিলেন। শ্রীমান্ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াই আর পারিল না। আতঙ্কে তাহার আত্মা-পুরুষ শুষ্ক হইয়া গেল—কখন যে নিম্নে পতিত হইবে এই কথা ভাবিয়া

তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। শ্রীমানের এই অবস্থা দেখিয়া সন্ন্যাসী পলকে আসিয়া তাহাকে অপর পারে লইয়া গেলেন, তৎপরে কহিলেন "এখন দেখিলে গুরুর আবশ্যকতা কি?"

সে দিন মূর্ত্তিপূজাসম্বন্ধে লেখকের সহিত শ্রীমানের তর্ক বিতর্ক হয়। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীমান্ সূক্ষ্মদেহে আশ্রমে গেলে পর তাহার গুরুদেবের সহিত এই বিষয় সম্বন্ধে আলাপ হয়। সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ একখানি দেবীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া শ্রীমানের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, "তুই এক ঘণ্টা ঘুরিয়া আসিয়া আমাকে এই চিত্রটি ফিরাইয়া দিবি।" শ্রীমান্ এক ঘণ্টা আশ্রমসন্নিহিত শৈলমালায় ভ্রমণ করিতে লাগিল—এদিকে তাহার হস্তের ছবিটীর মস্তক হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। শ্রীমানও ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। সন্ন্যাসীকে কি উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না। যাহাই হউক এক ঘণ্টা পরে যখন ছবিটি গুরুর হস্তে প্রত্যর্পণ করিল, তখন সবে মাত্র পা দুখানির ক্ষীণ আভাস পরিদৃষ্ট হইল। শ্রীমান্ ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না।

শ্রীমান্ তিনবার সাংসারিক ঘটনায় গুরুদেবের সাহায্য চাহিয়াছে। একবার শ্রীমান্ পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণে বহির্গত হয়। সে যে সহরে কিছুদিন অবস্থান করে, তথায় একটা কুলি ডিপো আছে। সেখানে সে একটি রমণীকে দেখিতে পায়। রমণীর সঙ্গে তাহার একটি অল্পবয়স্ক সন্তান ছিল। শ্রীমানের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইলে পর তাহার করুণ কাহিনী শুনিয়া তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া নয়নে অশ্রুধারা বহিল। শ্রীমান্ নারী মাত্রকেই জননীর ন্যায় দেখে, রমণীর দুঃখ সে সহ্য করিতে পারে না। সে রমণীকে পরামর্শ দিল, যখন তাহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে লইয়া যাইবে, সে যেন কিছুতেই কুলি হইতে স্বীকার না করে। রমণী তাহার কথামতই কার্য্য করিল।

কুলি-ডিপোর কর্ত্তৃপক্ষগণ রমণীর এই আচরণে অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিল ও তাহাকে তালাবদ্ধ করিয়া একটি কুটরিতে অবরুদ্ধ রাখিল। সেইদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীমান্ কুলিডিপোতে পদার্পণ করিবা মাত্র সেখানকার লোকেরা তাহাকে তীব্রভাবে তিরস্কার করিতে লাগিল। তাহারা কহিল যে, রমণী শ্রীমানের পরামর্শেই কুলি হইতে অস্বীকার করিয়াছে।

শ্রীমান্ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া কহিল, "আমি যদি মানুষ হই তবে তোমরা এই রমণীকে রাখিতে পারিবে না।" এই কথা বলিয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিল। পথে আসিয়া শ্রীমান্ ভাবিতে লাগিল—প্রতিজ্ঞা ত করিলাম রমণীকে উদ্ধার করিব, কিন্তু রোষবশে যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা ত আমার নাই। এইকথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন আকুল হইয়া উঠিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল কথা যদি না রাখিতে পারিলাম, তবে জীবন রাখিব না। কল্যই জীবন শেষ করিব।

পরদিন তাহার জীবনের শেষদিন ভাবিয়া শ্রীমান্ চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজপথে ভ্রমণ করিতে বাহির হইল—কিন্তু কিছুতেই শান্তি পাইল না। আবার গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শয্যার আশ্রয় লইল, রজনী প্রভাত হইল, পাখী ডাকিল, সূর্য্য উঠিল। শ্রীমান্ পরলোকের যাত্রী হইবার জন্ম আয়োজন করিতেছে, এমন সময়ে কুলী ডিপো হইতে একজন লোক আসিয়া কহিল, "আপনি আমাদের কুলি ভাগাইয়া দিয়াছেন। কাল রাত্রে সেই রমণী অন্তর্হিত হইয়াছে। আপনাকে একশত টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।" শ্রীমান্ অবাক্ হইয়া সব কথা শুনিয়া পরে বলিল, "তোমরা রমণীকে তালা বন্ধ করিয়া রাখিলে, সারারাত লোক রাখিয়া পাহারা দিলে—আমি কিরূপে তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম! তোমরা এরূপ অসম্ভব কথা কেন বলিতেছ, বুঝিতে

পারি না।" সে লোক তখন শ্রীমানের কথার সারমর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়া ক্ষুণ্ণ মনে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। ইহার কিছু দিন পরে শ্রীমান্ আশ্রমে গেলে রমণী উদ্ধার বিষয়ে তাবৎ বৃত্তান্ত গুরুর নিকট শ্রবণ করিল, গুরু তাহাকে পুনর্ব্বার এরূপ না করিবার জন্য বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিলেন।

এই ঘটনার বহুদিন পরে শ্রীমানের কোন কার্য্য করিতে যাইয়া দুইটি লোক সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়। তাহার জন্য দুইটি লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে এই কথা ভাবিয়া শ্রীমান্ অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে এক দিবস আশ্রমে যাইয়া গুরু দেবের নিকট তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিতে অনুরোধ করিল—তাহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল। কিন্তু এবার তিনি তাহাকে অত্যন্ত তীব্রভাবে তিরস্কার করিলেন। কোনও প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা-প্রদর্শনে তাঁহাকে বাধ্য করিতে এবারও বিশেষ ভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন।

এই ঘটনার অনতিকাল পরেই শ্রীমান্ কয়েকজন শত্রুর হস্তে অত্যন্ত লাঞ্ছিত হয়। তাহারা তাহার নামে নানা মিথ্যা অপবাদ তুলিয়া তাহাকে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা প্রদান করে। এবার সে গুরুর নিকট তাহা-দিগকে কিছু শিক্ষা দিতে প্রার্থনা করে। আর গুরু সহ্য করিতে পারিলেন না—প্রবল রোষে তাহার নেত্রদ্বয় বহ্নিময় হইয়া উঠিল। তিনি সক্রোধে কহিলেন "তুই এরূপ করিস্ ত তোকে শেষ করিয়া আমি নিজেও শেষ হইব।"

সন্ন্যাসীর বয়স বর্ত্তমান একুশ বৎসর। অপর শিষ্যটি ষোড়শবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। শ্রীমান্ আজকালও প্রায়ই হিমাচলে যাতায়াত করে।*

---

* ১৩১৬ সালের চৈত্রের 'প্রজাশক্তি'তে উক্ত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। আমরা ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া এই পত্রিকার নামও প্রকাশিত করিলাম। বিশেষ কারণে এই বালকরূপী সাধুর নাম প্রকাশ করিলাম না। অং সং।

পুনরাগমন।

(৩৯)

ব্রাহ্মণের বাটীর ভিতর যাওয়ার পরমুহূর্ত্তেই ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলাম তিনি একাকী। তাঁহার সঙ্গে আমি খুল্লপিতামহের আগমনের প্রত্যাশা করিতেছিলাম। তাঁহাকে একাকী দেখিবামাত্র দাদামহাশয়ের আগমন সম্বন্ধে নিরাশ হইলাম। কেন হইলাম, তাহা আমি বলিতে অক্ষম। মনে মনে সংকল্প করিলাম, ডাক্তার বাবু নিজে কিছু না বলিলে, আমি দাদার সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিব না। তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম, দাদাকে না দেখিয়া তাহা করিতেও নিরস্ত হইলাম।

ডাক্তার বাবু ধীরে ধীরে আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেইদিকে আসিতে লাগিলেন। সেখানটায় একটু অন্ধকার ছিল, সুতরাং আসিতে আসিতে প্রথমে আমাকে দেখিতে পান নাই। সেই ছায়ার অন্তরাল হইতে চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত ডাক্তার বাবুর মুখ দেখিয়া আমার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। তিনি মাটীতে হাঁটিতেছেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু যেন আকাশে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অগ্নির উত্তাপে লৌহ-গোলক যেরূপ দ্যুতিময় হয়, সেইরূপ যেন একটা জ্যোতির ছটা তাঁর মুখে চোখে খেলা করিতেছে। চন্দ্রকিরণ আসিয়া, মুখে পড়িয়া সেই জ্যোতির সঙ্গে খেলায় যোগ দিয়াছে। তিনি আমার সমুপস্থিত হইয়াও আমাকে দেখিতে পাইলেন না। কালুকে দেখিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, যে বাবু আসিয়াছেন তিনি কোথায়? কালু বলিল—তোমার চোখ দুটা কোথায় রহিয়াছে বাবু? সেই কথায় অপ্রতিভ হইয়া ডাক্তার বাবু ইতস্ততঃ চাহিলেন, আমাকে দেখিলেন।

দেখিবামাত্র দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। আমি সবিস্ময়ে তাঁহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এ আপনি পাগলের মত কি করিতেছেন? ডাক্তার বাবু প্রণত অবস্থাতেই বলিলেন, গোপীনাথ, ভাই! আমি আমার কর্ত্তব্যই করিতেছি, তুমি আমাকে বাধা দিও না। তোমার কৃপাতেই আমার আজ গো-জন্মের অবসান হইয়াছে। আমি হারান মনুষ্যত্ব ফিরিয়া পাইয়াছি। তুমি আমার চির নমস্য। তোমার পিতামহের কাছে আমি মন্ত্রদীক্ষিত, তুমি সেই ইষ্টবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

তিনি দাঁড়াইলেন। উন্মত্ততার চিহ্ন দেখিবার জন্য তীব্রদৃষ্টিতে আমি তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম, দেখিলাম মুখ-সৌন্দর্য্য শান্ত, দৃষ্টি অচঞ্চল। আর দেখিলাম না, কথা কহিলাম না।

ইত্যবসরে দুর্গা ফিরিয়া আসিল। ডাক্তার বাবুকে দেখিয়াই বলিল, "ওগো! তুমি পা ধুইয়া লও, দেরি করিতেছ কেন?" ডাক্তার বাবু দুর্গাকে দেখিয়াও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। দেখিয়া আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, তিনি পাগল হইয়াছেন, এবং তাহাকে প্রণাম-রোগে ধরিয়াছে। কিন্তু দুর্গা একটীও কথা কহিল না। বিস্ময়ের সামান্য মাত্র ভাবও দেখাইল না।

প্রণামান্তর যখন ডাক্তার বাবু দাঁড়াইলেন, তখন বলিল রাত্রি অনেক হইয়াছে খাবার জিনিষ ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে, শীঘ্র আহার করিবে চল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, আমি দিদি প্রসাদ পাইয়াছি। দুর্গা বলিল তা হ'ক, আমি বলিতেছি, নহিলে দাদা দুঃখ করিবেন।

ডাক্তার বাবুর কৈফিয়ৎও শুনিলাম, দুর্গার আদেশও শুনিলাম। এই অল্প সময়েই উভয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, আর সে সম্বন্ধের বিষয়ে দুর্গা কি বুঝিয়াছে, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সমস্ত কথাবার্ত্তাগুলা আমার কাছে হেঁয়ালির মত বোধ হইল। আমি হতভম্ব হইয়া গেলাম এবং দেবাদিষ্ট-বৎ-চলিত ডাক্তার বাবুর অনুসরণ করিলাম।

(৪০)

আহারান্তে, যখন বিশ্রাম করিতে আসিলাম, তখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। গ্রামে বিজয়ার কোলাহল একরূপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামের নীরবতা আমাকে সহরবাসী বুঝিয়া, ঘনাকারে আমাকে ঘেরিয়া রহস্য করিতে আসিয়াছে। সে রহস্য আমার বড় ভাল লাগিল না। নীরবতার চাপে প্রাণটা আমার কেমন ধড়ফড় করিতে লাগিল। আহারের সময়ে আমি ডাক্তার বাবুর সহিত কোনও কথা কহি নাই। ডাক্তার বাবুও আমাকে কোনও কথা কহেন নাই।

মনে করিলাম, বিশ্রামান্তে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি সমস্ত ঘটনা আমার কাছে প্রকাশ করিবেন। কোন কথা কওয়া দূরে থাক্, তিনি আমার কাছে কেমন একটা সঙ্কোচভাব দেখাইতে লাগিলেন এবং আমার নিকট হইতে অনেক দূরে শয়নের ব্যবস্থা করিলেন। শয়নের সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, তিনি গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াছেন। একে পিতামহ সম্বন্ধে তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না স্থির করিয়াছি, তাহার দুর্ব্বোধ্য আচরণে বিস্মিত হইয়াছি। অথচ সে নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার নিদ্রা নাই। দেহ ক্লান্ত, মনও চিন্তা করিতে অশক্ত হইয়া অবসন্ন। সে যে কি ভীষণ অবস্থায় পড়িয়াছিলাম, এখনও পর্য্যন্ত ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতেছিল যেন দেহের মধ্যে জীবন-মরণের সংগ্রাম চলিতেছে। সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শব্দ উঠিল "আর কেন? ঘরে ফিরিয়া যা" শব্দটা শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলাম। বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল।

ভূত-প্রেতাদিতে বিশ্বাস না থাকিলেও নির্লজ্জ ভয়টা আমাকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিল। প্রথমে ভাবিলাম, বাহিরে হয়ত কে কাহাকে আদেশ করিতেছে, অথচ স্বরটা বাহিরের বলিয়া বোধ হইল না। অতি কষ্টে হৃদয়টাকে স্থির করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম, আবার যদি কথা শুনিতে পাই। আবার সেই গভীর নিস্তব্ধতা। তবে কি এ আমার শ্রুতি-বিভ্রম! কিন্তু আমিতো স্পষ্ট শুনিয়াছি। কে যেন সুস্পষ্ট কথায় আমার ঘরের মধ্যে, কানের কাছে আসিয়া বলিয়াছে "যা যা ঘরে ফিরিয়া যা"।

অনেকক্ষণ, আর একটা কথা শুনিব মনে করিলাম, কিন্তু একটা উচ্চিচিঙ্গ পর্য্যন্ত সে রাত্রিতে সে শব্দের অনুসরণ করিল না। কেবল নিদ্রিত ডাক্তার বাবুর নাসিকা-বিনির্গত ধ্বনি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, সেই ঘরটাকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

শ্রুতিবিভ্রম স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি, চোখেও ঘুমের আবেশ আসিয়াছে, এমন সময় আবার শব্দ উঠিল "যা যা ঘরে ফিরিয়া যা"। ভয়ে এবার আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। ঘরে দীপ জ্বলিতেছিল, তাহাও নির্ব্বাণোন্মুখ হইল। আমি ডাক্তার বাবুকে ডাকিলাম। উত্তর পাইলাম না। উচ্চতর স্বরে আবার ডাকিলাম, তাঁহার নাসিকার ধ্বনি গভীরতর হইয়া আমার স্বর ঢাকিয়া দিল। তৃতীয়বার ডাকিতে যাইতেছি, এমন সময়ে বোধ হইল যেন ডাক্তার বাবু কথা কহিতে-ছেন। যেন কা'কে কি বলিতেছেন। প্রথমে কথা অস্পষ্ট, ওষ্ঠের বাঁধ ভাঙ্গিয়া কথাগুলা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বাহির হইতে পারিতেছিল না। কথাগুলা যখন অনেকটা স্পষ্ট হইল, তখন বুঝিলাম তিনি স্বপ্নে কাহার সহিত কথা কহিতেছেন। স্বপ্নের সহচর যদিও কি বলিতেছে শুনিতে পায় নাই, কিন্তু ডাক্তার বাবুর উত্তরে প্রশ্নগুলা অনেকটা অনুমান করিয়া লইতে সমর্থ হইলাম।

ডাক্তার বাবু বলিতে লাগিলেন; কেন যাইবে? না, আমি যাইতে দিব না। কি বল্‌লি? অপরাধ? বালক কি অপরাধ করিয়াছে? ওর পিতা অপরাধী। না—না—তারই বা কি অপরাধ? তোমাদের এ গভীর রহস্য ভাগ্যবান্ ভিন্ন বুঝিতে পারে না। ওর পিতা কি বুঝিবে? মাতো ক্রোধ করে নাই, তবে তুই বেটী, এ্যাতো ক্রোধ করিতেছিস কেন? "না আমি ওকে ছাড়িব না।"

প্রশ্ন—কি, চিঠি? সকালে আসিবে? বেশ, যায় বাধা দিব না। সময়ে আসিবে তো? দেখিস্ মা! আমি ঋণী। ওর কৃপায় আমি তোর চরণ লাভ করিয়াছি। হ'ক উপলক্ষ, আমি ঋণী। তবে আয়, প্রণাম।

বহুক্ষণের আবদ্ধ দীর্ঘশ্বাস ডাক্তার বাবুর নাসিকা হইতে স্বশব্দে বহির্গত হইয়া গেল। তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। বুঝিলাম, যাহার সঙ্গে কথা কহিলেন, তিনি রমণী। আর ইহাও বুঝিলাম সে রমণী আর কেহ নহে, সেই বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী। তাহার কথা আমি অনুমানে রচিয়া লইলাম। সে কথাগুলা এই :—"যা—যা—ঘরে ফিরিয়া যা"। আমি অপরাধী, আমার উপর বৃদ্ধার ক্রোধ হইয়াছে। বৃদ্ধা আবার আমাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিল। ডাক্তার বাবু ছাড়িতে চাহিল না, প্রাতঃকালে আমার কাছে একখানা চিঠি আসিবে, সেই চিঠি পাইলেই আমি চলিয়া যাইতে চাহিব। যাইতে চাহিলে ডাক্তার বাবু বাধা দিবেন না। সময় না আসিলে কিছু হয় না, সে সময় এখনও আমার আসে নাই। তবে আসিবে। আর তখন আমি কি একটা অমূল্য-রত্ন লাভ করিব। ডাক্তার বাবু সেই রত্ন আমাকে দেওয়াইয়া ঋণ পরিশোধ করিবেন। কেন না, আমি তাহাকে আনিয়াছি, আর সেই জন্যই ঘুমন্ত ডাক্তার বাবু স্বপ্নবুড়ীর চরণ লাভ করিয়াছে। আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক আসি নাই, ঘটনাসূত্রে গঙ্গাতীরে আমার তাঁহার সহিত

দেখা হইয়াছে, তিনিই ইচ্ছা করিয়া আমার সঙ্গী হইয়াছেন। তথাপি তিনি আমার কাছে ঋণী।

আমি জাগ্রত, সত্যের আসনে অবস্থিত। ডাক্তার বাবু স্বপ্নে, মিথ্যা কল্পনার আবরণে। তথাপি তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহার স্বপ্নের মহত্ত্বকে প্রণাম করিলাম। এই সামান্য কার্য্যের জন্য যে ব্যক্তি ঋণ স্বীকার করে, তাহার মহৎ অন্তঃকরণের নিকট আমি মস্তক অবনত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বোক্ত অনুমানের সঙ্গে সঙ্গে নানা জাতি অনুমান আমার মনে খেলা করিতে লাগিল। খেলিতে খেলিতে কখনও হাসাইয়া, কখনও কাঁদাইয়া, সর্ব্বশেষে ভুলাইয়া, আমাকে ঘুম পাড়াইয়া দিল।

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

চতুর্থ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪। সূক্ষ্মদেহ।

"তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ"—৭—৯

(অগ্নিতে উত্তাপ রূপে যে শক্তি প্রকাশ পায় সে শক্তি তাঁহারই।)

"গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।"—১৫—১৩

(পৃথিবীতে মাধ্যাকর্ষণ রূপে যে শক্তির অভিব্যক্তি হয়, তাহা তাঁহারই।)

"জীবনং সর্ব্বভূতেষু।"—৭-৯

(সমস্ত জীবের প্রাণ-শক্তি।)

উপনিষদে কোথাও কোথাও এই শক্তির সাধারণ নাম দেওয়া হইয়াছে,—প্রাণ ; যেস্থলে রয়ি অর্থে জড়ভূত বুঝায়।

"স মিথুনমুৎপাদয়তে। রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চ"। প্রশ্ন—১—৪

কথন এই দুইটীকে অন্ন ও অন্নাদ,* (ক) কথন মাতরিশ্বা ও অপ্* (খ) বলা হয়। এই উভয় শক্তিই ভগবান হইতে আসিয়াছে। এই মহাপ্রাণ নানা রূপে, নানা ভাবে কার্য্য করিয়া থাকেন। আমরা যাহা "প্রাণ"-শক্তি বলিয়া এই প্রবন্ধে বিস্তার করিয়া আসিয়াছি, ইহা সেই মহা প্রাণেরই আংশিক দর্শন। ইহাকে কোন একটী বিশিষ্ট শক্তি মনে করিয়া যেন ভ্রম না হয়। কেহ যেন না মনে করেন যে, ইহার উদ্ভব, অপচয় বা তিরোভাব আছে। তাহা হইলে প্রকৃত প্রাণ বুঝা হইবে না। যাহাকে অপচয় মনে হইতেছে, তাহা কেবল ভাবান্তরে পরিণতি। যাহা তিরোভব মনে হয়, তাহাই রূপান্তরে উদ্ভব হয়।

আমরা মানবের স্থূলশরীরের বিষয় আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। তাহার ছায়াশরীর বা পিণ্ডদেহের কথা ত বলিয়াছি। এই শরীর তাহার পিণ্ডদেহের অনুরূপ। তাহার পর আমরা দেখিয়াছি কিরূপে প্রাণ পিণ্ডদেহস্থিত চক্রাবলির সাহায্যে কার্য্য করে এবং পরে ছটারূপে কিরূপে প্রত্যেক দেহ বেষ্টন করিয়া অবস্থিত থাকে। তাহাকে আমরা "স্বাস্থ্য-ওজঃ" নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছি। মানবের সর্ব্বদেহ কেবল যে এই স্বাস্থ্য-ওজঃ বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহা নয়। সূক্ষ্মদৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের দৃষ্টিতে এই ছটার উপর্য্যুপরি বিভিন্নস্তর পরিলক্ষিত হয়। তাহার একটী স্তরের সহিত মানবের পশুবৃত্তির সংস্রব। যেমন স্বাস্থ্য-ওজঃ দেখিয়াই তাহার শরীরের স্বাস্থ্যের অবস্থা

(ক)। এতাবদ্ বা ইদং সর্ব্বং। অন্নংচৈব অন্নাদশ্চ। বৃহ—১।৪।৩

(খ)। তস্মিন্ অপো মাতরিশ্বা দধাতি। ঈশ—৪

বুঝা যায়, সেইরূপ এই ছটা দর্পণের মত মানবের কামক্রোধাদি যাবতীয় চিত্তবিকার প্রতিবিম্বিত করে। ইহার বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্য প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে; অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হইলে ইহারা ধূসর বর্ণ হয় ও তাহার মধ্যে লোহিত বর্ণের অসংখ্য শলাকা চপলাভঙ্গীতে ক্রীড়া করিতে থাকে। অতিরিক্ত ভয়ে ইহা ভীষণ নীলাভ কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়।

যেমন পিণ্ড-দেহ হইতে স্বাস্থ্য-ওজঃ নির্গত হয়, সেইরূপ মানবের যে উপাদান হইতে এই কাম ওজঃ নির্গত হয়, তাহাকে আমরা কাম-দেহ বলিব। কাম-দেহ বলায়, কেহ যেন না ভাবেন যে রিপুগুলির মধ্যে কেবল কামটিই এই দেহসাহায্যে উদ্ভূত হয়; ইহা কামক্রোধাদি ষড়রিপুরই ক্রিয়াক্ষেত্র; এক কথায় কামই আমাদিগের সুখ, দুঃখাদি দ্বন্দ্ব অনুভবশক্তির ভিত্তিভূমি। এই কথাটী আমরা একটী উদাহরণ দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিব।

একটী গাছ হইতে আলোক-রশ্মিসমষ্টি দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রতিফলিত হইল, অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে প্রতিফলিত ঈথর-তরঙ্গ-প্রবাহ বাহ্যিক দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রতিঘাত করিল; সেই প্রতিঘাতে ভাণ্ডদেহের চাক্ষুষ স্নায়বিক কোষ সমুদয় স্পন্দিত হইল এবং সেই প্রকম্পন, স্থূলদেহের কেন্দ্রস্থল হইতে পিণ্ডদেহের কেন্দ্রস্থলকে আলোড়িত করিল। কিন্তু, যে পর্য্যন্ত উক্ত অন্দোলনপ্রবাহ সুখ-দুঃখ-বোধশক্তির ক্ষেত্র কামে গিয়া উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত বৃক্ষের রূপ আমাদিগের সুখদুঃখ উৎপাদক হইতে পারে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কামের দ্বারাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুনিচয় আমাদিগের সুখদুঃখপ্রদ হইয়া থাকে।

এই যে কামদেহের কথা বলা হইল, ইহাকে কেহ কেহ এষ্ট্রেল (Astral) দেহ বলেন। এই ইংরাজি কথার অর্থ হইতেছে, জ্যোতির্ম্ময়। কাম-দেহ অতিশয় জ্যোতিবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহারা ইহাকে এষ্ট্রেল

(Astral) দেহ বলেন। কামদেহ সকলের সমান হয় না; কাহারও ইহা বেশ বিকসিত, কাহারও বা ইহা অর্দ্ধস্ফুট, কাহারও বা আবার ইহা একেবারে অস্ফুট। তাহার অভিব্যক্তি যেইরূপই হউক, এই কামদেহের উপর আমাদিগের সুখদুঃখবোধ নির্ভর করে, আমাদিগের যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহাদিগের সকলেরই কেন্দ্রস্থল এই দেহে নিহিত। শাস্ত্রে যে ষটচক্রের কথা দেখা যায়, যাহাদিগের সাহায্যে যোগীর সিদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য হয়, সেই চক্রগুলিও এই কামদেহে অবস্থিত। আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি সমস্ত ব্যাপারই এই কামপ্রসূত ও কাম-প্রেরিত। এই কামই মানবের সংসারবন্ধনের মূল; আবার সেই কামদেহ বিশুদ্ধ হইলে, যখন তাহা বিশিষ্ট "আমি"কে না দেখাইয়া একত্ব বা ব্রহ্মকে দেখায়, তখন তাহাই আবার মুক্তির কারণ হয়।

যাহার কামদেহ অবিশুদ্ধ, তাহার যে ভাবরাশি উদ্ভূত হয়, তাহা পাশবিক। অতি স্থূল কাম-অণু-গঠিত তাহার দেহে যে তরঙ্গ উদ্ভূত হয়, তাহা অতি ক্ষুদ্র, অতি মন্থর। তাহার বর্ণ তত উজ্জ্বল তত মনোহর নহে; ধূসর, কৃষ্ণাভরক্ত ও হরিৎ, ইহারাই সেইরূপ দেহের সাধারণ বর্ণ, তবে ক্ষণে ক্ষণে তাহার মধ্য হইতে ক্রোধের ভীতি-উৎপাদক রক্তিমবর্ণের চপলা-বিভা অস্ত্রফলকের মত প্রকাশ পায়। মানবের অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কামদেহ পবিত্র হইতে থাকে। তখন তাহা স্থূলভূতের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্মভূতে নির্ম্মিত হইতে থাকে এবং তাহার বর্ণও উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ ও মনোহর হইতে থাকে।

(ক্রমশঃ)

অলৌকিক রহস্য।

৭ম সংখ্যা] তৃতীয় বর্ষ। [মাঘ, ১৩১৮।

ফকির সাহেব।

সেদিন বৈকালের ট্রেণ কামালপুরে আসিতে এত বিলম্ব হইয়াছিল যে, ট্রেণ হইতে নামিয়া দারোগা নরেশবাবু যখন থানায় পঁহুছিলেন, তখন গৃহলক্ষ্মীগণ দীপালোক ও শঙ্খধ্বনির সহিত সন্ধ্যাদেবীর আগমন-বার্ত্তা সঙ্গে সঙ্গে জানাইয়া দিল।

সান্ধ্য আঁধার তাহার ধূসর ম্লানছায়া, মেঘলা আকাশের জলো হাওয়ার সঙ্গে মিশাইয়া সারা প্রকৃতির উপর কি যেন একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা জাগাইয়া তুলিতেছিল; দারোগা নরেশবাবুর বুকের ভিতরও সেরূপ একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কা সান্ধ্য আকাশের ধূসর ম্লানছায়ার মত জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল।

নরেশবাবু থানায় প্রবেশ করিয়াই রাইটারকে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকার খবর কি ?"

রাইটার ম্লানভাবে বলিল, আজ্ঞে আজ আবার ৩টা চুরির ডায়েরী করেছি।

ন। কোথাকার কেস্ ?

রা। একটা কাঁটাপুকুরের আর দুইটা হরনাথপুরের, প্রথমটা ছিঁচ্‌কে ধরণের, আর দুইটা সিঁধ, তবে শেষেরটা খুব বড় রকমের। প্রায় দেড় হাজার টাকার উপর। ষ্টেসন ডায়েরীতে সমস্তই তোলা হয়েছে এবং দেখলেই সব খবর বুঝতে পারবেন।

ন। এ কটাই কি কাল রাত্রের কেস্ ?

রা। আজ্ঞে হাঁ।

শুনিয়া দারোগাবাবুর ম্লানমুখ আরো ম্লান হইয়া গেল, এবং খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক থাকিয়া বা কিছু ভাবিয়া পুনরায় বলিলেন, আস্কারার কিছু সুবিধা হয়েছে কি ?

রা। আজ্ঞা না।

নরেশবাবুর চিন্তান্বিত মুখের ভ্রূযুগল আরো কুঞ্চিত হইয়া গেল এবং কতকটা উত্তেজিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,গোয়েন্দা বেটারা কি বলে ?

রা। তারাত কোন খবর দিতে পারছে না, আর যা দিচ্ছে সে সব বাজে ; তাতে কোন কিনারাই হচ্ছে না। তবে তারা বলে যে, কোন একটা বিদেশী gangএর দ্বারা এই সব চুরি হচ্ছে।

নরেশবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন, তারা কি ছেলের হাতে মোয়া পেলে নাকি ? দেশের সন্ধানী লোক না থাকলে কি কখনো চুরি হয় ? আর ছিঁচকে চুরিগুলোও কি gangএর কাজ !

তাদের বলে দাও যে সাতদিনের মধ্যে বিশেষ কিছু খবর না দিতে পারলে, আমি তাদের সব বরতরফ করাইয়া দিয়া নূতন গোয়েন্দা বাহাল করাব !"

রা। আমি তাদের সকলকে আজ রাত্রে ১০টার পর আসবার জন্যে ডাকিয়ে পাঠিয়েছি।

নরেশবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, তা বেশ করেছ। ভাল কথা, আচ্ছা কাঁটাপুকুরের আসামী কি কিছু একরার করেছে ?

রা। আজ্ঞে না, সে বলে কিছু জানি না।

ন। আমারো তাই বোধ হয় ; তবে আর তাকে আটকে রেখে ফল কি ? বরং কালই একটা রিপোর্ট দিয়ে সদরে চালান দাও।

এই সমস্ত কথাবার্ত্তায় একটাও আশার লক্ষণ না পেয়ে নরেশবাবু

অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লেন এবং খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে, হঠাৎ দ্রুতবেগে আপিস ঘরের মধ্যে গিয়ে ডাকের সরকারী চিঠিপত্র পড়তে আরম্ভ করলেন।

চিঠির মধ্যে পুলিস সাহেবের একখানি চিঠি ছিল, তাহা ইন-স্পেক্টরের মারফৎ আসিয়াছে। পড়িয়া দেখিলেন, যা ভাবিতেছিলেন তাই,—খুব কড়া তাগিদ।

তাহাতে কামালপুর থানার সমস্ত কর্ম্মচারীকে অকর্ম্মণ্য বলা হইয়াছে, এবং যেরূপেই হউক আসামী ধরিবার জন্ম জোর হুকুম দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি যে বিশেষ টিকটিকি পুলিসের জন্ম আবেদন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিয়া পুলিস সাহেব গোয়েন্দা-বিভাগকে লোক দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং আশা করেন যে শীঘ্রই তাহার একটা ব্যবস্থা হইবে। পত্রের রসাল প্রথম অংশটুকু পড়িয়া দারোগাবাবু যেমন দুঃখিত হইলেন, আবার শেষ অংশটুকু পড়িয়া সেইরূপ একটু আশ্বস্ত হইলেন এবং সকলকে তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া হিন্দিতে বলিলেন "দেখো উস্ রোজ যো হুকুম দিয়া একদম্ ঠিক্ ঠিক্ তামিল কর্ না; রাতমে যো কোই পরদেশী কি আউর যো কোই আদমী বিনা কাম্‌সে টহলেগা, উন্ লোক্‌কা জরুর পাকড়কে হাজতমে রাখ দেনা। যো কোই আদমী হোয়, পরদেশী আউর নেহি হোয়্, একদম পাকড়কে লে আও। আউর রাতভোর পাহরা বন্দবস্ত রাখ দেও? আচ্ছি তরফসে এহি কাম ইয়াদ রাখো?"

কনেষ্টবলগণ সমস্বরে বলিল, "বহুৎ ইয়াদ হায় হুজুর, ঠিক ঠিক তামিল হোগা।"

দ। ই নেহি হোয়, আউর চোরি না বন্দ হয় তো থানাকে থানা বেলকুল বদ্‌ল—

আর বলা হইল না, দারোগাবাবু "হেরিলা অদূরে ভীষণদর্শন মূর্ত্তি।"

দুইজন কনেষ্টবল তখন এক বলিষ্ঠগঠন দীর্ঘকায় বিদেশীকে ধরিয়া আনিয়া সেলাম করিয়া বলিল, হুজুর এ আদ্‌মি আলবৎ ডাকু। বাজারকো নগিচমে এক পেড়কা বীচমে বৈঠ্ রহা ; পুছ করনেসে কুছ সাফ জবাবভি দেনে নেহি সকতা, সেরেফ কয়তা হ্যায় কি ময় ফকির হ্যায়।

লেকেন সব ঝুট, ই জরুর চোট্টা হ্যায়।

লোকটা হিন্দুস্থানী মুসলমান—শ্যামকায়, দীর্ঘবাহু ও একখণ্ড ছিন্ন মলিনবস্ত্র-পরিহিত। সে এসব কথাবার্ত্তায় কোনই মনোযোগ না দিয়া সকৌতুকে গৃহের চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছিল।

দারোগা তাহার চাঞ্চল্যহীন নির্ভীক দৃষ্টির দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়াই তৎক্ষণাৎ বুঝিয়া লইলেন যে, দাগীচোর না হইয়া যায় না, নিশ্চয়ই Jail Bird, এবং এরূপ একটা সাংঘাতিক লোককে যে রাত্রিতে আটকাইতে পারা গিয়াছে, ইহাতে মনে মনে আনন্দিত হইলেন।

আগন্তুক কিন্তু তাঁহাকে সহাস্যবদনে বহু সেলাম ও তারিফ পূর্ব্বক বহুৎ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বলিল, "বাবু সাহেব আপকো বহুৎ ভালা হোগা, খোদা আপকো কুশীল করেগা। হামকো আজ বহুৎ আরাম দিয়া।"

নরেশবাবু তার সস্মিত প্রশান্তভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমকো এত্তা খোস্ কাহে, কেঁও কি মালুম নেহি হ্যাম তোমকো হাজত দেতা হ্যায়।

আগন্তুক পুনরায় হাসিয়া বলিল "সাহেব ফকিরকো হাজত দেনে-ওয়ালা কোন্ হ্যায় ; হম্‌নে আপ আজ বহুৎ তরিবৎ কিয়া। কাঁহা

ময়দানমে গির রহতা, আউর আপকো মেহেরবাণীসে এয়সা ইমারৎমে মজেমে রহ যাগা! ইয়ে আল্লা। *

নরেশবাবু তাঁহার এই কৃতজ্ঞতা এবং নিশ্চিন্তভাব দেখিয়া আরো আশ্চর্য্য হইলেন। ভাবিলেন, হায় রে ধূর্ত্ততস্করেরা এইরূপেই বাহিরে সাধুতার ভাণ দেখায়। যাহাই হউক, যখন লোকটা নিজেকে ফকির বলিয়া পরিচয় দিতেছে, তখন যতক্ষণ না নিজমূর্ত্তি প্রকাশ পায়, ততক্ষণ সম্মানসূচক ভাবেই কথা কহা উচিত। কিন্তু ফকির বলিয়া পরিচয় দিতেছে বটে, অথচ ফকিরীর কোন লক্ষণ—পোষাক বা আসবাব নাই। সুতরাং পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ত নিজেকে ফকির বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, কিন্তু আপনার ফকিরীর ত কোনই চিহ্ন দেখছি না।

আ। বাবু সাহেব যখন ফকিরী নিয়েছি তখন চটকদারীতে কোন কাম্; ফকিরীত দিলমে আর চটকদারী ত বাহিরের জিনিস।

নরেশবাবু উত্তর শুনিয়া মনে মনে পুনরায় হাসিলেন ও ভাবিলেন যে, এখন থানার মধ্যে পড়ে জ্ঞানের কথা ত খুব বলছ, কিন্তু যে জাঁতা কলে পড়েছ আর তোমার নিস্তার নাই। চুরির একটা না একটা কিনারা হবে; কালই হুলিয়া করে থানায় থানায় পাঠাচ্ছি।

তার পর জমাদারকে ডাকাইয়া চুপি চুপি বলিয়া দিলেন যে, "ইহাকে কড়া পাহারায় রাখিয়া দাও, তবে যখন ফকির বলিয়া পরিচয় দিতেছে, তখন যেন পারত পক্ষে কোন অসম্মান বা কষ্ট না হয়, কিন্তু এমন কড়া পাহারায় রাখ্‌তে হবে যে, কোনরূপে না পলায়ন করে, এবং যদি পলায়, তা হলে তোমাদের অদৃষ্টে বিশেষ শাস্তি আছে জানবে। আর একজন মুসলমান সিপাহী দিয়ে এর খাবার বন্দোবস্ত

---

* পাঠের সুবিধার জন্য যথাসম্ভব হিন্দি কথা পরিত্যক্ত হইল।

করিয়া দিবে, যা খরচ হয় আমি দিব! তা ছাড়া নদী তীর, মাঠের জঙ্গল ও পোড়োবাড়ী প্রভৃতি বিশেষভাবে খুঁজিয়া দেখ, কেননা নিশ্চয়ই এর দলের আরো লোক আশেপাশে আছে।”

নরেশবাবু তাঁহার বন্ধুদের ভাষায় “পুলিশকুলকলঙ্ক” ছিলেন। মোটা কথায়, তাঁহাতে পৌলিশ-“সদ্‌গুণরাজির” অত্যন্ত অভাব ছিল অর্থাৎ আজকাল মধ্যে মধ্যে যে দু চারিজন সদ্বংশসম্ভূত শিক্ষিত যুবক উচ্চ আদর্শ লইয়া পুলিশ-বিভাগে প্রবেশ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তিনি যে সে উচ্চ আদর্শ কতটা প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে এখনো কোন মীমাংসা হয় নাই। তবে তাঁহার যে উপরিপাওনার সহিত বিশেষ অসদ্ভাব ছিল এবং সাধ্যমত শক্তির অপব্যবহার করিতেন না, একথা তাঁহার শত্রু-মিত্র একবাক্যে স্বীকার করিলেও তাঁহাকে যে মধ্যে মধ্যে একেবারেই বিবেক-বহির্ভূত কাজ করিতে হইত না, একথা তিনি নিজেই হলফ করিতে পারেন না।

আজকালের বাজারে যতদূর সম্ভব তিনি আচার-নিষ্ঠাবান্ ও আতিথেয় ছিলেন; সে জন্য দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁহাকে বিশেষ যুদ্ধ করিতে হইত, তবে দেশে কিছু লাখেরাজ ধান জমি ইত্যাদি থাকায় বিশেষ কষ্ট ছিল না। সাধুতার বিনিময়ে পদোন্নতির সম্বন্ধেও বিশেষ গোল হইত, কেন না যে সকল কর্ত্তারা কাজ হাঁসিল ও ডায়েরী সাফ্ দেখিতে চাহিতেন, তাঁহারা তাঁহাকে একরূপ অকর্ম্মণ্যই বলিতেন, আর যাঁহারা সততা দেখিতেন, তাঁহারা প্রশংসা করিতেন; যাহা হউক, ফলে মোটের মাথায় কতকটা কর্ম্মোন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু বর্ত্তমানে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর। প্রথম তাঁহার এলাকায় ক্রমাগত চুরি হইতেছে, কিন্তু কোন কিনারাই হইতেছে না, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার একমাত্র নবমবর্ষীয় পুত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত;

ছেলেটী একদিন জলে ডুবিয়া যায়, কিন্তু সে যাত্রায় রক্ষা পাইলেও দারুণ শ্লেষ্মাঘটিত রোগে এরূপ পীড়িত যে, ডাক্তারেরা রক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে কোন আশাই দিতেছেন না; বিশেষতঃ গত দুই দিন হইতে অবস্থা বিশেষ আশঙ্কাপ্রদ।

তার উপর কিছুতেই ছুটী পাইলেন না; শেষে ইনস্পেক্টারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া এখন দিনের বেলায় বাড়ী থাকেন, আর রাত্রিতে থানায় আসেন। বাড়ীতে অবশ্য সেবা-শুশ্রূষার লোকের বিশেষ অভাব নাই, তাই অনেকটা সুবিধা। দিনের বেলায় মনটা থানায় পড়িয়া থাকে, রাত্রি বেলায় শরীরটা থানায় থাকিলেও প্রাণটা দূর গ্রামপ্রান্তের জনবহুল আলোকিত কক্ষের একটী রুগ্ন শয্যাশীন দেহের প্রতি বার বার ছুটিতে থাকে।

তাই আজ থানায় আসিয়া বার বার চঞ্চল হইয়া ছটফট করিতে করিতে একবার ঘরে, একবার বারান্দায় পাইচারী করিতেছিলেন। ফকির তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সরকার আপকো দিলমে কুছ দুখ্ চলত্যা হায়।"

ফকিরের এই কথা শুনিয়া নরেশবাবুর বড় দুঃখেও হাসি আসিল এবং একটু কৌতুক করিবার ইচ্ছায় তাহাকে বলিলেন, "তুমি ত ফকির লোক এবং ফকিরেরা দৈববলে সিদ্ধ; আচ্ছা বল দেখি, আমার মনের দুঃখটা কি?

ফকির ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ, পারি।"

ন। বল দেখি।

ফকির মেরুদণ্ড উন্নত করিয়া স্থির হইয়া বসিল এবং দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া দক্ষিণ নাসাপুট চাপিয়া নিমীলিতনেত্রে প্রায় তিন মিনিট ধরিয়া শ্বাস করিল এবং অভ্যন্তরীণ বায়ু ঘড় ঘড় করিয়া সুস্পষ্ট সশব্দে চলাচল করিতে লাগিল। নরেশবাবু তাহার এই হিন্দু যোগীর ন্যায়

সাধনক্রিয়া দেখিয়া একটু আশ্চর্য্য হইলেন। ফকির স্থির হইয়া বলিল, "আপকো তকলিফ দুনো তরফ্‌সে—একঠো কামকে লিয়ে, আউর একঠো ঘরকে লিয়ে,—লে—কে—ন দু—স্—রা—ঠো বড়ি মুস্কিল কি বাত।"

ন। ঘরের কষ্টটা কি ঠিক বলতে পার ?

ফকির পূর্ব্ববৎ আর একবার পূরক্, রেচক ও কুম্ভক করিয়া বলিল —"আপকো লেড়কা—উসকো উমের নও কি দশ—পহেলা তালাওমে গির গিয়া—আবহি বহুৎ মুস্কিল কা বাত, বড়ি জোর বোখার ডাগ্‌দার লোগ্‌নো কুছ পাত্তা ভি নেহি সেকতা।"

নরেশবাবু বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, "লোকটা ত খুব সন্ধানী, ইহারই মধ্যে সব খবর জানিয়া লইয়াছে, সুতরাং এরূপ লোককে আটকাইয়া রাখা বিশেষ বুদ্ধিমানের কাজ হইয়াছে ; কিন্তু যতই বুজরুকি দেখাক্ না কেন, পলায়নের সুবিধা দিচ্ছি না।" পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা ইস্‌কো হাল কেয়সা ?"

ফকির পূর্ব্ববৎ শ্বাস পূর্ব্বক কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া উত্তর করিল "মৎ পুছিয়ে জনাব--বড়ি মুস্কিল কো হাল !"

লোকটা ডাকাতই হোক্ বা জুয়াচোর বুজরুকই হোক্, তাঁহার এই সঙ্কোচ আশঙ্কাময় উত্তরে নরেশের উদ্বিগ্ন হৃদয় যেন আরো একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি ব্যগ্রভাবে বলিয়া ফেলিলেন, "বলিয়ে ফকির সাহেব, কুছ্ সরম কি বাত নেহি, সাফ্ কহে দিজিয়ে।"

ফ। ক্যা কহে বাবু সাব্, আজ রাত চার বোল্‌নেসে যব জিতা রহে, তব আল্লাকো মর্জ্জি।

নরেশবাবু যদিও এতক্ষণ কতকটা কৌতুকই করিতেছিলেন, কিন্তু এই শেষ জবাব শুনিয়া তাঁহার মাথাটা একবার ঘুরিয়া গেল ; যদিও এ কয়দিন একটা নিশ্চিত অনিশ্চিতের মধ্যে দোদুল্যমানভাবে কাটিতে

ছিল, কিন্তু তবু স্নেহের মায়া একটা অজানা আশার দিকে বরাবরই টানিয়া রাখিয়াছিল। তাই এই নিশ্চিত ভবিষ্যৎ বাক্যরূপ এই ফকির-বেশীর উক্তি তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে যেন বেত্রাঘাত করিয়া সম্ভব-অসম্ভব-জনিত আরোগ্যের স্থির আশাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিতেছিল।

তিনি আবার ভাবিলেন, "এই বুজরুকের কথাটাকে এত সত্য বলিয়া মনে করিতেছি কেন? সম্ভব ইহার আগাগোড়া একটা চালাকির আবরণে ঢাকা, তবে নিজেকে এতটা কাতর করে তুলছি কেন?" কিন্তু আবার যখন দূর স্বগৃহের প্রিয়তম পুত্রের তখনকার অবস্থার বিষয় মনে জাগিতেছিল, তখনই ভয়, উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা যেন এক সঙ্গে আসিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল। পুনরায় কিছু বলিতে যাইবেন, এমন সময় কনেষ্টবল মেহের আলী দৌড়াইয়া আসিয়া খবর দিল যে, কাঁটাপুকুরের হাজতের আসামী মৃতপ্রায়। গভীর অন্ধকার রাত্রিতে অন্যমনস্ক পথিক হঠাৎ আবছায়া দেখিলে যেমন চমকিয়া উঠে, তেমনি চঞ্চল কম্পিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহে"? কনেষ্ট-বল সভয়ে বলিল "হুজুর জেরাসে শাসন কিয়া।"

তখন ব্যাপারটা কতক বুঝিতে পারিয়া, মুখভঙ্গীসহকারে বিদ্রূপের ভাষায় তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "ক্যাহে শাসন কিয়া? হুজুর!"

ভীত কনেষ্টবলকে নির্ব্বাক দেখিয়া আবার তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "ক্যাহে শাসন কিয়া জনাব? কিস্‌কা হুকুম সে কিয়া?"

বারম্বার ধমকের চোটে কনেষ্টবল বলিয়া ফেলিল যে, জমাদার ও হেডবাবুর হুকুমে এইরূপ হইয়াছে। তদবস্থায় লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক নরেশবাবু হাজত-ঘরের দিকে ছুটিলেন। তারপর ডাকাডাকি, হাঁকা-হাঁকি ও ধাক্কাধাক্কির পরও আসামীর নিস্পন্দপ্রায় দেহ যখন চরম বৈরাগ্যের ন্যায় বিশেষ কোনরূপ সাড়া দিল না, তখন বুঝিলেন যে হতভাগ্যের আসামীলীলার শেষ অঙ্কের যবনিকা পতন হইতে আর

বিলম্ব নাই, কেবল তাহার চর্ম্ম-নিম্নস্থ হৃৎপিণ্ডটী রহিয়া রহিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অন্তিম বিদায়ের উপক্রম জানাইয়া দিতেছিল। নরেশবাবু তখন প্রমাদ গণিলেন, বুঝিলেন এ অবস্থায় চিকিৎসা নিষ্ফল, কিন্তু কি যে করা যায় তাহাও স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এক একবার মনে হইতে লাগিল যে, তৎক্ষণাৎ সদরে খবর দিয়া সমস্ত অপরাধীকে বাঁধিয়া চালান দেন। কিন্তু তাহাতে আরো বিপদ, কেন না আত্ম-রক্ষার জন্য তাহারা তাঁহাকেই জড়াইবে; অম্লানবদনে বলিবে যে, দারোগাবাবুর হুকুমেই তাহারা প্রহার করিয়াছিল।

অবশেষে থানার লোকেরা পরামর্শ দিল যে, রাতারাতি লাস জ্বালাইয়া দিতে পারিলে আর বিশেষ কিছু ভয় থাকিবে না; তখন অন্ততঃ কথাটা বা ব্যাপারটা প্রকাশ হইয়া পড়িলেও প্রমাণ করিবার কিছু থাকিবে না।

কথাটা খুব যুক্তিযুক্ত হইলেও নরেশবাবু ইহাতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, এবং সম্পূর্ণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া ফকির হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কেঁও ডরতে হো বাবু? উ বাঁচ যাগা।"

কথাটা নরেশবাবুর কর্ণে যেন নূতন সুরে বাজিয়া উঠিল; হতাশ ব্যক্তি যেমন ক্ষুদ্র আশাটীকেও সযত্নে আঁকড়াইয়া ধরে, তিনিও সেইরূপ এই কথাতে যেন একটা আশার ক্ষীণ জ্যোতি দেখিলেন।

ন। ক্যায়সা বাঁচে গা,—আপকো বাৎ বড়ি তাজ্জব—উ একদম মরণেকো লায়েক হ্যায়!

ফকির দৃঢ়স্বরে বলিল, "কভি নেহি, উস্‌কো জরুর বাঁচনে হোগা।"

নরেশবাবুর মনে হইল লোকটা বলে কি, পাগল নাকি?

ফ। নেহি বাবু হাম্ বাউরা নেহি—সাচ বাৎ কহ্‌তেঁহে, আপ-লোগ্ আব্‌হি দেখলেঙ্গে।

নরেশবাবু ভাবিলেন, "বেশ কথা, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, সত্য মিথ্যা ত এখনি জান্‌তে পারা যাবে।"

ফ। আলবৎ বাঁচ যাগা, উসকো বহুৎ উমের হ্যায়, আভি বহুৎ রোজ দুনিয়ামে রহনে হোগা।

ন। ক্যায়সে?

ফ। খোদা কিসম্, আপলোক্ বাত দিজিয়ে, এয়সা কাম কভি নেহি করেগা, তব হম্ উসকো জরুর আরাম করদেগা।

সকলে ভাবিলেন, হবেও বা; কেন না এই শ্রেণীর দস্যুরা অস্ত্রাঘাতের ক্ষত শুকাইবার ও এইরূপ মারপিট ও জখম আরোগ্য করিবার এরূপ অদ্ভুত মুষ্টিযোগ জানে যে, তাহা সুসভ্য চিকিৎসাশাস্ত্রের এখনো অজ্ঞাত।

সুতরাং বর্ত্তমান বিপদ হইতে উদ্ধারের আশায় সকলে আহ্লাদ-সহকারে শপথ করিল। ফকিরের আদেশে তৎক্ষণাৎ একটী নূতন কলসী করিয়া সম্মুখস্থ পুষ্করিণী হইতে টাটকা জল আনীত হইল। ফকির সেই স্থানেই পশ্চিম মুখ হইয়া মেঝের উপর ধূলা দিয়া উর্দ্দ বা ফার্সীতে মন্ত্র লিখিয়া তদুপরি কলসীটী স্থাপন করিয়া বিড় বিড় করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল। সে মন্ত্র উর্দ্দু, ফার্সী, কি হিন্দি তাহা না বুঝা গেলেও মধ্যে মধ্যে রোজাদের ন্যায় যে ফুৎকার দিতেছিল, তাহা সকলেই দেখিতে পাইল।

মন্ত্রশেষে ফকির বলিল, "এই জল লইয়া, উহার আপাদ-মস্তক সাতবার ছিটাইয়া দিয়া, উহার চোখে ও মুখে জলের ঝাপটা মার। তারপর জ্ঞান হইলে এই জল পান করিতে দিবে ও আজ আর কিছু খাইতে দিও না এবং যেখানে যেখানে প্রহার-জনিত চিহ্ন বা ব্যথা আছে, সেখানে এই জলের পটী লাগাইয়া দাও। এখনি সুফল পাইবে।"

সকলে উৎসুক হইয়া জল লইয়া ছুটিল ; কিন্তু পাছে এই সুযোগে চম্পট দেয়, তজ্জন্য পাহারারও ত্রুটি রহিল না।

যথারীতি জল ছিটাইতে ছিটাইতে দেখা গেল যে, সেই মৃতপ্রায় দেহে রোমাঞ্চ হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে ও পুলকে সমবেত সকলে রোমাঞ্চিত হইয়া বুঝিল যে, যখন রোমাঞ্চ হইতেছে তখন নিশ্চয়ই সে শীত অনুভব করিতেছে, সুতরাং প্রাণশক্তি ত লোপ পায় নাই বটে, বরং তাহার বিকাশ দেখা যাইতেছে।

আরো কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর, আসামী চক্ষু চাহিল এবং পিপাসা আছে কি না জিজ্ঞাসা করায় মাথা নাড়িয়া পিপাসা জানাইল এবং এক সঙ্গে প্রায় এক সের জল পান করিয়া সুস্থ বোধ করিল।

তখন রোগীর কথা ভুলিয়া সকলের মুখে ফকিরের কথা ফুটিল। কেহ বলিল লোকটা নিশ্চয়ই সাধু। কেহ বলিল দৈবশক্তি-সম্পন্ন। কেহ বলিল, কিছু নয় দস্যু-তস্করেরাও এরূপ অনেক মন্ত্র-তন্ত্র জানে। সমালোচনা যাহাই হউক, এই অভাবনীয় ঘটনায় সকলেই যে আনন্দিত হইল এবং মনে মনে যে কতকটা ফকিরের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইল, তাহা স্থির।

নরেশবাবু দৌড়াইয়া আসিয়া কৃতজ্ঞতাভরে ফকিরকে বলিলেন, আপনার বহুৎ মেহেরবাণী, কেবল আপনার মর্জ্জিতেই লোকটা রক্ষা পাইয়াছে।

ফকির মুখ তুলিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, বাবা আমার কোন কেরামতি নাই, যদি কোন মর্জ্জি বা মেহেরবাণী থাকে ত, সে একমাত্র আল্লাতালার ; লোকটার পরমায়ু ছিল—তাই রক্ষা পাইয়াছে, নহিলে আমিত আমি, আমার পীর আসিলেও কিছু হইত না।

নরেশবাবুর প্রাণে তখন তাঁহার পুত্রের কথাই জাগিতেছিল ; অপত্যস্নেহ বড়ই প্রবল। বিশেষতঃ লোকটা যা বলিয়াছে, তা কি

সত্য ? যাহা হউক, যখন কিছু শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তখন দেখা যাউক্ ইঁহার দ্বারা যদি কিছু উপকার সম্ভব হয়। সেইজন্য একটু থামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা আমার লেড়কার বিষয় যা বলেছিলেন তা কি সত্য।

ফ। বাবা, মানুষে কি কোন কথা ঠিক জোর করে বল্‌তে পারে ? তবে আমার কথাত বলেই দিয়াছি, যদি আজ রাত্রি ৪টা কাটিয়া যায়, তবে আশা আছে। কথাটা বড়ই মর্ম্মান্তিক, অন্ততঃ নরেশবাবুর পক্ষে।

ন। ইহার কি কোন উপায় নাই ?

ফকির নীরবে ঊর্দ্ধদিকে অঙ্গুলি বাড়াইল, উদ্দেশ্য ভগবান্ যদি কিছু করেন।

ন। আপনার দৈবশক্তি আছে, তা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি।

তার পর ফকিরের হাত দুইটী ধরিয়া কাতরভাবে ছলছলনেত্রে বলিলেন, আমার বিশ্বাস আপনি মনে করলে বাঁচাতে পারেন, দোহাই আমার ছেলেটাকে রক্ষা করুন।

ফকির প্রায় পাঁচ মিনিট চুপ করিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা দেখি, খোদা কি করেন, তবে কোন আশা দিতে পারি না !

নরেশবাবুর বুকের ভিতর ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল।

ফকির্ ধীরে ধীরে উঠিয়া পরিধানের বস্ত্রটী খুলিয়া ফেলিল। ন্যাঙ্গটা-পরিহিত তাহার দীর্ঘাকার উলঙ্গ মূর্ত্তি রাত্রির অন্ধকারে যেন ভীষণ দেখাইতে লাগিল।

ধীরে ধীরে মৃদু পদসঞ্চারে গুণগুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে ফকীর যেন উদাসভাবে সম্মুখস্থ পুষ্করিণীর জলের নিকট গিয়া দাঁড়াইল।

তীক্ষ্ণদৃষ্টি সন্দিগ্ধচিত্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর প্রতিপদে ভয় হইতেছিল, বুঝিবা এই সুযোগে দৌড়াইয়া পালায়; কিন্তু নিজে তখন যেন কতকটা বাক্‌শক্তিহীন।

ফকির পলাইল না, জলে নামিয়া তিনবার মুখ প্রক্ষালন করিয়া তিনটী ডুব দিয়া, নিকটস্থ অশ্বথবৃক্ষের পশ্চিম দিকের যে ডালটী সর্ব্বাপেক্ষা জলের দিকে ঝুঁকিয়াছিল তাহারই একটা আগা ভাঙ্গিয়া লইয়া পুষ্করিণীর চাতালের উপর, ডালটী হস্তে লইয়া পশ্চিমমুখ হইয়া স্থিরাসনে বসিল।

নরেশবাবু দুর্গানাম জপিতে জপিতে, ফকিরকেই তখনকারমত একমাত্র বিপত্তারণ মনে করিয়া নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির-দৃষ্টিতে ফকিরের প্রতি দেখিতে লাগিলেন।

যদিও তখন আকাশ ধরিয়াছে, কিন্তু বাহিরে তখনও জমাট অন্ধকার। কেবল শূন্যে পরিষ্কার নীল আকাশের তারাগুলি ঝকঝক করিয়া পৃথিবীকে আলোকিত করিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল। বাহিরের অন্ধকার যেন তাঁহার মনের ভিতর যাইয়া আরো জমাট বাঁধিতেছিল, কেবল তারাগুলির মত ফকিরের শেষ চেষ্টা মনের মধ্যে যেন একটা ক্ষীণ বর্ত্তিকা জ্বালাইবার চেষ্টা পাইতেছিল।

ফকির ও নরেশবাবু কতক্ষণ এরূপভাবে ছিলেন, তা ঠিক বলা যায় না। তবে দেওয়ালস্থিত ঘড়িটী যখন সশব্দে রাত্রি ৪টা জানাইয়া দিল, তখন নরেশবাবু মূর্চ্ছা যান নাই ইহা স্থির হইলেও, তাঁহার নিজের উপর কোন শক্তিই ছিল না। একবার তাঁহার বাটী, শয়নগৃহ, রুগ্ন পুত্রের মুখ মনে পড়িল, মনে হইল বুঝিবা সব শেষ। কল্পনায় যেন একবার মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন, পুত্রের শেষ দশা দেখিতে লাগিলেন; কাল্পনিক যাতনায় চক্ষু অশ্রুধারা ছুটাইয়া দিল।

এমন সময় ফকির লম্ফ দিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "ইয়ে বিসমিল্লা, কুছ ডর নেহি, বাঁচ গিয়া বাবু সাব্।"

এ [illegible] কতটা গাঁজাখুরী ও কতটা সত্য, এ সন্দেহ তখন নরেশবাবুর মনেই জাগিল না। আশ্বাসবাণী শুনিয়া যেন বুকের উপর

ক। এখন ঔষধ খাওয়ান্, আর না খাওয়ান্ তাতে কিছুই আসিয়া যাইবে না। ইহার মৃত্যুযোগ কাটিয়া গিয়াছে, এখন পাহাড় হইতে ফেলিয়া দিলেও মৃত্যু নাই; তবে ঔষধ খাওয়াইলে শীঘ্র সারিয়া উঠিতে পারিবে।

এ কথায় নরেশবাবুর যেন কয়দিনকার দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল এবং সে সময়ে বোধ হয় ইহা অপেক্ষা তাঁহার স্বর্গে মর্ত্তে আর অধিক কিছু প্রার্থনীয় ছিল না। তাই আনন্দে বলিয়া উঠিলেন যে আমার মনের ভিতর যে কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠছে, তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। তবে যে কতটা কৃতজ্ঞ হলাম, তা ভগবানই জানেন।

নরেশবাবুর বুক হইতে পাষাণ নামিয়া গেল। আনন্দে তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, ফকিরের পাদুইটী জড়াইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কিন্তু কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের পূর্ব্বেই ফকির তাঁহার হাত দুইটী ধরিয়া বলিল, "খোদা রাখা, খোদা রাখা, খোদা কি নাম লিয়ে, আউর কুছ ডর নেহি।"

তার পর অশ্বথের ডালটী নরেশবাবুর হাতে দিয়া বলিল যে, সকালে এই ডালটী তিনবার রোগীর আপাদমস্তকে বুলাইয়া দিয়া, রোগীর মাথার বালিশের নিম্নে রাখিয়া দিবেন; এবং সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইলে কোন জলাশয়ে ফেলিয়া দিবেন।

নরেশবাবু আরো দৃঢ়রূপে নিশ্চিত হইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আর ত কোন ভয় নাই ফকির সাহেব?

আনন্দে তাঁহার মুখ দিয়া ইংরাজি বুকনি বাহির হইতে লাগিল। ফকির যে ইংরাজি জানে না, সে কথা তিনি তখন ভুলিয়া গেছেন। আমাদের এমনই দুরবস্থা যে, ইংরাজি কথার প্রয়োগ না করিয়া

কিয়ৎক্ষণ শুদ্ধ মাতৃভাষায় কথা কহা আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর যদি কোনরূপ উত্তেজনা আসে, ত হিন্দি ও ইংরাজি অনর্গল ছুটিতে থাকে, সুতরাং এজন্য একা নরেশ-বাবুকেই দোষ দেওয়া যায় না।

ফ। আমার কথা যদি বিশ্বাস করেন ত বলি, এতে আমার এক বিন্দু এক্তিয়ার ছিল না, কেবল আল্লা আমার মুখ রক্ষা করিয়াছেন!

ন। যাক আর কিছু ঔষধ বা tonic খাওয়াতে হবে কি? না আপনি কিছু দৈব ঔষধ বলিয়া দিবেন।

ফ। এক কাজ করুন, কাল সকালে ঠাণ্ডা জল দিয়া মাথা ধুয়াইয়া আধপোয়া জলে একটু সালম মিছরী ও কিছু মনেক্কা ভিজাইয়া সেই জল পান করিতে দিবেন। এইরূপ তিন দিন করিবেন, তাহা হইলেই রোগের সমস্ত দোষ কাটিয়া যাইবে।

ন। By jove! This is a case of bronchitis, এরূপ ঠাণ্ডা করলে যে নিউমোনিয়া হয়ে উঠবে।

ফ। না, এটা হচ্ছে অতিরিক্ত ঔষধ সেবনের ফল। বিষম পিত্ত-কোপ হয়েছে, সেই পিত্তের প্রশমন হলেই সেরে উঠবে।

নরেশবাবু দেখিলেন যে প্রায় পাঁচটা বাজে সুতরাং আর বিলম্ব করলে ভোরের ট্রেণ পান না। সুতরাং আর কথাবার্ত্তা বন্ধ রাখিয়া, ফকিরের নিকট হাত জোড় করিয়া বিদায় লইলেন, এবং সেই সঙ্গে বলিলেন "যে যতক্ষণ না বাড়ীতে যাইয়া সমস্ত দেখি, ততক্ষণ আপনার কোন কথা বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার বিশেষ মিনতি যে আজকার দিনও আপনি থাকুন"। একটু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি চেষ্টা করিলেও যাইতে পারিবেন না! এজন্য যদি কোন অপরাধ হয় ত ক্ষমা করিবেন।"

ফকির স্বইচ্ছায় হউক অথবা উপায়ান্তর না দেখিয়াই হউক, থাকিতে সম্মত হইলে, নরেশবাবু থানায় আবশ্যকীয় উপদেশাদি দিয়া দুর্গা দুর্গা বলিয়া ষ্টেশন অভিমুখে ছুটিলেন।

সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর যদিও বিশ্রান্ত দেহ ট্রেণের দোলায় বারম্বার তন্দ্রালস হইয়া পড়িতেছিল, তথাপি দারুণ উৎকণ্ঠায় ঘুমঘোর বারম্বার ছুটিয়া যাইতেছিল; তাঁহার সে সময়কার অবস্থা যিনি ভুক্ত-ভোগী, একমাত্র তিনিই বুঝিতে পারিবেন। ট্রেণ হইতে নামিয়া গৃহে যাইবার সময় লোকের মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না, পাছে কেহ অমঙ্গলের কথা পূর্ব্বেই বলিয়া ফেলে; আবার যখনই ফকিরের আশ্বাসবাণী মনে জাগিতেছিল, তখনই সাহসে ভর করিয়া দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন। যখন গ্রামের পরিচিত লোকেরা অন্যান্য কথাবার্ত্তার পরও কোন দুঃসংবাদ দিল না, তখন বুঝিলেন যে, হয় কোন বিপদ হয় নাই, কিম্বা তাহারা গোপন করিয়া যাইতেছে।

বাড়ী পৌঁছিয়াই সদর দরজায় ছোট ভাই পরেশকে দেখিবামাত্র তাঁহার চক্ষের চাহনি নীরব ভাষায় হৃদয়ের সমস্ত উদ্বেগ একসঙ্গে জানাইয়া দিল, সুতরাং পরেশ আর কালবিলম্ব না করিয়া শুষ্কমুখে বলিয়া ফেলিল যে, এখনকার অবস্থা কতক ভাল বটে, কিন্তু কাল রাত্রি চারটের সময় অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল; তবে ডাক্তারেরা বলছে যে, এখন অবস্থা কতকটা আশাপ্রদ।

চকিতের মধ্যে তিনি বুঝিয়া লইলেন যে, পুত্র এখনো জীবিত এবং অবস্থা কতকটা আশাপ্রদ; তাঁহার পক্ষে আপাততঃ ইহাই যথেষ্ট। সুতরাং আর কিছু না বলিয়াই ব্যস্তভাবে চলিয়া গিয়া রোগীর পার্শ্বে বসিয়া সস্নেহে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন এবং কি জানি কেন বারংবার তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, রোগীর অর্দ্ধেক রোগ কাটিয়া

গিয়াছে এবং আশ্চর্য্যরূপে সুস্থতা ও উন্নতি লাভ করিয়াছে; মনে মনে তাঁহার একটা কেমন আনন্দ হইতে লাগিল।

স্ত্রীলোকেরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া জমিয়া পড়িলেন, এবং প্রায় সকলেই দীর্ঘশ্বাসের সহিত অনুচ্চস্বরে পরে পরে বলিয়া গেলেন যে, "আবার যে তুমি এসে খোকাকে এমন করে দেখবে ও আদর করবে, একথা কাল রাত্রিতে আমরা ভেবেও উঠতে পারিনি, তবে যে মা জগদম্বা মুখ তুলে চেয়েছেন, সেটা তাঁরি দয়া," এবং সকলেই যে আরোগ্য হ'লে যথাযোগ্য পূজা ও মানসিক দিবেন, একথা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হলেন না।

নরেশবাবু তখন আনুপূর্ব্বিক শুনিলেন এবং স্ত্রীলোকেরা দুই তিনজনে একসঙ্গে বলিয়া যাইতে লাগিলেন এবং যেখানে ত্রুটী হইতেছিল, অপর দু তিনজনে সমস্বরে সে সকল স্থান পূরণ করিয়া দিতে লাগিলেন।

মোটামুটী অবস্থাটী এইরূপ হইয়াছিল, অর্থাৎ রাত্রি ১৷৷০ দেড়টার পর হইতেই বিকার ও প্রলাপ বাড়িয়া উঠিল, ক্রমে সেটা একটু কমিতেই ঘাম দেখা দিল ও নাড়ী খারাপ হইল। প্রায় ৩টার সময় ডাক্তার একপ্রকার জবাব দিলেন এবং অনুচ্চ রোদন ও ঘন দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে বালককে মেঝেয় নামান হইল, এবং ঠিক ৪টার সময় মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে রোগীর চক্ষুতারকা ঊর্দ্ধে উঠিল। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস থামিয়া গেলে বোধ হইল যেন চক্ষু তারকা সরল ও স্বাভাবিক এবং বক্ষে হাত দিয়াও বোধ হইল যেন অতি মৃদু হৃদপিণ্ডের ক্রিয়াও চলিতেছে; তৎক্ষণাৎ চোখের জল মুছিয়া সকলে সভয়ে ও সানন্দে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন ও ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া হইল।

ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া বলিলেন যে, reaction হইয়াছে, কিন্তু

তাহলেও বিশেষ ভরসা নাই, তবে এরূপভাবে যদি ৩ ঘণ্টা কাটিয়া যায় তাহলে আশা আছে, আবার সকালে ৭টার পর দেখিয়া বলিয়াছেন যে, আশা হয়।

শুনিতে শুনিতে বারবার নরেশবাবুর মনে ফকিরের সেই কথা, “যব রাত চার বোলনেসে রহে তব্ আল্লাকো মর্জ্জি” জাগিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় কৃতজ্ঞতাভরে উদ্দেশে ফকিরের প্রতি প্রণত হইতেছিল। মনে হইল ইহা নিশ্চয়ই সেই ছদ্মবেশী মহাপুরুষের কৃপা, নহিলে কখনই এরূপ ঘটিতে পারিত না।

তখন অশ্বত্থডালটী ঝুলাইয়া মাথার শিয়রে রাখিয়া সকলকে ফকিরের ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন, তাঁহারা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং এরূপ যোগাযোগের জন্য নারায়ণকে অগণ্য ধন্যবাদ দিয়া অনুরোধ করিলেন, যে একবার ফকিরকে এখানে আনাইয়া যাহাতে খোকাকে আশীর্ব্বাদ করেন ও একটা তাবিজ দেন, তাহাই করিতে হইবে।

কিন্তু যখন সরবৎ খাওয়াইবার উদ্যোগ করিলেন, তখন স্ত্রীলোকেরা সমস্বরে আপত্তি করিয়া বলিলেন “ওমা সে হবে না, তাহলে এখুনি সন্নিপাত ধরিবে যে।” পুরুষেরাও অল্পবিস্তর আপত্তি করিলেন, কিন্তু নরেশবাবু দৃঢ়সঙ্কল্প, তাঁহার তখন ফকিরের কথায় বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস জন্মিয়াছে এবং ধারণা যে ইহার ফল কখনই ভাল ব্যতীত মন্দ হইবে না। তাই বলিলেন তোমরা আপত্তি করিও না, আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি যে, এখন রোগ সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে। যা বাকি আছে তা কেবল রোগজনিত অবসাদ ও দুর্ব্বলতা।

অপরাহ্ণে তিনি কর্ম্মস্থলে যাত্রা করিলেন, কিন্তু তাহার ভিতরে যেন সমস্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। ঘটনাচক্রে মানুষকে এমনি করিয়া অভাবনীয় ভাবে অলক্ষ্যে গড়িয়া তুলে; তখন উদ্বেগ, আশঙ্কা ও অস্থিরতা

নাই, তৎপরিবর্ত্তে স্ফূর্ত্তি, নিশ্চিন্তভাব ও সম্পূর্ণ নির্ভরতা। গতরাত্রিতে যাহাকে দাগী বদমায়েসরূপে ঘোর সন্দেহ চক্ষে দেখিয়াছেন, এখন তিনি সাধু পুরুষ; তখন ফকিরের সঙ্গ, কথাবার্ত্তা ও কার্য্যকলাপ অত্যন্ত প্রিয়। ফকিরের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর হইতে সমস্ত কার্য্য ও কথা, বায়স্কোপের চিত্রের ন্যায় চিত্তক্ষেত্রে একে একে ভাসিয়া উঠিল; কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যমনস্কভাবে ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িবামাত্রই অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, তাইত! ফকিরও নিশ্চয়ই ইংরাজী জানে, কেননা সেও ত একবার ইংরাজী ব্যবহার করিয়াছিল। এই তথ্যটা মগজে প্রবেশ করিবামাত্রই তাঁহার যেমনি আরাম বোধ হইল; তেমনি শ্রদ্ধা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল।

কালের এমনি স্বধর্ম্ম যে, আমরা সাধু সন্ন্যাসীর প্রকৃত শিক্ষাদীক্ষা যে কি জিনিস, তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। যদি কোন সাধু বা সাধুবেশীকে ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ দেখি, তৎক্ষণাৎ তাহাকে জ্ঞানী, সুপণ্ডিত ও প্রকৃত সাধু বলিয়া ধরিয়া লই। পরন্তু হিন্দুস্থানী বুলিওয়ালা বৃক্ষতলবাসী ধ্যানমগ্ন সাধুকে বুজরুক ঠাওরাইয়া political economyর হিসাবে অকারণ দেশের অন্নধ্বংসকারী বলিয়া মনে করি!

থানায় পৌঁছিয়াই নরেশবাবু ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং আবেগজড়িত ভাষায় বারংবার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

ফকির কিন্তু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, বাবু সাহেব ও কথা আর তুলিবেন না, আমরা সামান্য দীন ফকির আদমী, আমরা নিন্দা-সুখ্যাতির অযোগ্য। স্তুতিবাদ শুধু বড়লোকেরই প্রাপ্য, আমাদের তাহাতে কোন অধিকারই নাই।

ন। কিন্তু আমার—শুধু আমার কেন, আমাদের বাটীশুদ্ধ সকলেরই একটা বিশেষ অনুরোধ আছে, সেটা আপনাকে রাখিতেই হইবে।

ফ। কি বলুন?

ন। আমাদের সকলের অনুরোধ যে, একবার দয়া করিয়া আমাদের বাটীতে পদধূলি দিয়া খোকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া একটা মন্ত্রপূত তাবিজ করিয়া দিতে হইবে; যাহাতে ভবিষ্যতে আর কোন বিপদ না হয়—এটা আপনাকে রাখিতেই হইবে।

ফ। এত করিবার কোন প্রয়োজনই নাই, কেন না যা বিপদ ঘটিবার, তা ঘটিবেই; তবে তোমাদের যখন অনুরোধ, তখন একবার তোমাদের বাটী নিশ্চয়ই যাইব, কিন্তু কবে বা কতদিন পরে তা বল্‌তে পারি না। কিন্তু একবার যে যাইব, ইহা নিশ্চিত সুতরাং আর পীড়াপীড়ি করিবেন না।

ন। আর একটা জিজ্ঞাস্য আছে: কাল রাত্রে কথাবার্ত্তায় জানিয়াছি, আপনি ইংরাজি জানেন, সুতরাং আপনি যে সুশিক্ষিত সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ নাই।

ফ। (হাসিয়া) হাঁ কথা ঠিক; তোমাদের পাশ্চাত্য দেশও দেখিয়াছি, পাশ্চাত্য আদর্শে ও শিক্ষায় নিজেকে গঠিতও করিয়াছিলাম এবং তোমাদেরি মত নাম, যশ ও অর্থ-লোলুপ ছিলাম। কিন্তু তারপর গুরুর কৃপায় বুঝিলাম যে, এ সবই ঝুটা, তাই এই ফকিরি লইয়াছি; এখন বড়ই শান্তি ও আনন্দ; তোমরা বিষয় ও অর্থে মজিয়া আছ, তাই ফকিরীর আনন্দ ও শান্তির মূল্য ধারণা করিতে পার না।

ন। কিন্তু তা বলিয়া ফকিরী লইতে ইচ্ছা যায় না ও বোধ হয় পারাও যায় না। আমি এ বিষয় ঠিক বুঝি না—আপনি এ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিন।

ফ। বাবু সাহেব, উপদেশ কি দিব? আর উপদেশ দিবারও কিছু নাই, কেন না আজকাল সকলেই জ্ঞানপাপী; সব জানে, সব বুঝে, এবং যদি সে সকলের একটাও জীবনে পালন করে, তা হলে আর

ভাবনাই থাকে না। তবে একটা কথা বলিয়া রাখি যে, যদি কখনো বিশেষ বিপন্ন হও, ত আমাকে আন্তরিক ভাবে মনে করিও এবং সে সময়ে আমিও আমার সাধ্যমত সাহায্য করিবার চেষ্টা করিব; তবে যখন-তখন বা সামান্য কারণে উত্যক্ত করিও না। আমার আর কিছু বলিবার নাই, তবে এখনকার হিন্দুস্থানের হাল-চাল দেখিয়া বড়ই কষ্ট হয়। ইহারা ঝুটাকে সাচ্চা বুঝিয়াছে ও সাচ্চাকে ঝুটা মনে করে। সকলেই শাল-দোশালা, টাকা-পয়সা, দৌলত-দুনিয়া লইয়া ব্যতিব্যস্ত; কিন্তু এ সকলের মূল যে আল্লাতালা, তাহাকে ত একবার ভুলেও মনে করে না। খোদার উপর খোদকারী করিবে, কিন্তু খোদার কথা একবারও ভাবিবে না।

আমাদের দেশে একটা কথা আছে যে,—

চেহারা হোয়ত কেয়া হোয়,
  যিস্ চেহারামে রোয়াব নেহি,
তালাও হোয় ত কেয়া হোয়
  যিস্ তালাওমে গহেড়ি নেহি,
মোকাম্ হোয় ত কেয়া হোয়
যিস্ মোকাম্মে লছ্মী নেহি,
যিস্ দিলমে হাসেন্
যিস মযবুমে খোদা নেহি, ইত্যাদি—

অর্থাৎ সৌন্দর্য্যবিহীন চেহারা, গভীরতাহীন পুষ্করিণী বা লক্ষ্মীশ্রীহীন বাড়ী যেমন কিছুই নহে, তেমনি যে প্রাণে ধর্ম্ম নাই, যে হৃদয়ে ভগবান নাই, সে হৃদয়ের অধিকারী মানুষ মানুষই নহে। ফকির কথাগুলি অত্যন্ত আগ্রহসহকারে বলিতেছিলেন, এবং সেগুলি যেন নরেশের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া সমস্ত আলোড়িত করিয়া দিতেছিল। ফকিরের উজ্জ্বল দৃষ্টি যেন তাঁহার অন্তর পর্য্যন্ত বিঁধিয়া দিতেছিল এবং ভাবিতে

ভাবিতে তিনি যেন কতকটা তন্ময় হইয়া গেলেন। তার পর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া দেখিলেন, ফকির সম্মুখে নাই।

তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া থানা ও আশপাশে কোথাও না দেখিতে পাইয়া লোকজন লইয়া চারিদিকে তল্লাস করিলেন, কিন্তু কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

আত্মিক আনয়ন।

অলৌকিক রহস্যের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই শু'নে থাকবেন যে ইয়োরোপ ও আমেরিকাবাসী Mr. Stead, Mr. Glendenning, Mr. King, প্রভৃতি অধ্যাত্মবিদ্ পণ্ডিতগণ পরলোকগত আত্মিক আনয়ন করিতেছেন।

সংবাদটা খুব আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তেমন নূতন নয়। আমাদের বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, প্রভৃতি বহু গ্রন্থেই আত্মিক আনয়নের কথা বর্ণিত আছে।

আমি এখানে যে ঘটনার উল্লেখ করিতেছি, তাহা প্রাচীনকালের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত কিংবা সুদূর আমেরিকা অথবা লণ্ডনের ব্যাপার নহে। এই অদ্ভুত ব্যাপার আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের মধ্যেই প্রদর্শিত হইতেছে। আরও বহু আনন্দের বিষয় এই যে যিনি ইহার প্রদর্শক, তিনি আমাদের এই বঙ্গদেশবাসী। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

শ্রীযুক্ত তরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী সরস্বতী মহাশয় ঢাকা দক্ষিণ মৈশণ্ডিতে

অবস্থান করেন। ঠাকুর তারিণীকান্ত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, ঢাকার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সকলের নিকটই সুপরিচিত ও সম্মানিত। সম্মোহন, ত্রিকালদর্শন, জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিভ্রমণ, জীবন্ত সমাধি প্রভৃতি ইঁহার বহুবিধ অলৌকিক ক্রিয়া দর্শন করিয়া, কমিশনার জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, সিবিল সার্জ্জন প্রভৃতি উচ্চপদস্থ ইয়োরোপীয়ান্ ও এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত বহুলোকে একান্ত বিস্মিত হইয়াছেন। সম্প্রতি এই মহাত্মাই কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিত লোককে পারলৌকিক আত্মা আনিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথমে ঢাকা বারের গভর্ণমেণ্ট প্লীডার রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ বি, এল্ মহাশয় এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। আমরা সংক্ষেপে এখানে সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতেছি।

রায় বাহাদুর, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্টের আইন পরামর্শদাতা বলিয়াই যে সুপরিচিত, এমত নহেন। তিনি ধার্ম্মিক ও পরোপকারী। দীন দুঃখীগণের দুঃখ দুর্দ্দশা মোচনার্থ তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। তিনি ক্রমান্বয় তিন বিবাহ করিয়াছিলেন। বড় দুঃখের বিষয় তিন স্ত্রীই পরলোক গমন করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার একটী কৈশোর বয়স্ক পুত্রও মাতৃগণের সহযাত্রী হইয়াছে। রায় বাহাদুরের তৃতীয়া স্ত্রী পরলোক গমন করিয়াছেন গত ৩১শে আষাঢ়।

মৃত্যুর পর পরলোকে আত্মিকগণ কি ভাবে অবস্থান করেন, তাঁহারা ইহলোকে আসিতে পারেন কিনা, আমরা কোন উপায়ে তাঁহাদিগকে দেখিতে পারি কিনা, এই সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষরূপে জানিবার জন্য একান্ত ব্যাকুল হইয়া তিনি ঠাকুর তরণীকান্তের শরণাপন্ন হ'ন। ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহাকে ইহা প্রত্যক্ষরূপে প্রদর্শন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হ'ন।

গত ২৮শে শ্রাবণ বেলা ৮ ঘটিকার সময় রায় বাহাদুরের বাসাতে

ইহার এক (Seance) তত্ত্বাধিবেশন হয়। বিস্তৃত বৈঠকখানা ঘর প্রথমে পরিষ্কার করিয়া ঠাকুর মহাশয়, রায় বাহাদুর ও তাঁহার বাসার একটী বালক কক্ষের মধ্যে উপবেশন করেন। অন্যান্য যে সমস্ত লোক দর্শক-রূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে কক্ষের তিনদিগে থাকিতে হইয়াছিল। ঐ তিনদিগের দরজা বন্ধ করিয়া একদিগের সমস্ত দরজা খুলিয়া দেওয়া হয়। ইহাতেই ঘরখানা একেবারে আলোকিত অবস্থায় ছিল।

ইঁহারা তিনজন বৃত্তাকারে পরস্পর হস্তধারণ করিয়া মুদ্রিত নয়নে কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে নয়নোন্মীলন করিলে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইতে আরম্ভ হয়।

প্রথমে রায়বাহাদুরের বৃদ্ধ পিতা ও কৈশোর বয়স্ক পুত্র ত্রৈলোক্য নাথ ছায়ামূর্ত্তিতে আবির্ভূত হ'ন। তৎপর তাহার তিন স্ত্রী ক্রমান্বয়ে আগমন করেন; ইঁহাদিগের সকলকেই অতি স্পষ্ট ভাবে দেখা গিয়াছিল। আমাদের এই পার্থিব জগতে অবস্থান কালে ইঁহারা যে প্রকার বেশভূষা করিতেন, আত্মিকগণও সেই প্রকার বেশভূষায় সজ্জিত ছিলেন। মূর্ত্তিগুলি প্রায় তিন মিনিট কাল পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল।

রায় বাহাদুরের এই তৃতীয়া স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাস্য তিনটী প্রশ্ন ছিল। (১) আমার পরবর্ত্তী জীবন কি প্রকারে অতিবাহিত হইবে। (২) তোমার পারত্রিক কল্যাণ আমি কি উপায়ে করিতে পারি। (৩) তোমার অকাল মৃত্যু কেন হইল। প্রশ্ন তিনটী তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, মনে মনেই রাখিয়াছিলেন। ছায়ামূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান সময়ে তিনি "আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে"—এই কথা বলিয়া উঠিলেন। ছায়ামূর্ত্তিও দেখিতে দেখিতে যেন বালকের অঙ্গের সঙ্গে একেবারে মিলাইয়া গেল। বালক একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

তাহার হাত পা কাঁপিতে লাগিল। ঠাকুর মহাশয় তাহার হাতে একখণ্ড কাগজ ও একটী পেন্সিল দিলেন। বালক কাগজে এই তিনটী কথা লিখিয়া দিল—"ভাল" "শ্রাদ্ধ পিণ্ড" ও "অকাল নয়"। ইহা পাঠ করিয়া রায় বাহাদুর একান্তই পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

এই অলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে রায় বাহাদুর যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, সকলের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা ও তাহার মর্ম্মানুবাদ আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"It is with great pleasure, I certify that Srijukta Tarani Kanta Chakravarty Sarasvaty has performed wonderful feats of Spiritualism, Spirit invocation, and replies of Spirit. They have been done in broad day light in my house. Five of my very near and dear relations' Spirit-shapes have been shown vividly in my presence. This feat has highly astonished me."

"অতীব সন্তোষের সহিত জানাইতেছি যে শ্রীযুক্ত তরণী কান্ত চক্রবর্ত্তী সরস্বতী মহাশয় "ছায়ামূর্ত্তি আনয়ন ও তদ্দ্বারা প্রশ্নের উত্তর প্রদান" সম্বন্ধে আমার বাসাতে অদ্ভুত পারলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছেন। অতি প্রিয়তম পাঁচ জন ঘনিষ্ট আত্মীয়, ছায়ামূর্ত্তিতে প্রকাশ্য দিবালোকে স্পষ্ট ভাবে আমার নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল। এই ব্যাপারে আমি একান্তই বিস্মিত হইয়াছি।"

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই,—পাছে কেহ এই সমস্ত ব্যাপার সম্মোহন শক্তির প্রভাবে রায় বাহাদুরের দৃষ্টি বিভ্রম বলিয়া মনে করেন, এ জন্য সাক্ষী স্বরূপে রায় বাহাদুরের বাসার এই বালকটীকে রাখা হইয়াছিল। উক্ত বালক রায় বাহাদুরের তৃতীয়া স্ত্রী ভিন্ন আর কাহাকেও দেখে নাই। কিন্তু সে এই সমস্ত আত্মিকগণের যে রূপ

বর্ণনা করিতেছে, তাহাতে সে সকল তাহার প্রত্যক্ষীভূত বিষয় ভিন্ন অন্য কিছু মনে হয় না।

ইয়োরোপ ও আমেরিকাতে যাঁহারা আত্মিক আনয়ন করেন, তাঁহারাও প্রকাশ্য দিবালোকে ইহা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে গত নবেম্বর মাসের হিন্দু স্পিরিচুয়াল ম্যাগাজিনে, সম্পাদক লিখিয়াছেন ঃ—

"This is really a very wonderful feat and shows that the occultist possesses psychic powers of an extraordinary character. As a rule materialized spirits are produced in darkness or semi-lighted rooms, but to produce them in broad day light is a feat which occurs very rarely."

এই প্রকার একটী ব্যাপার যদি ইয়োরোপ কিংবা আমেরিকায় প্রদর্শিত হইত, তবে তাহারা ইহার যথার্থ অলৌকিকত্ব বুঝিতে সমর্থ হইতেন।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বসু।

অদ্ভুত দৈববল।

নচ দৈবাৎ পরম্ বলম্।

প্রথম যৌবন হইতে বর্ত্তমান বার্দ্ধক্য অবস্থা পর্য্যন্ত আমি ভয়ঙ্কর কোষবৃদ্ধি রোগ ভোগ করিয়া আসিতেছিলাম। রোগের যন্ত্রণা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে,আমি প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলাম। গত মহাবিষ্ণু সংক্রান্তির দিবস সহসা আমার জ্বর হয়। এক মাস যাবৎ কবিরাজী ও ডাক্তারী চিকিৎসা করাইলাম কিন্তু জ্বর বন্ধ হইল

না। অধিকন্তু কোষে দারুণ যন্ত্রণা অনুভূত হইতে লাগিল। মনে মনে বিপদের আশঙ্কা করিয়া বিপদহারী ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম। সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, কোষবৃদ্ধি যদি পক্ব হয়, তাহা হইলে আমার আর নিস্তার নাই ইহাও বেশ বুঝিতে পারিলাম। ইহার কয়েক দিবস পরেই আমি সহসা দেখিতে পাইলাম যে আমার কোষের উপরিভাগে একটী অতি ক্ষুদ্র সামান্য ক্ষত হইয়াছে। ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ আমার পরম আত্মীয় জনৈক বন্ধু শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ. বি. এল্, আলিপুরের প্লীডার মহাশয়কে এই ভয়াবহ সংবাদ প্রদান করিলাম। সংবাদ পাইবামাত্র তিনিও ভীত হইয়া তাঁহার পুত্র ও আমার প্রিয়তম ছাত্র শ্রীমান রাজেন্দ্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জনৈক ডাক্তার সহ আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তার বাবু পরীক্ষা করিয়া বলিলেন কোষ পাকিয়া উঠিয়াছে। অবিলম্বে অস্ত্র করান না হইলে পচিয়া যাইবে। আমার অর্থাভাব, সুতরাং আমাকে কলেজের হাঁসপাতালে পাঠানই সর্ব্ববাদী সম্মত হইল। বাল্যকাল হইতেই অস্ত্রের প্রতি আমার বড় ভয়, এমন কি পরের ফোড়া অস্ত্র করিতে দেখিলে আমি মূর্চ্ছিত হইতাম। হাঁসপাতালে ডাক্তার সাহেবেরা অবশ্যই অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন, মনে করিয়া ভয়ে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। সকলে চলিয়া গেলে আমি করুণ স্বরে ক্রন্দন করিয়া ভগবানকে ডাকিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, কাঁদিতে কাঁদিতে কখন যে তন্দ্রা আসিয়াছে, জানিনা। খানিক রাত্রে স্বপ্নাবেশে দেখিলাম যেন এক লম্বোদর মহাপুরুষ, সর্ব্বাঙ্গ বিভূতিভূষিত, গলে রুদ্রাক্ষ মালা, শান্ত ও সৌম্য মূর্ত্তি আমার সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইয়া আমার শিয়রে উপবেশন করিলেন, এবং আমার মস্তকটী তাঁহার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া মধুর স্বরে কহিলেন "ভয় নাই, তুই নিরাময় হইলি"। এক কথা বলিয়া

তিনি তাঁহার পদ্ম হস্ত আমার মাথায় ও মুখে বুলাইয়া দিলেন। যখন তাঁহার হস্ত আমার মুখের নিকট সংলগ্ন হইল, তখন আমি মুখব্যাদান ও জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাঁহার হস্তস্থিত কি যেন এক অমৃতময় মধুর পদার্থ খাইয়া ফেলিলাম। এবং আবেশে "আ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমার পত্নী জাগরিতা হইলেন, এবং ভয় বিহ্বল চিত্তে আমাকে এরূপ চীৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সমুদয় ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিলাম। তিনি ভক্তিভরে বার বার বাবা বৈদ্যনাথের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন এবং বৈদ্যনাথের ঘামচন্দন গঙ্গাজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া আমার কপালে মাখাইয়া দিলেন। এই সময়ে আমার বোধ হইল যেন আমার কোষের সেই সামান্য ক্ষতস্থান হইতে অল্প পরিমাণে রস বাহির হইতেছে। আমার পত্নীকে প্রদীপটী কাছে আনিতে বলিয়া আমি আস্তে আস্তে যেমন সেই ক্ষতস্থানে চাপ দিয়াছি, অমনই সেই ক্ষতস্থান হইতে সামান্য জল বাহির হইতে লাগিল। প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া আমি দুই হাতে খুব জোরে চাপ দিতে লাগিলাম, আর আমার কোষ হইতে রক্ত, পূজ ইত্যাদির ন্যায় পদার্থ প্রভূত পরিমাণে বাহির হইয়া পড়িল। তখন আমি মরিয়া হইয়া গিয়াছি, আমার হস্ত পদ কাঁপিতেছে, কিন্তু কোষ অনেক ছোট হইয়া আসিয়াছে, এমন কি জলশূন্য ভিস্তির ন্যায় কেবল চামড়াটী অবশিষ্ট আছে। ভীতা হইয়া আমার পরিবার সহসা যখন আমার হস্ত ধারণ করিল, তখন আমার চৈতন্য হইল। আমি দেখিলাম আমার দুই হস্তে দুইটী বিচি মাত্র আছে, অবশিষ্ট সমুদয় পদার্থ বাহির হইয়া গিয়াছে। তখন আমার অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ হইল এবং সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া আমি একটু সুস্থ হইলাম, এবং তুলা ও ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা কোষ বাঁধিয়া আবার শয়ন করিলাম। প্রভাতে

জাগরিত হইয়া দেখি, কোষের রসে আমার বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে। বন্ধন মুক্ত করিয়া দেখিলাম তিনটী স্থানে গভীর ক্ষত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি অস্ত্র প্রয়োগে আমার বড় ভয়, সুতরাং আমি বিনা অস্ত্রে ক্ষত চিকিৎসক প্রসিদ্ধ চাঁদসীর ডাক্তার শ্রীযুক্ত শ্রীমন্তকুমার দাস ধন্বন্তরী মহাশয়কে ডাকাইয়া আনিলাম। তিনি দুই মাস চিকিৎসা করিয়া স্বহস্তে আমার ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া দিতে লাগিলেন। দুইমাস পরে আমার ঘা সারিয়া গেল। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। যদিও অতিশয় দুর্ব্বল আছি, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রোগের লক্ষণ আর আমার কিছুই নাই।

শ্রীবিনোদবিহারি চট্টোপাধ্যায়।

আদান প্রদান।

"দান প্রতিদানের" লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় যে গল্পটী লিখিয়াছেন তাহার সার মর্ম্ম অন্ততঃ আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা এই হইতেছে যে, বিনোদ বাবুর স্ত্রীর কাতর প্রার্থনায় অরুণ বাবু নিজের জীবন বিনোদ বাবুকে দিয়া আপনি আপনার শরীরে তাহার কলেরা রোগকে সঞ্চারিত করিয়া লইয়া নিজেই নিজের দেহ ত্যাগ করিলেন। ঠিক এইরূপ ঘটনা প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমার নিজের পরিবারের মধ্যেই সংঘটিত হইয়াছে। ঘটনা দুইটী। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ দুই সময়েই আমি গৃহে উপস্থিত ছিলাম না, স্বচক্ষে দেখি নাই, তবে প্রথমটীর কথা আমি ৵ মাতৃঠাকুরাণীর মুখে শুনিয়াছিলাম, এবং দ্বিতীয়টীর কথা ৵ পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছিলাম। সুতরাং কোনটীই যে মিথ্যা নয়, সে বিষয় ধ্রুব সত্য।

প্রথম ঘটনাটী এইরূপ—আমার নিজ মাতুলের কথা। আমার মামার বাড়ী আমাদের গ্রামেই, নিজ বাড়ীর অতি সন্নিকট। এমন কি একবাড়ী বলিলেও বিশেষ দোষ হয় না। মামারা আমাদের গ্রামের গণ্যমান্য একঘর বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিলেন। মাতামহ একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। মামারাও সব পণ্ডিত। আমার তিনটী মামা ছিলেন। তাহার মধ্যে মাতামহ, মাতামহী, বড় মামা, ছোট মামা, ইঁহারা মানবলীলা সম্বরণ করিলে একমাত্র মধ্যম মাতুলই অবশিষ্ট রহিলেন। তিনি পরম ধার্ম্মিক, সর্ব্বদাই শাস্ত্রালোচনা ও পূজাপাঠ লইয়াই কাল যাপন করিতেন। দুঃখের মধ্যে কোনও মামারই পুত্র সন্তান হয় নাই। যখন তাঁহারা তিনজন জীবিত ছিলেন, তখন কাহারও না কাহারও পুত্রসন্তান হইবে এই মনে করিয়া সেদিকে কাহারও বিশেষ চিন্তা ছিল না। তিনভাই একপ্রকার নিশ্চিন্তভাবেই আমোদ আহ্লাদে কাল কাটাইতেন। যৎকালে মধ্যম মামা একা হইয়া পড়িলেন, তখন বাড়ীতে পুত্র সন্তানের সম্পূর্ণ অভাব দেখিয়া তিনি বংশরক্ষার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। নানাবিধ শান্তি স্বস্ত্যয়ণ, ঔষধধারণ ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দেবালয়ে ধন্না দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন। ঐ সকলের ফলে মধ্যম মাতুলানীর অধিক বয়সে প্রথমে একটী কন্যা সন্তান জন্মিল, তাহাই দেবতার প্রসাদ মনে করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাকে লইয়াই সংসার করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিয়তির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে চারি পাঁচ বৎসর বয়সে সেটী মারা পড়িল। তখন আবার পূর্ব্বের আকুলতা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আবার দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধার সহিত আরম্ভ করা হইল। তাহার ফলে একটী পুত্রসন্তান উৎপন্ন দেখিয়া মামা মামীর আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী সকলেরই আনন্দের সীমা রহিল না। পুত্রটীও অতি সুলক্ষণসম্পন্ন হইল।

পুত্রের উৎপত্তিতে সেই শ্মশানতুল্য নিরানন্দগৃহে পুনর্ব্বার আনন্দোৎসব হইতে লাগিল। মামা মামী উভয়েই সর্ব্বপ্রকার যত্নের সহিত পুত্রটীকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। পুত্রজন্মের ৪।৫ বৎসর পরে আবার একটী কন্যা জন্মিল। এবং ঐ পুত্রটী যখন ৮।৯ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিল, সেই সময়ে মাতুলানীর পুনর্ব্বার গর্ভ সঞ্চার হইল, এবং যথাসময়ে আর একটী পুত্র হইল। ঐ শেষজাত পুত্রটী লইয়া মাতুলানী যখন সূতিকাগারে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় মাতুল মহাশয় একদিনের জন্য আবশ্যক কার্য্যবশে বিদেশে গিয়াছিলেন, বাড়ী আসিয়া দেখিলেন প্রথম পুত্রটীর অত্যন্ত প্রকোপে জ্বর হইয়াছে। জ্বর একেবারেই এত প্রকোপে হইয়াছে, যে পুত্রটীর জীবন সংশয় এইরূপ তিনি বুঝিলেন। পুত্রের তথাবিধ অবস্থা দেখিয়া তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া ম্লান বদনে যে ঘরে গৃহদেবতা শালগ্রাম ঠাকুর ছিলেন সেই ঘরে আসিয়া ভগবান্‌কে বারম্বার প্রণাম করতঃ কাতর ভাবে এই মাত্র প্রার্থনা করিতে লাগিলেন "হে ভগবান্, প্রসন্ন হও, আমার জীবিত সর্ব্বস্ব পুত্রের পীড়াটী আমাতে সংক্রামিত কর; উহাকে রক্ষা কর।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতেই তাঁহার শরীরে কম্প দিয়া প্রবল জ্বর হইল। তিনি তখন হাসিতে হাসিতে ঠাকুর ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, "আর ভয় নাই। পুত্র রক্ষা পাইয়াছে।" এইরূপে পুত্রকে রক্ষা করিয়া তিনি স্বয়ং সেই জ্বরে দুই তিন দিনের মধ্যেই দেহত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। *

এস্থলে আর একটী কথা না লিখিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। ৺ মাতুল মহাশয়ের দেহত্যাগের সংবাদ শুনিবামাত্র মাতুলানী কেবলমাত্র এইকথা বলিলেন, "আঁ্যা, এ কি হইল ?" এই কথা বলিয়াই তিনি এইরূপ প্রবলজ্বরে আক্রান্ত হইলেন যে, তাঁহার মুখ দিয়া আর

কোন কথাই বাহির হয় নাই। এবং পরদিন প্রাতঃকালে তিনিও যথাবিধি ৺ গঙ্গালাভ করিয়া পতির অনুগামিনী হইলেন।

যখন আমি বিদেশে থাকিয়া এই সংবাদ বাড়ীর পত্রে পাঠ করিলাম, তখন আমার মনে কালিদাসের

"শশিনা সহ যাতি কৌমুদী
সহ মেঘেন তড়িদ্বিলীয়তে"

এই শ্লোকটা মনে হইয়া অজস্র অশ্রুধারায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল।

প্রথম ঘটনা ত এইরূপ। এক্ষণে দ্বিতীয় ঘটনার কথা বলিতেছি।

এ ঘটনাটী আমার নিজ বাড়ীর। আমার মায়ের অনেকগুলি পুত্র ও কন্যা সন্তান হইয়াছিল। তন্মধ্যে আমি এবং আমার কনিষ্ঠ এই দুইটী পুত্রসন্তান মাত্র আর গুটি দুই তিন কন্যা জীবিত ছিল। আমাদের দেশে চিরপ্রথা অনুসারে কন্যা সন্তান একপ্রকার সন্তানের মধ্যে পরিগণিত নয়। পুত্রই পিতামাতার প্রকৃষ্ট স্নেহের পাত্রই হইয়া থাকে। এই হিসাবে আমরা দুইটী ভাই কেবল পিতামাতার কেন, বাড়ীর সকল পরিবারেরই পরম স্নেহের পাত্র হইয়া অতিপ্রযত্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলাম। দুই ভাই বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম। দুই জনেরই বিবাহ হইয়াছিল। এই সময়ে কর্ম্মসূত্রে আমি অতিদূরদেশে পঞ্জাবের রাজধানী লাহোর সহরে গিয়া পড়িয়াছিলাম। এইজন্য আমার কনিষ্ঠই তৎকালে বাড়ীর সকলের বিশেষ মাতা ঠাকুরাণীর স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিল। তৎকালে আমার ৺ পিতামহ দেবও বর্ত্তমান, ৺ পিতৃদেবও বর্ত্তমান, আর সকলেই বর্ত্তমান, সুতরাং সংসার একপ্রকার জাজ্বল্যমান বলিলেই হয়। এই অবস্থায় কার্ত্তিকমাসে একদিন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্বর হইল। জ্বর প্রথমেই সামান্যাকারে হইয়াছিল, কিন্তু অপরাহ্নে বৃদ্ধি পাইল। রাত্রে জ্বরের প্রকোপ খুবই বাড়িল। মাতা ঠাকুরাণী সমস্ত রাত্রি রোগীর নিকটে বসিয়া তাহার

শুশ্রূষায় অনিদ্রাতেই রাত্রি কাটাইলেন। রোগীর শুশ্রূষা করিবার সময় তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া তাহার জীবনের প্রতি তিনি একেবারে আশাশূন্য হইলেন। প্রাতঃকাল হইবামাত্র তিনি বিষণ্ণবদনে গাত্রোত্থান করিয়া সংকল্পিত কার্ত্তিকমাসজন্য প্রাতঃস্নান করিয়া আসিলেন। তিনি আর রোগীর ঘরে না ঢুকিয়া যে ঘরে শালগ্রামশিলা থাকিতেন, সেইঘরে প্রবেশ করিয়াই অনর্গল অশ্রুধারা বর্ষণ করতঃ, মাথা খুঁড়িতে আরম্ভ করিলেন। কি আশ্চর্য্য! কিছুক্ষণ ঐরূপ করিতে করিতে তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া সেই ঠাকুরঘরেই অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ওদিকে আমার কনিষ্ঠ অনেকটা সুস্থতা লাভ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মাতার অন্বেষণ করিতে গিয়া দেখিল, যে মা ঐরূপ ঠাকুরঘরে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন সে বাড়ীর অপরকে সংবাদ দিল। বাড়ীর সকলে আসিয়া দেখিল, তিনি একেবারে অজ্ঞানাভিভূত, বাহ্যিক জ্ঞান নাই, এলোমেলো বকিতেছেন। তখন সকলে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে গৃহান্তরে লইয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎই সুচিকিৎসক ডাকিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। সেই সঙ্গে আমাকেও এইভাবে টেলিগ্রাফ করা হইল, যে তুমি যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থাতেই বাড়ী চলিয়া আসিবা; তোমার মায়ের সঙ্কটাপন্ন পীড়া।

সেইদিন প্রাতঃকালেই আমি বাড়ী হইতে চিঠি পাইয়াছিলাম, বাড়ীর সকলেই খুব ভাল আছে। সুতরাং সন্ধ্যাকালে ঐরূপ টেলিগ্রাম পাওয়া আমার মনে বিশ্বাস হইল না। আমি মনে করিলাম, কোন ব্যক্তি শত্রুতা করিয়াই ঐ প্রকার টেলিগ্রাফ করিয়াছে। এইজন্য বাড়ী না আসিয়া একখানা পত্র পাঠাইলাম।

এদিকে ঐ টেলিগ্রাম পাইয়া আমার যে সময় বাড়ী পৌঁছিবার কথা, সেই সময় বাড়ী না পৌঁছানতে আবার একটী টেলিগ্রাম পাইলাম

তাহাতে এইমাত্র লেখা ছিল "তুমি প্রথম টেলিগ্রাফে বাড়ী না আসিয়া অতীব গর্হিত কার্য্য করিয়াছ।" ঐ টেলিগ্রাফ পাইয়া আমি একেবারে সব অন্ধকার দেখিলাম। আর থাকিতে পারিলাম না। বাস্তবিক যে অবস্থায় ছিলাম, সেই অবস্থাতেই চলিয়া আসিলাম। কিন্তু আসিয়া দেখিলাম কি? কাজ শেষ হইয়াছে। মা আর এ জগতে নাই। বাড়ী শূন্য, হাহাকারে পরিপূর্ণ। যে সংসার সর্ব্বদাই আনন্দ কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকিত, তাহা আজ ক্রন্দনের রোলে পরিপূর্ণ। তখন মনে ভাবিলাম—আমি বাস্তবিকই কি গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। প্রথম টেলিগ্রাম পাইয়া কেন আসিলাম না? আমি বাড়ী আসিয়া দাঁড়াইবা মাত্রই ৺ পিতামহ ঠাকুর আমাকে কোলে করিয়া বসিলেন। তাঁহার চোখ দিয়াও অনবরত অশ্রুধারা বহিতেছে। ৺ পিতৃদেবও কাঁদিতেছেন। ছোট ভাই ত কাঁদিয়া আকুল সুতরাং মার কি হইয়াছিল, হঠাৎ কেন এরূপ হইল, একথা কাহাকেও যে জিজ্ঞাসা করিব, সে লোক খুঁজিয়া পাইলাম না। পরে সকল স্থির হইলে, আমি পিতৃদেবের মুখে সবিস্তার সকল কথা শ্রুত হইলাম।

তাই বলিতেছি, এইরূপ অপরের পীড়া লইয়া নিজের জীবন তাহাকে প্রদান করা জগতের মধ্যে বোধ হয় বিরল নহে। বোধ করি, অনেক স্থলেই এইরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। *

ভবদীয়
শ্রীহৃষীকেশ শর্ম্মা শাস্ত্রী,
ভাটপাড়া।

---

* পরম শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয়ের লিখিত কাহিনী এবং দেবেন্দ্রবাবুর লিখিত কাহিনী এতদুভয়ের কিছু পার্থক্য আছে। আমাদের মনে হয়, বালকের পূর্ব্বগুচ্ছ পূর্ব্বজন্মের ঋণ পরিশোধের জন্য ইহজন্মে অরুণবাবুর মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অরুণবাবুর কথায় বোধ হয়, তাহাতে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি বিদ্যমান ছিল। শাস্ত্রী মহোদয়ের লিখিত "আদান প্রদানে" জন্মান্তরের কোন সম্বন্ধ আছে। অং সং

স্বপ্নতত্ত্ব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা সর্ব্বক্ষণ এই শরীর ব্যবহার করিয়া থাকি। শিক্ষিত এবং ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির এই দেহ বেশ বিকশিত। নিদ্রিত অবস্থায় এই শরীর স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সহিত বাহির হইয়া পড়ে এবং সেইকালে মানব চৈতন্য এই শরীরে কার্য্য করে। আমরা নিদ্রাকালীন যখন এই দেহ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকি, তখন সূক্ষ্মলোকের অনেক ব্যাপার আমাদিগের চৈতন্য-গোচর হয় এবং সেই সমস্ত বিষয় আমাদিগের স্থূল মস্তিষ্কে পরিস্রবিত হয় এবং তাহা কখনও কখনও স্বপ্নরূপে আমাদিগের জাগ্রৎ অবস্থায়ও স্মরণে থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় অধিক সময়ই আমাদিগের নিজের নিজের চিন্তা ও ভাব লইয়াই আমাদিগের সূক্ষ্মশরীর নিযুক্ত থাকে, সূক্ষ্ম-লোকে কি ঘটিতেছে তাহা দেখিতে তাহার অবসর থাকে না; কিন্তু সূক্ষ্মদেহকে আত্মচিন্তা ও ভাব হইতে বিমুক্ত করিয়া সূক্ষ্মলোকের ব্যাপার অবলোকন করিতেও নিযুক্ত করা যাইতে পারে। সেই সময়ে মৃত বন্ধু বা আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে, তাহাদিগের সহিত কথোপকথনও হয়। প্রবোধন ভবিষ্যৎ ঘটনার পূর্ব্বাভাস, পূর্ব্বাববোধ সাধারণের জাগ্রৎ অবস্থায় অদৃশ্য সূক্ষ্মদেহীদিগকে দর্শন ও তাহাদিগের সহিত কথোপকথন—এ সমস্ত কার্য্য নিদ্রাকালীন মানবচৈতন্য সূক্ষ্ম-দেহের সাহায্যেই করিয়া থাকে, এবং তাহা কখনও কখন জাগ্রৎ সময়েও মানবের স্মরণে থাকে। এ জাগ্রৎ অবস্থায় এই সমস্ত ব্যাপার যাহার যত অধিক স্মরণে থাকে, সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহের যোজক যন্ত্রের তাহার যে অধিক বিকাশ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে হইবে। আমরা

এখন যেমন অব্যাহত ভাবে স্থূলদেহে কার্য্য করি, এবং তাহার বিষয় অবগত আছি, সময়ে সর্ব্বসাধারণের সকলেরই সেইরূপ সূক্ষ্মদেহ সম্বন্ধে হইবে।

আমাদিগের স্থূলদেহের উপাদানভূত ভূতগুলিকে যেমন সাত ভাগে বিভক্ত করা যায়, সেইরূপ এই কামদেহের উপাদানগুলিকেও করিতে পারা যায়। ইহাদিগের কতকগুলি স্থূল, কতকগুলি সূক্ষ্ম। কামদেহের সূক্ষ্মতর উপাদান-ভূতগুলির সহিত সূক্ষ্মতর মন-দেহের স্থূলতর উপাদান ভূতগুলির বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাহারা যেন একত্র জড়িত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহারা একত্র কার্য্য করে; একের আঘাতে অপরটীতে প্রতিঘাত উৎপাদন করে। তাহারা উভয়ে যেন প্রকৃতিজাত যমজ ভ্রাতাদ্বয়। মন দেহের ধর্ম্ম চিন্তা, স্মৃতি ইত্যাদি। কামদেহের ধর্ম্ম সুখ দুঃখ বোধ, বাসনা রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি। বাসনা হইতে গেলেই, মূলে স্মৃতি, চিন্তার কার্য্য পরিলক্ষিত হয়। সুখ, দুঃখ বোধ হইতে হইলেও স্মৃতি ও চিন্তার কার্য্য যে জড়িত আছে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয়। পাতঞ্জল অতি "রাগ" ও দ্বেষের এইরূপ সূত্র রচনা করিয়াছেন ;—

"সুখানুশয়ী রাগঃ।" ২য় পাদ, ৭ সূ !

(সুখ বা সুখের উপায়ে কামনাকে রাগ বলে।)

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ। ঐ, ৮ সূত্র।

(যে ব্যক্তি দুঃখের অনুভব করিয়াছে তাহার দুঃখ অথবা দুঃখের কারণে যে ক্রোধ হয় তাহাকে দ্বেষ বলে।)

এই দুই সূত্রের ব্যাসদেব এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেন ;—

"সুখাভিজ্ঞস্য সুখানুস্মৃতিপূর্ব্বঃ সুখে তৎসাধনে বা যো নর্দ্ধস্তৃষ্ণালোভঃ স রাগ ইতি।"

(যে ব্যক্তি সুখভোগ করিয়াছে, তাহার সুখের স্মরণ হইয়া সুখ

বা সুখের সাধনে (সুখজনক পদার্থে) যে লোভ তাহাকে রাগ বলে। গর্দ্ধ, তৃষ্ণা, লোভ ও রাগ এই কয়েকটী পর্য্যায় শব্দ।

সেইরূপ "দুঃখ" সূত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন,—"দুঃখাভিজ্ঞস্য দুঃখানুস্মৃতি পূর্ব্বে দুঃখে তৎসাধনে বা যঃ প্রতিঘোমন্যুর্জিঘাংসা ক্রোধঃ স দ্বেষ ইতি।"

(দুঃখাভিজ্ঞ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কখনও দুঃখের অনুভব করিয়াছে তাহার দুঃখ স্মরণ হইয়া দুঃখ অথবা দুঃখের কারণ প্রহার প্রভৃতিতে যে ক্রোধ হয় তাহাকে দ্বেষ বলে। প্রতিঘ, মন্যু, জিঘাংসা ক্রোধ ও দ্বেষ ইহারা পর্য্যায়শব্দ।)

কামদেহ বা বাসনাদেহ মন-দেহের সহিত এইরূপে সংমিশ্রিত হইয়া কার্য্য করে বলিয়া, বেদান্তদর্শনে ইহাদিগের সাধারণ নাম দেওয়া হইয়াছে "মনোময় কোষ।" কাম-দেহ মনোময় কোষের অপেক্ষাকৃত স্থূলাংশ লইয়া গঠিত ও মন-দেহ তাহার সূক্ষ্মাংশে গঠিত। আমরাও এই দুইটী শরীরকে একত্রে সূক্ষ্মশরীর এই সাধারণ নামে অভিহিত করিলাম।

আমরা যে সূক্ষ্মদেহের আলোচনা করিলাম ইহা আমাদিগের বাসনা ও চিন্তার ক্রিয়াক্ষেত্র; তাই অপরের কামনায় ও চিন্তায় এই দেহ আক্রান্ত ও উত্তেজিত হয়। বাহিরের বাসনা বা চিন্তাস্রোতে এই দেহ অনুস্পন্দিত হইতে থাকে এবং আমরা অপরের বাসনা বা চিন্তাকে নিজেদের বাসনা বা চিন্তা বলিয়া ভাবি। আমাদিগের সারাদিনের চিন্তা বা ভাবরাশিকে বিভাগ করিলে দেখিতে পাই যে, তাহাদিগের অধিকাংশই অপরের বা আমাদিগেরই অতীত কালের। পরের ভাব ও চিন্তা লইয়া নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া আমরা বৃথা উত্তেজিত হইয়া থাকি। ধ্যান করিতে বা কোনও বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে যাইলে এই তথ্যটী বেশ বুঝিতে পারা যায়। আমরা দেখিতে পাই যে, যেই

আমরা মনকে একাগ্র করিতে যাই, অমনি কোথা হইতে অভাবনীয় চিন্তারাশি আমাদিগের চিত্তকে উদ্বেলিত করিতে থাকে। একটী উদাহরণে এই মতটী বেশ উপলব্ধি হয়।

একজন ঘোর মদ্যপায়ী ছিলেন। তাহার পর অনেক প্রকার পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, অনেক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া নানা সৎ ও হিতৈষী লোকের উপদেশে তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর ভবিষ্যতে তিনি কখনও মদ্যপান করিবেন না। তিনি অনেক আয়াসে সেই প্রতিজ্ঞাও রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অবশেষে মদিরার আসক্তি তিনি একেবারে মন হইতে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন। তাহার আর মদ্যপানে কামনা হইত না এবং মদ্যের কথা মনে আসিলে তাহার মনে ঘৃণার ভাবেরই উদয় হইত। জাগ্রত অবস্থায় এইরূপ ঘটিলেও নিদ্রাবশে তিনি পূর্ব্বের ন্যায় মদ্যপানের সুখ উপভোগ করিতেন; তিনি স্বপ্ন দেখিতেন যেন তিনি পূর্ব্ব সহচর মিলিয়া পূর্ব্বেরই মত আমোদ প্রমোদ করিতেছেন। এইরূপ কেন হইত তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। জাগ্রত অবস্থায় মদ্যপান ত্যাগের তীব্র ইচ্ছা, মদ্যপানের বাসনাকে সম্পূর্ণরূপে শাসন করিয়া রাখিত। এই ইচ্ছাশক্তি বলবান প্রহরীর মত তাহার চিত্ত-দ্বারে বসিয়া থাকিত এবং পানের বাসনা বা অপর মদ্যপায়ীর মদ্যপান-বিষয়ক চিন্তা-মূর্ত্তি আসিলেই তাহাকে লাঞ্ছিত করিয়া দূর করিয়া দিত। কিন্তু, নিদ্রার সময় তাহার সূক্ষ্ম দেহগুলিকে সম্পূর্ণরূপে সংযত রাখিতে তিনি এখনও শিখেন নাই; তাই নিদ্রাবস্থায় যখন তাহার সূক্ষ্মদেহ বাহির হইয়া পড়িত, তখন তাহা অনেকটা অরক্ষিতভাবে বিচরণ করিত। জাগ্রত অবস্থায় তাহার আসক্তি না রহিলেও মদ্যপানরূপ বাসনার অভ্যাস হইতে তাঁহার সূক্ষ্মশরীর যেইরূপ বিকৃত হইয়াছিল, তাহা এখনও সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয় নাই। তাই তাহার আবদ্ধ সূক্ষ্মদেহ অরক্ষিতভাবে থাকিলেই, অপরের তজ্জাতীয়

বাসনা বা মদ্যপানের সুখবিষয়ক অপরের চিন্তাস্রোত তাহার সূক্ষ্মদেহকে আক্রান্ত ও স্পন্দিত করিত। ইহাতেই বুঝা গেল অপরের চিন্তা বা ভাবস্রোত কিরূপে আমাদিগের সূক্ষ্মদেহকে অতর্কিতভাবে সম্মোহিত করে।

আমরা আর একটী উদাহরণে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। একজনকে কৃত্রিম উপায়ে স্বপ্নাবিষ্ট করা হইয়াছিল। আবিষ্টকারী তাহার পর তাহার সম্মুখে কতকগুলি ক্ষুদ্র কাগজ রক্ষা করিলেন এবং একাগ্রচিত্তে একটী "টেকঘড়ির" চিত্র ভাবিতে লাগিলেন। আবিষ্টকারী পূর্ব্বসাধনবশতঃ এরূপ প্রগাঢ়ভাবে ঘড়িটীর বিষয় ভাবিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মানসচক্ষে ঐ ঘড়ী ব্যতীত কোন পদার্থের অস্তিত্বজ্ঞান রহিল না। তিনি কল্পনাবলে ঐ ঘড়িটী জড়পদার্থরূপে দেখিতে লাগিলেন এবং পরে ঘড়ির ঐ মানসিক চিত্রটী আবিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখস্থিত একটী কাগজখণ্ডের উপর পাতিত করিলেন। তিনি ঐ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলেন না কিংবা তাহাকে সম্বোধন করিয়া কোন কথাও বলিলেন না। ঐ ব্যক্তি জাগ্রত হইবার পর অন্য কোন ব্যক্তি ঐ কাগজখণ্ড উহাকে দেখাইবামাত্র সেই আবিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, "আমি এই কাগজের উপর একটী ঘড়ি দেখিতে পাইতেছি। তাহার পর তাহাকে ঘড়িটির বর্ণনা করিতে বলায়, ঐ ব্যক্তি আবিষ্টকারীর চিন্তিত ঘড়িটীর অবিকল বর্ণনা করিল।

এই উদাহরণটীতে দেখা গেল কিরূপে একজনের চিন্তা অপরের মানসে চালিত হয়। কেবল তাহাই নহে। আমরা আরও দেখিলাম যে সূক্ষ্মদেহের ভাবনা স্থূল জগতেও কেমন ব্যক্ত হইয়া পড়ে। আমরা যখন কোন জড়বস্তু সম্বন্ধে প্রগাঢ়রূপে চিন্তা করি তখন আমাদের চিত্তদর্পণে ঐ বস্তুর একটী অবিকল প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠে। প্রতিকৃতি সূক্ষ্মভূতে গঠিত। প্রগাঢ় চিন্তা পুনঃ পুনঃ ধ্যেয় বস্তুতে একাগ্র হইলে

ঐ সূক্ষ্ম পদার্থ সংশ্লিষ্ট মানসিক প্রতিকৃতিটী স্থূলজগতে প্রকাশ পায়। আমরা এই তথ্যটী আর একটী উদাহরণে বুঝিবার চেষ্টা করিব।

কোনও ব্যক্তিকে কৃত্রিম উপায়ে আবিষ্ট করা হইল এবং তাহাকে বলা হইল, "এখন হইতে দুই ঘণ্টার পর তোমার দক্ষিণ বাহুতে বেদনা অনুভব করিবে, এই বেদনা ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উত্তপ্ত লৌহশলাকা-দহনে যেরূপ বেদনা হয় তুমি সেইরূপ বেদনা অনুভব করিবে, কিছুক্ষণ পরে তোমার বাহুর ঐ স্থান রক্তবর্ণ হইবে, এবং উহাতে ফোস্কা পড়িয়া ক্ষত উৎপন্ন হইবে।" ইহার পর ঐ ব্যক্তিকে জাগ্রত করা হইল। উহার নিদ্রিত অবস্থায় কি হইয়াছে এবং উহাকেই বা কি বলা হইয়াছে সে বিষয়ে তাহাকে ইঙ্গিতেও কিছুই বলা হইল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ঠিক দুই ঘণ্টা পরে তাহার দক্ষিণ বাহুতে বেদনা অনুভূত হইল এবং কিছু পরে উত্তপ্ত লৌহশলাকা স্পর্শে যেরূপ বেদনা, ফোস্কা ও ক্ষত উৎপন্ন হয় তাহাই হইল। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিনগরে সল্ পেট্রিয়ে নামক স্থানে উপরোক্তরূপে উৎপন্ন ক্ষতের অনেক আলোক-চিত্র রক্ষিত আছে।

ফরাসী-বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ে (The French Academy of Science) চিন্তা মূর্ত্তির আলোকচিত্রের বিষয় আলোচনা চলিতেছে। মেজর ডারজেট্ (Major Darget) অনেকগুলি এইরূপ চিন্তামূর্ত্তির আলোক-চিত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি একটী বোতলের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া তাহার বিষয়ে একাগ্র চিন্তা করিতে করিতে আলোকচিত্র উপকরণ-পীঠিকায় (Photographic plate) দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, কয়েক মিনিট পরে এই পীঠিকার উপর বোতলের চিত্র অঙ্কিত হইল। ঐ পীঠিকায়,খালি আলোক-চিত্র করণোপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত জলাভ্যন্তরে রক্ষিত ছিল এবং সেই প্রক্রিয়ার সময় তাঁহার অঙ্গুলি দ্বারা

তিনি সেই বারি স্পর্শ করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি যষ্টি ও অপরাপর দ্রব্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

আমরা সূক্ষ্মদেহসম্বন্ধীয় আলোচনা সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। যাঁহারা অনুসন্ধিৎসু তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা যেন তাঁহারা অপরাপর বৃহৎ পুস্তক পাঠ করেন। পর সংখ্যায় আমরা স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিধারী অহং তত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

গোধূলি-সঙ্গমে।

কাল বৈশাখী আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় প্রতিদিন বৈকালেই মেঘ উঠে, ঝড়-বৃষ্টি হয়। এজন্য "গোধূলি-সভা"র অধিবেশন আর প্রত্যহ হয় না। যেদিন আকাশ পরিষ্কার থাকে, ঝড়-বৃষ্টি হয় না, সেইদিনই বৈঠক বসে।

১০ই বৈশাখ। আকাশে মেঘ নাই; পশ্চিমাকাশ অস্তগামী সূর্য্যের রক্তিম কিরণে স্বর্ণাভ হইয়া উঠিয়াছে। কয়েকদিন বৈকালে উপর্য্যুপরি বৃষ্টিপাত হইয়া আজ প্রকৃতি বর্ষণ-শূন্যা হইয়াছেন। নির্ম্মেঘ আকাশ দেখিয়া 'গোধূলি-সভা'র সদস্যগণ আজ বটবৃক্ষতলস্থ বেদীমূলে সমবেত হইয়াছেন।

পুরোহিত মহাশয় মন্দির হইতে বাহির হইয়া সর্ব্বাগ্রে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কবিরাজ মহাশয় সকলের মুখপাত্রস্বরূপ বলিলেন, "হাঁ আমাদের সকলেরই কুশল।"

পুরোহিত মহাশয় তাহার পর নায়েব মহাশয়কে জিজ্ঞাসা

করিলেন,—আপনাদের সেই গোপীপুরের বাঙ্গলো বাড়ীর খবর কি বলুন।

নায়েব। খবর একই রকম। রাত্রি ৩টার সময় রোজই সেই স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শুনা যায়।

পুরোহিত। জমীদার মহাশয় এর একটা বিহিত করেন না কেন?

এই কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই নায়েব মহাশয়কে বলিলেন, "হাঁ আমরা এইরূপ একটা গুজব শুনিতে পাইতেছি বটে; কিন্তু ব্যাপারটি কি সত্য? আপনি আমাদিগকে সব খুলিয়া বলুন।"

নায়েব মহাশয় উত্তর করিলেন, "গত বৎসর আমাদের জমীদার মহাশয় গোপীপুরের এক নীলকর সাহেবের পুরাতন বাঙ্গলো কুঠি খুব অল্প মূল্যে খরিদ করেন। উদ্দেশ্য,—শীতের সময় যে দু' চারিজন সাহেব-সুবা পাখী শীকার করিতে আসেন, তাঁহাদিগকে সেইখানে বাসা দিবেন। এইজন্যই ঐ বাঙ্গলোটি প্রায় নূতন করিয়াই মেরামত করা হয়। বাঙ্গলো সুসংস্কৃত ও বাসের উপযোগী হইলে জমীদার মহাশয় আমাকে ঐস্থানে প্রেরণ করিয়া বলেন, "আপনি উহা ইউরোপীয় ধরণের আসবাব দ্বারা সুন্দররূপে সজ্জিত করুন। স্বয়ং সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া সাজ-সজ্জার সুব্যবস্থা করিয়া আসুন।" এইজন্য কলিকাতার সাহেব বাড়ী হইতে ভাল ভাল আসবাব আসিল, সেখান হইতে কয়েকজন অভিজ্ঞ মিস্ত্রীও প্রেরিত হইল। আমি আসবাব ও লোকজন সঙ্গে লইয়া গোপীপুরের কুঠিতে যাইলাম। সেদিন সকলে পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়ায় কাজকর্ম্ম আর কিছু হইল না; সন্ধ্যার পরই কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া সকলে শয়ন করিলাম। বলা বাহুল্য, আমি একাকীই একটি ঘরে শুইয়াছিলাম। রাত্রি অনুমান ৩টার সময় স্ত্রী-লোকের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠিয়া বসিলাম। আমার ঘরের ভিতর

একটি 'হারিকেন' জ্বলিতেছিল। আমি সেইটা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া চাকরদিগকে ডাকিলাম। তাহারা উঠিল। তাহাদিগকে বলিলাম, "স্থির হইয়া শুন দেখি, কোন আওয়াজ পাও কিনা? তাহারা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও দাঁড়াইয়া রহিলাম। একটু পরেই আমরা সকলে বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম, অদূরে যেন কোন স্ত্রীলোক ক্রন্দন করিতেছে। এত রাত্রিতে স্ত্রীলোকের রোদন-শব্দ এ কুঠির মধ্যে কিরূপে আসিল, তাহা আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক, আমরা সকলেই এক একগাছি লাঠিহস্তে সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর বেশ ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম যে, শব্দ অশ্বশালার পার্শ্ববর্ত্তী একটি ঘর হইতে আসিতেছে। আমরা যখন সেই ঘরের দরজার নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন স্পষ্টই শুনিলাম, বামাকণ্ঠে শব্দ হইতেছে,—"রক্ষা কর, আমায় ছেড়ে দাও, আমি তোমার মেয়ে।" তাহার পরই ক্রন্দন-ধ্বনি। ইহার পর আর কোন শব্দ শুনা গেল না। অনুমান চার কি পাঁচ মিনিট পরে আবার ঠিক সেই শব্দ,—"রক্ষা কর, আমায় ছেড়ে দাও, আমি তোমার মেয়ে।" তাহার পরই ক্রন্দন-ধ্বনি।

স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া আমার ন্যায় ক্ষীণ প্রাণীও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমি চাকরদের হুকুম দিলাম,—"দরজা ভাঙ্গ", দেখছ কি? আমাদের সাম্‌নে কি একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হ'বে?" চাকরেরাও ব্যাপার বুঝিয়া পূর্ব্ব হইতেই উত্তেজিত হইয়াছিল, এক্ষণে আমার আজ্ঞা পাইবামাত্র তাহারা পদাঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আমি তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমাদের সঙ্গে দুইটা "হারিকেন" লণ্ঠন ছিল; চাকর তিনজনও আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমরা সেই ঘরের মধ্যে জন প্রাণীকেও দেখিতে পাইলাম না। ঘরে একটি গবাক্ষ

বা সামান্য একটু ছিদ্রমাত্র নাই যে, কাহারও পলায়নের সম্ভাবনা থাকিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উত্তেজনার বশে আমরা দরজায় যে তালা বন্ধ ছিল, তাহা দেখি নাই। দরজা খুব মজবুত ছিল না, তাহার উপর পুরাণোও হইয়াছিল; কাজেই দুই চারি পদাঘাতেই উহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, যখন দেখিলাম যে, ঘরে কেহই নাই; তখন আমি একটু সন্দিগ্ধ হইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, এটা একটা নীলকুঠি ছিল; আর বহুদিন পর্য্যন্ত 'পতিত'ও ছিল। সম্ভবতঃ এ ক্রন্দন-ধ্বনি তবে অমানুষিক হইবে। আমি ইহা মনে করিয়া চাকর তিনজনকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। তাহারা তিনজনে ব্যাপার দখিয়া একেবারে ভয়-বিহ্বল ও বিস্ময়-চকিত হইয়াছিল।

আমি শয্যার উপর আসিয়া শুইয়া পড়িলাম বটে, কিন্তু আর নিদ্রা আসিল না এবং সেই রোদনের শব্দও আর শুনিতে পাইলাম না।

তাহার পর সেখানে আমি আরও পাঁচ সাতদিন ছিলাম। প্রতি রাত্রিতেই ঠিক ঐ সময় আমরা সকলেই সেই ক্রন্দনের শব্দ শুনিতে পাইতাম। প্রথম দুই একদিন চাকর-বাকর ও মিস্ত্রীরা ভয় পাইয়াছিল, কুঠীতে কাজ করিতে চায় নাই; কিন্তু শেষে আমি তাহাদিগকে সাহস ও ভরসা দেওয়াতে তাহারা কাজ করিতে আর কোনরূপ আপত্তি করে নাই।

কাজ শেষ হইয়া গেলে আমি এখানে চলিয়া আসিলাম এবং আসিয়া জমীদার মহাশয়কে এই ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক বলিলাম। তিনি ঘটনা শুনিয়া একটু চিন্তান্বিত হইলেন। পরে বলিলেন, "ইহার একটা প্রতীকার করা আবশ্যক।"

আমি বলিলাম, "ঐ ঘরে একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাইলে ভাল হয়।"

জমীদার। ঐ কুঠীতে আরও কয়েকদিন বাস করিয়া ঐ ঘরে

ভগবানের নাম-কীর্ত্তনাদি করিলে আমার বিশ্বাস এই অপদেবতার ক্রন্দন-শব্দ দূর হইতে পারে। যাহা হউক, যাহাতে ঐ কুঠীতে কয়েক-দিন বসবাস করিতে পারা যায়, এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে।

আমি উত্তর করিলাম, "হাঁ, এরূপ ব্যবস্থা মন্দ হইবে না।"

জমীদার মহাশয়ের এই আদেশের দুই তিন দিন পরে আমি পল্লীস্থ কয়েকজন লোক এবং চারি পাঁচজন সৎ বৈষ্ণবকে সঙ্গে লইয়া গোপীনাথপুরের কুঠীতে উপস্থিত হইলাম। আমার আদেশে ঐ ঘরটির সংস্কার করা হইল; তাহার সম্মুখে তুলসীমঞ্চ স্থাপিত হইল। প্রতি সন্ধ্যায় হরিসংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। ঐ 'আবিষ্ট' গৃহের ভিতরে, বাহিরে, উহার চারিপার্শ্বে নাম-কীর্ত্তন ক্রমশঃ প্রাতে ও সন্ধ্যায় আরম্ভ হইল! কিন্তু তবুও নিশীথরাত্রের সেই অতিমানুষিক ক্রন্দন-ধ্বনির বিরাম হইল না; যেমন পূর্ব্বে হইত, তেমনই এখনও হইতে লাগিল।

একদিন আমি প্রাতঃকালে বসিয়া মনে মনে এই কথারই আলো-চনা করিতেছি এবং তামাকু সেবন করিতেছি, এমন সময়ে একজন বৃদ্ধ আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবু মহাশয়, আপনাদের এই কুঠিতে রোজ নাম-কীর্ত্তন হইতেছে কেন? হায় হায় কালের কি মহিমা! যেখানে একদিন অধর্ম্মের ডঙ্কা বাজিত, সেখানে আজ ধর্ম্মের মৃদঙ্গ-রোল হইতেছে! আপনারা কি এখানে হরি-সভা করিবেন?"

আমি উত্তর করিলাম,—"না হরি-সভা হইবে না; আমাদের জমীদারবাবু এখানে একটা বাঙ্গলো করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়া-ছেন। তবে একটা বড় প্রতিবন্ধক হইতেছে; রোজই ঐ তফাতের ঘরটা থেকে একটা স্ত্রীলোকের ক্রন্দন-স্বর শুনা যায়, কিন্তু ঘরের ভিতর যাইয়া অনুসন্ধান করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইজন্য আমরা বুঝিয়াছি যে, ইহা মনুষ্যের কণ্ঠস্বর নহে; ইহা কোন প্রেতের যাতনা-সূচক স্বর।

বৃদ্ধ। স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর যে এ কুঠীতে শুনিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। বহু সতীসাধ্বী এখানে ধর্ম্মরক্ষার জন্য জীবন দিয়াছেন, একথা আমি শুনিয়াছি। কত স্ত্রীলোককে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হইয়াছে। শেষকালের খবর আমি জানি,—সে সময়ে একজন সধবা তরুণী গোপ-কন্যাকে কুঠীয়ালেরা বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনে। তাহার উপর কুঠীর প্রধান গোমস্তার কুদৃষ্টি ছিল। তাহাকে ঐ ঘরেই বদ্ধ করিয়া রাখা হয়। তখন এ কুঠীর চারিদিকে প্রাচীর ছিল। রাত্রিতে ঐ গোমস্তা চাবুক হাতে করিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিত, "তুই স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয় করবি কিনা বল্?" ধর্ম্মশীলা গোপকন্যা অসম্মতি প্রকাশ করিলে দুর্ব্বৃত্ত তাহাকে তিনবার উপরি উপরি চাবুক মারিত। উপরি উপরি দুইদিন এইরূপ অত্যাচার করিবার পর তৃতীয় দিনের দিন যখন পাষণ্ড গোমস্তা চাবুক হস্তে তাহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন অর্দ্ধমৃতা গোপকন্যা তাহাকে কর-যোড়ে বলিয়াছিল, 'আমি তোমার কন্যা, আমাকে ছাড়িয়া দাও।' দুর্ব্বৃত্ত তাহা না শুনিয়া তাহাকে কু-প্রস্তাব করে, তখন সেই তেজস্বিনী গোপবালা তাহাকে অভিসম্পাত দিয়া বলে, "আমি প্রতি রজনীতেই তোর এই অধর্ম্মের কথা সকলকে শুনাইব। তুই আগুনে পুড়িয়া মরিবি, তুই নির্ব্বংশ হইবি।" দুর্ব্বৃত্ত ইহা শুনিয়া সতীর উদরে সজোরে পদাঘাত করিল; অনশনক্লিষ্টা, অর্দ্ধমৃতা গোপকন্যা সেই আঘাতে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তাহার সেই মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গিল না! সেই অবধি গ্রামের অনেকেই নিশীথরাত্রিতে এইরূপ কণ্ঠস্বর শুনিয়া আসিতেছে। সতীর কথাও অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে। দুর্ব্বৃত্ত গোমস্তার আবাস-বাটীতে যখন আগুন লাগে, সেই সময়ে সেও অগ্নিদগ্ধ হইয়া মারা যায়। তাহার পর তাহার দুই পুত্র একমাসের মধ্যেই—একটি ওলাউঠায় এবং একটি সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এখন

গ্রামে তাহার বাসবাটীর চিহ্নমাত্র নাই এবং তাহার বংশে বাতি দিবারও কেহ নাই।"

বৃদ্ধ এই কথা বলিয়া চলিয়া গেল। আমিও প্রতীকারের উপায় ভাবিতে লাগিলাম। বলা বাহুল্য, এখন হইতে প্রাতে ও সন্ধ্যায় দ্বিগুণ উৎসাহে নামকীর্ত্তন হইতে লাগিল।

একদিন বৈকালে আমরা কয়জনে বসিয়া বসিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেছি, এমন সময়ে একজন গৈরিকবসনপরিহিত সন্ন্যাসী আসিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিশাল ললাট ও উজ্জ্বল চক্ষু দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিলাম, ইনি সাধারণ ভিক্ষুকশ্রেণার সন্ন্যাসী নহেন। আমরা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ভিতরে আহ্বান করিলাম, এবং তথায় উপবেশন করিতে বলিলাম। সন্ন্যাসী বলিলেন, "অল্পক্ষণ বসিয়া কি করিব? আমি আজকারমত এইখানে রাত্রিযাপন করিতে চাই।"

আমি। কোন আপত্তি নাই; আপনি অনুগ্রহ করিয়া এখানে থাকিলে আমরা বরং সকলেই বাধিত হইব।

সন্ন্যাসী। আমি বহুদূর হইতে আসিতেছি, এখানে একটু বিশ্রাম করিতে পাইব বলিয়াই আপনাদিগকে অনুরোধ করিলাম।

আমি। আমাদের পরম সৌভাগ্য।

অতঃপর সন্ন্যাসী তাঁহার ছোটঝুলি ও দণ্ডগাছি আমাদের নিকটে রাখিয়া হস্তপদপ্রক্ষালনের জন্য সম্মুখবর্ত্তী পুষ্করিণী-তটে গমন করিলেন এবং প্রায় দুই ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিলেন। উপস্থিত হইয়াই তিনি বলিলেন, আমাকে একটা নির্জ্জন গৃহ দিতে হইবে; ঐ দূরের ঘর-খানিকে যদি আজ রাত্রিতে আমার ব্যবহারের জন্য প্রদান করেন, তবে ভাল হয়। ক্রমশঃ।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

অলৌকিক রহস্য।

৮ম সংখ্যা] তৃতীয় বর্ষ। [ফাল্গুন, ১৩১৮।

পুনরাগমন।

(৪১)

ঘুম ভাঙ্গিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। আমি বাড়ীতে সচরাচর এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাই না। প্রায়ই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শয্যা পরিত্যাগ করি। যদিইবা কখন উঠিতে বিলম্ব হয়, মা ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেন। ব্রাহ্মণের আর কোন কার্য্য করি আর নাই করি, সূর্য্যরশ্মিকে ঘুমন্ত চোখের উপর কদাচ পড়িতে দিয়াছি। কিন্তু আজ বিদেশে পল্লীগ্রামে তাহাও আমার ভাগ্যে ঘটিল। চোখ মেলিয়া দেখি পূর্ব্বদিগের জানালার মধ্যদিয়া রাশি রাশি রৌদ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে। পল্লিগ্রামের রৌদ্র গ্রামস্থ অশ্বত্থ বটের মাথার উপর না উঠিলে গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ করিবার অধিকার পায় না। ইহাতেই বুঝিলাম বেলা অন্ততঃ এক প্রহর হইয়াছে।

শয্যাতে বসিয়াই কালুকে ডাকিলাম। কালুর পরিবর্ত্তে আর একজন ভৃত্য আসিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বেলা কত ?" সে বলিল—"একপ্রহর" বুঝিলাম আমার অনুমান মিথ্যানয়। দীর্ঘসময় ব্যাপী নিদ্রারজন্য আমার লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। ইহারা হয়ত মনে করিয়াছে, এইরূপ বেলাতে উঠাই আমার নিত্য কার্য্য। তাহাদের এই ভ্রম দূর করিবার জন্য তাহাকে বলিলাম,—"সূর্য্যওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তুলিয়া দাও নাই কেন ?"

কেন, সেকথা ভৃত্য বলিতে পারিল না।

আমি তাহাকে আর প্রশ্নে বিব্রত না করিয়া, মুখপ্রক্ষালনাদি কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলাম।

আদেশ করিবামাত্র সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াগেল। আমিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাহিরে আসিলাম।

মুখপ্রক্ষালনাদি কার্য্য শেষ করিয়া আবার ঘরে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দেখি কালুসরদার তুলাসিংকে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তুলাসিংকে দেখিয়াই আমি ভীত হইলাম। ভয়ের কারণ, পিতা যে আগ্রহে আমাকে গোপালের অনুসন্ধানে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে এত শীঘ্র শীঘ্র তুলাসিংকে আমার কাছে পাঠাইবার তাঁহার প্রয়োজন ছিল না। সুতরাং তুলাসিংকে দেখিয়া আমার মনে হইল, পিতা বোধহয় পুনরায় রোগকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছেন।

তুলাসিং কাছে না আসিতে আসিতেই তাহাকে বাটীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরদিয়া সে আমাকে নিশ্চিন্ত করিল; এবং আমার হাতে একখানা পত্র দিল।

পত্র পড়িতে পড়িতে আমার মুখে হাসি আসিল। পড়িতে পড়িতে ডাক্তার বাবুর স্বপ্নকথা মনে পড়িল। এতক্ষণ রাত্রির ঘটনা একরূপ ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তুলাসিংকে দেখিবামাত্র তাহা আমার মনে পড়া উচিত ছিল; কিন্তু বিস্ময়ের কথা তাহা হয় নাই। পত্র এক্ষণে তাহা স্মরণে আনিয়া দিল। পত্রপাঠ করিতে করিতে একবার ভাবিলাম—স্বপ্নকথাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এতকালের দুঃখ-স্মৃতিভরা জাগ্রতজীবন বহন করিয়া কি ফললাভ করিলাম!

কালু আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু, খবর ভাল?"

আমি বলিলাম, "ভাল।"

"তাহলে অনুমতি করুন, আমি একবার দরোয়ানজীকে সঙ্গে লইয়া যাই। সেদিন রাত্রের দেখা শুনায় এক রকম খাতির করিয়াছিলাম। আজকে যখন দরোয়ানজী ঘরের লোক হইয়া গেল, তখন তাহার মতনও একটু খাতির করা চাইত!" এই বলিয়া কালু তুলাসিংকে সঙ্গে লইবার ব্যগ্রতা দেখাইল।

আমি তুলাসিংকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছ?"

তুলাসিং বলিল—"শেষ রাত্রে।"

"এ বাড়ীর ঠিকানা তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

"কর্ত্তা বাবু বলিয়া দিলেন।"

"আমিত কর্ত্তা বাবুকে কোনও ঠিকানা বলিয়া আসি নাই! তবে আমি এখানে আছি, তিনি কেমন করিয়া জানিলেন! বিশেষতঃ যে বাড়ীতে আসিয়াছি, সে বাড়ীর বাবুর নাম পর্য্যন্ত জানিবার তাঁহার সম্ভাবনা ছিল না!"

"তাহাত কিছুই জানিনা হুজুর! কর্ত্তাবাবু এই চিঠি আমার হাতে দিয়া এইখানে আসিতে হুকুম করিয়াছেন। বলিয়া দিয়াছেন, 'জরুরী'।

"বেশ, বিশ্রাম কর।"

কালু তুলাসিংকে সম্ভ্রমের সহিত সঙ্গে লইয়া চলিল। দেখিলাম, উভয়েই একমুহূর্ত্তে পূর্ব্ববিরোধ ভুলিয়া পরস্পরের বন্ধু হইয়াছে।

কালুকে একবার ডাক্তার বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম।

কালু বলিতেপারিল না। সে পূর্ব্বরাত্রে উক্ত ভৃত্যটার উপর আমার পরিচর্য্যার ভার দিয়া তাহার প্রভুর আদেশে অন্যত্র গিয়াছিল। তাহার প্রভুর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। কালু তৎসম্বন্ধেও কোন উত্তর দিতে পারিল না। বৃথা প্রশ্নে আর উৎপীড়িত না করিয়া তাহাকে তুলাসিংহের সঙ্গে বিদায় দিলাম।

হতভাগ্য ভৃত্যটা শুধু পরিচর্য্যা জানে, কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলে হয় বুঝিতে পারে না, কিম্বা বুঝিলে উত্তর দিতে পারে না। পরিচর্য্যান্তে যখন সে অন্য আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইল, তখন আমি তাহাকে দুর্গাকে বাড়ীর মধ্য হইতে ডাকিয়া আনিতে কহিলাম।

ভৃত্য বুঝাইল বাবুর বিনা হুকুমে বাড়ী ভিতরে একটা পিপীলিকার পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার নাই। নিরুপায়ে পত্র সম্বন্ধে চিন্তা করিবার জন্য কক্ষমধ্যে পুনঃপ্রবৃষ্ট হইলাম। পত্র পিতার স্বহস্ত লিখিত। তিনি সুস্থ হইয়াছেন, মাও সুস্থ আছেন। আমাকে পত্রপাঠমাত্র কলিকাতায় ফিরিতে আদেশ করিয়াছেন। তাহার কারণ, আমি যে ইন্‌জিনিয়ারিং পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলাম, তাহার ফলে গবর্ণমেণ্ট আমাকে চাকুরী দিয়াছেন। খুব সুবিধার চাকুরী—পিতার একমাত্র পুত্র, আমাকে দূরদেশে যাইতে হইবে না। আমি গ্রহণেচ্ছু কি না, কর্ত্তৃপক্ষকে সত্বর জানাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের কথা। আমার ভাবীশ্বশুর কার্ত্তিকমাসের মধ্যে পাকা দেখার কথা লিখিয়া জানাইয়াছেন। পরমাসের প্রথম সপ্তাহেই অর্থাৎ প্রায় পক্ষান্তেই আমাকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। কার্ত্তিকমাসে বিবাহ দিবার হইলে আমার পত্রপাঠ বিবাহকার্য্যটীও শেষ হইয়া যাইত। ইহাই পত্রের মর্ম্ম। পত্রখানা আমি দুই তিনবার পড়িলাম। এক বোকাভৃত্য ছাড়া আর দ্বিতীয় ব্যক্তি এমন কেহ সেখানে ছিল না যে, তাহার সহিত যে কোন প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত করি। সুতরাং পত্র খানাই তখন আমার রহস্যালাপের সাথী হইয়াছিল।

দুইতিন বার পত্রখানা আদ্যোপান্ত পড়িলাম। কোন কোন অংশ আরও দুইচারিবার পাঠ করিলাম। 'শুভানুধ্যায়ী' হইতে 'ইতি' পর্য্যন্ত সমস্ত অক্ষর গুলা আমার পরিচিত হইয়াগেল; কিন্তু পত্রের কোনও স্থানে গোপালের নামগন্ধ পর্য্যন্ত পাইলাম না! পিতা কি ইচ্ছাপূর্ব্বক

গোপালের কথা বিস্মৃত হইলেন, অথবা আমার ভাবী ভাগ্যের মোহে স্মৃতি হইতে গোপালের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে ?

পিতার প্রতি শ্রদ্ধা, মাথায় শামলা পরিয়া আমার অন্তরাত্মার বিচার গৃহে অনেকক্ষণ ধরিয়া ওকালতী করিল, অনেক যুক্তি তর্কে বুঝাইল, পিতা ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপালের নাম লিখিতে ভুলিয়া যান নাই। কিন্তু বিচারপতি যেন কিছুতেই সে কথা শুনিতে চাহিলেন না। কে যেন আমাকে ভিতর হইতে বলিতে লাগিল, "তোর গৃহত্যাগের সঙ্গেসঙ্গেই তোর পিতার মত ফিরিয়া গিয়াছে। যে সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া তোর পিতা গোপালকে সর্ব্বস্ব দিতে চাহিয়াছিল, সে উত্তেজনা চলিয়া গিয়াছে।" ইচ্ছা পূর্ব্বকই যেন পিতা পথিমধ্যে গোপালের নাম করেন নাই। এ উত্তেজনা আসিলই বা কেন, আবার এত শীঘ্র চলিয়াই বা যাইল কেন ? এ 'কেন'র উত্তর কে দিবে ?

আমি এখন কি করিব ? গোপালকে লইয়া যাইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি। পিতার আদেশ, সর্ব্বস্ব দিয়াও যদি গোপালকে ফিরাইতে হয় তাও আমাকে করিতে হইবে। পিতার সেই সাময়িক উত্তেজনা বিদ্যুৎ সঞ্চারে আমাকেও মুহূর্ত্তের মধ্যে উত্তেজিত করিয়াছিল। পিতার আদেশ শুনিবামাত্র আমি দিগ্ বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছি। আমি এখন কি করিব ?

বুঝিতেছি, পিতা পত্রমধ্যে গোপালের নাম লিখিতে সাহসী হন নাই। আদেশ প্রত্যাহার করিতে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়াছে, হাত কাঁপিয়াছে—দুই একটা হেলা দোলা অস্পষ্ট অক্ষরই তাহার সাক্ষী। গোপালকে ফিরাইবার প্রয়োজন নাই, একথা সহস্র চেষ্টাতেও তাঁহার লেখনী হইতে বাহির হয় নাই। অবশেষে আমার বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করিয়া, পিতা যেন কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

আমার এখন কর্ত্তব্য কি? গোপালের সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে ফিরিতে অনুরোধ করিব, না চাকরী বজায় করিতে ঘরে ফিরিব? পূর্ব্ব রাত্রে ব্রাহ্মণের গৃহে পদার্পণ করিয়া যদি গোপালের সঙ্গে দেখা হইত, তাহা হইলে পিতার আদেশ তাহাকে না শুনাইয়া স্থির থাকিতে পারিতাম না। এখন দেখিতেছি, ভাগ্যবশেই গোপালের সঙ্গে দেখা হয় নাই। দেখা হইবার পর যদি এই চিঠি পাইতাম, তাহা হইলে যে কি বিপদে পড়িতাম, তাহা আর কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। সমস্ত কথা শুনিবার পর গোপাল যদি আমার সঙ্গে যাইতে স্বীকৃত হইত, আর বাটীতে গিয়া অপদস্থ হইত, তাহা হইল আমার আর লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিত না। এখন ও গোপালের সঙ্গে পুনর্মিলনের আশা আছে, কিন্তু এরূপ ঘটনা ঘটিলে এ জীবনে গোপালের সহিত মিলন প্রত্যাশা ত্যাগ করিতে হইবে।

মনে মনে অনেক বিচার বিতর্কের পর কলিকাতায় ফিরিয়া যাওয়াই স্থির করিলাম কেবল একবার মাত্র ডাক্তার বাবুর পরামর্শ লওয়ার অপেক্ষা।

(৪)

অল্পক্ষণ পরেই ডাক্তার বাবু আসিলেন। দেখিলাম, তিনি একখানি সুন্দর গরদ পরিয়াছেন। গলায় একটী ফুলের মালা ও কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা। তিনি সমীপে আসিয়াই, আমাকে পূর্ব্বরাত্রির মত প্রণাম করিলেন। তাঁহার আচরণের এই বিচিত্র পরিবর্ত্তনে আমি বিস্মিত—কোন কথাই কহিতে পারিলাম না।

প্রণামান্তে তিনি আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং অনেকক্ষণ আমার তত্ত্ব লইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি এখন বিস্মিত নই—বিপন্ন। একদিন পূর্ব্বে যাঁহাকে গুরুজনের ন্যায় শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়াছি, আজ তাঁহাকে সহসা এরূপ

ভাবাপন্ন দেখিয়া আমার মনের অবস্থা কি ইহা সকলেরই সহজে অনুমেয়। যাই হ'ক, বাধ্য হইয়া আমাকে মনের ভাব চাপিতে হইল। আমি তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি বসিলেন, কিন্তু নিকটে বসিলেন না। আমি যে চৌকীর উপর বসিয়াছিলাম, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে মৃত্তিকাসনে তিনি উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার আচরণে মস্তক ঘর্ম্মাক্ত করিবার প্রয়োজন নাই বুঝিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনি এখন কি করিবেন ?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"আমাকে আজই বাড়ী যাইতে হইবে।"

আমি। আমাকেও বাড়ীযাইতে হইবে।

ডাক্তার। সে কি ভাই, গোপালের সহিত দেখা না করিয়া তুমি কেমন করিয়া যাইবে !

আমি। গোপাল কোথায় ?

ডাক্তার। গোপাল তোমাদের গ্রামে গিয়াছে। আজ আসিতে না পারে কাল তাহাকে আসিতেই হইবে।

আমি। আমি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিব না।

ডাক্তার। সে কি ভাই, এই যে তুমি তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছ !

আমি। আসিয়াছিলাম, কিন্তু ডাক্তারবাবু, আমি হতভাগ্য—প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিলাম না।

ডাক্তারবাবুর উত্তর শুনিয়া বোধ হইল, তিনি বুঝিয়াছেন, আমি ব্রাহ্মণের উপর বিরক্ত হইয়াছি—আমার প্রতি তাহার যথোচিত যত্ন হইতেছে না। তিনি বলিলেন—"বুঝিতেছি, তোমার কষ্ট হইতেছে। বেলা দশটা বাজে, বাড়ীতে থাকিলে এতক্ষণ দুইবার জলযোগ হইত। সকালে চা খাওয়া অভ্যাস, তাও পাও নাই।"

আমি বলিলাম—"ইহা আমার চলিয়া যাইবার কারণ নহে।"

ডাক্তারবাবু সে কথায় বিশ্বাস না করিয়া, বলিতে লাগিলেন—"ব্রাহ্মণের কোনও অপরাধ নাই। তুমি চা খাও, একথা আমার কাছে শুনিয়া তিনি প্রভাত হইতেই গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সন্ধান করিয়াছেন,—কোথাও পান নাই। এখনও এদেশের লোক চায়ের নাম পর্য্যন্ত জানে না। এখনওপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃসন্ধ্যা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণ তৎপরিবর্ত্তে তোমার জন্য নানাবিধ মিষ্টান্ন, দুগ্ধ ও ফলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি ইতিমধ্যে তিন চারিবার তোমার তথ্য লইয়াছেন। তোমাকে গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া, তিনি তোমাকে জাগাইতে সাহস করেন নাই। এখন তিনি একটী বিশেষ কারণে আবদ্ধ হইয়াছেন, এইজন্য তোমার কাছে আসিতে পারিতেছেন না। তৎপরিবর্ত্তে আমি আসিয়াছি।"

আমি তাঁহার সন্দেহ দূর করিতে পারিব না বুঝিয়া বলিলাম—"আপনি যাইবেন কেন ?"

আমি তোমার বউদিদিকে আনিতে চলিয়াছি। কালই তাঁহাকে লইয়া ফিরিব।

আমি। তিনিও বুঝি দীক্ষাগ্রহণ করিবেন ?

ডাক্তারবাবু ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"দীক্ষার জন্যই তাঁহাকে আনিতে চলিয়াছি। সে আমার সুখদুঃখের ভাগী। এমন অমূল্যরত্ন আমি একা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। তাঁহাকে অংশ না দিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটী হয়। আমি গুরুদেবের নিকট আদেশ লইয়াছি। এই দুই তিন দিনের ভিতর দীক্ষা না হইলে, এজন্মে আর বোধ হয় তার ভাগ্যোদয় হইবে না।

আমি। কেন ?

ডা। গুরুদেব কাশীধামে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বোধহয়, আর ফিরিবেন না। পুত্রের বিবাহকার্য্য শেষ হইলেই চলিয়া যাইবেন।

আমি। গোপালের কোথায় বিবাহ হইয়াছে?

ডা। বিবাহ হইয়া গিয়াছে। হইয়াছে মহানবমীর দিবসে, গোধূলিলগ্নে। শুধু কুশণ্ডিকাদি কার্য্য বাকী। যেদিনে মা দুর্গা শিবের সঙ্গে কৈলাসগমনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই দিনই এই ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহশোভাকরী সচল প্রতিমা তাঁহার শিবের সঙ্গিনী হইয়াছেন।

আমি। এতক্ষণে বুঝিলাম, কাল দুর্গা আমাকে সন্তান বলিয়াছিল কেন। দুর্গার গোপালের সঙ্গে বিবাহ হইয়া গিয়াছে! তথাপি বলিলাম—"শুনিয়াছি, আশ্বিন মাসে বিবাহ হয় না।

ডা। গুরুর আদেশে সব হয়।

আমি। গুরু কখন আদেশ দিবার অবকাশ পাইলেন? আপনিত সব জানেন। পিতা যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন পিতামহ গোপাল সম্বন্ধে কি বলিয়াছিলেন, আমিও কি উত্তর দিয়াছিলাম, আপনিত সমস্তই শুনিয়াছেন!

ডা। শুনিয়াছি।

আমি। তবে আপনি কেমন করিয়া বলিতেছেন, গোপাল গুরুর আদেশ পাইয়াছে।

ডা। গোপালত পিতার কাছে দীক্ষা লয় নাই। পিতার কাছে দীক্ষাগ্রহণ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ। আমার গুরুদেবও গোপালের বিবাহসম্বন্ধে জানিতেন না। এখানে কাল আসিয়া জানিয়াছেন।

আমি। গোপালের গুরু কে?

ডা। সেকথা আমি বলিতে পারিব না। অন্ততঃ গুরুদেবের আদেশ না পাইলে আমার বলিবার অধিকার নাই।

আমি। আমি বলিতে পারি—সেই বুড়ী সন্ন্যাসিনী।

ডা। গোপীনাথ, ভাই, আমাকে জেরা করিয়ো না—আমি বলিতে পারিব না।

আমি। আপনি বলিয়াছেন—আমি শুনিয়াছি।

ডাক্তার বাবু এইকথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"আমি বলিয়াছি!"

আমি তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে বলিলাম,—"ভয়নাই—আপনি জাগরিতাবস্থায় বলেন নাই। স্বপ্নে আপনার মুখ হইতে তাঁহার কথা বাহির হইয়াছে।

বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে ডাক্তারবাবু একবার আমার মুখের পানে চাহিলেন। তাহার পর বলিলেন—"তুমি শুনিয়াছ?"

আমি। সমস্ত শুনিয়াছি। সারারাত্রি আমি জাগিয়াছিলাম। সেই জন্যই উঠিতে আমার এত বেলা হইয়াছে। আমি শুনিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, সেই বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী গোপালের গুরু।

ডাক্তারবাবু আমার একথায় কোনও উত্তর করিলেন না। তিনি যুক্তকরে শিরস্পৃষ্ট করিয়া বলিলেন—"কেজানে মা তোর কি লীলা! আমি জ্ঞানহীন কেমন করিয়া বুঝিব!"

আমি বলিলাম—"আপনার কি স্বপ্নকথা কিছুই মনে নাই?"

ডা। না ভাই, কিছুই মনে নাই। আমি এইমাত্র জানি, কাল অতি স্বচ্ছন্দে ঘুমাইয়াছি। এরূপ গভীর নিদ্রা আমার আর কখন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। তবে মা যখন তাঁর ভৃত্যের মুখদিয়া কথা কহিয়াছেন, তখন সে কথা শুনিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে।

একবার মনে করিলাম বলি, আবার মনে করিলাম, না, বলিবনা। ডাক্তারবাবুর যদি শুনিবার হইত, তাহা হইলে স্বপ্নকথা তাহার মনে পড়িত। সঙ্গে সঙ্গে অভিমান জাগিল। তিনি যখন আমাকে গোপালের গুরু সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে অনিচ্ছুক, তখন আমিই বা আমার এই গুহ্য কথা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিব কেন? আমি

বলিলাম,—"না ডাক্তার বাবু, স্বপ্ন কথা যখন আপনার স্মরণ নাই, তখন সে কথা শুনিবারও প্রয়োজন নাই।

ডা। ভাল, বলিয়োনা।

আমি। কিন্তু সেই সন্ন্যাসিনী গুরু হইলেও আপনার কথা টিকে না। সে বৃদ্ধাও ত সে রাত্রিতে আমাদের ঘরে ছিলেন!

ডাক্তার বাবু এ কথার কোনও উত্তর করিলেন না, একটু হাসিলেন এই মাত্র।

আমি কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহি—তাই জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"হাসিলেন যে?"

"উত্তর দিবার কিছুই নাই বলিয়া হাসিলাম। আমি মুখুজ্যে মহাশয়ের মুখে যেমন শুনিলাম, তেমনি বলিলাম।"

"মুখুজ্যে মহাশয় কি বলিলেন—'বৃদ্ধার অনুমতিতে বিবাহ হইয়াছে?"

"শুধু অনুমতি নয়, মা বিবাহ সময়ে উপস্থিত থাকিয়া বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন।"

"ডাক্তার বাবু, আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না।"

"বিশ্বাস না হইলে তোমার অপরাধ কি! সন্ধ্যাকালে যে ব্যক্তি কলিকাতা হইতে দশ বারোক্রোশ দূরে, সে যে সন্ধ্যার অব্যবহিত পরমুহূর্ত্তে কলিকাতায় থাকিতে পারে, একথা কে বিশ্বাস করিবে?"

"আপনি কি বিশ্বাস করেন?"

"আমি দুই একটী যোগীর সম্বন্ধে এরূপ গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু কখন বিশ্বাস করি নাই। তবে এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকেও মিথ্যাবাদী বলিয়া আমার মনে হয় না।"

"মিথ্যাবাদী না হইলেও উন্মত্তও ত হইতে পারে!"

দেখিলাম ডাক্তার বাবু এই কথা লইয়া অধিকক্ষণ বাগ্বিতণ্ডা

করিতে ইচ্ছুক নহেন। বলিলেন—"যাক্, আর বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণ একরূপ গ্রামবাসীর অজ্ঞাতসারেই পৌত্রীর বিবাহ দিয়াছেন। দুইচারি জন একান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া, আর কেহই এ বিবাহের কথা জানেনা। পঞ্চগ্রামী লোককে এ বিবাহের কথা জানাইতেই হইবে। তাই বালিকার কুশণ্ডিকায় ব্রাহ্মণ একটু সমারোহের আয়োজন করিতেছেন। সুতরাং আজ তোমার কোন মতেই কলিকাতা যাওয়া হইতে পারে না। কেন না জ্ঞাতির মধ্যে একমাত্র তুমি। তোমাকে অন্ন পরিবেশন করিয়া মা দুর্গা তোমাদের কুলভুক্তা হইবেন।

"আমি কিছুতেই থাকিতে পারিব না।"

"ব্রাহ্মণ তোমাকে কি ছাড়িবেন!"

"উপায়ান্তর নাই। তুলাসিং আসিয়াছে, আপনি দেখিয়াছেন?"

সবিস্ময়ে ডাক্তার বাবু বলিলেন—"কইনা! তুলাসিং কখন আসিল! আর এখানের ঠিকানাই বা সে কেমন করিয়া জানিল!"

"তা জানি না। তবে তুলাসিং আসিয়াছে। সে পিতার নিকট হইতে এক পত্র আনিয়াছে, পিতা পত্রপাঠ আমাকে কলিকাতায় ফিরিতে আদেশ করিয়াছেন।"

এই বলিয়া পত্রখানি আমি তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি পত্র হাতে লইয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া মনে মনে পত্রখানা পাঠ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে আমি তাঁহার মুখ দেখিতে লাগিলাম। দেখিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম, পত্রপাঠে তাঁহার সকল স্মৃতি জাগিয়া উঠে কি না! পত্র পড়িতে পড়িতে ডাক্তার বাবুর মুখ গম্ভীর হইল, দেখিতে দেখিতে চক্ষু আর্দ্র হইল, একবিন্দু অশ্রু পত্রের উপর পতিত হইল।

পত্রখানা পড়িয়া তিনি আমাকে ফিরাইয়া দিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ

কোনও কথা কহিলেন না। আমার মনে হইল, সেই সমস্ত সময়টা তিনি ভাব সংবরণ করিতেছিলেন, অতিকষ্টে কি একটা প্রবল মনোবেগ দমন করিতেছিলেন।

আমি আর অধিকক্ষণ নীরব থাকিতে পারিলাম না। বেলা দেখিতে দেখিতে বাড়িয়া উঠিতেছে, ক্ষুধাও অল্পে অল্পে বাড়িয়া প্রবল হইবার উপক্রম করিতেছে। বাস্তবিক, বাড়ীতে থাকিলে অন্ততঃ দুইবার জলযোগ অথবা প্রাতর্ভোজ শেষ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। যদি বাড়ীতে ফিরিতেই হয়, তাহা হইলে এখন হইতেই প্রস্তুত হইবার প্রয়োজন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনার মত কি? এরূপ পত্র পাইয়া আর কি আমার গোপালের জন্য অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য?"

ডা। আমি কি বলিব!

আমি। আমি বিপন্ন হইয়া আপনার সৎপরামর্শের অপেক্ষা করিতেছি।

ডা। গোপীনাথ, আমি যে কি পরামর্শ দিব, বুঝিতে পারিতেছিনা। তবে তুমি যদি এই পত্র পাইয়া বাড়ী ফিরিয়া যাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে অপরাধী মনে করিতে পারিব না।

আমি। ডাক্তার বাবু, প্রতিশ্রুতিমত পিতা যদি আজ গোপালকে সর্ব্বস্ব দান করিতেন, তাহা হইলে, সত্য কথা বলিতে কি, আমার আনন্দের সীমা থাকিত না। কিন্তু এরূপ পত্র প্রাপ্তির পর, আমি কেমন করিয়া গোপালের সঙ্গে দেখা করিব। এই শুভ বিবাহে কি উপঢৌকন আমি দম্পতীর সম্মুখে উপস্থিত করিব?

ডা। এই তোমার মনোভাব?

আমি। এই আমার মনোভাব। আমায় শপথ করিতে বলেন, আমি তাও করিতে প্রস্তুত আছি—আমি যদি পিতার সম্পত্তিতে অধি-

কার প্রাপ্ত হইতাম, তাহা হইলে, সর্ব্বস্ব দিলেও যদি গোপালকে ফিরিয়া পাইতাম, সর্ব্বস্বই গোপালকে দান করিতাম। কিন্তু আমার পিতা—”

আমি আর কথা কহিতে পারিলাম না। হৃদয়ের আবেগে আমার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল। অন্তরের কোন নিভৃত প্রদেশে রাশীকৃত অশ্রু আবদ্ধ ছিল, আজ সমস্তই যেন চোখে আসিয়া উপস্থিত হইল। চক্ষে ফোয়ারা ছুটিল।

ডাক্তার বাবু উঠিয়া আমার হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহারও চক্ষু দিয়া ঝর ঝর জল ঝরিল। অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন— “ভাই! শান্ত হও—তোমার হৃদ্গত ভাব সমস্তই বুঝিয়াছি। আর ইহাও বুঝিয়াছি যে পবিত্রতাময়ী জননীর গর্ভে স্থান পাইয়াছে, তাহাতে তোমার মনুষ্যত্বহীন হইবার উপায় নাই। এখন বুঝিতেছি, তোমার আমার সঙ্গে ফিরাই কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের দারুণ ক্ষোভ হইবে, কিন্তু কি করিবে! আমি তাঁহাকে বুঝাইব। তাহলে, যাইবার পূর্ব্বে একবার গুরুদেবের সঙ্গে দেখা কর না কেন!”

আমি। কোন মুখ লইয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব!

ডা। আজ দেখা না হইলে, আর তাঁহার সঙ্গে দেখার সম্ভাবনা থাকিবে না।

আমি। আপনি কি দেখা করিতে বলেন?

ডা। না, না— ভুলিয়াছি ভাই—আজত আর তাঁহার সহিত দেখা হইবে না!

আমি। তিনি কোথায়?

ডা। বিশালাক্ষীর মন্দিরে।

আমি। দেখা হইবে না কেন?

ডা। তিনি দৈবকার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। কাল তিনি মাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

আমি। মানে কি?

ডা। কাল মা দুর্গার দীক্ষা হইবে। গোপাল এই জন্য কুলদেবতা দামোদরকে আনিতে গিয়াছে। দীক্ষান্তে কুশণ্ডিকা। গুরুদেবের ইচ্ছা ছিল বর কন্যাকে গৃহে লইয়া কুশণ্ডিকা কার্য্য শেষ করেন। কিন্তু ঠাকুরের তা ইচ্ছা নয়। তিনি দুর্গাকে সংবাদ দিয়াছেন,—"আমি তোমাদের বাড়ীতে অতিথি হইব।" ব্রাহ্মণ সেই জন্য ব্যস্ত—দামোদরের সেবার আয়োজন করিতেছেন।

আমি। দামোদর কালু সরদারকে দিয়া সংবাদ পাঠাইলেন নাকি?

ডা। তা ভাই জানিনা। যেমন শুনিলাম, তেমনি তোমাকে বলিলাম। অন্যের কাছে একথা প্রকাশ যোগ্য নয়। তবে তুমি এখন হইতে আমার গুরুস্থানীয়। তোমার কাছে গোপন করিয়া কথা বলা উচিত নয় বলিয়াই বলিলাম।

আমি। তা ভালই করিয়াছেন। শুনিয়া আপনার বিশ্বাস হইয়াছে কিনা জানি না। যদি হইয়া থাকে, আমি সে বিশ্বাসে বাধা দিব না। আমার জীবনে অল্প সময়ের মধ্যে এত ঘটনা ঘটিয়াছে যে, তাহার সবগুলার আমি আজিও পর্য্যন্ত কোন নৈসর্গিক কারণ নির্ণয় করিতে পারি নাই। আপনিওত তাহার কতকগুলার সাক্ষী, এমন কি গত রাত্রিতেও আমি ঘটনার অলৌকিকত্বের নিদর্শন পাইয়াছি। আপনাকে যখন বলিব না বলিয়াছি, তখন বলিব না। যদি বলিবার অবস্থা হয়, তাহা হইলে সময়ান্তরে বলিব।

ডা। তোমার বলিবার ইচ্ছা না থাকিলে, আমিও জানিবার ইচ্ছা করি না। যে সিদ্ধবংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহাতে অলৌকিক ব্যাপারের নিদর্শন পাওয়া তোমার পক্ষে বিচিত্র নয়।

আমি। তথাপি ডাক্তার বাবু, আমি বলিতেছি, মুড়ী কথা কহিতে

পারে, একথা আমি কোনও মতে বিশ্বাস করি না। নিজের বিশ্বাস দূরে থাক, অন্যে যদি কেহ বিশ্বাস করে, তাহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ দেখিলেও, তাহার বুদ্ধিমত্তার অসংখ্য পরিচয় পাইলেও, তাহাকে পাগল ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না।

ডা। যাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়,—এরূপ কথা জোর করিয়া বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন কি। অন্তরে অবিশ্বাস রাখিয়া মুখে বিশ্বাসের ভাব দেখান একরূপ আত্মপ্রতারণা। এ প্রতারণায় নিজের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। আমার গুরুদেব বলিয়াছেন, সরল অবিশ্বাসীরও এক সময় না এক সময় মুক্তির আশা আছে, কিন্তু যে বিশ্বাসের কথা কয়, কিন্তু বিশ্বাস যে কি বস্তু তাহা জানে না, তাহার কোনও কালে মুক্তি নাই। যাক, ব্রাহ্মণ আমার উপরে তোমার পরিচর্য্যার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। তোমার সেবার ক্রটী হইলে আমাকেই লজ্জিত হইতে হইবে। একান্তই যদি গৃহে ফিরিতে হয়, তা হইলে এখন হইতেই উদ্যোগ করার প্রয়োজন।

আমি। গৃহে ফিরিতেই হইবে। আমি ইচ্ছা করিলেও এখানে থাকিতে পারিব না।

ডা। তা হইলে গাত্রোত্থান কর।

আমি। আমি একবার দুর্গাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।

ডা। দীক্ষার পূর্ব্বে আর তাহার সহিত দেখা হইবে না। চিত্ত স্থির রাখিবার জন্য বালিকা নির্জ্জনে সংযতভাবে থাকিতে আদিষ্টা হইয়াছে।

আমি। আমি গাত্রোত্থান করিলাম ও স্নানাদি কার্য্য সম্পাদনের জন্য গৃহের বাহিরে আসিলাম। আমার গোপালকে ফিরাইবার সঙ্কল্প ঘরে ফিরিবার সঙ্কল্পে পর্য্যবসিত হইল।

সেই দিনই অপরাহ্নে আহারান্তে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে ব্রাহ্মণের গৃহ

পরিত্যাগ করিলাম। নীরবে, সকলের অলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ আমার আহারের যে অপূর্ব্ব ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আমি তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলাম না। দারুণ দুশ্চিন্তায়, মনঃক্ষোভে, লজ্জায় আমার ক্ষুধা দূর হইয়া গিয়াছিল। তবে আর কিছু করিতে না পারিলেও, সেই পঞ্চাশৎ ব্যঞ্জন সমন্বিত, রৌপ্যপাত্র পরিবেষ্টিত অন্নপাত্র সম্মুখে দেখিয়া আমি বেচুর কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিলাম। দেখিলাম যেন প্রতি আহার্য্যের পাত্র হইতে ব্রাহ্মণের অপূর্ব্ব সেবা প্রীতি স্বর্গীয় সৌরভরূপে প্রস্ফুরিত হইতেছে।

আমি সকল দিকেই পদে পদে অপদস্থ হইয়াছি। সেখানে কাহারও কাছে মুখ তুলিতে আমার সামর্থ্য নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আমি যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ডাক্তার বাবু বোধ হয় আমার অসাক্ষাতে আমার সম্বন্ধে সকল কথা তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন। কেননা তিনি গৃহে ফিরিয়া শুধু সযত্নে আমার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন এইমাত্র। আমি থাকিতে পারিবনা শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই। বরং ভাল পাল্‌কীও উপযুক্ত বাহক দিয়া আমার যাত্রার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ তাঁহার পূর্ব্বৈশ্বর্য্য আমাকে দেখাইবেন বলিয়াছিলেন, আমার আর তাহা দেখা হইল না। বাড়ী ফিরিবার পথে ব্রাহ্মণের পূর্ব্বৈশ্বর্য্যের একটী মাত্র নিদর্শন আমার চক্ষে পড়িল। সেটী মুখুজ্যে মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাগরতুল্য একটী সরোবর। আমি যেখান দিয়া চলিয়াছি, সরোবরটী সেখান হইতে দূরে। তাহার বাঁধান ঘাট আরও দূরে, কিন্তু তাহার নীলাকাশগর্ভ নীল স্বচ্ছ জলরাশি-মধ্যে অপূর্ব্ব কারুকার্য্যময় চাঁদনী প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। চাঁদনী আমি দেখিতে পাই নাই। আমার মনে হইল, যেন একটী অপ্সর শিশু সরোবর মধ্যে আপনার রূপদীপিকা হস্তে লইয়া নৃত্য করিতেছে।

হায়! তুচ্ছ ঐশ্বর্য্যের দম্ভে আমি এই ঐশ্বর্য্যের অধিকারীকেই না ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলাম!

(ক্রমশঃ)

স্তম্ভন।

"প্রবৃত্তি রোধঃ সর্ব্বেষাং স্তম্ভনং তদুদাহৃতং।"

ইতি তন্ত্রসার।

কাহারও বুদ্ধিবৃত্তি চালনা বন্ধ করাকে স্তম্ভন কহে। স্তম্ভন নানা প্রকার :—নরস্তম্ভন, অগ্নিস্তম্ভন, মেঘস্তম্ভন, গোস্তম্ভন, ব্যাঘ্রাদি স্তম্ভন, শক্রস্তম্ভন, অস্ত্রস্তম্ভন, নৌকাস্তম্ভন প্রভৃতি। অস্ত্রস্তম্ভনে অস্ত্র দ্বারা কাটিবে না, মেঘস্তম্ভনে জল হইবে না, অগ্নিস্তম্ভনে অগ্নির দাহিকা শক্তি থাকিবে না, ব্যাঘ্রাদি জন্তুর স্তম্ভনে উহারা জীবের অনিষ্ট করিতে পারিবে না, ইত্যাদি বুঝায়। এ সম্বন্ধে মন্ত্র, ঔষধি, ফেৎকারিনী, দত্তাত্রেয়, ষটকর্ম্মদীপিকা, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি তন্ত্রে সবিস্তার উল্লেখ আছে।

শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্‌স্কির লিখিত "নীলগিরি উপত্যকা" নামক গ্রন্থ হইতে আমার এই স্তম্ভনের সত্য ঘটনাটি প্রকাশ করিতেছি। নীলগিরি উপত্যকায় উটি (Ooty) নামক একটি নগর আছে। নগরটি অনেকটা বৈদ্যনাথের উইলিয়াম্‌স্ টাউন, বম্‌পাস্ টাউন প্রভৃতির ন্যায়। উপত্যকার নিম্নে ঝড় বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দূরে দূরে এক একটি বাটী; সহরের মত রাস্তা ও সারিবন্দী বাটী আদৌ এখানে নাই। প্রত্যেক বাটীর পশ্চাতে অদূরে জঙ্গল। সম্মুখে রাস্তারমত। এইরূপ একটি বাটীতে শ্রীমতী সিমসন (Simpson)

দুইটি পুত্র ও একটি ভগিনী পুত্র লইয়া বাস করিতেন। পুত্রেরা গভর্ণমেণ্ট আফিসের কেরাণী, এবং তাহার ভগিনীপুত্র টম্ স্কুলে পড়ে ও বৈকালে খেলিয়া বেড়ায়। ভগিনীর মৃত্যু হওয়ায় শ্রীমতী সিম্‌সন্ তাহার পুত্রকে নিজে রাখিয়াছেন ও ইহাকে অতিশয় স্নেহ করেন। শ্রীমতী ব্ল্যাভাট্স্কি স্বয়ং এই বালকটীকে দেখিয়াছেন। এই ইউরেশিয়ান পরিবার বড় ধার্ম্মিক।

টম বড় পাখি ভাল বাসিত, বাড়ীর পশ্চাতে তাহাদের একটী পুরাতন খালিঘর ছিল, সেই ঘর সে পাখিতে বোঝাই করিয়া রাখিয়াছে। সকল প্রকার পাখিই তাহার ছিল, কেবল নিলগিরি সোয়ালো (swallow) পাখি না থাকায়, কয়েকদিন যাবত ঐরূপ পাখি ধরিতে সে চেষ্টা করিতেছে।

একদিন সে পাখির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতের বনে চলিয়া গিয়াছে, বনে অকস্মাৎ সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় তাড়াতাড়ি আসিতে পায়ে পাথর ফুটিয়া বিব্রত হইয়া পড়ে। এমন সময় শীকার উদ্দেশে দুইটি কুরুম্বা আসিতেছে দেখিয়া তাহাদের একটু মদ ও কিছু পয়সা দিতে স্বীকার করায় তাহারা উহাকে বাটী পৌঁছাইয়া দিল। পথিমধ্যে উহাদের সোয়ালো পাখির কথা বলায় উহারা পরদিন পাখি ধরিয়া দিতে স্বীকৃত হইল।

টম্ পাখি ধরিতে যাইবার কথা তাহার মাসীকে বলে। পরদিন বৈকালে উহাদের সহিত বনে পাখি ধরিতে যাইল। তাহারা পাখি ধরিয়া উহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবার কালে উহার জামার ছিট দেখিতে বড় ভাল এই কথা বলিতে বলিতে পুনঃপুনঃ উহার গায়ে হাত দিতে লাগিল। এইরূপে তাহারা বালকটিকে স্তম্ভিত করিল। শিক্ষিত হিপ্‌নটাইজার নিয়মমত হস্ত চালনা করিয়া অভীষ্ট ব্যক্তিকে বশ করিয়া থাকেন। এই অসভ্যজাতিদের এই সম্মোহন বিদ্যা আজন্মসিদ্ধ।

ইহাদের সামান্য স্পর্শে এইরূপ কার্য্য সাধিত হইল। টমের হিতাহিত বোধশক্তিকে ইহারা ধরিয়া স্তম্ভিত অর্থাৎ শক্তিহীন করিয়া চাপিয়া রাখিয়া দিল। সেইস্থলে নিজ ক্রিয়াশক্তি বালকের শরীর মধ্যে কতক প্রয়োগ করিয়া তাহাদের নিজ অভিমত কার্য্য করাইবার উপযোগী করিয়া লইল। বালক টম্ কিছুই বুঝিল না, পাখি পাইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বাটী ফিরিল। কুসঙ্গদের সহিত মিশিতে মাসীর নিষেধ থাকায় একথা কাহাকেও প্রকাশ করিল না।

পরদিন হইতে টমের বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল। সে যেন অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের মত দেখাইতে লাগিল। যেন স্বপ্নে বেড়াইতেছে, অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় চলিয়া বেড়াইতেছে। বাড়ীর সকলে সময় সময় এইরূপ বোধ করিত। বালকটির স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল। এখনও ক্ষুধা নষ্ট হয় নাই, কিন্তু অলস ও অন্যমনস্ক হইয়াছে। ইহার পরেই শ্রীমতী সিমসনের ঘরের ভিতর হইতে অলঙ্কার আদি চুরি হইতে আরম্ভ হইল। লোহার সিন্দুকের চাবি তাঁহার নিজের কাছে থাকিত, তাহার ভিতর হইতেও জিনিষ চুরি হইতে লাগিল। বাটীর সকলে বিশেষ সতর্ক হইয়াও চুরি বন্ধ করিতে পারিল না। পুলিশ তদন্তে কোন কিনারা হইল না, চাকরদের দোষী করা গেল না।

মান্দ্রাজ হইতে একটি মূল্যবান অঙ্গুরীয়ক আসায় শ্রীমতী উহা লোহার সিন্দুকের ভিতর রাখিয়া চাবি বালিশের তলায় রাখিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে মনস্থ করিলেন। টম পার্শ্বের ঘরে শয়ন করিত। রাত্রি দুইটার সময় বৃদ্ধার ঘরের দ্বার খুলিয়া টম প্রবেশ করিল। কৌশলের সহিত বৃদ্ধার বালিশের নীচে হইতে চাবি বাহির করিয়া লইল ও লোহার সিন্দুক খুলিয়া ঘাটিয়া পরে উহা চাবিবন্ধ করিয়া, চাবি বৃদ্ধার বালিশের নীচে রাখিয়া টম বাহির হইয়া গেল। এই সময়ে তাহার চক্ষু বেশ খোলা এবং মুখের চেহারা পাশবিক মত। বৃদ্ধা

কিছু না বলিয়া কেবল সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া টমের ঘরে আস্তে আস্তে যাইলেন। দেখিলেন, ঘরের দ্বার খোলা, টম পাখির ঘরের নিকট গিয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি বলিয়া স্পষ্ট দেখা গেল টম একটি জানালার নিকট হেঁঠ হইয়া কি পুতিয়া রাখিল। স্নেহপরায়ণা মাসী টমকে চোর বলিয়া ভাবিতে পারিলেন না। বোধ হয় বালকটি ঘুমের ঘোরে কিরূপ হইয়াছে,উহাকে জাগাইয়া কোন ফল নাই, রাত্রি প্রভাতের পর বোধ হয় ঐ জানালার নীচে খুঁড়িলেই চুরির জিনিষ পাওয়া যাইতে পারিবে, এই মনে করিয়া এবং টম ঘরে আসিয়া শুইল দেখিয়া তিনি আপন ঘরে চলিয়া গেলেন। টম ঘুমাইতেছে কিন্তু তাহার চক্ষু বেশ মেলা রহিয়াছে, তাহার বালিসের নীচে হইতে চাবি লইবার সময় চক্ষু যেরূপ খোলা ছিল এখনও সেইরূপ রহিয়াছে দেখিয়া তিনি ভীত হইলেন ও রহস্য নির্ণয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

পরদিন প্রাতে আপন পুত্রদের ডাকিয়া বৃদ্ধা রাত্রের ব্যাপার বলিলেন ও রাত্রির নির্দ্দিষ্টস্থান খুঁড়িয়া দেখিলেন কিছুই পাইলেন না। বুঝিলেন ভিতরে লোক আছে। যাহা হউক বৈকালে টম স্কুল হইতে আসিল। দুইজনে জল খাইতে বসিলেন, ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজের হাতের একটি অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া হাত ধুইবার ছলে উঠিয়া গেলেন ও বালকটির উপর দৃষ্টি রাখিলেন। তিনি দেখিলেন বালকটির চক্ষু আনন্দে বিস্ফারিত হইল ও বালক অঙ্গুরীয় লইয়া পকেটে পুরিল; আহারান্তে বাহিরে যাইবার জন্য সে উঠিয়া যাইলে, বৃদ্ধা উহাকে ডাকিয়া বলিলেন "টম আমার আঙটি কোথায় গেল ?" টম বলিল "আমি কিছুই জানিনা"। ইহাতে বৃদ্ধা টমের পকেট হইতে আঙটি বাহির করিয়া তাহার চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন "এটি কি ? দুষ্ট ছেলে তুমি চুরিবিদ্যা শিখিয়াছ ! শীঘ্র বল আমার অলঙ্কারগুলি কোথায়

রাখিয়াছ, নচেৎ আমি পুলিশ ডাকিব।" বৃদ্ধার কথায় কোন গ্রাহ্য না করিয়া টম বলিল "ইহাত একটি পাখির সোণার খাদ্য, আমি আপনার আদেশমত মধ্যে মধ্যে আপনার সিন্দুকের মধ্য হইতে এইরূপ সোণার খাদ্য বাহির করিয়া পাখিদের খাইতে দিই। এরূপ খাদ্য বাজারে কিনিতে পাওয়া যায় না, এজন্য আমি লইতেছি। কিন্তু সিন্দুকে আর বেশী নাই, ফুরাইলে পাখিরা কি খাইবে?"

বৃদ্ধা সিমসনের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, টম চোর নহে। ইহার ভিতরে কোন রহস্য আছে। ছেলেকে চোর বলিয়া তিনি ভাল কাজ করেন নাই। যাহা হউক তিনি বলিলেন, "আমি কবে তোমাকে সোণার খাদ্য লইতে অনুমতি দিয়াছি?" টম বলিল যেদিন আমি সোয়ালো ধরিয়া আনি, সেইদিন আপনি বলিলেন—"তোমার বালিসের নীচে হইতে চাবি লইয়া তুমি আবশ্যক মত লইও। সোণার খাদ্য ব্যতীত পাখি যদি না বাঁচে কাজেই যত পার লইবে।" এইরূপ আপনি আদেশ দিয়াছেন। একথা যে আমাকে পাখি ধরিয়া দিয়াছিল, সেই লোকটি বলিয়াছিল। সেই লোক তিনদিন পূর্ব্বে একদিন খাইবার সময় আসিয়াছিল। টেবলে কয়েকটি টাকা ছিল, সে বলিল—"ইহা পাখিদের খাইবার জন্য, তুমি লইয়া আইস।" আমি উহা লইয়া পাখিদের দিবার জন্য তাহাকে দিলাম।

বৃদ্ধা সিমসন বলিলেন—"আমরা সেইদিন রাত্রে খাইতেছিলাম, রাত্রে পাখিদের খাওয়াইবার দরকার হয় না, তুমি টাকা কয়েকটি কি করিলে?" টম বলিল—"যেইদিন মধ্যাহ্ণে আমরা খাইতেছিলাম সেদিন আমার মনে পড়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাত্রি হয় নাই।" ইহাতে টমের বুদ্ধিবিকৃত হওয়ার বিষয় বুঝিতে বৃদ্ধার বাকি রহিল না।

অকস্মাৎ বৃদ্ধার মনে এক ভাবের উদয় হইল। তিনি গলা হইতে আপন সোণার ব্রুচ খুলিয়া উহা টমকে দিলেন, বলিলেন চল তুমি

পাখিদের খাওয়াইবে, আমি দেখিব। টম আনন্দে উহা লইয়া পাখিদের ঘরে গেল। ক্রুচটি একবার করিয়া হাতে আনিয়া প্রত্যেক খাঁচার নিকট যাইয়া শিশ দিতে ও উহাদের খাঁচায় দিতে লাগিল। যে খাঁচায় পাখি নাই তথায়ও ঐরূপ করিল। যেন রুটির টুকরা হইতে ভাঙ্গিয়া রুটি গুঁড়া পাখিদের দিতেছে এরূপভাবে সব খাঁচার নিকট যাইয়া শেষে টম বলিল,"মাসীমা খাবার দেওয়া হইয়াছে। বাকি সোণার শস্য আমি সেই লোকের নিকট জমা দিয়া আসি। পূর্ব্বে সে আমাকে উদ্বৃত্ত খাদ্য জানালার নীচে পুতিয়া রাখিতে বলিয়াছিল, কিন্তু আজ সকালে বলিয়াছে যে তুমি আসিয়া আমাকে দিয়া যাইবে। মাসীমা তুমি আমার সঙ্গে যাইও না, তাহা হইলে তাহাকে দেখিতে পাইব না। যে আমাকে সোয়ালো পাখি ধরিয়া দিয়াছিল, এ সেই লোক।

টমকে কথায় কথায় আধঘণ্টা আটক রাখিয়া বৃদ্ধা পুলিশ আনিলেন ও পরে বালককে যাইতে বলিলেন। এদিকে পুলিশকে বলিয়া দিলেন, "বালকের পশ্চাৎ যাও। বালক যাহাকে ক্রুচ দিবে তাহাকেই ধরিবে।" বালক জঙ্গলের ভিতর কিয়দ্দূর যাইলেই একটি বামনাকার কুরুম্বা ঝোপের মধ্য হইতে বাহির হইয়া বালকের নিকট আসিল। ক্রুচটি বালক তাহাকে দিল। এদিকে পুলিশও তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

বিচারে কুরুম্বার সামান্য কয়েকদিনমাত্র জেল হইল। টমের সাক্ষ্য ডাক্তারের কথায় একটি বদ্ধ মূর্খের সাক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইল। বৃদ্ধা সিমসন যাহা বলিলেন তাহা টমের নিকট হইতে শোনা কথামাত্র। এইরূপে কুরুম্বা একপ্রকার অব্যাহতি পাইল। টমকে ডাক্তারের চিকিৎসায় রাখায় এখন অনেকটা সারিয়াছে বটে, কিন্তু সোণার জিনিষকে সোণার পাখির খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করে। বোম্বাই নগরে কয়েকমাস ধরিয়া বিশেষ প্রকার চিকিৎসাতেও তাহার এভাব কাটে

নাই। এবং কুরুস্বাদের সহিত মিশিবার ইচ্ছাও তাহার কমে নাই, লোক দিয়া তাহাকে আটক রাখিতে হইতেছে।

এইখানে আমরা এই স্তম্ভনকাহিনীর শেষ করিলাম, ইহাকে বশীকরণও বলা যায়।

অন্যান্যপ্রকার স্তম্ভনের মধ্যে গাভীর দুগ্ধ স্তম্ভন, পিষ্টক স্তম্ভন (পিটেভারা) প্রভৃতি সচরাচর দেখা যায়। অগ্নিস্তম্ভন সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে কাগজে নানাস্থানে বৃহৎ বৃহৎ বর্ণনাও দেখা যায়।

সম্প্রতি আমার জ্ঞাতি দাদা রাজনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অর্দ্ধাঙ্গ পড়িয়া যাওয়ায় একজন ওঝা উহার চিকিৎসা করিতেছেন। এই ওঝা উত্তপ্ত পুরাতন ঘৃত অগ্নির উপরিস্থিত কটাহ হইতে হাতে করিয়া লইয়া তাঁহাকে মাখাইতেছেন। ওঝার হাতে কোন দ্রব্য মাখান নাই, বিশেষ করিয়া অনেকে দেখিয়াছেন। আগুন ভারিয়া তবে সে এই কার্য্য করে বলিল। ইহার অগ্নিস্তম্ভন ক্রিয়া মন্ত্র দ্বারা সাধিত হয়।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোধূলি-সঙ্গমে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি। ঐ ঘরের বিষয়ে আমার একটু আপত্তি আছে। ঐ ঘরটি প্রেত-অধ্যুষিত—ওখানে বেশী রাত্রিতে প্রেতের কণ্ঠস্বর শুনা যায়।

সন্ন্যাসী। সেজন্য কোন চিন্তা নাই—এই আপনার আপত্তি!

আমি। দেখুন ঠাকুর, আমি কয়েকদিন ধরিয়াই ঐ প্রেতাত্মার যাহাতে উর্দ্ধগতি হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। কিন্তু কোন

ফল হইতেছে না। প্রত্যহ তিনবার করিয়া আমি তাঁহার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি।

সন্ন্যাসী তখন ঘটনা আনুপূর্ব্বিক জানিতে চাহিলেন এবং আমিও তাঁহাকে পূর্ব্বাপর সমস্ত নিবেদন করিলাম।

যাহা হউক, সন্ধ্যার সময় আমাদের প্রাত্যহিক নামকীর্ত্তন বন্ধ হইল না; বরং আজ সন্ন্যাসী কীর্ত্তনে যোগদান করায় তাহা অতি অপূর্ব্ব হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসীর উজ্জ্বল-গৌরকান্তি ও উচ্চ অথচ কোমল-কণ্ঠে মধুর হরিধ্বনি সকলেরই হৃদয়ে ভক্তির প্রবাহ ছুটাইয়া দিল। তেমন সজীব হরিনাম-কীর্ত্তন আর আমরা জীবনে দেখি নাই, শুনি নাই। ভক্তি ও আনন্দে পূর্ণপ্রাণ হইয়া আমরা ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলাম। পরে তাঁহার চতুর্দ্দিকে পুনঃ পুনঃ হরিধ্বনি করায় তিনি উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "সর্ব্বমঙ্গলময় হরি আমাদের মঙ্গল করিবেন।"

তখন সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়াছে; আমরা সকলেই সসম্ভ্রমে সন্ন্যাসীকে লইয়া কুঠীর ভিতরের দালানে আসিলাম। সন্ন্যাসীকে জলপান করিতে বলায় তিনি কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। পরিশেষে বলিলেন, "কয়েকটী তুলসীপত্র ও গঙ্গার জল আমি পান করিতে পারি।" আমি তখনই স্বহস্তে কয়েকটী তুলসীপত্র এবং এক পাত্র গঙ্গাবারি তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি আনন্দের সহিত তাহাই গলাধঃকরণ করিলেন। তাহার পর আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখুন আপনার প্রার্থনার ফল ফলিয়াছে; নামকীর্ত্তনও বৃথায় যায় যায় নাই। এতদিন কীর্ত্তন তেমন বিশ্বাসের সহিত প্রাণ খুলিয়া হয় নাই, তাই কোন ফলই হয় নাই। তবে এস্থানের বায়ু অনেকটা পবিত্র হইয়াছে; কিছুদিন ভগবানের এইরূপ নাম-কীর্ত্তন করিলে, দীন-দুঃখীকে অন্ন বিতরণ প্রভৃতি সৎকর্ম্ম করিলে আর এখানে অপ-

দেবতার অধিষ্ঠান থাকিবে না। এখানে পূর্ব্বে যে সমস্ত লোক যন্ত্রণা পাইয়া মরিয়াছে, তাহাদের আত্মার ঊর্দ্ধগতিলাভের জন্য আপনারা একাগ্রচিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকিবেন। তাহা হইলে এখানে অতিমানুষিক বা প্রেতযোনিঘটিত ভয় থাকিবে না। যাউক, আপনারা বিশ্রাম করুন, আমি ঐ ঘরে যাইয়া রাত্রি যাপন করি।"

সন্ন্যাসী এই বলিয়া তাঁহার ঝুলি ও দণ্ড লইয়া প্রেতের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং কম্বল বিছাইয়া তাহার উপর কিছুক্ষণ উপবেশন করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন। পরে কম্বলের উপর শুইয়া পড়িলেন।

এদিকে আমরা সকলেই একটা ঘরে বসিয়া বিনিদ্রভাবে রজনী কাটাইতে লাগিলাম। রাত্রি ৩টার সময় ক্রন্দন-ধ্বনি হয় কিনা, তাহা শুনিবার জন্য আমরা উৎক হইয়া রহিলাম। ক্রমে ঘড়ির কাঁটা তিনটার ঘর ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু আমরা সেই স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি আর শুনিতে পাইলাম না, তৎপরিবর্ত্তে শুনিলাম, কে যেন উদাত্তস্বরে গাইতেছে ঃ—

"সত্য ধর্ম্মং সমাশ্রিত্য যৎকর্ম্ম কুরুতে নরঃ।
যদেব সফলং কর্ম্ম সত্যং জানিহি সুব্রতে ॥
নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মঃ ন পাপমনৃতাৎ পরম্।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা মর্ত্ত্যঃ সত্যমেকং সমাশ্রয়েৎ ॥
সত্যহীনা বৃথা পূজা সত্যহীনে বৃথা জপঃ।
সত্যহীনং তপোব্যর্থমূষরেবপনং যথা ॥
সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যংহি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরং নহি ॥"

এই সুপবিত্র স্বরে সমস্ত কুঠীখানি পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়া গেল ; বোধ হইতে লাগিল, যেন গোপীপুরের গগন-পবন এই পূত কণ্ঠধ্বনিতে

পরিপূরিত হইয়াছে। আমরা তন্ময় হইয়া উঠিলাম। কতক্ষণ এইরূপ অবস্থায় ছিলাম জানিনা ; যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখি পূর্ব্বাকাশ-প্রান্তে তরুণ অরুণের কনক-রশ্মি ঈষৎ দেখা দিয়াছে। আমরা সোৎসাহে এবং সানন্দে ছুটিয়া গিয়া দেখিলাম—সন্ন্যাসী নাই ! সবিস্ময়ে গৃহের চারিদিকে চাহিয়া দেখি,—দেওয়ালের উপর উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "এ স্থানে দেব স্থাপনা করিও, দেবারাধনা করিও, অন্নসত্র খুলিও—তোমাদের ইহাতে অসামর্থ্য নাই।" ভাল করিয়া চক্ষু ঘষিয়া আর একবার দেওয়ালের দিকে চাহিলাম—আর সেই উজ্জ্বল অক্ষররাজি দেখিতে পাইলাম না।

তৎপরদিনই আমি জমীদার মহাশয়ের নিকট ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত ঘটনার কথা আদ্যোপান্ত বলিলাম। তিনি বলিলেন—"না আমার সংকল্প আর সিদ্ধ হইবার প্রয়োজন নাই ; সাধুর কথাই রাখিব ; ঐখানে আমি রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি বসাইয়া উহাকে দেবস্থানে পরিণত করিব এবং একটি অন্নসত্র খুলিব। সাহেবদিগের জন্য অপর ব্যবস্থা হইবে।"

নায়েব মহাশয় এই অবধি বলিয়া পুরোহিত মহাশয়কে কহিলেন, "জমীদার মহাশয় এখন ঐ স্থানে মন্দির ও অন্নসত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন।"

পুরোহিত। উত্তম কথা। ইহা অপেক্ষা আর পুণ্যকার্য্য কি হইতে পারে ?

জ্যোতিষী। আজকার সন্ধ্যাটা নায়েব মহাশয়েরই এই কথায় কাটিয়া গেল ; আর কিছু হইল না।

জমীদার পুত্র। বড়ই দুঃখের বিষয়, আজ এইজন্য আমরা পুরোহিত মহাশয়ের প্রতিশ্রুত সেই ঘটনাটির বিবরণ শুনিতে পাইলাম না।

পুরোহিত। কাল যদি ঝড় বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে অগ্রেই আমি সেই গল্প আরম্ভ করিব।

অতঃপর মন্দিরে সান্ধ্য আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই দিনকার মত 'গোধূলি-সভা'ও ভাঙ্গিয়া গেল।

শ্রীঅমূল্য চরণ সেন।

ভৌতিক-কাহিনী।

ছায়ারূপিণী বধূ দর্শন।

(১)

ঢাকা জেলার অন্তর্গত রায়পুরা থানার এলাকাধীন—গ্রাম নিবাসী 'ক' বাবু আমার জনৈক বন্ধু। তাঁহার সঙ্গে আমার আত্মীয়তার বিশেষ কারণ আত্মিক তত্ত্বানুসন্ধান। দীর্ঘকাল হইতে আমি অধ্যাত্ম-তত্ত্বে বিশ্বাস করি এবং প্রায় ৩।৪ বৎসর যাবৎ আমরা উভয়ে একত্রে থাকিয়া অধ্যাত্ম-তত্ত্বের আলোচনা ও অনুসন্ধানে ব্যাপৃত রহি। এ কারণেই আমরা উভয়ে উভয়ের ধর্ম্ম, চরিত্র এমন কি পারিবারিক অবস্থা পর্য্যন্ত বিশেষভাবে জ্ঞাত আছি।

'ক' বাবুর চরিত্র সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি, তাহাতে তিনি সরল, এবং পারতপক্ষে মিথ্যা বলা কি পরের অনিষ্ট করেন না বলিয়াই আমার ধারণা। তাঁহার সহধর্ম্মিণী সম্বন্ধে আমার মত আরও উচ্চতর। স্ত্রীসুলভ স্বাভাবিক সরল ধর্ম্ম বিশ্বাস, পতিপ্রাণতা সচ্চরিত্রতা প্রভৃতি গুণগুলি তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যকে শতগুণে উজ্জ্বল করিয়াছিল। যদিও বহুপূর্ব্ব হইতে তাঁহার স্বামীমুখে তাঁহার গুণ-কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি তাঁহার সঙ্গে আমার চাক্ষুস দেখা একবার মাত্র,

এবং সে দেখা মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে। তাঁহার তৎকালীন শান্ত গম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তি ও রোগাক্লিষ্ট মুখের অপূর্ব্ব মধুর হরিনামোচ্চারণ জীবনে ভুলিতে পারিব না।

'ক' বাবু অধ্যাত্ম তত্ত্বে বিশ্বাসী। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও তৎসংসর্গগুণে ইহাতে অধিকতর বিশ্বাস লাভ করিয়াছিলেন। সময়ে একজন দেহ ত্যাগের পর অপরকে পারলৌকিক তত্ত্ব অবগত করাইবার জন্য ছায়ারূপে দর্শনদান দিবেন বলিয়া পরস্পর কঠিন প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হয়েন। আমি জানি 'ক' বাবু তাঁহার স্ত্রীকে জীবিতকালে এই প্রতিজ্ঞার কথা সময় সময় স্মরণ করাইয়া দিতেন।

কালক্রমে তাঁহার স্ত্রী জ্বর ও যকৃত রোগে আক্রান্তা হয়েন। ক্রমে রোগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে রোগিণীকে ঢাকা মিটফোর্ড হস্পিটেলের ১৩ নং কুঠরিতে চিকিৎসার্থ আনা হয়। এই রোগ-শয্যাতেও 'ক' বাবু তাঁহার স্ত্রীকে প্রতিজ্ঞার কথা সময় সময় স্মরণ করাইয়া দিতে কুণ্ঠিত বা বিরত হয়েন নাই। এমন কি মৃত্যুর প্রাক্কালে যখন আমি দেখিতে গেলাম, তখনও তিনি ধীর গম্ভীর ভাবে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রতিজ্ঞার কথা মনে আছে?" উত্তর—"আছে, সাধ্য হইলে নিশ্চয় দেখা দিব।"

প্রতিজ্ঞার মধ্যে এই ছিল যে, তিনি স্বপ্নে কিম্বা অন্য কোন প্রকারে দেখা দিলে বিশ্বাস করিবেন না। তাঁহাকে ছায়ামূর্ত্তিতে দর্শন দিতে হইবে।

১৩১২ সনের ২৭শে শ্রাবণ ৫টা ২০ মিনিটের সময় 'ক' বাবুর সহধর্ম্মিণী উপরোক্ত সিমসন ওয়ার্ডে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর সেই রাত্রির সমস্ত ঘটনা এখানেই ঘটিয়াছিল। 'ক' বাবু স্ত্রীর সৎকারের জন্য অপরাপর সকলের সঙ্গে শ্মশান ঘাটে গিয়াছিলেন। তথা হইতে রাত্রি ১২টার সময় বাসস্থানে ফিরিলেন।

শ্মশানের সেই ভয়াবহ চিত্র জলন্তভাবে তাঁহার অন্তরাত্মার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রিয়তমার ধ্যানে তাঁহাকে নিমগ্ন করিতেছিল। তিনি শয্যায় উপবিষ্ট থাকিয়া প্রতিমুহূর্ত্তে প্রাণপ্রিয়ার সাক্ষাৎকার লাভের অপেক্ষায় রহিলেন।

কিছুকাল পরে তাহাদের শয়ন কক্ষের দ্বারে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। দ্বারটি তাঁহা হইতে ২।৩ হাতের অধিক দূর নয়। 'ক' বাবু শুনিলেন, কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইহার ক্ষণেক পরে আবার ঐরূপ শব্দ। এবার 'ক' বাবুর বুঝিবার বাকি রহিল না। তাঁহারই প্রণয়িনী তাঁহাকে দর্শনদান করিবার জন্য বারংবার ব্যাকুলভাবে দ্বারদেশে উপনীতা হইতেছেন। 'ক' বাবু বাঙ্গালীর স্বাভাবিক ভীরুতায় ভীত, তথাপি প্রাণের টানে এবং একান্ত কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রণয়িনীর সাক্ষাৎলাভার্থ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া যেই কক্ষের দ্বার খুলিতে উদ্যত, অমনি পশ্চাৎদিক হইতে তদীয় ভ্রাতা, মাতুল, বিশেষতঃ শ্বশ্রুঠাকুরাণী, স্ত্রীসুলভ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া বলিলেন "বাবা—"আপনিও কি উহার সঙ্গে মরিতে চাল-লেন?" অগত্যা তিনি গমনে বিরত হইয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন।

কতক্ষণ পরে পুনরায় অন্তর্বাটির দ্বারে মুহুর্মুহু বিষম আঘাতের শব্দ হইতে লাগিল। আবার 'ক' বাবু চমকিয়া উঠিলেন। মনে হইতে লাগিল যেন বাহিরে যাওয়া মাত্রই মৃতা সহধর্ম্মিণীর সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইবে। এবার 'ক' বাবু সকল ভয় ভাবনা দূরে রাখিয়া জীবনপণ করতঃ দরোজার দিকে ছুটিলেন; কিন্তু সকলে মিলিয়া তাঁহাকে তাঁহার অভিপ্রেত উদ্যম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তিনি অতি কষ্টে মনের আবেগ সংবরণ করিয়া শয্যাতে বসিয়া পড়িলেন।

পরে জানা গেল তাঁহার শাশুড়ী, জামাতা শ্মশান হইতে ফিরিবার

পূর্ব্বেই দ্বারে উক্তরূপ চপেটাঘাত ও অদূরে আম্রবৃক্ষতলে মৃত কন্যার পীড়িতাবস্থার অনুরূপ কাতরকণ্ঠের হরিনাম ধ্বনি শুনিতেছিলেন।

অতঃপর কয়েকমাস পর্য্যন্ত বেশী কিছু ঘটে নাই। যদিচ প্রায় প্রতি রাত্রিতেই 'ক' বাবু তাঁহার স্ত্রীকে স্বপ্নে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গে সময় সময় আলাপ করিয়াছেন, কিন্তু উপস্থিত প্রসঙ্গে এ সকল তত আবশ্যকীয় নয় বলিয়া, আমরা কাহিনীর মূল ঘটনাটি পাঠকের গোচর করিতে প্রয়াসী হইতেছি।

১৩১২ সনের মাঘ মাসে 'ক' বাবু কিছুকালের জন্য বাড়ি গেলেন। তাঁহার শয়নঘর ও রান্নাঘরের মধ্যস্থ স্থানটি কয়েকটি বৃক্ষদ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া তাহা নিবিড় ও মনোরম। স্থানটী 'ক' বাবুর স্ত্রীর বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি অবসর পাইলেই দিবসের অধিকাংশ সময় এইস্থানে পাদচারণ ও সমবয়সীদিগকে লইয়া আলাপ আমোদ উপভোগ করিতেন অথবা দক্ষিণের সুস্নিগ্ধ বায়ু সেবন করতঃ পরম শান্তিলাভ করিতেন। কিন্তু আজি সেই শান্তি নিকেতন 'ক' বাবুর পক্ষে বিশেষ অশান্তিজনক ও ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। 'ক' বাবু সেখানে গেলেই তাঁহার অভূতপূর্ব্ব ভয়ের সঞ্চার হয়। যেন প্রণয়িণীর জীবন্ত মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়া তাঁহাকে যেন কিরূপ ভাবাবিষ্ট ও ভয়বিহ্বল করিয়া তোলে। এ ভয় স্থানের নির্জ্জনতা ও নিস্তব্ধতাহেতু নহে। ঘোর অন্ধকারে কি নির্ম্মল জ্যোৎস্নাতে এ ভয়ের কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য হয়, এইমাত্র। তবে ঈদৃশ ভয়ের কারণ কি কে বলিবে! ইহ-পরকালের লীলাময় বিধাতাপুরুষ ভিন্ন এ রহস্য উদ্ভেদ করিতে কে সমর্থ? 'ক' বাবু ভাষায় এভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম।

'ক' বাবু তাঁহার শয়নঘরে রাত্রিতে একাকীই শয়ন করিয়া থাকেন। কখন কখন ভয়াক্রান্ত হইয়া তদীয় ৬ বৎসরের পুত্রকে সঙ্গে শুইতে

বলেন। কিন্তু এসকল ভয়ভাবনার কথা তিনি অপরকে জানাইতে অনিচ্ছুক! কেননা তিনি প্রথম বয়সে আত্মিক-তত্ত্বে অবিশ্বাসী ও ইহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কোন স্থানে ভূত প্রেতের আবির্ভাব কি উপদ্রবের কথা শুনিতে পাইলে শতকার্য্য ফেলিয়া ও সহস্র বাধাবিঘ্ন পায়ে ঠেলিয়া তত্তৎ স্থানে উপস্থিত হইতেন ও বীরের ন্যায় নির্ভিক চিত্তে তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন। বলা বাহুল্য, সর্ব্বসাধারণের ভীরুতাসূচক মিথ্যা প্রেত বিশ্বাসরূপ মহা কুসংস্কার বিদূরিত করাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ঘোর অমাবস্যা নিশিতেও তিনি প্রবাদমূলক বিশেষ ভয়াবিষ্ট স্থান সকলও একাকী বিচরণ করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। একারণেই তিনি পূর্ব্বের অসাধারণ নির্ভীকতা ও বীরত্বের অবমাননা করতঃ হঠাৎ আত্মিক বিশ্বাসী বলিয়া জনসাধারণের নিকট পরিচিত হইতে এতটা লজ্জিত!

আজ রজনীর (১৩১২।২ মাঘ) আগমনে 'ক'—বাবুর ভয় অভূত পূর্ব্বরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কেন এরূপ হইল বিধাতা জানেন। যেন তাঁহার প্রিয়তমা অন্তঃপুরে সেই প্রিয়তম স্থানে বিচরণ করিতেছেন, অথবা অনুক্ষণ তাঁহার অতি নিকটে রহিয়া তাঁহার সঙ্গে প্রেমালাপ বা প্রেমালিঙ্গন করিতে ব্যাকুলা। ইহা ভ্রম নয়, কল্পনা নয় অথবা দাম্পত্যানুরাগজনিত মনের সংস্কার ও নয়! ইহা প্রকাশে 'ক'—বাবু অক্ষম।

রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভয়ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শয়ন কালে তিনি প্রথমে পুত্রকে ডাকিলেন। পুত্র তাঁহার মাতার নিকটে ঘুমে অচেতন। ভ্রাতুষ্পুত্র সরমারঞ্জনকে পাঠাইয়া দিবার জন্য মাকে ডাকিলেন, সেও নিদ্রিত। পক্ষান্তরে, 'ক'—বাবু ভুতভয়গ্রস্ত একথা তাঁহার মাতা সহজে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; কেননা যে পুত্র

এক সময়ে ভূতের প্রসঙ্গ প্রলাপ বাক্য বলিয়া উড়াইয়া দিতেন, সে আজ আত্মিকভয়ে ভীত ইহা কিরূপে তাঁহার বোধগম্য হইবে।

'ক'—বাবু অগত্যা একাই শয়ন করিলেন। ভাগ্যক্রমে অবিলম্বেই নিদ্রাদেবীর আবির্ভাব হইল, তদীয় শান্তিময় ক্রোড়ে ভয় বিরহিত চিত্তে তিনি অবশিষ্ট রজনী অতিবাহিত করিলেন।

অনুমান রাত্রি ২টার সময় 'ক'—বাবুর বৃদ্ধা মাতা ও বিধবা ভগিনী এক সঙ্গে ঘরের বাহির হইলেন। মাতা শয়ন ঘরের পশ্চাৎদিকে যাইতেছিলেন। ভগিনী অগ্রসর হইতে লাগিলেন দক্ষিণদিকে। দক্ষিণে পাশাপাশি দুইটি ঘর, তন্মধ্যে জ্বালানী কাষ্ঠের স্তূপ রাখা গিয়াছে। ভগিনী যখন কাষ্ঠ স্তূপের সমীপবর্ত্তিনী, তখন হটাৎ দেখিলেন—কাল কস্তাপেড়ে কাপড় পরা অর্দ্ধ ঘোমটা দেওয়া একটি স্ত্রীলোক ৫।৬ হাত দূরে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। সে কিছুই বলিতেছে না। তিনি হঠাৎ চমকিয়া ভাবিলেন, একি সেই প্রতিবেশিনী অসচ্চরিত্রা বৈষ্ণবী, কোন কু অভিসন্ধিতে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার গৃহকোণে উপস্থিত! কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই স্পষ্ট চিনিতে পারিলেন যে, এ রমণী আর কেহ নহে তাহারই ভ্রাতৃজায়া। চিনিবা মাত্র তিনি ভয়ে জড়প্রায় হইলেন। মাতাকে ডাকিবার ইচ্ছা কিন্তু মুখ ফুটিতেছে না। চক্ষু বধূঠাকুরাণীর প্রতি স্থির ও অচঞ্চল, স্বয়ং পাশ ফিরিয়া পলাইতে অশক্তা। বধূ দুই মিনিট কাল চাহিয়া থাকিয়া স্বাভাবিক ধীর পদবিক্ষেপে কাঠের স্তূপের পার্শ্ব ধরিয়া পশ্চিমদিকে চলিলেন। সুতরাং ১০।১৫ হাত দূর পর্য্যন্ত বধূর দক্ষিণ পার্শ্বে সুস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে গৃহের অন্তরালে আসিয়া 'ক'—বাবুর শয়ন ঘরের দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে তাঁহারা সমান্তরাল ভাবে উপস্থিত হইলেন। এবার কিছু কাল বধূর দক্ষিণ পার্শ্বও পরে পৃষ্ঠদেশ দেখা যাইতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে ছায়া-রূপিণী বধূঠাকুরাণী ভ্রাতার

গৃহে প্রবেশ না করিয়া ধীরে ধীরে ঘরের দক্ষিণ পার্শ্ব ধরিয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন। দুই বার প্রায় ৩।৪ মিনিট কাল সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছিল। ভগিনীটি নিতান্ত সরলা এবং ছায়া দর্শন তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কথিত ছায়ামূর্ত্তি স্বামীর সঙ্গে প্রতিজ্ঞা পার্শ্বে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহাকে দেখা না দিয়া তাঁহার ভগিনীকে দেখা দিলেন কেন? ইহার উত্তরে অধ্যাত্ম তত্ত্বের সামান্য অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বলিতে পারি, ভয়ই সূক্ষ্মদেহীর সঙ্গে দেখা শুনার প্রধান অন্তরায়। 'ক'—বাবু অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিলেন বটে কিন্তু কার্য্যকালে ভয়শূন্য হইতে পারেন নাই, কাজেই তদীয় পত্নী তাঁহাকে দর্শন দিতে না পারিয়া তাঁহার ভগিনীকে দেখা দিয়া প্রকারান্তরে অঙ্গীকারের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

এখানে বলা কর্ত্তব্য, আমরা কাহিনীটিকে অবিকল অবিকৃত ভাবে পাঠক মহোদয়গণের গোচর করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছি। পাঠকের মনস্তুষ্টির জন্য প্রকৃত ঘটনা অতিরঞ্জিত করা আমরা পাপ মনে করি।

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

বন্ধু ভূতের ভীষণ উৎপাত।

আমি নিম্ন লিখিত প্রকৃত ঘটনাটী হুগলী জেলার অন্তর্গত জয়নগর নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ সিংহ রায় মহাশয়ের প্রমুখাৎ যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই যথাযথ নিম্নে বিবৃত করিলাম। ঘটনাটী কিঞ্চিদধিক চারি বৎসরের। উক্ত শশী বাবু নদীয়া জেলার কোন জমীদার এষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তাঁহার মামা-বাড়ী হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ভাঙ্গামোড়া গ্রামে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় তাঁহার মামাতো ভাই। সতীশ বাবু একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত এবং বর্দ্ধিষ্ণু লোক, তাঁহার পিতা জীবিত নাই। উক্ত সতীশ বাবু স্বগ্রামের একটী বৈদ্যের ছেলের সহিত সাঙাত (বন্ধুত্ব) পাতাইয়া ছিলেন। দুই জনে খুব ভাব ছিল। গত অর্দ্ধোদয় যোগের পর বৈদ্য বন্ধুর মৃত্যু হয়। ১৯শে ফাল্গুন হইতে সতীশ বাবুর বাড়ীতে উৎপাত আরম্ভ হয়। ঐ দিন দিবা দুই প্রহরের সময় ঢেঁকি শালের চালাতে হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠে। চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত আঙ্গিনার মধ্যে ঐ ঘর, সুতরাং আগুণ নিভাইবার জন্য অনেক লোক সমবেত হইলেও কেহ সদর দরজা খুলিয়া না দেওয়ায় ঘরখানি ভস্মীভূত হইল। তাহার পরদিন গোয়াল ঘরের চালে অতি প্রত্যুষে আগুন লাগে। লোক জনের চেষ্টায় অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। অনেক অনুসন্ধানেও কে এই ঘটনার নায়ক তাহা প্রকাশ পায় না, কিন্তু কোন দুষ্ট লোকের দ্বারা যে এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে। তখন সতীশ বাবু অনন্যোপায় হইয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ঘটনার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান। মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর পুলিশের উপর তদন্তের ভার দেন। ঐ জেলার পুড়সুড়ো থানার সবইনস্পেক্টর সামসুদ্দিন সাহেব

সদলবলে সতীশ বাবুর বাটীতে আসিয়া আড্ডা গাড়িয়া তদন্ত আরম্ভ করেন। তিনি আসিবা মাত্র বাটীর মধ্য হইতে ঘোর চীৎকার শব্দ উঠিল—"আগুন, আগুন"। ভিতরে সতীশ বাবুর শুইবার ঘরে গদি, বালিস, তোষকে কে যেন চতুর্দ্দিকে কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন দিয়াছে। পুলিশের লোক জন গিয়া দেখে ঘরে তালা বন্ধ। পূর্ব্বে ২।১ বার আগুন হওয়াতে প্রায় প্রত্যেক ঘরই বন্দ করিয়া রাখা হইত, কারণ অনেকের মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, বাহিরের কোন লোকের সহিত বাটীর কোন দাসদাসীর এই ঘটনায় সংশ্রব আছে এবং তাহার দ্বারাই এই সকল কার্য্য সংঘটিত হইতেছে। ঘরের তালা খুলিয়া তাড়াতাড়ি আগুন নিভান হইল এবং অর্দ্ধ দগ্ধাবস্থায় বিছানা ইত্যাদি বাহিরে রাখা হইল, এইরূপ প্রত্যহ সূর্য্য অনুদয়ে, দ্বিপ্রহরের সময় এবং সূর্য্যাস্ত সময়ে নানা স্থানে আগুন লাগিতে লাগিল। সকল স্থানেই কেরোসিন তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইত। পুলিশ খুব কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিল। বাটীর দাসদাসীগণ বাহির হইতে আসিবার সময় তাহাদের কাপড় চোপড় বিশেষরূপ অনুসন্ধান না করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত না। আগুন প্রত্যহ একই সময়ে লাগিত। সেই সেই সময়ে তরবারি, লাঠি ইত্যাদি লইয়া পুলিশ এবং আরও অনেক লোক খাড়া পাহারায় থাকিত, কিন্তু এত সতর্কতা সত্ত্বেও আগুন লাগার নিবৃত্তি হইত না, কিম্বা কে এই কার্য্য করিতেছে ঘুণাক্ষরেও তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইত না। এইরূপ দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ভদ্রলোকটীত জেরবার হইতে বসিলেন। রাত্রে বড় বেশি উপদ্রব হইত না। একদিন সতীশ বাবুর স্ত্রী একটী গ্লাসে করিয়া খিড়কীর পুকুরে জল আনিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় একটী কাল চেহারার লোক বাঁশবনের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহার পিঠের কাপড়ে খানিকটা কেরো-

সিন তেল ঢালিয়া দিয়া দিয়াশালাই ধরাইয়া দিতে, তিনি পেছন ফিরিয়া দেখিয়া যেমন চিৎকার করিবেন, অমনি লোকটী বলিল, "খবরদার যদি চীৎকার কর এখনই গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিব।" এই বলিয়া আবার বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। কাপড় খানি জ্বলিয়া উঠিতে তিনি তাড়াতাড়ি কাপড় খানি ত্যাগ করিয়া পুকুরের জলে গিয়া পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। বাটীর মধ্য হইতে চাকর চাকরাণী সকলে দৌড়াইয়া আসিল এবং অপর কাপড় দিতে তিনি পরিয়া জল হইতে উপরে উঠিলেন। ইত্যবসরে পুলিশের লোকজনও ঘটনাস্থলে আসিয়া সমস্ত অবগত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল। সতীশ বাবুর ভদ্রাসন বাটী প্রায় পঞ্চাশ বিঘা। প্রবলতেজা দামোদর নদের তীরে। মাঝে মাঝে দুই এক ঘর প্রজার বসতি আছে। লোকজন বাঁশবনের ভিতর কোথাও কোন সন্ধান না পাইয়া দামোদর তীরে গিয়া দেখিল একটী কাল চেহারার লোক গলায় মালা, মাথায় টিকি, নদীপার হইয়া যাইতেছে। আর যায় কোথা, অমনি তাহারা তাহাকে ধরিয়া টানা হিচড়া আরম্ভ হইল। সে বলিল "ওগো, আমাকে ধরিতেছ কেন? আমি কোন সাহসে সতীশ বাবুর বাড়ী গিয়া এমন কার্য্য করিব! আমি জাতিতে জেলে, অমুক বাবুর বাড়ীতে মাছের দরুণ পয়সা পাওনা ছিল, তাহাই লইয়া ঘরে ফিরিতেছি।" কিন্তু কে তাহার কথা শোনে। তাহাকে সতীশ বাবুর বাটীতে বন্ধনাবস্থায় আনা হইল, যে যেখান হইতে পারিল যথাসাধ্য তাহার পৃষ্ঠে কিল মুষ্ট্যাঘাত বর্ষণ করিতে লাগিল। সবইনস্পেক্টর সাহেব বলিলেন "তোমরা একটু থাম, আমি আগে ইহাকে সনাক্ত করাইয়া লই, পরে যাহা হয় তোমরা করিও।" সতীশ বাবুর স্ত্রী ঐ লোকটীকে দেখিয়া বলিলেন "ঠিক এইই বটে।" তখন সে গরিব বেচারার প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা হইতে লাগিল তাহা আর কি বলিব। মোট কথা লোকটী

জখম হইয়া যাওয়াতে ২।৩ দিন তাহাকে চালান দেওয়া হইল না। পরে ডাক্তার দ্বারা তাহাকে আরোগ্য করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল। মাজিষ্ট্রেট তাহাকে জামিনে না ছাড়িয়া হাজত বাসের ব্যবস্থা করিলেন। লোক ধরা পড়িল, এদিকে কিন্তু আগুনের নিবৃত্তি হইল না। দিনের মধ্যে তিনবার যেমন হইয়া থাকে, তেমনই চলিতে লাগিল। সকলে তখন বলিল ইহাদের দলে অনেক লোক, তাহার মধ্যে একবেটা ধরা পড়িয়াছে বইত নয়। এইরূপে প্রায় দেড়মাস গত হইল। চৈত্রমাসের শেষে সতীশ বাবু তাঁহার পিসতুত ভাই শ্রীযুক্ত শশীভূষণ সিংহ রায় মহাশয়কে নয়নগর হইতে আনিতে লোক পাঠাইলেন। শশীবাবু চৈত্রমাসের ২।১ দিন থাকিতে না আসিয়া একেবারে ১লা বৈশাখ রাত্রে রওনা হইলেন। তাঁহার বাড়ী সতীশ বাবুর বাড়ী হইতে আটমাইল ব্যবধান। রাস্তায় চলিতে চলিতে তিনি প্রেরিত লোক মুখে ঘটনার আদ্যোপান্ত শুনিয়া লইলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনিও বুঝিলেন এই ঘটনা কোন দুষ্ট লোকের দ্বারা সংসাধিত হইতেছে। রাত্রি শেষে তিনি তাঁহার মামা-বাড়ীতে পৌঁছিয়া বাটীতে না ঢুকিয়া লোকটীকে বিদায় দিলেন এবং তাহাকে বলিয়া দিলেন তাঁহার আগমন সংবাদ যেন বাটীর কেহই না জানিতে পারে। তিনি লোকটীকে বিদায় দিয়া একটী কামিনী ফুলের গাছে চাদর জামা জুতা ইত্যাদি লুকাইয়া রাখিয়া বাগানে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যস্থিত একটা বৃহৎ আম্র বৃক্ষে আরোহণ করিয়া সতীশ বাবুর বাটীর উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ বৃক্ষ হইতে অন্যের অলক্ষ্যে বাটীর মধ্যে কে কি ভাবে গতিবিধি করিতেছে সমুদায়ই স্পষ্টরূপে দেখা যাইতেছিল। তিনি দেখিলেন উষার প্রাক্কালে পুলিশের লোক একটী ঘণ্টায় ঘা দিতে সকলে ব্যস্তভাবে বাড়ী ঘেরাও করিয়া পাহারায় নিযুক্ত হইল। বাটীর দাসদাসীগণ উঠিল এবং যে

যাহার গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইল। তিনি সমস্তই বৃক্ষের উপর হইতে দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে চতুর্দ্দিক পরিস্কৃত হইয়া দিনমনির আগমন জানাইয়া দিল। ক্রমে রৌদ্র উঠিল। তখন সকলে বলিল আজ আর আগুন হইবে না, এই বলিয়া সকলে সদর বাটীর দিকে চলিয়া গেল। শশী বাবুও বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া কাপড় চোপড় লইয়া খিড়কির দরজায় গিয়া ঘা মারিতে তাঁহার মামী মাতা আসিয়া দোর খুলিয়া দিলেন এবং শশীবাবুকে দেখিয়াই ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন -"বাবা কিছু আর আমাদের রাখিল না। পোড়াইয়া সর্ব্বস্বান্ত করিল। এখন কোন দিন যেন প্রাণে মারে।" শশী বাবু বলিলেন "মামীমা আর ভয় নাই। কাঁদিওনা। এখন যখন আমি আসিয়াছি তখন ইহার কোন একটা কিনারা না করিয়া আর এখান হইতে যাইতেছিনা।" পরে তিনি সতীশ বাবুর সহিত দেখা করিলেন। সতীশ বাবু বয়সে ছোট, দাদাকে পাইয়া যথেষ্ট বল পাইলেন। বাটীস্থ সকলেই বিশেষ আশ্বস্ত হইলেন। শশীবাবু দেখিলেন, স্তূপাকার বিছানাপত্র দগ্ধ এবং অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। দুই ভাই মিলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইল। পরে শশী বাবু দারোগার সহিত দেখা করিলেন। শশীবাবু উক্ত বাড়ীতে আসার পর দ্বিতীয় দিনেও কোন আগুন হইল না। তখন দুইজনে পরামর্শ করিয়া দারোগাকে বলিলেন "আপনি থাকিয়াও যখন এই ব্যাপারের কোন প্রতিবিধান হইতেছে না, তখন আপনি দলবল লইয়া স্বস্থানে যাইতে পারেন। এই ভদ্রসন্তানটী যে জেরবার হইবার মত হইল, একদিকে সম্পত্তি নাশ অন্য দিকে এতগুলি লোকের খরচ যোগান।" দারোগা সাহেবও তাহাই চাহিতেছিলেন। তাঁহার পক্ষে বসিয়া বসিয়া আর এইরূপ পাহারা দেওয়া ভাল লাগিতেছিল না। তিনি ঐ দিনই থানা উঠাইয়া চলিয়া গেলেন। সদলবলে দারোগা সাহেব চলিয়া যাওয়ার পর

শশীবাবু স্নানাদি সমাপন করিয়া ভ্রাতার সহিত আহার করিতে বসিয়াছেন এমন সময় "আগুন,আগুন" শব্দ উঠিল। তাঁহারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া যেদিক হইতে চাকর চাকরাণী চেঁচা চেঁচি করিতেছিল সেই দিকে দৌড়াইয়া গিয়া দেখিলেন একটী তালাবন্দ ঘরের মধ্যে বিছানা-পত্রে আগুন ধরিয়াছে। তাড়াতাড়ি ঘর খুলিয়া ভিতর হইতে বিছানা পত্র টানিয়া বাহির করিলেন এবং জল দিয়া আগুন নিভাইয়া ফেলিলেন। ঘরের মধ্যে কেরোসিন তেলের উৎকট গন্ধ বাহির হইতেছে। বিছানায় কে যেন তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। যাহোক সেদিন বেশি কিছু অনিষ্ট হয় নাই। তার পরেই তাঁহারা দেখিলেন, কড়িকাঠময় কে যেন বিষ্ঠা লেপন করিয়া দিয়া গেল। তখন শশী বাবু বলিলেন "ভাই, এ কোন শত্রু কিম্বা দুষ্ট লোকের কাণ্ড নয়, এ নিশ্চয়ই ভূতের কাণ্ড। আমি কোন দিনই ভূত বিশ্বাস করিতাম না কিন্তু যে ঘটনা আজ প্রত্যক্ষ করিলাম তাহাতে ঐরূপ কোন উপদেবতার কাণ্ড বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া আর পারিতেছি না। যদি তাহাই না হইবে তবে আমরা যখন বাহিরে দাঁড়াইয়া আছি তবে এমন অবস্থায় কে ঘরের মধ্যে অলক্ষ্যে গিয়া কড়িকাঠে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিষ্ঠা লাগাইয়া দিল? মই কি সিঁড়ি না লইয়া এত উচ্চে মানুষের হাত পেঁছান অসম্ভব নয় কি?" সতীশ বাবুও এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন,কিন্তু তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া ইহার কোন প্রকৃষ্ট কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও হাসিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিলেন "ভূত বলিয়া কিছু নাই। সবই মনের ধাঁধা।" শশীবাবু শুধু এই মাত্র বলিলেন, "ভাই ক্রমে বুঝিতে পারিবে।" আবার পাহারার খুব কড়াকড়ি বন্দোবস্ত হইল, কিন্তু এবারে পুলিশের নহে—চাকর বাকর এবং প্রজাদের মধ্যে কেহ কেহ। পর দিবস পাহারা সত্ত্বেও বাহিরের বৈটক খানা ঘরের মটকায় আগুন জ্বলিয়া

উঠিল। সেখানেও সকলের চোখের উপর অপর কাহারও উঠিয়া আগুন দেওয়া সম্ভব নয়, তখন বেলা দুইপ্রহর। অন্য কিছু চালের উপর ফেলিয়া দিলেও কাহারও না কাহার চোখে পড়িত। যাহারা পাহারা দিতেছিল তাহাদের মধ্যে কাহার কাহার হাত হইতে লাঠি কিম্বা তরবারি আপনা হইতেই শোঁ শোঁ শব্দে উপরে উঠিয়া গেল, আবার অন্যস্থানে পতিত হইল, যাহার হাত হইতে লাঠি গেল সেত ভয়ে কাঠ হইয়া রহিল। এত উৎপাতের মধ্যেও মন্দের ভাল এই বলিতে হইবে যে সন্ধ্যার পর আর কোন উপদ্রব সংঘটিত হইত না। শশীবাবু ভাইকে এক এক করিয়া ঘটনাগুলি উল্লেখ করিয়া বলিলেন "ভাই, দুষ্ট লোকে রাত্রিতেই সাধারণতঃ উৎপাত করিয়া থাকে। দিনের বেলা এত কাণ্ডকারখানা করিয়া রাত্রে চুপ করিয়া থাকে কেন? ইহাতেও কি তোমার মনে কোনরূপ ভৌতিক কাণ্ড বলিয়া বোধ হয় না।" অবশেষে সতীশ বাবুও ঘটনা পরম্পরায় এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীগণপতি রায়।

স্বপ্নতত্ত্ব।

পঞ্চম অধ্যায়।

"আমি" কি ?

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় আরণ্যকে ঋষি মেঘমন্দ্রে গাহিয়াছেন,—অচেতন মৃৎপাষাণে সত্তামাত্র থাকে, ওষধি বনস্পতিতে বোধশক্তি বিদ্যমান থাকে, মনুষ্যেতর জঙ্গম জীবে জ্ঞান আছে, কিন্তু তাহারা কেহই বলিতে বা ভাবিতে পারে না যে,—"আমি রহিয়াছি, আমি বোধ করিতেছি, বা আমি চিন্তা করিতেছি" কেবল মানুষই জানে যে, সে সে আছে, সে সুখ দুঃখ বোধ করিতেছে, সে চিন্তা করিতেছে।"* পুরাণে সৃষ্টি রহস্য আলোচনা করিতে যাইয়াও এই এক কথাই রূপকে বিবৃত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মা তপ ও ধ্যানের দ্বারা, প্রথমে উপাদান ও আকৃতির মূলাদর্শ নির্ম্মাণ করিলেন; তাহার পর বিষ্ণু তাহাতে প্রাণ ও চেতনা রশ্মি সঞ্চারিত করিয়া দিলেন; অবশেষে যখন এই সমস্ত দেহ পূর্ণভাবে বিকসিত হইয়া উঠিল তখন মহাদেব তাহাদিগকে অমর করিয়া দিলেন। যাহা দিয়া তাহাদিগকে অমর

* ওষধি বনস্পতিষু হি রসো দৃশ্যতে। চিত্তং প্রাণভৃৎসু। প্রাণভৃৎসু ত্বেবা বিস্তরামাত্মা। তেষু হি রসোঽপি দৃশ্যতে। ন চিত্তমিতরেষু। পুরুষে ত্বেবা বিবস্তার মাত্মা। স হি প্রজ্ঞানেন সম্পন্নতমঃ। বিজ্ঞাতং বদতি। বিজ্ঞাতং পশ্যতি। বেদ শ্বস্তনম্। বেদ লোকালোকৌ। মর্ত্যেনামৃতং ইপ্সতি। এবং সম্পন্নঃ। অথেতরেষাং পশূনামশনাপিপাসে এবাভিবিজ্ঞানম্। ন বিজ্ঞাতং বদন্তি। ন বিজ্ঞাতং পশ্যন্তি। ন বিদুঃ শ্বস্তনম্। ন লোকালোকৌ। ত এতাবন্তো ভবন্তি। যথাপ্রজ্ঞং হি সম্ভবাঃ॥ ২—৩—২।

করিলেন সেই অমৃতকণা আর কিছুই নয়, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে বিকসিত জীবাত্মা।

এই আত্মচৈতন্য আছে বলিয়াই, মানবের পক্ষে একদিকে সর্ব্ব-চৈতন্যের আধার ভগবানকে ও অপরদিকে এই জগতের শৃঙ্খলা ও উদ্দেশ্য বুঝিবার সম্ভাবনা। ইহা আছে বলিয়াই মানব চিন্তাশীল জীব, ইহা আছে বলিয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব। ইহাকে কেহ কেহ "মন" এই সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, কেহ তাহাকে "অন্তঃকরণ" বলেন, কেহ আবার তাহাকে "চিতানুত" এই আখ্যা প্রদান করেন। যখন তাহার পূর্ণ বিকাশ হয় তখন ইহা সৎ ও অসতের, সান্ত ও অনন্তের মধ্যে যে অসীম ব্যবধান তাহার যোজক বা সেতুর কার্য্য করে। তখন আর অন্তহীন অতীত হইতে অন্তশূন্য ভবিষ্যৎ বা অনন্ত বর্ত্তমানের পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ইহাই প্রকৃত অমরত্ব। বায়ুপুরাণে আছে,—কোনও সৃষ্টির মধ্যে যখন তাহার আরম্ভ হইতে প্রলয়ে অবসান পর্য্যন্ত সমস্ত, তৈলধারার মত ধারাবাহিকক্রমে,—অসংলগ্ন না হইয়া,—কোনও চৈতন্যে পরিস্ফুট হয়, তখন সেই সৃষ্টির সম্বন্ধে সেই চৈতন্যকে অমরত্ব লাভ করিয়াছে বলা হয়। * এই ভূত, ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান গ্রথিত করাই ইহার কার্য্য, এবং ইহাই মানবের "আমি",—তাহা এক জীবনের "আমি" বোধই হউক, অথবা ভগবান জৈগীষব্যের ন্যায় দশ মহাকল্পের জন্ম পরম্পরাক্রমে অনুস্থিত "আমি" বোধই হউক। এই ব্যাপারটী আমরা কিঞ্চিৎ পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। মনে করুন, রামচন্দ্রের এখন বয়ক্রম চল্লিশ বৎসর। রামচন্দ্র একসময়ে শিশু ছিল; সে তখন যাহা আহার করিত, যে বিহার করিত, যে সমস্ত লোকের সহিত মিশিত, এখন তাহার কিছুই নাই; সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

---

* অভূত সংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভাষ্যতে।

পূর্ব্বের সে দেহ নাই, সেইরূপ শোকহর্ষ নাই, পূর্ব্বের বালকের সেই চপলতা নাই। পূর্ব্বের সবই গিয়াছে, কেবল একটা জিনিষ অক্ষুণ্ণ আছে, সেটা আর কিছুই নহে, সেটা "আমি"-বোধ। সেইরূপ আমার বাল্য, যৌবন, আমার বার্দ্ধক্য ইত্যাদি কত অবস্থা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, নানা প্রকার চিন্তাস্রোত প্রতিমুহূর্ত্তে আমাতে প্রবর্ত্তিত হইতেছে, সুখদুঃখাদি ভোগ একটির পর আর একটি নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে; যখন যে অবস্থা উপস্থিত হয়, তখনই আমি তত্তৎ অবস্থায় আত্মবুদ্ধিযুক্ত হই, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি বালক, আমি যুবা, আমি বৃদ্ধ, আমি সুখী, আমি দুঃখী বলিয়া আপনাকে তত্তৎভাবাপন্ন অনুভব করি। পক্ষান্তরে এই সমস্ত অবস্থা একটির পর আর একটি অতীত হইয়া যাইতেছে; কিন্তু, আমি একই আছি বলিয়া অনুভব করি; বালককালে যে "আমি" যৌবনাবস্থায় বা বৃদ্ধাবস্থায়ও সেই "আমি"; পীড়িত অবস্থায় যে "আমি", সুস্থাবস্থায়ও সেই "আমি"। এক কথায় আমার জন্ম হইতে অদ্য পর্য্যন্ত যাহা কিছু হইয়াছে তাহা সমস্তই এই "আমি"র উপর প্রতিষ্ঠিত।

এইবার আমরা জৈগীষব্যের ন্যায় জাতিস্মর মহাযোগীর "অহং" প্রত্যয়ের আলোচনা করিব। তাঁহাকে প্রশ্ন করায় জীবন্মুক্ত আবট্যকে কোনও এক প্রশ্নের উত্তরে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি, তাঁহার "অহং"—প্রত্যয় একজীবনের নয়, তাহা দশ মহাকল্পের। তিনি স্বর্গে যে সুখভোগ করিয়া আসিয়াছেন, নরকে যাইয়া যে দুঃখ আবর্ত্তে নিষ্পেষিত হইয়া আসিয়াছেন, তৎসমস্তই তাঁহার স্মরণে অক্ষুণ্ণ। ইহাই প্রকৃত অমরত্ব; মৃত্যুঞ্জয় হইতে যে চিদাঙ্কুর আবির্ভাব বলা হইয়াছে, ইহা তাঁহারি কার্য্য; ইহাই জীবাত্মার অমরতা। আর এক প্রকার অমৃতত্ব আছে, তাহা আরও মহান, তাহা সমষ্টির অমরতা, তাহা প্রকৃত আত্মার অমরতা। সে "আমি"—জ্ঞান কোনও বিশেষ ভেদাত্মক

জীবাত্মার "আমি" জ্ঞান নহে, তাহা পরমাত্মার ভাব। শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন, বামদেব পরম মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। সেই অবস্থায় কিভাব হয়, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন,—

তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মাস্মীতি তস্মাৎ তৎসর্ব্বমভবৎ,

তত্র কোমোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"—বৃহদারণ্যক ১অঃ।

[তিনি আপনাকে "আমি ব্রহ্ম" বলিয়া জানিয়াছেন, অতএব তিনি সকলের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্তাবস্থায় সকলই এক বলিয়া যখন দর্শন হয়, তখন শোক অথবা মোহ হওয়া কি সম্ভব ?]

শ্রুতি তাহার পর বলিয়াছেন,—"বামদেবের মোক্ষদশায় তিনি জ্ঞাত হইয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন,—"আমি সূর্য্য, আমি মনু ইত্যাদি।

"ঋাষর্বামদেবঃ প্রতিপেদেহহং মনুরভবৎ সূর্য্যশ্চেতি।"

অতএব আমরা তিন প্রকার "আমি"—প্রত্যয় দেখিলাম ;—প্রথমটী সাধারণ লোকের একজীবনের "আমি"—প্রত্যয় ; মৃত্যুর পর, জন্মান্তর গ্রহণে তাহা শেষ হইয়া যায় বলিয়া মনে হয়। ইহা দেহাভিমান এবং আমরা ইহাকে ভূতাত্মা এই আখ্যা প্রদান করিব। ইহা নশ্বর। দ্বিতীয়ের "আমি"—প্রত্যয় ইহা প্রকৃত মানবের বা জীবাত্মার "আমি"—প্রত্যয়। ইহা অবিনশ্বর। তৃতীয়ের "আমি"—প্রত্যয় ইহা পরমাত্মার "আমি"—প্রত্যয়—অতএব ইহা প্রকৃত অমরত্ব। গীতায় ভগবান এই তিন ভাবের সুন্দররূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরোবিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩॥
অধিভূতং ক্ষরোভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতং।
অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥৪॥

গীতা, ৮ অঃ।

"যাহা পরম অক্ষর তাহাই ব্রহ্ম; স্বভাবকেই (স্=ব্রহ্ম,ভাব=উৎপত্তি; অংশক্রমে জীবরূপে উৎপন্ন ব্রহ্মই) অধ্যাত্ম বলা হয়; ভূতভাবের উদ্ভবকর যে বিসর্গ (দেবোদ্দেশে ত্যাগ) তাহারই নাম কর্ম্ম।

"যাহা ক্ষরভাব তাহাই অধিভূত, (ভূতমাত্রকে অধিকার করিয়া আছে বলিয়া তাহা অধিভূত) পুরুষই অধিদৈবত এবং দেহভৃৎগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! এইদেহে আমিই অধিযজ্ঞ।

এখন আমরা এই অধিভূত, অধিদৈব এবং অধ্যাত্ম কথার কি অর্থ তাহার আলোচনা করিব।

একটি রঙ্গালয়ে প্রত্যহ রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন নাটকের অভিনয় হয়। গোপাল নামে একব্যক্তি প্রতি রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন সাজ সাজিয়া অভিনয় করিয়া থাকে; কোন রাত্রে সে লক্ষণ সাজে, কোন রাত্রে বা চৈতন্য সাজে, কোন রাত্রে বা নারদ ঋষি সাজে। গোপালের এই যে লক্ষ্মণ বা চৈতন্য বা নারদরূপ ধারণ উহা ক্ষণিকরূপ; ভিতরে সে যে গোপাল সেই গোপালই থাকে; যখন তাহার কোনও সাজ থাকেনা তখন সে গোপাল ছাড়া আর কিছুই নহে। মানুষও সেইরূপ এই সংসারের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিবার জন্য এক এক সাজ সাজিয়া জন্মগ্রহণ করে; মৃত্যুর পর সেই সাজ ছাড়িয়া, যে মানুষ সেই মানুষই হইয়া থাকে। ভৌতিকদেহ ঐ সাজ। ইহা ছাড়িলে মানুষের যে অহংভাব থাকে উহাই স্থায়ীভাব। ভৌতিক দেহরূপ সজ্জায় সজ্জিত থাকিবার সময় মানুষের যে অহংভাব থাকে উহা অল্পকাল স্থায়ী ক্ষরভাব। ক্ষরশব্দের অর্থ নশ্বর। গীতায় ইহাকে অধিভূত এবং ইংরাজীতে ইহাকে personality বলে।

এখন আমরা অধিদৈব কাহাকে বলে দেখিব। 'শ্রীমদ্ভাগবতের কপিল দেবহুতি সংবাদে সাংখ্যযোগ কথন প্রস্তাবে অহঙ্কার তত্ত্ব সম্বন্ধে

কথিত আছে,—অহংকার তত্ত্বের কর্তৃত্বই অহংকার তত্ত্বের দেবত্বরূপ। যিনি আমার পূজা গ্রহণ করেন ও ইষ্ট ফল প্রদান করেন তিনি সেই পূজার গ্রহীতা দেবতা। এই গ্রহীতৃত্ব অহংকার অহংকারতত্ত্বেই আছে, সেইজন্য অহংকার তত্ত্বকেই অধিদৈব বলা হয়। ইহাই individuality, ইহা একটী অমর পদার্থ। কিন্তু অহংকারতত্ত্বও সময়ে মহৎ তত্ত্বে লয় পায়, অতএব ইহা পরম অমর নয়। যাহা পরম অমর তাহাই ব্রহ্ম পদবাচ্য।

ভগবান বাসুদেব গীতায় বলিয়াছেন যে দেহমধ্যে তিনিই অধি-যজ্ঞরূপে অধিষ্ঠিত। অধিযজ্ঞশব্দের অর্থ যজ্ঞের অধীশ্বর। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড আলোচনা করিতে দেখা যায় যে শাস্ত্রমতে দেবতা অনেক আছেন; কোন না কোন দেবতার উদ্দেশ্যে যে আহুতি দেওয়া যায় উহাই এক একটি কর্ম্ম এবং একই সময়ে শাস্ত্রবিধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে শৃঙ্খলা অনুযায়ী যে কতকগুলি কর্ম্ম করা যায় তাহার নাম যজ্ঞ। যজ্ঞের এই কর্ম্ম শৃঙ্খলা যিনি শিখাইয়া দেন তিনি যজ্ঞেশ্বর বা অধিযজ্ঞ দেবতা। যজ্ঞ কথাটি যজ্ ধাতু হইতে নিস্পন্ন। যজ্ ধাতুর অর্থ সংহতি করণ বা ভিন্ন পদার্থকে একত্র সম্মিলন করণ। যে অধিষ্ঠাতা পুরুষ এই সংহতি করেন, তাঁহারই নাম অধিযজ্ঞ; ইনিই ঈশ্বর, ইনিই যাবতীয় জীবের হৃদয়ে জ্যোতির্ম্ময় বিন্দুরূপে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইনিই অধ্যাত্ম। উপনিষদে আছে,—

অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।—বৃহদারণ্যক—১-৩-২৮।

"অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়া যাও; অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও; মৃত্যু হইতে অমরত্বে লইয়া যাও।"

পূর্ব্বে যে আমরা যোজকের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই মৃত্যুঞ্জয় অংশই অধিদৈব; ইনিই সৎ বা অধ্যাত্মের সহিত অসতের বা অধিভূতের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেন। এবং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহার নিমিত্তই তাঁহার প্রবেশ।

ক্রমশঃ

শ্রীকিশোরিমোহন চট্টোপাধ্যায়।

অলৌকিক রহস্য।

৯ম সংখ্যা] তৃতীয় বর্ষ। [চৈত্র, ১৩১৮ ।

সাধু বাবা।

আমাদের সময় বীরেন্দ্র কলিকাতার ছাত্রসমাজে সর্ব্বজনপরিচিত ছিল; আমাদের মধ্যে বীরেন্দ্রকে কে না চিনিত, কে না তাহার সঙ্গলিপ্সা করিত? শুধু ছাত্রমহল কেন, কলিকাতার অন্যান্য সমাজেও এই অল্প-বয়স্ক নবীন যুবক সবিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। বীরেন্দ্রের কি না ছিল, যুবক ছাত্রের সংসারে একত্রে যাহা কিছু প্রার্থনীয়, তাহার সবই ছিল। অটুট স্বাস্থ্য, অনিন্দ্য সুন্দর কনককান্তি, উজ্জল প্রশস্ত চক্ষু, বাণানিন্দিত কণ্ঠ, অতুলনীয় প্রতিভা ও বাগ্মিতা, তাহার ছিল। ময়দানে ক্রিকেট ও টেনিস্ খেলিবার সময় যেমন পারদর্শিতা দেখাইত, আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্নি-পরীক্ষায় তেমনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হইত। তাকে অপরাজেয় ও সদা সপ্রতিভ এবং স্ফূর্ত্তিব্যঞ্জক সরস বাকব্যঞ্জনায় সিদ্ধকণ্ঠ ছিল। সে যেন একা একশত, এবং একাই আসর মাৎ করিত। এই সকল কারণে তাহার বন্ধুবান্ধব ও স্তাবকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল এবং ছাত্রজীবনে সে আমাদের নেতা ও আদর্শ ছিল; তবে এই সকল গুণের জন্যই তাহাকে মনে মনে হিংসা করিত না, এমন লোকও বিরল ছিল না।

সভাসমিতিতে উদ্বোধন-সঙ্গীত-গান, ইংরাজী ও বাঙ্গালা কবিতার আবৃত্তিতে ও কবিতা-রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করা যেন, তাহার একচেটিয়া ছিল। তাহার ইংরাজী প্রবন্ধের গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও লিপিকুশলতা প্রভৃতিতে তদানীন্তন অধ্যাপক, টনী, চার্লস্ প্রভৃতিরাও মুগ্ধ হইতেন; আলবার্ট হলের বক্তৃতায় ৺ মনোমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতিও মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন যে, এ যুবক ভবিষ্যতে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলিয়া পরিচিত হইবে। নববিধানসমাজে তাহার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বক্তৃতায় আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র প্রভৃতিও ভক্তিরসে অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ফলে তাহার নব উন্মেষিত প্রতিভা যে দিক দিয়াই প্রবাহিত হউক না কেন, সে যে একজন নিশ্চয়ই বড়লোক হইয়া উঠিবে, তাহা কি নব্য কি প্রাচীন সকলেই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

পোষাক-পরিচ্ছদে, এমন কি অতি সামান্য বিষয়েও তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা এরূপ বৈচিত্র ফুটাইয়া তুলিত যে, তাহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করাও আমাদের অসম্ভব হইত। সে আমাদের আদর্শ ও ঈপ্সিত ছিল, তাহার জনক-জননী ঐরূপ পুত্রলাভে নিজেদের সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেন, গুরুজনেরা আশীর্ব্বাদ বা তিরস্কারকালে বীরেন্দ্রের তুলনা দিতেন, আর যে সব অপোগণ্ড যুবকের পিতা ঐরূপ পুত্রের বিবাহকালীন নিশ্চিত দশ হাজার টাকা পাইতেন, তাঁহারা পুত্রদের ও নিজেদের দগ্ধ অদৃষ্টকে মনে মনে শত ধিক্কার দিতেন।

কিন্তু কোন্ ত্র্যহস্পর্শে বা অশ্লেষা-মঘা-ঘটিত অশুভ মুহূর্ত্তে বা কোন্ বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বীরেন্দ্রের মনে সকলের অজ্ঞাতে সয়তান প্রবেশ করিল, কি করিয়া এই প্রথম যৌবনে অবসাদ ও প্রাণের গাঙ্গে ভাঁটা পড়িল, তাহা এখনও অজ্ঞাত।

বীরেন্দ্র এখন কাহারও সঙ্গে মেশে না, হঠাৎ দেখা হইলে চমকিয়া পাশ কাটাইয়া পলাইয়া যায়; কখনও কখনও দু'চার দিন বাড়ী হইতে আদৌ বাহির হইত না; কখনও বা দু'চার দিন গঙ্গাতীরে বা গড়ের মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইত বা নির্জ্জন স্থানে বসিয়া থাকিত; কোনও দিন বা বাটীতে আহার করিত, কোনও দিন করিত না। ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "কিছু না," চাপাচাপি করিলে বলিত, "মনটা খারাপ আছে", কিন্তু আর কিছু ভাঙ্গিত না।

প্রাচীনেরা বলিলেন বায়ুরোগের পূর্ব্বলক্ষণ, রসিকেরা বলিলেন প্রেমজ, সর্ব্বতত্ত্ববিদেরা বলিলেন চরিত্রদোষ ঘটিয়াছে। আমরা এবং শত্রুরা পশ্চাতে গুপ্তভাবে অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কিছুই জানিতে পারা গেল না। ফলে এ রহস্যতত্ত্ব 'গুহায়াম্ নিহিত' রহিয়া গেল।

আবার সভাসমিতি, তাস, পাশা পরচর্চ্চা যথারীতি চলিতে লাগিল, বীরেন্দ্রের আলোচনা যথানিয়মে কমিয়া আসিল, কেবল যাহাদের কপাল সত্য সত্যই পুড়িয়াছে, শুধু তাহারাই নিরস্ত হইতে পারিলেন না। অনুনয়, বিনয়, অনুযোগ, অভিযোগ, মাথার দিব্য, হাতে ধরা, পূজা, মানসিক, চিকিৎসা প্রভৃতি বরাবরই করিতেছিলেন, কিন্তু ফলে কিছুই হইল না।

একদিন তাহার জননী আমাদের ডাকাইয়া হাতে ধরিয়া বলিলেন, "বাবা তোমারা সব জান, আমার বীরেনের কি হয়েছে বলে দেও, তোমরা ছেলের মতন, কোন লজ্জা ক'রো না, আমার কাছে ভেঙ্গে বল; এ উপকারটী কর বাবা, এ ধার আর আমি কখন শুধ্‌তে পারব না। ও ছোঁড়াও পাগল হবে, আর আমাদের বুড়ো বুড়ীকেও পাগল করবে। মনে করলাম বিয়ে দিলে সেরে যাবে, পাঁচ সাতটী পরীর মত মেয়েও ঠিক করলাম, কিন্তু বিয়ের কথা বললেই সর্ব্বনাশ, বলে যে বিষ খাব, দেশত্যাগী হব, সে সব কথা মুখে আনলেও অমঙ্গল হয়।

আমরা নির্ব্বাক ও নিরুত্তর; কেন না, তিনিও যা জানেন, আমরাও তাই জানি, তার বেশী কিছু না।

বীরেন্দ্র দিনকতক ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাকালে যথারীতি যাইতে আরম্ভ করিল, এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত; পীড়াপীড়ি করিলে কথা না কহিয়া পলাইয়া যাইত, তবে ধরিলে গান গাহিত। আচার্য্যেরা বলিলেন, ধর্ম্মপিপাসা জাগিয়াছে। Optimistরা বলিলেন বিবাহ দাও pessimistরা বলিলেন গতিক খারাপ।

কিছুদিন পরে সে ব্রাহ্মসমাজেও যাতায়াত বন্ধ করিল।

এই সময় বঙ্গদেশে থিয়সফির তুফান ও হিন্দুধর্ম্মের প্রবাহ ছুটিল। কর্ণেল অল্‌কট্ ও ৺ কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন উভয়ে মিলিয়া নগরে নগরে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান-সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছিলেন। শিশিরবাবু ও নরেন্দ্র সেন সনাতন ধর্ম্মের কূলে পাড়ি জমাইলেন। সকলেরই মুখে হিন্দুধর্ম্মের কথা, পরমহংস ঠাকুর, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, অল্‌কট ও ব্ল্যাভাটসকির কথা।

ঠিক এই সময়ে জনশ্রুতি রটাইয়া দিল যে, সিঁথি সাতপুকুরের ঘোষেদের বাগানে এক সাধু আসিয়াছেন, তিনি না কি সিদ্ধ মহাপুরুষ, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে সর্ব্বদর্শী, মনের কথা হুবহু বলিতে পারেন, অসাধ্য রোগ হাত বুলাইয়াই সারাইয়া দিতেছেন; আবার কেহ বলিলেন কিছু নয়, বেটা বুজরুক, নাম জাহির, বা পয়সার চেষ্টায় কলিকাতায় আসিয়াছে, নহিলে সাধু কখনও সহরে আসে, না বড়লোকের বাগানবাড়ীতে থাকে?

ফলে যাহাই হউক, জনশ্রুতি এ সংবাদটীকে সযত্নে কাণের ভিতর দিয়া বীরেন্দ্রের মরমে পশাইয়া দিতে ক্রটী করিল না। শুনিয়া অবধি তাহার মনে হইল, সেখানে যায়। তারপর সাত পাঁচ ভাবিয়া একদিন ঘোষেদের বাগানে যাইয়া উপস্থিত, কিন্তু বাহির হইতে দেখিয়া শুনিয়া সরিয়া পড়িল। পরদিন সাহস করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল ও

কতকটা স্বেচ্ছায় ও কতকটা দেখাদেখি প্রণাম করিল; কিন্তু পদধূলি লইল না।

সাধু প্রাঙ্গণে সতরঞ্চের উপর স্থিরাসনে সস্মিতবদনে কথা কহিতে-ছিলেন, বোধ হয় কোন প্রশ্নের উত্তর দিতেছিলেন, শ্রোতাগণ স্থির ও নীরব; দৃশ্যটী বীরেন্দ্রের ভাল লাগিল।

সাধু তখন বলিতেছিলেন,—"দ্বন্দ্বমোহ"; দেখ সংসারে যতদিন দ্বন্দ্ব আছে, বুঝিবে ততদিন মোহঘোর কাটে নাই, আর যতদিন মোহ থাকিবে, ততদিন দ্বন্দ্বও থাকিবে। দ্বন্দ্ব আছে বলিয়াই মোহ যায় না, মোহ হইতেই দ্বন্দ্বের প্রসার; যাহার এ ভাব কাটিয়াছে, সে ত মুক্তপুরুষ।

গোমুখীর স্বচ্ছ স্রোতের মত সাধু ধীর ও দৃঢ়ভাবে কথাগুলি বলিয়া যাইতেছিলেন। যখন মধ্যে মধ্যে স্থির হইতেছিলেন, তখন তাহার উজ্জল দৃষ্টি যেন শ্রোতাগণের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিতেছিল। কথাগুলি যেন মন্ত্রপূত, কি যেন একটা অজানা শক্তির সহিত জড়িত করিয়া এরূপ ভাবে বলিতেছিলেন যে, তাহাতে সকলেই মুগ্ধ ও তৃপ্তিবোধ করিতেছিল। একজন শ্রোতা বলিলেন, "তবে উপায়"?

সা। যিনি নিরুপায়ের উপায়, তিনি।

শ্রো। আমরাও ত নিরুপায়।

সা। হাঁ যতক্ষণ ঐরূপ ভাবিবে—কিন্তু যখন চিন্তামণিকে ধরিবে, তখন আর কোন চিন্তাই থাকিবে না।

শ্রোতা। তবে এই দ্বন্দ্ব ও মোহের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?

সা। এই দ্বন্দ্ব দ্বারাই মোহ কাটিবে, দ্বন্দ্বের ঘর্ষণে ভিতরের সোণা যতই উজ্জল ও দীপ্তিমান্ হইবে, মোহের কুয়াসা ততই অপসারিত হইবে।

শ্রো। কিন্তু যতদিন এই রিপু বা ইন্দ্রিয় ও বিষয় বাসনা থাকিবে, ততদিন ত কিছুই হইবে না, ইহাদের তাড়াইবার উপায় কি?

সা। তাড়াইবে? ক্ষুদ্র জীব; তাড়াইবার তোমার সাধ্য কি? যতই দূর দূর করিতে যাইবে, ততই বিষম বেষ্টনে প্রতিক্রিয়া করিবে। মনে রাখিও, ইহারাও ভগবৎ শক্তি, তোমার দেহপুরীতে ইহারা ভগবৎ ইচ্ছায় আশ্রয় লাভ করিয়াছে, আর ইহারা কিছু বাঙ্গালী নয় যে গলা টিপিবে, আর বার করিয়া দিবে। ইহারা যেমন শত্রু, যেমন বিপদ, তেমনি মিত্র, তেমনি সহায়; কেবল ব্যবহার করিতে জানিলেই হয়; ময়লা আবর্জ্জনাও হয়, আবার সারও হয়। শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়গণকে দেবতা বা দেব অংশ বলা হইয়াছে; দেবতার অধিপতি ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মন-ইন্দ্র, অর্থাৎ সহস্র চক্ষু। ইহারা যেমন বিষয়-লালসা বৃদ্ধি করে, তেমনি বিষয়-বাসনার অনিত্যতা বুঝাইয়া দেয়। ইহাদের সুপথে চালাও, শান্তি ঢালিয়া দিবে। ঘোড়াকে সোজা পথে ছুটাও, ঠিক আস্তানায় যাবে, আর খানায় চালাইলেই হাত-পা ভাঙ্গিবে। ধারাল যন্ত্র ওস্তাদের হাতে কারুকার্য্য করে, আর আনাড়ীর হাতে রক্তপাত করে।

শ্রো। কিন্তু ইন্দ্রিয় ত প্রবৃত্তির পথেই লইয়া যায়।

সা। ধরিয়া রাখো দুই নাই, সব এক জিনিস, সব এক ভাব দেখাচ্ছে, এক খেলা খেলাচ্ছে। এইজন্য ভগবানকে একরস বলে, তাঁর নাম সর্ব্বনাম, সর্ব্বকাম। সর্ব্বথা একরস গ্রহণ ও বিতরণ করছেন, সর্ব্বনাম ও সর্ব্বকাম তাঁহাতেই উদ্ভূত ও তাঁহাতেই মিলিত। প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি দুটা জিনিস নয়। তাহা যখন বহির্ম্মুখী ও বিষয়-বাসনালোলুপা, তখনই প্রবৃত্তি; আবার যখন অন্তর্ম্মুখী—ঈশ্বরাভিমুখী তখনই নিবৃত্তি। যখন বহির্ম্মুখী তখন কাম, আর অন্তর্ম্মুখী হইলেই প্রেম। ইন্দ্রিয় এখনও আছে, এখন রূপ দেখা যায়; তখন অরূপ জানায়, লোপ পায় না, ভাব পরিবর্ত্তন করে মাত্র। মদন ভস্ম হইল কিন্তু মরিল না,

প্রদ্যুম্নরূপে জন্মাইল। ভয় কি? কত খেলা খেল্‌বে খেলুক না? বিকশিত সকল পদার্থই জরা-মরণের অন্তর্গত; অনন্ত শক্তির বিকাশ হইলে, রিপুসকল মরিয়া নূতন ভাব লইবে, নূতন ভাব দেখাইবে। তৃষ্ণা লালসাও মহাশক্তির বিকাশ—"যা দেবী ভ্রান্তিরূপেন, যা দেবী তৃষ্ণারূপেন সর্ব্বভূতেষু সংস্থিতা"; আবার পবিত্র হইলেই অন্তরেন্দ্রিয় বুঝাইয়া দিবে যে, "যা দেবী মাতৃরূপেন"। মনে কর না সব ভগবানের—দেহ সংসারভোগের জন্য ভগবানের গচ্ছিত সম্পত্তি; তখন আর উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারিবে না, মন ভগবানের, তখন আর মন ব্যভিচারী হইবে না, চক্ষু ভগবানের, তখন দেখিবে, সব সুন্দর অতি সুন্দর, পুণ্যময়, যত্র জীব, তত্র শিব। তোমারও একাদশ ধার আছে, সাধুরও আছে। তুমি দেখ সব স্থির ও নিত্য, সাধু দেখে অস্থির ও অনিত্য; তুমি ভাব তুমি আমি, সাধু ভাবে সব এক; তোমার কাম কামিনী দেখে, সাধুর কাম জননীর স্নেহভোগ করে, দেখে যত্র তত্র গৌরী। এই দুই যখন এক দেখিবে, তখন আর দ্বন্দ্ব থাকিবে না। মোহও থাকিবে না। তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ।

প্রো। কিন্তু হয় কৈ! ভাব যে ভোলে না!

সা। অভ্যাসেন বৈরাগ্যেন; বার বার বিফল হবে, বার বার পেরত্ন করবে। অভ্যাসে বৈরাগ্য জাগাও আর বৈরাগ্য অভ্যাস কর। কথায় বলে ঘস্‌তে মাজ্‌তে রূপ, তাই বলি বাবা ঘসা বন্ধ দিও না। ঘস্‌তে ঘস্‌তেই দেখবে এক দিন ময়লা কেটে রং ফরসা হয়েছে। ও রঙ্গে লাগ রহো, বনত্‌ বনত্‌ বন যায়ই। সাধু কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া স্থির হইলেন। সকলের নির্ব্বাক মৌন মুগ্ধ প্রাণে যেন এক নূতন সুরের স্পন্দন, নূতন মদিরার উত্তেজনা বহিতে লাগিল।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া কেহ কেহ উঠিলেন। বীরেন্দ্রের বড় ভাল লাগিতেছিল, রোমাঞ্চ হইতেছিল, উঠিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু অপরিচিত, তাই পরের বাড়ীতে বেশীক্ষণ থাকা অসঙ্গত মনে করিয়া সাধুকে প্রণাম করিয়া উঠিল।

প্রণাম করিবার সময় সাধু তার পৃষ্ঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া বলিলেন, আবার এস বাবা ? সে স্পর্শে যেন সর্ব্বাঙ্গে পুলক বহিল, কি এক আকর্ষণীশক্তি সে অনুভব করিল। ঘাড় নাড়িয়া জানাইল আবার আসিবে।

বীরেন্দ্র যতক্ষণ না ফটক পার হইয়া গেল, সাধু ততক্ষণ এক-দৃষ্টিতে বীরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর নিকটস্থ লোকদের বলিলেন, এই বালক যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ, ইহার চোখে মুখে যোগলক্ষণ পরিস্ফুট, এতক্ষণ যে দ্বন্দ্ব-মোহের কথা বলিতেছিলাম, এই বালক তার জীবন্ত সাক্ষী, ইহার ভিতর প্রকৃত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আনন্দ হইল। একজন বলিলেন, "সাধু হলে কি হৃদয় পাষাণ হয়, খুব ত প্রাণ আপনাদের, একজন কষ্ট পাচ্ছে আর আপনার তাতে আনন্দ।" সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

সা। আনন্দ হবে না ? 'যদৃচ্ছয়া চোপপন্নম্ স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্, সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্।" গুরুকৃপায় যদি এই বালক অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তা হলে এ কুঁড়িটী যে দিন ফুটিবে, সেদিন ইহার সৌরভে হিন্দুস্থান আমোদিত হইবে। দেখি গুরুজীর মনে কি আছে, যদি এইরূপ একটী জীবের যথার্থ উদ্ধারের উপলক্ষ হইতে পারি, তাহা হইলে বুঝিব লাল কাপড় পরা সার্থক হইয়াছে।

বীরেন্দ্র যে তিন চার জনের সহিত বাহিরে আসিল, তন্মধ্যে একজন বলিল অদ্ভুত শক্তি, আমি যে প্রশ্ন মনে করিয়া আসিলাম তাহা

জিজ্ঞাসা না করাতে যেন ঠিক মনের ভাব বুঝিয়া কথা প্রসঙ্গে উত্তর দিয়া দিলেন। বড় আনন্দ হইল।

আর একজন বলিল, ঠিক কথা আমার সংশয় দূর হইল, আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই।

কথাগুলি বীরেন্দ্র মনোযোগের সহিত শুনিল।

সে ভাবিল সত্যই কি? সত্যই কি ইহার এমনি অন্তর্দৃষ্টি আছে, না শুনিয়া মনোভাব বুঝিতে পারেন? হবেও বা, নহিলে ঠিক আমারই উপযুক্ত এমন উপদেশ পাইলাম কেন? ঠিক যেন আমার জন্য বলিতেছিলেন। না অসম্ভব, হইতে পারে না, আমার সেই নিভৃত অন্তরালের অতি গুহ্য কথা জানিবে কি করিয়া? কিছু না, একটা অন্ধযুক্তিবশতঃ আমরা কাকতালীয় যুক্তি আনিয়া ফেলিতেছি।

তবু কিন্তু বীরেন্দ্রের মাথায় কথাগুলি নূতন নেশার মত নাচিতেছিল, সেই নেশাতেই বিভোর হইয়া সে মত্তপের ন্যায় দোদুল্যমান ভাবে গৃহে ফিরিল।

ফিরিবার সময় বীরেন্দ্র ভাবিল, সাধু ত বলিলেন, "যত্র নারী তত্র গৌরী," "যা দেবী মাতৃরূপেন সর্ব্বভূতেষু সংস্থিতা", "কামই প্রেমে পরিণত হয়, আমাদের কাম কামিনী খুঁজে, সাধুর কাম জননীর স্নেহভোগ করে।" আচ্ছা ইহা কার্য্যে পরিণত করি না কেন? মাথায় তখন বেশ নেশা জাগিয়াছিল। তাই যেমনই সঙ্কল্প, অমনি কার্য্যারম্ভ। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা প্রবাহ ছুটিতে লাগিল, তাহার মনে যত স্ত্রীলোকের মূর্ত্তি জাগিতে লাগিল, কল্পনা-চক্ষুতে বেশ উপলব্ধি করিতে লাগিল যে, তাহারা সব এক, একই মহাশক্তির অংশরূপিণী,—সুন্দরী কুৎসিতা, বৃদ্ধা বালিকা, পরিচিতা অপরিচিতা, সকলকেই মনে হইতে লাগিল যে, একই দেবী ভিন্ন ভিন্ন বিগ্রহে বিরাজমানা, কল্পনায় বড়ই আনন্দ পাইল। কিন্তু এ ভাব এক

স্থানে যাইয়া বাধা পাইল, পর্ব্বতচারী পথিক যেমন সম্মুখে গভীর খাত দেখিয়া স্তম্ভিত হয়, সেরূপ স্তম্ভিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া; স্থির জলাশয়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে যেমন তদুত্থিত ক্ষুদ্র স্পন্দনটি চক্রাকারে ক্রমশঃ বর্দ্ধিতায়তন হইতে থাকে, মানস-তরঙ্গও তেমনি আবার উজান বহিতে লাগিল। বীরেন্দ্র বিমোহিত হইল।

বীরেন্দ্র এখন সুবিধা বুঝিলে প্রায়ই ঘোষেদের বাগানে আসে, কখন কখন দুই এক দিন থাকিয়া যায়, সাধুকে গুরুর তুল্য ভক্তি করে এবং তিনিও শিষ্যের ন্যায় স্নেহ করেন, ফলে কতকটা গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গেল।

ব্যাপারটা বীরেন্দ্রের পিতামাতার কর্ণে পৌঁছিল; শুনিয়াই তাঁহারা প্রমাদ গণিলেন যে, ছেলে বুঝি বিবাগী হইয়া যায়। কিন্তু যখন বহু চেষ্টাতে বীরেন্দ্রকে সাধুসঙ্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন একদিন গাড়ী করিয়া সাধুবাবার নিকটে আসিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাদের আশা ভরসারস্থল, চক্ষুরমণি প্রিয়তম পুত্রকে যেন সন্ন্যাসী করিয়া না তুলেন।

সাধু। সাধ্য কি আমার, যে এক জনকে সন্ন্যাসী করিতে পারি! বহু জন্মজন্মান্তরীণ তপস্যায় যদি কাহারো কর্ম্মবন্ধন টুটিয়া যায়, তবেই সে সন্ন্যাসী হইতে পারে। উহার এখনও সম্পূর্ণ সংসার-লালসা রহিয়াছে, এবং অভাব না কাটিলে সে কিছুতেই সন্ন্যাস লইতে পারিবে না, কিম্বা আমিও উহাকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত করিব না।

শেষে আরও অনেক পীড়াপীড়ির পর সাধুবাবা স্বীকৃত হইলেন যে, বীরেন্দ্রের যাহাতে সুমতি হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ যত্ন করিবেন। উঁহারাও কতকটা হৃষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

সাধু মিথ্যাও বলিলেন না, অথচ একটা স্তোক বাক্য দিলেন; কেন না গৃহীর পক্ষে সুমতি সংসারাসক্তি, কিন্তু সাধুর পক্ষে বৈরাগ্য।

একদিন সাধুবাবাকে নিভৃতে পাইয়া বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, গুরুজী সব শুনছি ও বুঝছি কিন্তু লালসা ত কিছুতে যায় না, প্রাণপণে চেষ্টা করছি তবু সকলি বিফল—বড় জ্বালা, বড় অশান্তি।

সাধু বীরেন্দ্রকে কোলের উপর টানিয়া লইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সস্নেহে বলিলেন, ভয় কি বাবা যাহাকে মহাসমুদ্রে পাড়ি জমাইতে হইবে, তাহাকে সামান্য নদীর তুফানে ভয় পাইলে চলিবে কেন ?

বাস্তবিক পক্ষে কাম আছে বলিয়াই রক্ষা ; কাম ক্রমশঃ আমাদের পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইতেছে ; যতদিন অপূর্ণতা ততদিন কামনা ; যে বিষয় উপভোগ হইয়া গিয়াছে, কামনা আর সেদিকে যায় না। আবার নূতন বিষয়ে ধাবিত হয় ; এইরূপে যতক্ষণ না পূর্ণ হও, কাম ততক্ষণ তোমাকে ছাড়িবে না। প্রত্যেক চরম উপভোগের পর লালসা বুঝাইয়া দেয় যে, সে বস্তু অনিত্য, এক নিত্য ছাড়া যা কিছু লালসা বহ্নিতে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। অন্ধকার আলোকের আবশ্যকতা বুঝায় ; পাপ পুণ্যের গরিমা ফুটাইয়া দেয়। কাম অকামকামী করিয়া তুলে। যৌবনে কাম উগ্র হয়, কেন না দেহীর যা কিছু যৌবনে পূর্ণতা লাভ করে, আরো পূর্ণ হইতে চায়। কাম যৌবন খুঁজে, কেন না যৌবনে রূপরসের পূর্ণবিকাশ হয় : সব সুন্দর হয় ও সুন্দর দেখে। এইজন্য বলে 'যৌবনে কুক্কুরী রম্যা'।

জীব ভগবত-প্রেরণায় এই রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ ও মৈথুন অর্থাৎ পরস্পর সংযোগজাত সুখানুভূতি বিশদভাবে বুঝে, পূর্ণতালাভ করিবার জন্যই এই প্রেরণা। তাই বলি, নিত্য বস্তুর আস্বাদ লও, পূর্ণতা লাভ কর, দেখিবে আর কাম তোমার পিছু লইবে না।

পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালাঃ। বালকই এটা ওটা করিয়া বাহ্য বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়, কিন্তু একটু জ্ঞান হইলেই গম্ভীর হয় ; সেরূপ

জীবেরও যতদিন বালকত্ব থাকে, ততদিন সে স্রক চন্দন বনিতা প্রভৃতিতে আসক্ত হয়, একটু জ্ঞান হইলেই আর ও সকলে মুগ্ধ হয় না। তাই বলি কেবল একটু জ্ঞানের অপেক্ষা, জ্ঞানসূর্য্যের সামান্য বিকাশ হইলেই কামের কুয়াসা সরিয়া পড়িবে। সুতরাং ত্রস্ত চঞ্চল হইবার কোন প্রয়োজন দেখি না, যে বুঝে সে হাসে, "ধীরোস্তত্র ন মুহ্যতি"। রঙ্গালয়ে কোন দৃশ্যের পর, রৌদ্র-করুণাদি ভাবসমন্বয়ে দর্শকবৃন্দ মোহিত হইয়া উত্তেজিত বা অবসাদগ্রস্ত হয়, কিন্তু যাহার নাটকীয় বৃত্তান্ত জানা আছে, সে উদ্বেলিত হয় না, কেবল সাক্ষীরূপে উপভোগ করে।

যখন অমৃতত্ব পাইবে তখন দেখিবে লেলিহমানা লালসা কিছুই নয়, কেবল একটা ধাঁধার ঘোরে ঘুরাইতেছিল, তখন এখনকার কথা মনে হবে আর হাসবে; প্রবীণ ব্যক্তি যেমন শিশুকালের ছেলেমানুষীর সব কথা মনে উদয় হলে হাসে আর ভাবে, যে কি ছেলেমানুষই ছিলাম। তখন সেইরূপ হাসি আসবে, আর অতীত স্বপ্নস্মৃতির মত একটা অস্পষ্ট আভাসে জানিয়ে দেবে যে, এ সবই স্বপ্নের অস্থিরতার মত একটা মায়ার ছলনা বা মিথ্যা কাতরতা; তখন দেখিবে যে, "সর্ব্বে কামা প্রমুচ্যন্তে," এখনকার অতৃপ্ত পিয়াসা, অপূর্ণ লালসার ফুটন্ত ফুলগুলি ঝরা ফুলের মত ঝরিয়া গিয়াছে।

বীরেন্দ্রের তখন আর কিছু শুনিবার প্রয়োজন ছিল না, সে ইহাতেই তৃপ্ত হইতেছিল, মনে হইল যেন ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু হৃদয়ের এক কোণে যে ছিদ্রটী ছিল সেটীর কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল।

সাধু বাবাকে প্রণাম করিয়া গৃহে যাইতে উদ্যত হইলে তিনি বলিলেন, "ভুলে যেও না বাবা, যত ঘন ঘন পারিবে আসিবে এবং পারত প্রত্যহ আসিবার চেষ্টা করিও।"

চলিয়া গেলে সাধু আপন মনে বলিলেন, "অবোধ শিশু জানে না, ইহাকে কি অগ্নি পরীক্ষায় ফেলিলাম, নারায়ণ মুখ রক্ষা করিও। গুরু বালকের হৃদয়ে বল দাও, যেন বীরের ন্যায় জয়ী হইতে পারে।"

বীরেন্দ্রের তখান বাটী ফিরিতে ইচ্ছা হইল না। ভাবের নেশায় বিভোর হইয়া ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া সোপানের উপর বসিয়া তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিল।

তখন দশমীর চন্দ্র সবে আকাশ হইতে জ্যোৎস্না ছড়াইতেছে, বিবিধ যান রাজপথে ও তরণী নদীবক্ষে কল্লোলের সহিত ছুটিতেছে; রাজধানী ও ভাগীরথী তখনো জন-কোলাহল-মুখরিত; কিন্তু দিবস অপেক্ষা শান্ত এবং ধরণীও বুঝি একটু শ্রান্ত। কেহ গৃহে ফিরিতেছে, কেহ নদীতীরে বায়ু সেবন করিতেছে, কেহ বা শ্রান্তি অপনোদন করিতেছে। জলতরঙ্গ আহ্লাদে কল্লোল তুলিয়া চন্দ্রকিরণ সর্ব্বাঙ্গে মাখিতেছে। বীরেন্দ্রের স্থান ও কাল বড় ভাল লাগিতেছিল।

পাশের ঘাট হইতে তখন একজন পূরবীতে উচ্চকণ্ঠে গাইতেছিল, 'বেলা বহে যায়, কি কর বসিয়া এবে'। গানের সুর ও বাণী বায়ুর কম্পনে বীরেন্দ্রের কানে পৌঁছিতেছিল, সে ভাবিল সত্যই ত বেলা বহে যায়; কিন্তু আমি হেথা বসিয়া কি করিতেছি, দিনের পরদিন অবসাদে, উত্তেজনায় একই ভাবে কাটিয়া যাইতেছে, আর আমি এখানে বসিয়া "করিতেছি তটিনীর লহরী-গণনা।"

তার মনে হইল এ সব কিছুই নয়, যেন একটা মায়াপুরী; এই ধন-দৌলত, গাড়ী-জুড়ী, বাগান-বাগিচা, সাধের বাড়ী, এ গুলা বন্ধন, জীবের স্বর্ণশৃঙ্খল, একটা কাল্পনিক মরীচিকার প্ররোচনায় অষ্টবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিতেছে। রাজপার্শ্বস্থ অট্টালিকা, পরপারস্থ কলের বৃহৎ চিমনী বিস্তীর্ণ রাজপথ নদীবক্ষস্থিতা তরণীমালা, যেন সুধাকরেরই মত ম্লান হাসি

হাসিয়া বলিয়া দিতেছে যে, আমরা সকলি অনিত্য, ও ক্ষণভঙ্গুর, আজ আছি কাল নাই, "শুধু খেলে যাই দুদিনের খেলা।"

সকলে যেন একসুরে বৈরাগ্য-রাগিণী গাহিতেছিল, যেন একভাবে বীরেন্দ্রের প্রাণে আঁকিয়া দিতেছিল যে সারভূত এক, একই কথা, একই ভাব, একই ভাষা, যেন তদেব ভাষা "সর্ব্বমিদং বিভাতি"।

আর কিছু ভাল লাগিতেছিল না, বার বার ইচ্ছা হইতেছিল যে, সমস্ত ত্যাগ করিয়া কৌপীন মাত্র লইয়া আবার গুরুজীর কাছে ছুটিয়া যাই, এবং তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতে, অরণ্যে, তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াই।

বীরেন্দ্র এই ভাবের ঘোরে বহুক্ষণ তন্ময় হইয়া রহিল, তারপর যখন হৃদয়ের ক্ষুদ্র রন্ধ্রপথ চুয়াইয়া সমস্ত ভাবরাশি নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, গভীরা রজনী। আলোক-প্লাবিতা রাজধানী যেন সুপ্তির ক্রোড়ে গা ঢালিয়া তরঙ্গে রিমি রিমি, ঝিমি ঝিমি, কুলু কুলু ভাষায় নাচিয়া নাচিয়া প্রেমের মিলনে ছুটিতেছে। দশমীর আকাশের শীর্ষদেশ হইতে শত সহস্রচ্ছটায় কৌমুদীরাশি সারা ধরণীকে চুম্বন-চেষ্টায় জড়াইয়া ধরিতেছে, ধরণীও যেন মত্ত পুলকে শিহরিয়া উঠিতেছে। বিহ্বলা প্রকৃতি যেন আবেশ-মগ্না; "সুদূর প্রান্তরভূমে আকাশ পড়েছে নুয়ে, যেন মিশেও মিশেনি দুটী তৃষার্ত্ত অধর।" দূরে এক দ্বিতল অট্টালিকার সজ্জিত আলোকিত কক্ষ-গবাক্ষ হইতে এক অজানিতা বারবনিতার মিহি কণ্ঠের সুর, তবলার ঠেকায় নাচিয়া নাচিয়া মধ্যে মধ্যে ছুটিয়া আসিতেছিল। মদিরা-বিহ্বলা কামিনী গাহিতেছিল "পিও পিও পিয়ালা ঢাল সরাপ।"

বীরেন্দ্র আবার বিমোহিত হইল; সুপ্তিমগ্না প্রকৃতি যেন মধুর সুরে বলিতেছিল, ইহাই সুখ, ইহাই স্বর্গ। সে ভাবিল, ছার বৈরাগ্য, ছার শুষ্ক বেদান্ত—ইহাই সুখ ইহাই স্বর্গ; এই প্রেমাবেশ, এই সোহাগ-বিহ্বলতা, এই পুলক-মদিরা, ইহাই বাঞ্ছনীয়। আবার পূর্ব্বকথা জাগিল; মনোমধ্যে

আবার আলোড়ন হইল, বিস্মিত, মুগ্ধ বীরেন্দ্র আবার ব্যথিত, কাতর হইল, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। দ্বন্দ্বমোহে পড়িয়া ঘূর্ণাবর্ত্তে পতিত ক্ষুদ্র তরণীর মত অবশ হইয়া ভাবিল কি করি? শ্যাম রাখি, না কুল রাখি? একদিকে কামের পরাজয়, প্রেমের জয়, বৈরাগ্যের আভাস, মনুষ্যত্বের বিকাশ, আর একদিকে পরিপূর্ণ যৌবনের বিকসিত লালসা। করি কি? জীবনের সব কথা মনে জাগিতে লাগিল, কখনো আশা, কখনো অবসাদ। দুই পথই খোলা, কোথায় যাই। আমার সবই আছে কিন্তু যেন কিছুই নাই, ইচ্ছা করিলে ভগবানের পায়ে প্রাণ ঢালিতে পারি। আবার এই পরিপূর্ণ যৌবনে সব আশা লইয়া গা ভাসাইতে পারি। পাপ কখনও চাপা থাকিবে না, একদিন না একদিন আমার গুপ্ত কলঙ্ক-কাহিনী প্রচারিত হইবে। দূর সম্পর্কীয়া বিধবা যুবতীর সহিত গুপ্ত প্রণয় প্রকাশ হইয়া পড়িবে; তাহা লইয়া কি করি? দোষ কাহার? তাহার না আমার, কে কাহাকে প্রথম মজাইয়াছিল। যাক্ পূর্ব্বকথা, এখন কোন্ পথে যাই?

আর ভাবিতে পারিল না। বিমোহিত বীরেন্দ্র ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিল; বৃহৎ বাটীর সকলেই সুপ্তিমগ্ন। সদর বাটী পার হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে দেখিল, সম্মুখে বর্ত্তিকাহস্তে রমণীমূর্ত্তি। পথিক সম্মুখে হঠাৎ সর্প দেখিলে যেমন ত্রস্ত হয়, সে তেমনি শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু যেই রমণীর মুখের উপর দৃষ্টি পড়িল; অমনি বোধ হইল সুন্দরী বড়ই সুন্দরী, প্রেমিকার চোখে মুখে কি অতুলনীয় সৌন্দর্য্য! রমণী বর্ত্তিকা নিভাইয়া বীরেন্দ্রের হাত দুটী ধরিয়া কাতরকণ্ঠে প্রেমের ভাষায় বলিল, "বীরেন্দ্র আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করেছি, তুমি আমায় একেবারে পায়ে ঠেলিলে, মুখ পর্য্যন্ত দেখিলে না। আমি তোমা বই জানি না, কিন্তু তুমি এত বিরূপ কেন?"

বলিতে বলিতে রমণী কাঁদিয়া ফেলিল; তপ্ত অশ্রুধারা তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া টস টস্ করিয়া বীরেন্দ্রের হাতে পড়িল। বীরেন্দ্র ব্যথা পাইল।

রমণী আবার বলিল, "বল বীরেন্দ্র, বল, আমার কি অপরাধ, মনে জ্ঞানে কোন পাপ করি নাই, এক পাপ তোমাকে ভালবাসিয়াছি, কিন্তু এ যদি পাপ হয়, তা হলে তোমার পায়ে প্রাণ সঁপিয়া অনন্ত নরকেও আহ্লাদের সহিত যাইব। যদি আমায় না চাহ, তবে কেন মজাইয়াছিলে? কেন এই কার্ত্তিকের মত চেহারা লইয়া এই বিধবার সম্মুখে আসিয়া প্রলোভন জাগাইয়াছিলে?"

যেন বীরেন্দ্রের সব দোষ! বিমোহিত বীরেন্দ্র স্তব্ধ ও নিরুত্তর। কি যেন একটা উত্তেজনা ও অবসাদ এক সঙ্গে তাহাকে ঘেরিয়া ফেলিতেছিল। কুলটা তাহার স্বভাবসুলভ আকর্ষণে বীরেন্দ্রের প্রাণ টানিয়া লইতেছিল।

রমণী আবার বলিল, "জান ত আমি তোমাকে কি চোখে দেখি, তোমার এই তাচ্ছল্যে আমার প্রাণে যে কি যাতনা হচ্ছে, তা অন্তর্যামীই জানেন। যদি বুক চিরিয়া দেখাবার হত ত দেখাতাম। আজ তিন দিন তিন রাত্রি আহার করি নাই; এই দেখ আমার সব জ্বালা জুড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।

রমণী বস্ত্রাঞ্চল হইতে অহিফেন বাহির করিল। কেবল একবার শেষ দেখা দেখাইবার জন্য; একবার তোমার মুখে আমার অপরাধটা কি জানিতে পারিলে, নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারি।

রমণী আবার অশ্রুজলে গণ্ডস্থল ভাসাইয়া দিল। বীরেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না; প্রেমিকাকে হৃদয়ে ধরিয়া বলিল, "বল কি করতে হবে, স্বীকার করছি সব দোষ আমার, আমার হৃদয়ের অনুরোধ আত্মহত্যা কর' না, যা বলবে তাই করব।"

রমণী বলিল, "তোমায় কিছুই করিতে হইবে না, বল আমার অপরাধ কি ? আর না বল ত, শুধু মাঝে মাঝে এক একবার বাড়ীতে এস, আর দেখা দিও, আর কিছু চাই না।"

বীরেন্দ্র স্বীকৃত হইল। জলেই জল বাঁধে ; পরদিন তাহার পিতামাতা উভয়েই জেদ ধরিয়া বসিলেন যে, কিছুতেই সাধুর নিকট যাওয়া হইবে না। অন্ততঃ চার পাঁচ দিন অন্তর একবার করিয়া যাইবে, আবার সেই দিনই চলিয়া আসিবে এবং সেই সঙ্গে ইহাও জানাইলেন যে তাহার শীঘ্র বিবাহ দিতে তাঁহারা কৃতসংকল্প ; অবসন্ন বীরেন্দ্র সংগ্রামে পরাজিত হইল।

কুলটা সুযোগ বুঝিয়া আরো মদিরা ঢালিতে লাগিল। প্রস্তাব করিল, এখানে ভাল না লাগে চল বিদেশে যাই। আমি যখন কুল-শীল-মান সব তোমার পায়ে ঢালিয়াছি, তখন যেখানে বলিবে সেখানে যাব। তোমার সব আছে ; বিদ্যা, বুদ্ধি, সাহস আছে ; আমারো যথেষ্ট অর্থ ও অলঙ্কার আছে, বিদেশে যাইয়া রাজার হালে থাকিব।

উদ্‌ভ্রান্ত বীরেন্দ্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিল। জীবন-সংগ্রামের দোটানায় পড়িয়া তাহার এইরূপ ক্রমাগত অস্থিরতা, ব্যাকুলতা ভাল লাগিতেছিল না। শেষে স্থির করিল ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূরে দেখি, গোপনে গৃহ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিল।

একদিন শেষ রাত্রিতে গোপনে উঠিয়া একখানি ঠিকাগাড়ী আস্তাবল হইতে ডাকিয়া লইল। শীতকালে, সমস্ত পল্লী নীরব। সদর বাটীর একটী নিভৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অর্গল বদ্ধ করিয়া উভয়ে নিঃশব্দে দ্রুতভাবে আবশ্যক বস্ত্র, অর্থ, দ্রব্যাদি গুছাইয়া লইতে লাগিল।

এমন সময়ে বাহিরের দরজায় মৃদু করাঘাত ; উভয়ে ভীত স্তম্ভিত হইয়া, উৎকর্ণ হইল। আবার আঘাত, কিন্তু অন্য দরজা ছিল না, পলাইবার

উপায় নাই। আঘাতে কোন সাড়া না পাইয়া বাহিরের ব্যক্তি মৃদুস্বরে ডাকিল, "বীরেন্দ্র!"

বীরেন্দ্রের তখন মনে হইল, পৃথিবী দ্বিধা হউক; একি! অসম্ভবও সম্ভব! বিস্মিত বীরেন্দ্র মর্ম্মর মূর্ত্তির ন্যায় অসাড় ও নিস্পন্দ! স্বর বহু পরিচিত! আবার আহ্বান হইল, "বীরেন্দ্র!"

বীরেন্দ্র মন্ত্রাবিষ্ট মানবের ন্যায়, যন্ত্রচালিত পুত্তলিকাবৎ দ্বার উন্মোচন করিল, কিন্তু স্পন্দহীন।

ধীরে মৃদুপদসঞ্চারে এক কৌপীনধারী সাধু গৃহে প্রবেশ করিল; রমণী লজ্জাতাড়নায় গৃহকোণ আশ্রয় লইল।

সাধু বাবা বলিলেন, "বীরেন্দ্র! ছি! তোমার এই কাজ! তোমার এ পতন আমি আশা করি নাই। বড় আশা ছিল, তুমি এ সংগ্রামে জয়ী হইবে, ভাবিয়াছিলাম আমার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। এ কয়দিন যে তোমার জন্য কত ভেবেছি তা তুমি জান না, যদি ইহার মধ্যে একদিনও যাইতে, তা হ'লে আর এ বিভ্রাট ঘটিত না।

স্তম্ভিত বীরেন্দ্র দেখিল যে মহাপুরুষ ধীর ও স্থির; একটু ক্রোধ বা ঘৃণা নাই, যেন অনুকম্পায় পরিপূর্ণ। যাতনায় বীরেন্দ্রের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল

সাধু বাবা বলিলেন, 'চল এস'?

বীরেন্দ্র অসাড়ভাবে অনুসরণ করিল ও সাধুর সঙ্গে পূর্ব্ব নির্দ্দি- গাড়ীতে উঠিল।

পরদিন জনশ্রুতি কলিকাতায় রটাইয়া দিল যে, ঘোষেদের বাগানে সাধু, অতি প্রত্যূষে, কাহাকেও না বলিয়া তীর্থভ্রমণে চলিয়া গিয়াছেন।

ইহার ঠিক দ্বাদশবর্ষ পরে, বীরেন্দ্র একবার দেশে ফিরিল; কিন্তু নূতন নামে, নূতন বেশে,—শুধু সন্ন্যাসের নিয়মানুসারে জন্মভূমি দেখিবার জন্য।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বন্ধু ভূতের ভীষণ উৎপাত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শশীবাবু বলিলেন, "ভাই এখন ত বুঝলে এই ব্যাপার মানুষের ক্ষমতার বাহিরে। অতএব সেই নিরপরাধ জেলেটাকে আর কেন নিরর্থক হাজতে পচাও।" "মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে গিয়া বলিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া আন। তুমি তাহার উপর কোন চার্জ্জ না আনিলেই সে রেহাই পাইবে, আহা গরিব বেচারি অনেক কষ্ট পাইয়াছে।" সতীশবাবু তদনুসারে পরদিন সবডিবিসনাল মাজিষ্ট্রেটের নিকট গিয়া বলিলেন যে, তাঁহার বাটীতে যে উৎপাত হইতেছে, সে সমস্ত ভৌতিক কাণ্ড। জেলের তাহাতে কোন দোষ নাই, অতএব অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিউন। মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "সতীশবাবু, আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক, আপনি এ কিরূপ বলিতেছেন, আপনি এরূপ অসম্ভব কথায় কি করিয়া বিশ্বাস করেন, বুঝিতে পারিতেছি না। যা হোক, আমি কিন্তু চাক্ষুষ আপনার ভূতের কার্য্যকলাপ না দেখিয়া সেই অপরাধী জেলেকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেছি না। যে ব্যক্তি একজনকে পোড়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিয়াছিল, আমি তাহার নিরপরাধিতার উপযুক্ত প্রমাণ না পাইয়া কোন মতেই ছাড়িতে পারিব না। এ ক্ষেত্রে আমি আপনার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। যদি আমাকে আপনার পোষা ভূতের দৌরাত্ম্য দেখাইতে পারেন, তবেই সে মুক্তি পাইতে পারে; নতুবা নহে ইহা স্থির জানিবেন।" তাহাতে সতীশবাবু বলিলেন, "যদি আপনার অসুবিধা না হয় তাহা হইলে আগামী কল্যই ভূতের কার্য্যকলাপ আপনাকে প্রত্যক্ষ করাইব। কোন্ সময় আপনার যাওয়ার সুবিধা হইবে বলুন।" মাজিষ্ট্রেট পরদিন বেলা তৃতীয়

সময় যাইবেন বলিয়া দিলেন। সতীশবাবু ফিরিয়া আসিয়া শশীবাবুকে সমস্ত কথা জানাইলেন। পরদিন যথা সময়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়া পৌছিয়াই সতীশবাবুকে বলিলেন, "কই মহাশয়, আপনার ভূত কোথায় কিছুই ত দেখিতে পাইতেছি না ?" সতীশবাবু বলিলেন, "যখন অনুগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন। তবে সে ত আমার মাহিনার চাকর নয় যে ডাকিলেই আপনার সম্মুখে আসিয়া হাজির হইবে।" এইরূপ কথাবার্ত্তার পর সতীশবাবু মাজিষ্ট্রেটকে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, দরজার উপর হইতে অমনি একখানি প্রগার ইঞ্চি ইট সাহেবের ঠিক সম্মুখে পতিত হইল। মাজিষ্ট্রেট ত দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মহাশয় এ কি ?" সতীশবাবু বলিলেন, "মহাশয় এই ত সবে সূত্রপাত। ভূত ভায়া আপনাকে অভ্যর্থনা করিল। ইহাতে ভীত হইবার কোন কারণ নাই। এরূপ অভ্যর্থনা আমরা আজ ৪।৫ মাস পাইতেছি।" পরে বাটীর মধ্যে আঙ্গিনায় সাহেবের বসিবার জন্য একখানি চেয়ার স্থাপিত হইল। তিনি তদুপরি উপবেশন করিলেন। ২।৪টী কথার পর সাহেব আবার বলিলেন, "কি মহাশয়! আরত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।" শশীবাবু বলিলেন 'সাহেব আপনি ব্যস্ত হইবেন না। ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবেন।' এই কথা বলিতে না বলিতে একটি বিষ্ঠাপূর্ণ হাঁড়ি শূন্যমার্গ হইতে শোঁ শোঁ শব্দে আসিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে পতিত হইল। শশীবাবু বলিলেন, "আপনি ব্যস্ত হইয়াছিলেন, এই নিন মহাশয় দ্বিতীয় উপঢৌকন।" ইহার পর মুহূর্ত্তেই গৃহাভ্যন্তরে দরজা জানালা ঝড় বাতাসে যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু তখন সামান্য রকম বাতাসও অনুভূত হইতেছিল না। দরজা জানালার যখন ভয়ানক দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইয়াছে, ঘরের মধ্যে একটী বার মণ আন্দাজ লোহার সিন্দুক ২।৩টী দরজা পার হইয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে

আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের পাশেই পতিত হইল।” তখন ত ম্যাজিষ্ট্রেট আঁৎকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ভয়ে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তহীন হইয়া উঠিয়াছে। তিনি এই অসম্ভব অথচ চাক্ষুষ ব্যাপার দেখিয়া বলিলেন, “সতীশবাবু আপনি এই অদ্ভুত ভূতকে লইয়া সুখে ঘরকন্না করুন। আমার চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটিয়াছে, আমি এখন চলিলাম। কালই আপনার জেল খালাস পাইবে।” সতীশবাবু বিনীতস্বরে বলিলেন, “আর একটু থাকিয়া গেলে ভাল হইত; আপনি ইহাকে যেরূপ উত্তেজিত করিলেন, ইহার তাল সামলাইতে আমাদের বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইবে।” ম্যাজিষ্ট্রেট ত চলিয়া গেলেন। কিন্তু দরজা জানালা ভাঙ্গার শব্দ ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন শশীবাবু একখানি তরবারি লইয়া বাতাসের সহিত যেন লড়াই করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, “পাজি বেটা ভূত, আজ তোকে কাটিয়া ফেলিব।” পূর্ব্বে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যখনই উৎপাতের মাত্রা বাড়িয়া উঠিত, তখনই তিনি তরবারি লইয়া যে দিকে শব্দ হইত সেই দিকে বাতাসের সঙ্গে লড়াই করিয়া গালি পাড়িতেন। তখনই কিন্তু সব শান্তভাব ধারণ করিত। আজও তাহাই হইল। সব যখন চুপচাপ হইয়া গেল, তখন দুই ভাই স্নানান্তে আহারাদি সমাপন করিলেন। শশীবাবুকে প্রত্যহই তাঁহার মাসী মা এবং ভাদ্রবধূর আহারের সময় ঘরের দরজায় তরবারি হস্তে পাহারা দিতে হইত। নতুবা বিষ্ঠা ইত্যাদি দিয়া ভূতে তাঁহাদের আহারীয় বস্তু নষ্ট করিয়া দিত। একদিন তাঁহার ভ্রাতৃবধূ স্নানান্তে কেশপাশ শুকাইতেছিলেন, অমনি ভূত মহাশয় তাঁহার আলুলায়িত কুন্তলে পুরীষ নিক্ষেপ করিয়া বিকট হাস্য করিয়া উঠিল। তিনি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অমনি শশীবাবু দৌড়াইয়া গিয়া তরবারি যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, পরে সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইয়া আনিলেন। উপর্য্যুপরি এইরূপ ঘটনায় মেয়েদেরও

অনেকটা সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল। সতীশবাবুর স্ত্রীর উপরেই ভূতের আক্রোশ কিছু বেশী ছিল, কিন্তু বিশেষ কোন অনিষ্ট করিত না। একদিন দুই ভাই পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, বৌকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিলে হয় ত উৎপাত কমিয়া যাইবে। তদনুসারে সতীশবাবু তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার মামার বাড়ীতে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া পাল্কী আনাইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় পালকীখানা বাড়ীর দরজায় আসিতেই কে যেন শূন্যে উঠাইয়া লইয়া গেল এবং পরক্ষণেই আবার অন্যস্থানে নামাইয়া রাখিল। বেহারাগুলি এই ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া রহিল। সতীশবাবুর স্ত্রী পাল্কীতে আরোহণ করিলে পাল্কীখানা একধার হইতে অন্য ধারে গড়াইতে লাগিল। তিনি পরিত্রাহি চীৎকার করিতে লাগিলেন, আবার একটু পরেই যেখানকার পাল্কী ঠিক সেখানে স্থিরভাবে অবস্থিত রহিল। বেহারাগণ এই সব দেখিয়া শুনিয়া পাল্কী লইয়া যাইতে নিতান্তই নারাজ হওয়াতে আট জনের স্থানে ষোল জন বেহারার বন্দোবস্ত হইল। এক জন ঝি সঙ্গে গেল। তিনি মাতুলালয়ে পৌঁছিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা সকলের নিকট বলিতেছেন, এমন সময় তাঁহার মাতুল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি খুব বড় লোক। (তাঁহার নামধাম শুনিয়াছিলাম, কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছি।) তাঁহার ভাগিনেয়ীকে নিজের ঘরে বসাইয়া সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "এখানে যখন আসিয়াছ, তখন আর ভূতের ভয় থাকিবে না। তোমার বাবা যেমন একটী ভূতের হাতে তোমাকে দিয়াছেন, ভূত ত কাজেই তাহার সঙ্গী খুজিয়া লইয়াছে। ভূতের কাছেই ভূত বাস করে। মানুষের কাছে ভূত আসে না।" তাঁহার নিজের ঘরে প্রায় পাঁচশত টাকার কয়টী বেলোয়ারী ঝাড় টাঙ্গান ছিল। এই কথাও বলা আর সেইগুলি ঝনঝনাৎ শব্দ করিয়া চুরমার হইয়া গেল। তাঁহার ত একেবারে চক্ষু স্থির। তখন তাঁহার ভাগিনেয়ী

বলিলেন, "এই দেখুন হতভাগা এখানেও আমার সঙ্গ লইয়াছে।" মাতুল তখন তাঁহার পূর্ব্বের উক্তির জন্য বিশেষ লজ্জিত এবং অপ্রস্তুত হইয়া ভাগিনেয়ীকে বলিলেন, "মা লক্ষ্মী পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই তোমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যে ঘটনা এইমাত্র দেখিলাম এরূপ কখনও দেখা ত দূরে থাকুক, শুনিও নাই। এখন এই একটা জিনিষের উপর দিয়া গেল, ইহাতে তেমন কিছুই আসিয়া যায় না; কিন্তু এইরূপ যদি প্রত্যহই অনিষ্ট হয়, তবে দেখিতেছি প্রায় ৫।৭ হাজার টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইবে। অতএব ভালোয় ভালোয় তোমার এখান হইতে যাওয়াই শ্রেয়।" ঐ গ্রামে একটী জেলের মেয়ে এই ভূতের উৎপাতের কাণ্ড শুনিয়া একটী মাদুলী দিয়া বলিল, "এই মাদুলীটি বাম হাতে ধারণ করিবে। কোন রকমেই যেন মৃত্তিকা-স্পর্শ না হয় এবং অন্য স্থানে খুলিয়া না রাখা হয়, তাহা হইলেই কিন্তু ইহার গুণ যাইবে।" আর একটী গাছের শিকড় দিয়া বলিল, "এইটি বাড়ীর এক কোণে পুঁতিয়া রাখিবে।" মাদুলী ধারণাবধি কিছুদিন আর কোন উপদ্রব হইল না। পরে সতীশ-বাবুর স্ত্রী নিজের বাড়ীতে চলিয়া আসিলেন। বাটীতেও আর কোন উৎপাত নাই। সকলেই মনে করিল, মাদুলীর গুণে এইবার ভূতের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া গেল। বহুদূরের লোকপর্য্যন্ত এই ভূতের গল্প শুনিয়াছিল। একদিন মৌলবি আবু বকোর নামে এক ফকির দুইটি চেলা সঙ্গে করিয়া সতীশবাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া বলিল, "সে ভূতের ওঝা। যে কোন রূপ উৎপাত হউক না কেন, সে তাহার শান্তি করিয়া ভূতকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারে। অতএব সে তিনখানি নূতন গামোছা এবং তিনটী নূতন কাল হাঁড়ি ঢাক্নাসমেত পাইলে ভূতের উপদ্রব নিবারণ করিয়া দিবে। কিন্তু তাহাকে পারিশ্রমিক-স্বরূপ পঞ্চাশ টাকা দিতে হইবে।" সতীশবাবু তাহার কথায় সম্মত

হইয়া হাঁড়ি ইত্যাদি তৎক্ষণাৎ আনাইয়া দিলেন। ওঝা বলিল, "যেখানে যাহা পূর্ব্বের ওষুদ পত্র আছে তাহা উঠাইয়া ফেলিতে হইবে এবং শরীরেও যদি কাহার ওষুদ পত্র থাকে তবে তাহাও খুলিয়া রাখিতে হইবে, নতুবা ভূতকে বাগে আনিতে পারিব না।" ওঝার কথামত কাজ করা হইলে, বাড়ীর আঙ্গিনায় ওঝা তাহার সাক্রেৎদ্বয় সমভি-ব্যাহারে বসিয়া ধূলা মন্ত্রপূত করিয়া বাটীর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিল এবং স্ব স্ব দেহও মন্ত্রপূত করিয়া লইল। পরে হাঁড়ি কয়টি সম্মুখে রাখিয়া তদুপরি গামছা ঢাকা দিয়া ওঝাজী সবে মন্ত্র পড়িয়া ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছে, অমনি দমাদম ইষ্টকখণ্ড পড়িতে লাগিল। হাঁড়িগুলিত মুহূর্ত্ত মধ্যে চূরমার হইয়া গেল। সাক্রেৎদ্বয় জখম হইল। ওঝা নিজেও ঘায়েল হইয়া খোদার নাম করিতে লাগিল। তাহাদের গাত্রে বিষ্ঠা ইত্যাদিরও প্রচুর বর্ষণ হইতে লাগিল। ওঝা তখন সতীশবাবুকে ডাকিয়া বলিল, "বাবু মহাশয় গো, শয়তান মোদের মেরে ফেল্‌লে গো। এমন শয়তানের হাতে মোরা কখনও পড়িনি। এখন মোদের রক্ষা করুন।" তাহারা ইটের আঘাতে আধমরা হইয়া প্রাচীরের পার্শ্বে গিয়া আশ্রয় লইল। যখন এইরূপে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল, লোকগুলি মারা যায় আর কি, বাড়ীর লোকেও শঙ্কিত হইয়া উঠিল, তখন শশীবাবু তাঁহার অভ্যস্ত অস্ত্র লইয়া বাহির হইয়া বলিলেন, "ওহে ওঝা এতদিন ত এক রকম ছিল ভাল, এখন তুমি ভূতকে রাগাইয়া আমাদের আরও বিপদে ফেলিলে। শীঘ্র শীঘ্র ভূতকে ধরিয়া লইয়া যাও।" তখন ওঝা অতি মৃদু স্বরে বলিল, "বাবু মহাশয়, মোর আর শয়তানকে ধরে কাজ নাই। আপনাদের বাড়ী হইতে বাহিরে যাইতে পারিলে বাঁচি। আর কোন্ বেটা ভূত ধরিবার নাম করে?" শশীবাবু তখন বাতাসের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিয়া ভূতকে উদ্দেশ করিয়া যথোচিত গালি দিতে লাগিলেন।

তখন আবার সব যেন যাদুমন্ত্রে শান্তভাব ধারণ করিল। তখন ওঝা বেচারি চেলাদিগকে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে একেবারে বাটীর বাহিরে গিয়া উপস্থিত হইল এবং আর পশ্চাৎ না ফিরিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

একদিন সতীশবাবুর মাতাঠাকুরাণী এবং তাঁহার স্ত্রী ঘরের মধ্যে আহার করিতে বসিয়াছেন। শশীবাবু বাহিরে পাহারায় নিযুক্ত আছেন; এমন সময় ঘরের মধ্যে অস্ফুট ধ্বনি শোনা গেল। অমনি শশীবাবু উঠিয়া জানালা দিয়া ঘরের ভিতর চাহিয়া দেখিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার যেন শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, কে যেন দুইখানি অতি দীর্ঘ বাহু অপর দিকের জানালার মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইয়া ঘরের কোণে স্থির একটি আলমারি ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু তাহার পাশেই একখানা পালঙ্ক থাকায় তাহার সহিত আলমারির নিম্নাংশ আটকাইয়া যাওয়াতে আলমারি উত্তোলন করিবার চেষ্টা বিফল হইতেছে। হাত দুইখানি পোড়া কাঠের ন্যায় এবং খুব সরু। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া ইষ্ট দেবতার নাম স্মরণ পূর্ব্বক সাহসে ভর করিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই হাত দুইখানি লক্ষ্য করিয়া সজোরে তরবারির আঘাত করিলেন। কিন্তু ব্যস্ততাবশতঃ অথবা ভয়ে তাঁহার তরবারির চোট পালঙ্কের উপরিভাগের মশারির ফ্রেমে লাগিয়া তাহাতে দুইখণ্ড করিয়া ফেলিল। হাতে কোন চোট লাগিল না। অমনি সেই মুহূর্ত্তেই হাত দুইখানি রবারের মত নোয়াইয়া কে যেন বাহির করিয়া লইল। বাহির হইতে ঐ আলমারি স্পর্শ করিতে হইলে পনর হাত একখানা বংশ দণ্ড চাই। ইহাতেই সেই হাতের দৈর্ঘ্য বুঝিয়া লউন। এই ঘটনার পরেই কিছু সময় খুব উৎপাত আরম্ভ হইল। আবার শশীবাবু স্বমূর্ত্তি ধারণ করিলেই সব চুপ চাপ হইয়া গেল। এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা সকল প্রায় প্রত্যহই সংঘটিত হয়। কিন্তু প্রতিদিন

দেখিয়া বাড়ীর মেয়েদেরও এক রকম গা-সহা হইয়া গিয়াছিল। নতুবা উপরের বর্ণিত ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলে, আমি খুব সাহস করিয়া বলিতে পারি, পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই মূর্চ্ছা যাইবেন। বাটীর সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ভূত কেবল শশীবাবুকে ভয় করে, আর কাহাকেও গ্রাহ্য করে না। উৎপাতের সময় শশীবাবু এবং বাটীস্থ সকলেই অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া ভূতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কি উপায় করিলে তাহার মুক্তি হইতে পারে, এবং এরূপ ভাবে নির্দ্দোষী একটী পরিবারের উপর অত্যাচারই বা করে কেন? কিন্তু উত্তরে কিছুই পাওয়া যাইত না। একদিন হঠাৎ যেন কোন গহ্বর হইতে শব্দ হইল, "জেঠাই মা, আমার উদ্ধারের কোন উপায় কর। আমি মৃত্যু সময়ে পুষ্করা পাইয়াছিলাম। তাহাকেই তখন জিজ্ঞাসা করিতেই জানিতে পারা গেল যে, সে সতীশবাবুর পূর্ব্বকথিত বন্ধু সেই বৈদ্য বটু। এতদিন সে এই কথা কেন বলে নাই এবং বন্ধুর উপর এত অত্যাচার এবং অনিষ্টই বা কেন করিল, তাহার উত্তরে সে শুধু বলিল, সতীশবাবুর পারিবারিক সুখশান্তি তাহার সহ্য হইত না। আরও প্রশ্ন করা হইল, কিন্তু আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না। পরদিনই একটি লোককে পিণ্ডদানের জন্য গয়ায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পিণ্ডও যথারীতি প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু যে উৎপাত সেই উৎপাতই রহিয়া গেল। পরে উক্ত বৈদ্যের শ্বশুর-বাড়ী সালিখা হইতে তাহার স্ত্রীকে আনাইয়া যথাবিধি শ্রাদ্ধাদি করান হইল, তাহাতেও কোন ফল হইল না। দ্বিতীয় বার সতীশবাবুর কোন পরিচিত গয়ালী পাণ্ডার নিকট পুনঃ পিণ্ডপ্রদানের জন্য টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইল। গয়ালী পিণ্ডাদি দান করিয়া সতীশ বাবুকে পত্র লিখিল। সে বারেও কোন ফল পাওয়া গেল না। অত্যাচার পূর্ব্ববৎই চলিতে লাগিল। তবে এখন মধ্যে মধ্যে ভূতের দুই চারিটি

কথা শুনিতে পাওয়া যাইত। তাহার মুক্তির উপায়-সম্বন্ধে তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, "পুষ্কর-শান্তি কর এবং সেই দিনই গয়ায় পিণ্ড দাও, তবেই হইবে। অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছি" ইত্যাদি। পরে বাঁকুড়া হইতে একটি নিষ্ঠাবান্ ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণকে আনাইয়া পুষ্কর-শান্তির ব্যবস্থা করা হইল। শনি মঙ্গলবারে রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় শ্মশানে হোম দ্বারা উক্ত ক্রিয়া করিতে হয়। ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল। তিনি স্বহস্তে পাক করিতে লাগিলেন। ভাত হইয়া গিয়াছে। তিনি তরকারি চড়াইয়া ভাতের মাড় গড়াইবার জন্য হাঁড়িটি উবুড় করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন, এমন সময় হাঁড়িটী গড়াইতে গড়াইতে নোংরা একটি স্থানে গিয়া পতিত হইল। ব্রাহ্মণের ত দেখিয়া চক্ষু স্থির। তিনি বলিলেন, অনেক স্থলে পুষ্করশান্তি করিয়াছি, কিন্তু এমত ঘটনা দেখি নাই! তিনি ত আর পাক করিয়া খাইতে রাজি নহেন। সতীশবাবু এবং শশীবাবু উভয়ে অনেক পীড়াপীড়ি করাতে আবার নূতন হাঁড়িতে রাঁধিয়া লইলেন। শশীবাবু এবারে পাহারায় রহিলেন। আর কোন উপদ্রব হইল না। ব্রাহ্মণ ঠাকুর আহারান্তে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "এই হোম তিনি নিশীথে করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহা হইলে কি জানি বেটা মারিয়াই ফেলিবে।" যে ঘটনা পরে ঘটিয়াছিল, তাহাতে ঐরূপ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য ছিল না। একজন নিজের লোককে সবিশেষ উপদেশ দিয়া গয়ায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল। পুষ্কর-শান্তির জন্য দ্রব্যাদি আহরিত হইল। দিবা দুই প্রহরে উক্ত হোম করিবার সময় নিরূপিত হইল। শ্মশানে ছাপ্পর বাঁধা হইল। দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত করা হইল। কারণ, পুরোহিত বলিলেন, হোম করিতে বসিয়া তিনি আর আসন ত্যাগ করিতে পারিবেন না। যে জিনিষ যখন চাই তাহাই সম্মুখে তখনই

দেওয়া চাই, নতুবা সমুদয়ই পণ্ড হইবে। সমস্তই কথামত অনুষ্ঠিত হইল। ব্রাহ্মণ গিয়া কার্য্যে ব্রতী হইবেন, এমন সময় হোম গৃহের চালা উড়িয়া গেল। সে সময়ে বাতাসের চিহ্নমাত্র ছিল না। তখন চালা পুনঃ প্রস্তুত হইল। শশীবাবু মোতায়েন রহিলেন। কার্য্য আরম্ভ হইল। কার্য্যোপযোগী পূজাদি সমাপনান্তে একটি কৃষ্ণবর্ণ ছাগ বলি প্রদত্ত হইল। পরে ব্রাহ্মণ যখন হোমে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন, নির্ব্বাত অবস্থায়ও হোমশিখা যেন তাঁহাকে ঝলসিয়া দিতে লাগিল। কিন্তু উপায় নাই, আসন ছাড়িলেই মহা বিপদ। এই অবস্থায় দুই ঘণ্টা কাটাইয়া ব্রাহ্মণ সকলকে তথা হইতে সরিয়া যাইতে বলিলেন। পরে তিনি ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, হোম মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া পুষ্করাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ছায়া-শরীর আনয়ন পূর্ব্বক তাহাকে হোমশিখায় ক্রমে ক্ষয় করিয়া দেওয়া হয়। যখন আর অবশিষ্ট কিছুই থাকে না, তখনই তাহার উদ্ধার-সাধন হয়, পুষ্কর-শান্তি হয়। ঐ ছায়া-শরীর কেহ দেখিলে ভয় পাইতে পারে। এইরূপে এখানকার কার্য্য সমাধা হইল। যে ব্যক্তি গয়ায় পিণ্ডদান করিতে গিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া বলিলেন যে, যে দিন পিণ্ডদান করিবার জন্য তিনি বহির্গত হইতেছিলেন, তাঁহার সম্মুখে একখানি ইষ্টক পতিত হইল। তিনি কিছু ভীত হইলেন বটে, কিন্তু গমনে বিরত হইলেন না। পিণ্ড যথাবিধানে দেওয়া হইলে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পুষ্কর-শান্তি এবং তৃতীয় বার গয়ায় পিণ্ডদানের পর হইতে সতীশবাবুর বাড়ী উপদ্রবশূন্য হইল। তদবধি আর কোন বিপত্তি শুনা যায় নাই। শশীবাবুও স্বগৃহে চলিয়া আসিলেন। এই ঘটনায় শশীবাবু যেরূপ কৃতিত্ব এবং সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই অনুকরণ-যোগ্য। প্রকৃত ঘটনা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই এখানে পাঠকগণকে উপহার দিলাম। ইহার মধ্যে আমার

নিজের কথা কিছুই নাই। তবে যদি বর্ণনার দোষে কোনরূপ অসামঞ্জস্য হইয়া থাকে, সে দোষ সম্পূর্ণ আমার।

শ্রীগণপতি রায়।

স্বপ্ন তত্ত্ব।

পঞ্চম অধ্যায়।

আমি—কি?

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রকৃত "আমি" যে কি পদার্থ, এ বিষয়ে অনেক মত থাকিলেও, মানবের যে "আমি" জ্ঞান আছে, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। *

সেই "আমি" প্রত্যয়টি কি? ইহা কি কাল? না, ইহা সাদা? ইহা কি মাংস, অস্থি, মজ্জা, রক্ত, স্নায়ু বা মস্তিষ্ক? ইহা কি পর্ব্বত, নদী, চন্দ্র, সূর্য্য বা আকাশ? কি ইহা? ইহা কি উত্তাপ, না আলোক বা অপর কিছু অদৃশ্য শক্তি? ইহা কি আমাদিগের কোষাণুসমষ্টীভূত এই দেহ বা এই দেহান্তর্গত কোন একটী কোষাণু বিশিষ্ট সম্পত্তি? যেমন তণ্ডুলে জল মিশ্রিত করিয়া রাখিলে সময়ে তাহার মধ্যে একটা মাদকতা-শক্তি উদ্ভূত হয়, সেইরূপ কি "আমি" প্রত্যয়টী এই দেহ হইতেই

---

* নহি কশ্চিৎ সংদিগ্ধে অহং বা নাহং বেতি।—ভামতি, ২য় পৃঃ।
Bib-Ind.

উদ্ভূত হইয়াছে? অথবা যকৃৎ হইতে যেইরূপে পিত্ত ক্ষরিত হয়, আমাদিগের মস্তিষ্ক হইতেই এই অভিনব "আমি" জ্ঞান ফুটিয়া উঠে? *

কোথায় এই আমি জ্ঞান সন্নিবেশিত আছে? কে ইহার মীমাংসা করিবে?

এইরূপে শত শত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রশ্ন করিয়া আসিতেছেন এবং একটা না একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই সমস্ত মীমাংসার কোন্‌টি গ্রহণীয়? তাহাদিগের কোন একটী গ্রহণের পূর্ব্বে একটী জিনিষ স্মরণে রাখা চাই। সেটী এই,—কতকগুলি পরিণামী ও ক্ষর পদার্থের মধ্যে থাকিয়াও যাহা অপরিণামী ও অক্ষর তাহা নিশ্চিতই ঐ সমস্ত ক্ষর পদার্থ হইতে বিভিন্ন। †

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, আমাদিগের "আমি"-জ্ঞান অক্ষয়, ইহা নিত্য। আমি এক সময়ে স্বয়ং শিশু ছিলাম, পিতার হস্ত ধরিয়া নৃত্য করিতাম, ক্রীড়া করিতাম, সেই আমার অঙ্কে এখন আমার পুত্র ক্রীড়া করিতেছে। আমার এই দেহের কোন অংশ কি শৈশব হইতে অদ্যপর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত আছে? আমার শৈশব দেহের কোনও অংশ কি প্রৌঢ় আমি, আমার দেহে অবশিষ্ট আছে? বিজ্ঞান বলিবেন, কিছুই নাই। কিন্তু "আমি" এই বোধের পরিবর্ত্তন হয় নাই। উহা ঠিক আছে। আমার নিজের বিষয়ে কিছু বলিতে হইলে, যেমন পূর্ব্বে বলিতাম "আমি," এখনও তাহাই বলিতেছি। যে সমস্ত বিষয় বা অবস্থার সহিত আমার আমির সম্বন্ধযুক্ত করিয়া আসিতেছি তাহাদিগের পরিবর্ত্তন হইতেছে। আমি সুখী বা আমি দুঃখী, আমি ধনী বা আমি ভিখারী, আমি সুস্থ বা রোগাক্রান্ত,

* "Thought is only the product of the brain, as bile is the product of the liver.—CARL VOGT.

† আবর্ত্তমানেষু যদনুবর্ত্ততে তত্তেভ্যো ভিন্নং।—শ্রুতি।

আমি বালক বা আমি বৃদ্ধ, এই সমস্ত অস্থায়ী বা আনুষঙ্গিক গুণ (accidents or incidents); এইগুলি আমিরূপ অবিচ্ছেদের এক একটী ভাব মাত্র। তাহাদিগের ধর্ম্মই পরিণাম, তাহাদিগের ধর্ম্মই পরিবর্ত্তন। তাহারা সমস্তই "আমি"-রূপ নিয়ত প্রবাহিত স্রোতের এক একটী ঊর্ম্মি, উঠিতেছে, আবার স্রোতে তাহা অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। কিন্তু স্রোত নিজে সমভাবে প্রবাহিত হইতেছে। একজন রুদ্ধদ্বার অন্ধকার গৃহমধ্যে বসিয়া আছেন; তাঁহাকে বাহির হইতে আহ্বান কর,—"ভিতরে কে আছ!" তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিবেন, "আমি"। প্রথমে তিনি বলিবেন 'আমি', তাহার পর বলিবেন, "আমি রামচন্দ্র।" প্রথমে "আমি" এই উত্তর স্বতঃই স্ফুরিত হইবে, তাহার পর তাঁহার নাম বা বিশেষ যে পরিচয়, "আমি রামচন্দ্র" তাহা অনুচিন্তার ফলে, গৌণ ভাবে, পরে আসিবে। পূর্ব্বে যে আমরা "অধিদৈব" কথার আলোচনা করিয়া আসিয়াছি, সেই অক্ষর ভাবটী প্রথমে ফুটিয়া উঠে, পরে তাঁহার ক্ষর ভাবটী জাগে। গৃহ, দেশ, পৃথিবী, সৌরজগৎ ইত্যাদি যাহার মধ্যে "আমি" বর্ত্তমান আছি, এবং আমার সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত করি, তাহারা সকলেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহাদিগের মধ্যে থাকিয়াও কেবল আমার "আমি"-প্রত্যয়টী সমান ভাবে থাকে। আমার "আমি"-প্রত্যয়ের জন্ম কবে, তাহার শেষই বা কোথা, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তাই পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন, অনন্ত মাস, বৎসর, যুগ, কল্প অতীত হইয়াছে, আবার ভবিষ্যতে তাহারা আসিবে। ইহাদিগের আদি আছে, সকলেরই অন্ত হয়, কেবল এক সম্বিতের আরম্ভ বা অন্ত নাই।" *

---

* মাসাব্দযুগকল্পেষু গতা গম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা॥ পঞ্চদশী ১—৭

দেবী ভাগবতে এই কথা বেশ সুন্দরভাবে আছে। "দৃশ্য বস্তু মাত্রেরই যেমন ব্যভিচার দেখা যায়, সংবিতের সেরূপ ব্যভিচার কদাচ কেহ অনুভব করিতে পারে না। অতএব সংবিৎ যে নিত্য, তাহা আপনা হইতে সিদ্ধ হইল। কিন্তু, যদ্যপি সম্বিতেরও ব্যভিচার অনুভবসিদ্ধ বল, তবে সেই ব্যভিচার অনুভব করে কে? অবশ্যই চৈতন্যময় সাক্ষীই অনুভব করেন; অতএব সেই চৈতন্যময় সাক্ষী নিত্য হইলেন এবং তিনিই সংবিৎ।" *

অতএব দেখিলাম আমার "আমি" প্রত্যয়ের ব্যভিচার নাই, দৃশ্য পদার্থের,—দেহ, গৃহ, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, জগৎ সকলেরই ব্যভিচার আছে। অতএব "আমি" প্রত্যয়টি এই সমস্ত পরিণামী পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র, ইহা এই সমস্ত পরিণামী পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না।

তবে "আমি" কি? আমি পূর্ব্বভাগে দেখাইয়াছি এই "আমি"-প্রত্যয়টি কি? ইহা কোথা হইতে আসিয়াছে, ব্রহ্মভূতের সে প্রত্যয়টি কিরূপ, জীবাত্মার 'অহং' প্রত্যয় কিরূপ, আর দেহাভিমানী 'অহং' প্রত্যয় কিরূপ। আমরা এইবার আত্মা ও জীবতত্ত্ব আরও একটু বিশদ করিতে চেষ্টা করিব। আত্মা কি? প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন,—"এই যে চিন্ময় অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ, প্রাণসমূহের মধ্যে হৃদয়ে বিরাজিত আছেন, তিনিই আত্মা।" †

যেমন স্বপ্রকাশিত জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের দর্পণে পতিত প্রতিবিম্ব হইতে আলোক-ছটা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু সেই আভা যেমন সূর্য্যও

---

* সংবিদো ব্যভিচারস্তু সানুভূতোঽস্তি কর্হিচিৎ॥
যদি তস্যাপ্যনুভবস্তর্হ্যয়ং যেন সাক্ষিণা।
অনুভূতঃ স এবাত্র শিষ্টঃ সংবিদ্বপুঃ স্বয়ম্॥ ৭—৩২-১৫, ১৬

† কতম আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি অন্তর্জ্যোতি পুরুষঃ।
বৃহদারণ্যক

নয়, বা সূর্য্যের প্রতিবিম্বও নয়, সেইরূপ হৃদয়ে নিহিত আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয়; সেই প্রতিবিম্বই জীব। * সুষুপ্তি অবস্থায় প্রত্যহ এই জীব ব্রহ্মে লয় পায়, প্রতিবিম্ব বিম্বে মিলিয়া যায়, আবার জাগ্রৎ অবস্থায় সেখান হইতে ফিরিয়া আসে। † শ্বেত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে রূপকের ভাষায় ব্রহ্ম ও জীব সম্বন্ধে অতি সুন্দর উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। জন্মরহিত (নিত্য) একটী (জীবাত্মা,) তদ্রূপ নিত্য লোহিত শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ। (সত্ব রজঃ এবং তমোরূপা) এবং নিজের সমান বর্ণ বিশিষ্ট (ত্রিগুণাত্মক) প্রজাসৃষ্টিকারিণী অপর একটিকে (ত্রিগুণাত্মকা নানারূপ বিশিষ্টা প্রকৃতিকে) ভোগ করিয়া তাহাতে সংযুক্ত হইয়া আছেন, নিত্য অপর একটী (ঈশ্বর) ভোগদায়িকা প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করেন।

সখ্যভাবে স্থিত পক্ষী দুইটী একত্র সংযুক্ত হইয়া একটী বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া আছেন। তন্মধ্যে জীবরূপী পক্ষী ঐ বৃক্ষের ফলকে স্বাদু বোধে আস্বাদন করেন, অপরটী (ঈশ্বররূপী পক্ষী) ফলভক্ষণ না করিয়া কেবল দ্রষ্টৃরূপে অবস্থিতি করেন।

"একাই বৃক্ষে জীবরূপী পক্ষী অবস্থান করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়েন, এবং সামর্থ্যাভাবে আপনাকে তাহা হইতে মুক্ত করিতে না পারিয়া শোক করিতে থাকেন। পরে যখন তিনি অন্য ঈশ্বররূপী পক্ষীকে ভজন

* অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।১৮

† য এষোহন্তর্হৃদয়ে আকাশতস্মিন্ শেতে।—বৃহদারণ্যক, ২।১।১৭

সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি।—ছান্দোগ্য, ৬।৮।১

সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহঃ গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং। ঐ ৮।৩।২

করিয়া তাঁহার মহিমা অবগত হয়েন, তখন তিনি (তৎপ্রভাবে) শোক হইতে বিমুক্ত হয়েন।" *

এই দুইটীর মধ্যে যিনি অনীশ, যিনি সুস্বাদু ফলভোগ করেন, যিনি শোক করেন, তিনিই জীব; যিনি ঈশ, যিনি কেবলই দ্রষ্টা, সাক্ষীস্বরূপ তিনিই আত্মা। তাঁহাদিগের "এক জন অজ্ঞ; একজন প্রাজ্ঞ; একজন অনীশ, একজন ঈশ।"

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ ঈশানীশে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বুদ্ধিতে যে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব তাহাই জীব। এই জীবরূপী প্রতিবিম্বের আবার মনোময় প্রাণময় ও অন্নময় কোষে পর পর প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্ব পড়িতে থাকে। প্রত্যেক প্রতিবিম্বই আমাদিগের নিকট "আত্মারূপে" প্রতিফলিত। †

---

* অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাঃ সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্ত ভোগামজোঽন্যঃ। ৪ অঃ ৫।
দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে
তয়োরন্যঃ-পিপ্পলং স্বদ্বত্ত্য।
নশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥ ঐ, ৬।
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-
হনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য
মহিমানমিতি বীতশোকঃ। ঐ, ৭

† Suppose, for instances we compare the *Logos* itself to the Sun. Suppose I take a clear mirror in my hand, catch a reflection of the Sun, make the ray, reflect from the surface of the mirror—say upon a polished metallic plate—and make the rays whichare reflect-

হয় সাধারণতঃ স্থূল দেহে প্রতিফলিত যে চিদাভাস হয় তাহাই আমাদিগের নিকট "আত্মা" বলিয়া মনে হয়; সেইরূপ কামকে, সেইরূপ মনকে "আত্মা" বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, ইহা প্রকৃত "আত্মা" নহে, ইহা চিদাভাস, ইহাই আমাদিগের পূর্ব্বালোচিত "অধিভূত," "ভূতাত্মা" personality আর বুদ্ধিতে প্রথম যে প্রতিবিম্ব হয়, তাহার নাম চিন্মাত্র বা অবিদৈবত পুরুষ বা Individuality; তাহার পর যাহাকে আমরা সূর্য্যের সহিত তুলনা করিয়াছি, তিনিই আমাদিগের পূর্ব্বোল্লিখিত অধিযজ্ঞ বা প্রত্যাগাত্মা।

এখন আমাদিগের "আমি" কি বুঝিলাম। যিনি প্রকৃত পুরুষ বা আত্মা তিনি স্বভাবতঃ গুণাতীত, তিনি মুক্ত এবং প্রকৃতি গুণময়ী। এই গুণময়ী প্রকৃতি তাঁহার সহিত দৃশ্যরূপ সম্বন্ধে নিয়ত অবস্থিত। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যিনি গুণাতীত,—গুণসম্বন্ধরহিত, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে কিরূপে গুণ সকল দৃশ্যরূপ সম্বন্ধেই বা অবস্থিত হইতে পারে? তৎসম্বন্ধে পঞ্চশিখাচার্য্য এইরূপ সূত্র করিয়াছেন, "একমেবদর্শনং খ্যাতিরেবদর্শনম্"।

ed in their turn from the plate fall upon a wall. Now are have three images, one being clearer than the other, and one being more resplendent than the other. I can compare the clear mirror to *Karana Sarira*, the metallic plate to the astral body, and the wall to the physical body. In each case a definite *bimbam* is formed, and that *bimbam* or reflected image is for the time being considered as the self. The *bimbam* formed on the astral body gives rise to the idea of self in it when considered apart from the physical body; the *bimbam* formed in the *Karana sarira* gives rise to the most prominent form of individuality that man possesses. You will further see that these various *bimbams* are not of the same lustre.

চুম্বক যেমন লৌহের সন্নিধানে মাত্র থাকিলেই লৌহ চুম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুরুষ গুণবর্গ হইতে পৃথক থাকিয়াও গুণবর্গে স্বীয় চৈতন্যশক্তি অনুপ্রবিষ্ট করেন। এই গুণে অনুপ্রবিষ্ট চৈতন্য শক্তিকে গুণস্থ পুরুষ প্রতিবিম্ব বলিয়া যোগসূত্রে বর্ণিত আছে এবং ইহাই আমাদিগের দ্বিতীয় পুরুষ বা চিন্মাত্র বা Individuality তাহা আমরা পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত করিয়া আসিয়াছি। এই যে পুরুষ প্রতিবিম্ব ইহাতে কতকটা প্রকৃত পুরুষের ভাব, কতকটা গুণময়ী প্রকৃতির ভাব আছে। সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দর্পণে পতিত হইলে, তাহাকে যদ্যপি বারুদের স্তূপে নিক্ষিপ্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহা অগ্নি উৎপাদন করিতে পারে। এই যে অগ্নি উৎপাদনের ক্ষমতা ইহা দর্পণে ছিল না, ইহা সেই সূর্য্যেরই শক্তি। সেইরূপ পুরুষ প্রতিবিম্ব পুরুষেরই স্বভাব প্রাপ্ত হয়। কিন্তু আবার দেখা যায় যে, দর্পণকে পরিচালিত করিলে প্রতিবিম্বও তৎসহ পরিচালিত হয়; দর্পণ অপরিষ্কার হইলে সূর্য্য-প্রতিবিম্বও মলিনতা প্রাপ্ত হয়, তাহার শক্তির হ্রাস হয়। অতএব দেখা যাইতেছে দর্পণ ও প্রতিবিম্ব বিভিন্ন পদার্থ হইলেও উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ধর্ম্মসাদৃশ্য আছে। সেইরূপ গুণের যে সমস্ত পরিণাম হয়, তৎসমস্তেরই প্রতিজ্ঞান ঐ প্রতিবিম্ব পুরুষের হয়। তাই যোগসূত্রে পুরুষকে বুদ্ধির "প্রতিসংবেদী" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। * অতএব এই প্রতিবিম্ব পুরুষও স্বরূপতঃ নির্গুণ হইলেও গুণ সঙ্গে গুণীর ন্যায়ই প্রতিভাত হন এবং গুণময়ী প্রকৃতিও তাঁহার প্রতিবিম্ব ধারণ করায় তাহা চৈতন্য-সমন্বিত বলিয়া মনে হয়। ইহার যে কি ফল, তাহা আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। আমরা সেখানে বলিয়াছি যে, প্রত্যেক প্রতিবিম্বই আমাদিগের নিকট "আত্মা" রূপে প্রতিফলিত হয়।

---

* সপুরুষো বুদ্ধেঃ প্রতি সংবেদী।—যোগসূত্র, সাধনপাদ ২০শ সূত্র ব্যাসভাষ্য।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি যে, আমাদিগের এই "আমি" ভাবটাই আমাদিগকে অমর করিয়াছে। তাহা কিরূপে হয়? আমাদিগের সকল কার্য্য ও সকল বৃত্তি একটী সূত্রের দ্বারা গ্রথিত হয়; এই সূত্রেই আমাদিগের "আমি" এই সত্যটী বাহ্য উপায়ে তন্দ্রাভিভূত লোকের কার্য্য কলাপ আলোচনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। একজনকে তন্দ্রাভিভূত করিয়া, তাহাকে এক সময়ে একটা ভাব দেওয়া হইল, তাহার পর আবার অপর সময়ে তন্দ্রাভিভূত করিয়া অপর একটা ভাব দেওয়া হইল। এই রূপে নানা সময়ে নানা ভাব দিয়া, তাহাকে তন্দ্রাভিভূত করিয়া, যগুপি জিজ্ঞাসা করা যায়, "তুমি কে?" সে বলিবে, "আমি অমুক, এবং আমি অমুক অমুক কার্য্য করিয়াছি।" তন্দ্রাবস্থায় নানা সময়ে তাহাকে যে সমস্ত ভাব দেওয়া হইয়াছে, সে সেই সমস্ত যোজনা করিয়া বলিবে যে, সে এই সমস্ত কার্য্য করিয়াছে বা তাহার সেই সেই ভাব হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, "আমি"-রূপ সূত্রে যে তন্দ্রাবস্থায় ভাবগুলি গ্রথিত করিয়াছে। এইরূপে নানা অবস্থার "আমি" উদ্ভূত হয়।

স্বপ্নতত্ত্ব বুঝিতে হইলে এই "আমি"র আর একটি বিশেষত্ব জানা আবশ্যক। স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় আমাদিগের যে সকল কার্য্য ও বৃত্তি, "আমি"-সূত্র গ্রথিত করে, জাগ্রৎ অবস্থায় সেই সমস্ত সাধারণতঃ স্মরণে আসে না। সুষুপ্তি অবস্থায় ত কিছুই আসে না, তবে স্বপ্নাবস্থার কথাও আনুক্রমিক বা পর্য্যায়ক্রমে জাগ্রৎ অবস্থায় প্রকাশ পায় না। দুই একটা যাহা আসে তাহা আমরা পরে আলোচনা করিব। কিন্তু ঐ সমস্ত অবস্থায় আমাদিগের "আমি" যে নিশ্চিন্ত বা আত্মহারা থাকে তাহা নহে। যোগ-সূত্রের ব্যাস ভাষ্যে এই বিষয়ের আলোচনা আছে। নৈয়ায়িক প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ নিদ্রাকে চিত্তের একটী বৃত্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন সকল জ্ঞানের অভাবই নিদ্রা কালে হয়; কারণ উক্ত কালে

কোনও জ্ঞানেরই কারণ থাকে না, তখন কি বহিরিন্দ্রিয়, কি অন্তরিন্দ্রিয় কাহারও ব্যাপার থাকে না, সুতরাং কিরূপে জ্ঞান জন্মিবে। পাতঞ্জলের মতে কিন্তু নিদ্রা একটী বৃত্তি বিশেষ, কারণ জাগ্রৎ অবস্থায় উহার স্মরণ হয়। আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন নির্ম্মল হইয়া স্বচ্ছবৃত্তি উৎপন্ন করিতেছে, বা আমি দুঃখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্ম্মণ্য হইয়া অধীর ভাবে ভ্রমণ করিতেছে, অথবা আমি অতিমাত্র মূঢ়ভাবে নিদ্রিত ছিলাম, আমার শরীরে ভারবোধ হইতেছে, চিত্ত শ্রান্ত হইয়া অলস হইয়াছে ইত্যাদি রূপ যে অনুভব হয়, তাহার কারণ নিদ্রাও আমাদিগের প্রত্যয় বিশেষ। অতএব আমরা দেখিতেছি সম্পূর্ণরূপে স্মরণে না থাকিলেও সেই সমস্ত অবস্থায় আমাদিগের "আমি" জ্ঞান অটুট থাকে। সাধনার দ্বারায় আবার এই তিন অবস্থায় "আমি" ভাবকে তৈলধারাবৎ বিচ্ছেদশূন্য করা যায়। এই বিচ্ছেদশূন্য ভাব সাধকের, সাধারণের কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় স্বপ্ন-চৈতন্যের সব কথা স্মরণ থাকে না, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় সুষুপ্তির কথাও স্মরণে আসে না ; কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় জাগ্রৎ ও স্বপ্নের কথা স্মরণ থাকে, স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎ অবস্থার বিষয় স্মৃতিবহির্ভূত হয় না। বাহ্য উপায়ে তন্দ্রাভিভূত hypnotised করিলেও তাহাই হয়।*

(ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

---

* The hypnotised person on waking know nothing, save rarely, of what happened in the hypnotiex trance ; but when he is all up his memory embraces all the facts of his sleep, of his waking state, and of previous hypnotic sleep.—Binet and Firi.

Schelling, the German philosopher, relates a case he observed, in which a clairnoyante began to cry, and said

ভূতাবেশ।

আমার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী আত্মিক কাহিনী সম্বন্ধে ঢাকা হইতে যে পত্র লিখিয়াছিল, নিম্নে তাহারই অবিকল প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

প্রিয় দাদা মহাশয়,

* * * বাসাতে একটী বউএর ফিট হইত। আমি তাহাকে যে ভাবে আরোগ্য করিয়াছি, নিম্নে তাহাই লিখিতেছি।

২১শে অক্টোবরই উহার প্রথম ফিট দেখি। আরও বহু পূর্ব্ব হইতেই উহার ফিট হইত; কিন্তু অদ্য পর্য্যন্ত ডাক্তারী ও কবিরাজী ঔষধ ভিন্ন অন্য কোনও দৈব ঔষধ ব্যবহার করান হয় নাই, অথবা কোনও ওঝা দ্বারাও চেষ্টা করিয়া দেখা হয় নাই যে, ইহা কি? প্রেতাবেশ কি না, পরীক্ষা করিবার জন্য, আমার ঔষধটি হাতে দিলাম; কিন্তু উহা নির্ব্বিঘ্নে হাতেই রহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ যাতনা দেওয়ারও চেষ্টা

---

that the death of a member of the family had taken place at a distance of 150 leagues. She added that the letter announcing the death was on its way. On awaking, she remembered nothing and was quite bright and cheerful, but when again hypnotised she again wept over the death. A week later, Schelling found her crying, with a letter beside her on the table, announcing the death, and on asking whether she had previously heard of her illness, she answered that she had heard no such news of him, and that the intelligence was quite unexpected.—Abstracted from "Isis Revelata" Vol I. page 89, 92.

করিলাম। রোগিণী ইহাতে একটুকুও যাতনা অনুভব করিলেন না। সুতরাং সে দিন কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না যে. ইহার কি ব্যাধি।

একটি ঔষধ বলয়ের মত করিয়া হাতে বাঁধিয়া রাখিতে বলিয়া সেদিনকার মত চলিয়া আসিলাম। রাত্রি আট ঘটিকার সময় রোগিণীর স্বামী * * * * উহা বাম হাতে পড়াইয়া দিলেন। যেইমাত্র উহা পড়ান হইল, তখনই ফিট হইতে আরম্ভ হইল এবং প্রায় রাত্রি ১২টার সময় রোগিণী উহা কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

পরদিন প্রাতে ৮টার সময় রোগিণীর কাছে গেলাম। সেই সময়েই উহার আবার ফিট হইল। কিন্তু ১০।১৫ মিনিটের ভিতরেই ২।৩ বার। উহার একটা বিশেষ লক্ষণ এই ছিল যে, রোগিণী দুই হাত জোর করিয়া প্রণাম করিতে পারিলেই ফিট ছাড়িয়া যাইত। যদি জোর করিয়া উহা করিতে দেওয়া না হইত, তাহা হইলে খুব রাগ হইত এবং প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া নিরস্ত রহিত। আমি ঐ অবস্থায় তাহাকে আবদ্ধ করিয়া নানাপ্রকার যাতনা দিতে আরম্ভ করি। অনেকক্ষণ পরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। তখন প্রশ্ন করিলাম :—

প্রঃ। বল তুই কে?

উঃ। তোকে কেন বলব?

প্রঃ। ব'লতেই হবে।

উঃ। না, বলব না আমার ইচ্ছা, তুই কি করবি।

প্রঃ। যাতনা দিব।

উঃ। দে তুই যাতনা! (কতক্ষণ যাতনা দেওয়ার পর) আমি ভগবতীর মা।

প্রঃ। তবে এখানে কেন?

উঃ। আমাকে পূজা দেওয়ার কথা ছিল, এখন বলে যে, বাড়ী যেয়ে দিব।

প্রঃ। এই রোগিণী কি পূজা দিলেই আরোগ্য হবেন ?

উঃ। হাঁ তাই হবে।

প্রঃ। মা হ'য়ে সন্তানকে এত কষ্ট দাও কেন ?

উঃ। আমাকে পূজা দেয় না কেন, একটা পাঁঠা বৈ ত নয় ?

প্রঃ। তুমি যদি ভগবতীই হয়ে থাক, তা হ'লে এ সামান্য যাতনায় এত অস্থির হও কেন ?

উঃ। ওর (আবিষ্টার) কষ্ট হয় বলে।

প্রঃ। তবে তুমি যাও !

উঃ। না, যাব না।

প্রঃ। কেন ?

উঃ। আমার ইচ্ছা।

প্রঃ। আমি তোমাকে আবদ্ধ করে রাখ্‌লুম তুমি যাও দেখি !

উঃ। যেতে পারি কিন্তু যাব না।

প্রঃ। বল্‌তে পার * * কোথায় আছেন ? (মৃত ব্যক্তি)

উঃ। বৈকুণ্ঠে।

প্রঃ। * * * অসুখ আরাম হবে ?

উঃ। হ'লে হ'তে পারে।

প্রঃ। তুমি আরাম করে দাও না কেন ?

উঃ। আমি দিব না !

প্রঃ। কি হ'লে আরাম হবে ?

উঃ। বৈদ্যনাথ কি তারকেশ্বর গেলে।

* * * বাবুর মা আরাম হবেন ?

উঃ। হ'লে হ'তে পারে।

প্রঃ। ঠিক করে বল ?

উঃ। তাঁর আর বাঁচবার প্রয়োজন কি? তাঁর ছেলেরা সব উপযুক্ত, তার মরলেও তত দোষ নাই!

পরে অনেকেই অনেক প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিল। আর আমিও তাহাকে মুক্ত না করিয়াই চলিয়া আসিলাম। রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় যাইয়া দেখি, সেই অবস্থায়ই পড়িয়া আছেন। যেইমাত্র তাঁহার বন্ধন ছাড়িয়া দিলাম, আবিষ্টা তখনই জ্ঞান লাভ করিলেন। দুই তিন দিবস পরে পূজা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পূজা দেওয়ার পর আজ পর্য্যন্তও রোগের কিম্বা প্রেতাবেশের কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই।

* * * * *

স্নেহার্থী—
শ্রীসতীশচন্দ্র গাঙ্গুলী,
নারিন্দিয়া, ঢাকা।

আত্মার কথামত দু'জনেরই মৃত্যু হইয়াছে। যাহাকে বৈদ্যনাথ কিম্বা তারকেশ্বর পাঠাইতে বলিয়াছিলেন, তাহাকে ঢাকা হইতে বরিশালে আনা হয় এবং সেইখানেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আত্মার কথামত বৈদ্যনাথ কিম্বা তারকেশ্বর পাঠাইলে যে কি শুভ ফলিত, তাহা ভগবানই জানেন। কিন্তু তাহার কথার সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় এমন মনে হইতেছে যে, বোধ হয়, তিনি আরাম হইতেন। এই ভগবতীর মা যে কে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে কয়েক দিবস পরে অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে, ভগবতীর মা বলিয়া একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আবিষ্টাকে বাল্য-

বস্ত্রায় খুব ভাল বাসিতেন। অনুমান করি, এই ভগবতীর মাই আমাদের সেই ভগবতীর মা হইবেন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী,
চাঁদপুর, ত্রিপুরা। *

একটি প্রত্যক্ষদৃষ্ট ভৌতিক ঘটনা।

নিম্নে একটি প্রত্যক্ষদৃষ্ট ভৌতিক ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারি নাই; বস্তুতঃ ইহা আমার নিকটে আজিও প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছে।

ভূতের বিক্রম।

সে আজ অনেক দিনের কথা; সম্ভবতঃ ১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বের হইবে। আমার তখন ছাত্রাবস্থা। আমার একজন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু আসিয়া বলিলেন, "কি হে একজনদের বাড়ীতে ওঝা আস্‌বে, ভূত ঝাড়ান হবে, তুমি দেখ্‌তে যাবে।" এ সব বিষয়ে আমার খুবই উৎসাহ। আমি অমনই তদ্দণ্ডেই একটা পিরাণ গায়ে দিয়া বন্ধুবরের সহিত বাহির হইয়া

* আত্মিক তথ্য জানিবার জন্য অনেকেই শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়কে পত্র লিখিয়া থাকেন। আমাদের অনুরোধ এখন হইতে যাঁহারা তাঁহাকে পত্র লিখিবেন, তাঁহারা যেন অতিরিক্ত একখানি ষ্ট্যাম্প পত্রের সঙ্গে প্রেরণ করেন।

পড়িলাম। পথে যাইতে যাইতে বন্ধুর মুখে শুনিলাম, পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলের কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে এক ১৬৷১৭ বৎসরের বধূকে 'ভূতে পাইয়াছে', একজন খুব ভাল ওঝা আসিয়াছে। অনুমান ১০৷১২ মিনিটের মধ্যেই আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তথায় প্রায় ৩০৷৩৫ জন লোক সমবেত হইয়াছে। আমরাও তাহাদের মধ্যে একস্থলে দাঁড়াইলাম।

ওঝা ও তাহার ২ জন সাকরেদ খড়ি দিয়া ঘর কাটিতেছে এবং সেই সকল ঘরের মধ্যে সকলের দুর্ব্বোধ ভাষায় কি কতকগুলি লিখিতেছে। একটি ঘরের ভিতর হইতে খুব জোরে একজন স্ত্রীলোক চীৎকার করিতেছে।

ওঝা আদেশ করিল,—"উহাকে ঘর হইতে দালানে বাহির করিয়া আন।"

তৎক্ষণাৎ আদেশ প্রতিপালিত হইল। আমরা দেখিলাম, এক অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী যুবতীকে প্রায় ৪৷৫ জন বলবান পুরুষ ও একজন মহিলা ধরাধরি করিয়া আনিতেছে। আবিষ্টা যুবতী কর্ত্তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যুবতীকে যথেষ্ট আয়াসস্বীকার করিয়া আনা হইতেছে। যুবতী এক একবার ঝাপট দিতেছেন, আর দুই একজন করিয়া লোক ছিটকাইয়া পড়িয়া যাইতেছে। সময়ে সময়ে যুবতী হাস্যরোল তুলিতেছে। চক্ষুর্দ্বয় জবাফুলের মত রক্তবর্ণ, মুখমণ্ডল আরক্তিম, কেশপাশ আলুলায়িত; লজ্জার চিহ্নমাত্র নাই, বস্ত্রও যথারীতি শরীরে সংলগ্ন নাই। এমন অবস্থায় তাহাকে ওঝার সম্মুখে আনা হইল। ওঝাকে দেখিয়াই বধূ লাফাইতে লাগিল, দাঁত কড়মড় করিয়া বলিল, "বাড়ীতে এত লোক কেন, এ লোকটা আবার কে, সব দূর করে দাও।"

ওঝা। চুপ করে থাক্। ফের চেঁচাবি ত তোর দফা সেরে দিব।

বধূ। তোর ঘাড় ভেঙ্গে দিব।

ওঝা। বড় যে আস্পর্দ্ধা দেখ্ছি। এই বলিয়া কতকগুলি সরিষা পড়িয়া বধূর গায়ে মন্ত্রপূত করিয়া ছড়াইয়া দিল।

বধূ। (সরিষার প্রভাবে যাতনায় চীৎকার করিয়া মেজেতে বসিয়া পড়িয়া, কাঁদুনীর সুরে) তুই চলে যা।

ওঝা। তুই কে আগে বল।

বধূ। আমি বল্‌ব না।

ওঝা তখন বিড়্ বিড়্ করিয়া খানিকক্ষণ মন্ত্র পড়িল; তারপর একভাঁড় জলে ফুঁ দিয়া বধূর সম্মুখে ঐ ভাঁড় রাখিয়া দিল এবং পুনরায় কতকগুলা সরিষা-পড়া বধূর গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"দেখ দেখি ঐ জলে কি আছে?"

বধূ। আমি দেখব না।

ওঝা। বলিল, ভূত বড় বদ্‌মায়েস দেখিতেছি! বেটা নিশ্চয়ই ছোট জেতের ভূত হবে। বেটাকে অল্পে সায়েস্তা করা যাবে না। অতঃপর ওঝা একটা চাদর চাহিয়া লইল এবং বেশ করিয়া পাকাইয়া লইয়া মোটা দড়ির মত করিল। মন্ত্র বলিতে বলিতে উহা ঘুরাইয়া যেমন দুই তিন ঘা বধূর গায়ে মারিল, অমনি বধূ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ওঝা। দেখ্, ভাঁড়ের জলের দিকে চেয়ে দেখ্।

বধূ। আমি প্রাণ থাক্‌তে পারব না।

ওঝা। (তদ্দ্বারা আবার প্রহার করিয়া) দেখ বল্‌ছি।

বধূ। এই দেখ্‌ছি।

তাহার পর আবিষ্টা বধূ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ওঝা ইত্যবসরে বাড়ীর লোকদিগকে বলিল, আপনারা এই জায়গায় গঙ্গাজলের ছিটা দিন এবং ৩।৪টা ধূনুচি আনিয়া ধূনা দিন; ধূপ জ্বালুন।

ওঝার কথামত বাড়ীর লোকেরা সমস্তই করিল। ধূপ ধূনার গন্ধে বাড়ী ভরপুর হইল। তখন ওঝার আদেশে ৩।৪ জন বলিষ্ঠ লোক বধূর ঘাড় ধরিয়া তাহাকে সেই পাত্রের জল অনেক কষ্টে দেখাইল।

ওঝা। কি দেখ্‌লি?

বধূ। ও সব ঢের দেখেছি।

ওঝা। চালাকি রাখ বল্‌ছি; আমার কথার জবাব দে।

বধূ। ওঃ হোঃ হোঃ হোঃ—তোর ঘাড় ভাঙ্গব।

ওঝা। বটে! তবে এই দেখ্ (এই বলিয়া পটাপট প্রহার।)

বধূ। তাল গাছ দেখ্‌ছি।

ওঝা। গাছের উপর কে বসে আছে?

বধূ। ভুবন ডুলে।

ওঝা। আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিস্?

বধূ। ওরে বাবারে মেরে ফেল্‌লে রে।

এই সময় বোধ হইতে লাগিল, ভূতটা যেন বধূকে খুবই পীড়ন করিতেছে।

ওঝা। চেঁচালি কেন বল?

বধূ। আমি ত ছাড়্‌ব না, তুই মিছে চেষ্টা কর্‌ছিস্, যা ঘরে ফিরে যা

ওঝা। তুই ছাড়্‌বি কি না, পরে দেখা যাবে।

এই কথায় আমাদের বোধ হইল যে, ভূত আসিয়া আবার বধূর ঘাড়ে চাপিল। কারণ জল দেখিবার সময় বৌ ঠাকুরাণীর যেমন স্বাভাবিক মানুষের মত চাহনি ও ভাবভঙ্গি হইয়াছিল, এখন সে সবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

ওঝা আর কোন প্রশ্নাদি না করিয়া প্রায় ১৫ মিনিট কাল কি কতকগুলি বিড়্ বিড়্ করিয়া মন্ত্র আওড়াইল। তাহার পর ২১টা হলুদ

একটি বাঁতি চাহিয়া লইয়া উহা কাটিতে আরম্ভ করিল। এক একবার সরিষা পুড়া বধূর গায়ে ছড়াইয়া দেয় এবং আসনে বসিয়া একটা একটা করিয়া হলুদ কাটে।

ইহার ফল শীঘ্রই দেখা গেল। বধূ খুবই চীৎকার ও যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল, "আমি ছাড়ব, পাঁচ শ বার ছাড়ব, আমায় ছেড়ে দাও।"

ওঝা। তবে ছাড়।

বধূ। আগে তুমি আমায় ছাড়, বাঁধন খুলে দাও, তবে ত আমি ছাড়ব।

ওঝা। আচ্ছা যা, তোর বাঁধন খুলে দিলাম।

বধূ। হোঃ হোঃ হোঃ—আমি বেশ সুখে আছি। আমি যাব না।

তখন ওঝা দ্বিগুণউৎসাহে পূর্ব্বকথিত ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন।

এইবার আবিষ্টা বধূর কণ্ঠস্বর খুবই যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক এবং ক্ষীণ হইয়াছে। ভূত অনেকটা সায়েস্তা হইয়াছে ভাবিয়া, ওঝা এইবার তাহাকে বলিল, "ভুবন বাপধন এইবার সরে পড়।"

বধূ। যাচ্ছি।

ওঝা। এখনই যা, এক নিমিষও দেরী করিস্ নে।

বধূ। এই চল্লুম।

ওঝা। ওরে শোন্। তোকে বিশ্বাস নেই, এমন একটা কিছু তোর কাজ দেখিয়ে দিয়ে যা, যাতে উপস্থিত ভদ্রলোকেরা বিশ্বাস করেন যে, তুই গেলি।

তখন আমরা সকলে ওঝাকে বলিলাম, "ওকে বলুন এই পেয়ারা গাছের ডালটা যদি ভূত ভেঙ্গে দিয়ে যায়"

ওঝা। ওরে ভুবনো, এই পেয়ারা গাছের এই বড় মোটা ডালটা গোড়া থেকে ভেঙ্গে দিয়ে যা। খবরদার আর এ মুখো হ'স্ নি।

ভূত। (বধূর মুখ দিয়া) আমি ত ছাড়ছি। কিন্তু ম'শায় আমার কোন দোষ নেই। আমি এই তাল গাছের গোড়ায় বসে আরাম কর্তুম্ আর এই বৌটা যত ঘর ঝাঁট দেওয়া ধূলো আমার গায়ে ফেল্ত। তাই আমার রাগ হয় ও ওকে ধরি।

ওঝা। তুই ওকে বারণ কর্তে পার্তিস ত!

ভূত। (বধূর মুখ দিয়া) কে আবার বারণ করে!

ওঝা। তবে যা, এ চৌহদ্দীতে আর থাকিস্ নে। অন্য কোথাও যা।

ভূত। যে অপমান্টা কর্লেন, তাতে এ মুল্লুক ছাড়তেই হ'ল। এ পর্য্যন্ত কত ওঝা এল গেল, কেউ আমাকে পারে নি।

ওঝা। তবে যা বল্লাম তাই কর্।

বলিতে এখনও শরীর শিহরে, সেই 'জল জ্যান্তো' পেয়ারা গাছের মোটা ডালটা আমাদের সকলের চক্ষুর সম্মুখে মড়্ মড়্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তারপর একটা প্রবল বাতাসের দাপট যেন সেই সদ্যভগ্নশাখ বৃক্ষের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বধূঠাকুরাণী এতক্ষণ বসিয়াছিলেন, তিনি এখন অজ্ঞান হইয়া মেজেতে পড়িয়া গেলেন। ওঝা দর্শকদিগকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। আমরা এই বিস্ময়কর ঘটনায় অবাক হইয়া ওঝার আদেশমত চলিয়া আসিলাম।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

অলৌকিক রহস্য।

১০ম সংখ্যা] তৃতীয় বর্ষ। [বৈশাখ, ১৩১৯।

অশ্রুতপূর্ব্ব প্রতিশোধ।

নাগপুরের নিকট পুরাকালে মোপা নামক একটি নগর ছিল। তথায় ব্রজগোপাল নামক একজন সুপণ্ডিত বাস করিতেন। এই নগর তৎকালে বর্দ্ধরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। রাজসকাশে ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্যের ও সৎ চরিত্রের জন্য বিশেষ সুনাম ছিল। ব্রাহ্মণ বাটীতে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অধ্যাপনার আয়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ গণিত আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির অধ্যাপনার জন্য বিদ্যালয় বিখ্যাত ছিল।

শত্রুর আক্রমণে বর্দ্ধরাজ পরাভূত হওয়ায় ব্রাহ্মণকে সপরিবারে তিন বৎসরকাল নানাস্থানে ঘুরিয়া অতি কষ্টে দিন নির্ব্বাহ করিতে হইল। পরে কোন গতিকে শত্রুগণ বিতাড়িত হইলে পুনরায় রাজ্যে শান্তি-স্থাপন হইল ও ব্রজগোপালও স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। জ্যেষ্ঠ সন্তানটি বিশেষ শিক্ষিত হওয়ায় তাহার সাহায্যে পুনরায় একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভাল করিয়া চালাইতে লাগিলেন।

ব্রজগোপালের কনিষ্ঠা কন্যার বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষ হইয়াছে। কন্যা সুশ্রী, এ কারণ নগরস্থ জনৈক ধনী ব্যক্তির তাহার উপর দৃষ্টি পড়ে, তিনি উহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। ধনী হইলে কি হইবে পাত্রটি অতি দুরাচার, লম্পট, শঠ ও প্রতারক এবং বয়সও অধিক

হইয়াছে; এরূপ পাত্রে কন্যা-সম্প্রদানের ব্রজগোপালের ইচ্ছা কিছুতেই হইল না, অথচ প্রকাশ্যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস হইল না। কিন্তু পুনঃ পুনঃ বাটীতে আসিতে থাকায় অগত্যা ব্রজগোপাল তাহাকে স্পষ্টই বলিতে বাধ্য হইলেন, তাঁহাকে কন্যাদান করা হইবে না ও তিনি আর যেন এই বাটীতে না আসেন।

একে ধনবান তায় প্রবৃত্তির দাস, তাহার এরূপ প্রত্যাখ্যান সহ্য হইল না, সে মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আমি কোন গতিকে এই কন্যাকে গ্রহণ করিবই করিব এবং আমার অপমান করার জন্য তোমাকে বিশেষ প্রতিশোধ না দিয়া ছাড়িব না।"

ব্রজগোপাল বুঝিলেন, তাঁহার কার্য্যবশতঃ তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইবে, ধনবান প্রতিবেশীর সহিত বিবাদ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তাঁহার বিরুদ্ধে মধ্যে মধ্যে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র, মিথ্যাপবাদের উৎপত্তি হইতে লাগিল, কিন্তু ব্রাহ্মণের নির্ম্মল চরিত্র বশতঃ তাহাতে বিশেষ ফল হইতে পারিল না। একরাত্রে ব্রজগোপাল চীৎকারের শব্দে নিদ্রোত্থিত হইয়া শুনিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যার গৃহ হইতে চীৎকার আসিতেছে। নিজে তরবারি হস্তে বাহির হইয়া দেখিলেন,—উক্ত ধনী ব্যক্তি দুইটি লোক সহ তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, ক্রোধান্ধ হইয়া তরবারি আঘাতে প্রত্যাখ্যাত ধনী পাত্রকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলেন এবং অপর দুইজন লোক কর্ত্তৃক আপনিও গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে কন্যাকে রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ উক্ত হত্যার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

অনেক চিন্তার পর শেষে রাজদ্বারে উপস্থিত হওয়াই সঙ্গত মনে করিয়া অতি প্রত্যূষে শিবিকারোহণে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া সমুদয় ঘটনা বিবৃত করিলেন। রাজাও উক্ত হত ব্যক্তির চরিত্র অবগত ছিলেন।

তিনি ব্রজগোপালের কার্য্য দোষশূন্য হইয়াছে এবং হত ব্যক্তির পক্ষীয় লোকের নিকট হইতে হত্যার কারণ কোন নালিস লওয়া যাইবে না এবং ব্রজগোপালের হত্যাপরাধ রাজদ্বারে আলোচিত হইয়া তাহা ক্ষমাযোগী হওয়ায় উঁহাকে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি দেওয়া হইল বলিয়া চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়া দিলেন। রাজা পরিশেষে ব্রজগোপালকে বলিলেন, "আমি আপনাকে রক্ষা করিলাম বটে; কিন্তু আপনার বিরুদ্ধে হত ব্যক্তির পক্ষ হইতে এত অত্যাচার হইতে থাকিবে যে, সকল সময়ে আমিও আপনাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না, এ কারণ আপনি বিশেষ সাবধানে থাকিবেন।

ব্রজগোপালের এইবারে সময় মন্দ পড়িল। বিনা কারণে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়িয়া যাইতে লাগিল। কাজেই সংসারে অর্থাভাব দেখা দিল। তাঁহার একজন সন্তানহীন আত্মীয় ছিল, তিনি প্রচুর অর্থের অধিপতি ছিলেন এবং ব্রজগোপাল ব্যতীত তাঁহার অন্য উত্তরাধিকারী ছিল না। ব্রজগোপাল তাঁহার নিকট যাইয়া নিজ দুরবস্থার বিবয় জানাইয়া কিছু সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি কোন বিশেষ কারণ না থাকা সত্বেও ব্রজগোপালের উপর চটিয়া উঠিলেন এবং কোন অর্থাদি ত দিলেনই না, অধিকন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে অর্থাদি অন্যকে দিয়া যাইবেন এবং যাহাতে ব্রজগোপাল কিছুমাত্র না পায় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া যাইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। ব্রজগোপাল তাঁহার মনোভাব-পরিবর্ত্তন নিজ দুঃসময়ের ফল বুঝিলেন, বিশেব কিছু না বলিয়া আত্মীয়ের স্থানে বিদায় লইলেন।

একদিন রাত্রে অকস্মাৎ তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল, তিনি উক্ত আত্মীয়কে হত্যা করিয়া তাঁহার অর্থাদি লইয়া আসিয়া সংসারে সুখী হইবেন। ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণ এইভাব মনে আসায় তাহা চাপিয়া ফেলিলেন এবং কিরূপে এরূপ কুভাব উদয় হইল তাহার চিন্তা করিতে করিতে

বুঝিলেন, ইহা সেই তাঁহা কর্ত্তৃক হত ব্যক্তির কাজ, সেই দুর্দ্দান্ত ব্যক্তিই তাহার মস্তিষ্ক মধ্যে এই কুভাব প্রবেশ করাইয়া দিতেছে। পরে মধ্যে মধ্যে কয়েকদিন স্বপ্নযোগে হত ব্যক্তি ব্রজগোপালকে দেখা দিয়া তাহাকে আত্মীয় হত্যা করিবার জন্য প্রলোভন দেখাইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের মনের বল বেশী থাকায় কিছুতেই তাঁহা দ্বারা এরূপ নৃশংস কার্য্য সম্পাদন করান সম্ভব নহে বুঝিয়া, হত ব্যক্তি অন্য উপায় অবলম্বন করিল।

ব্রজগোপাল বসিয়া আছেন, অকস্মাৎ রাজদূতগণ তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত ধনী আত্মীয়ের হত্যাপকারী বলিয়া ধৃত করিয়া লইয়া যাইবে জানাইল। হত্যাসম্বন্ধে তাঁহার কোন অপরাধ নাই ও হত্যার বিষয় তিনি অবগতও নহেন বলায়, রাজদূতগণ তাঁহাকে ছাড়িল না। তিনি কারাগারে নীত হইলেন। কয়েকদিন পরে বিচারার্থ ধর্ম্মাধিকরণে নীত হইলেন। তাঁহার নিজ তরবারি রক্তাক্ত অবস্থায় উক্ত আত্মীয়ের গৃহমধ্যে পাওয়া গিয়াছে, সপ্রমাণ হইল। মৃত আত্মীয়ের এক ভৃত্য আসিয়া কহিল। ঘটনার দিন রাত্রে ইনি আমার মনিবের বাটীতে যান, আমি দ্বার খুলিয়া দিয়াছিলাম, তাঁহার ঘরের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হইতেছে শুনিলাম, পরে হুড়াহুড়ি শুনিয়া দ্বার খুলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইলে ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ থাকা হেতু ঢুকিতে পারিলাম না। ইহার পর গোঁয়ানি শব্দ পাইতে লাগিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে ঘরে ঢুকিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, কেবল ঘরের মধ্যে রক্ত ও হুড়াহুড়ি বশতঃ জিনিষপত্র কেবল ছড়ান রহিয়াছে দেখিলাম। অন্য দুইজনে সাক্ষ্য দিল, তাহারা ব্রজগোপালকে উক্ত আত্মীয়ের বাটীতে সেই দিন সন্ধ্যায় ঢুকিতে দেখিয়াছে। একজন বলিল, সে রাত্রে দেখিয়াছে ব্রজগোপাল পৃষ্ঠে একটি থলের মধ্যে কি পুরিয়া বহিয়া লইয়া যাইতেছে,

থলের আকার যেরূপ তাহাতে তাহার মধ্যে মৃত দেহ থাকাও সম্ভব হইতে পারে। সেই সময়ে তাহার চেহারা অতিশয় ভীতিগ্রস্ত ও সে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে নদীর ধারে যাইতেছিল। যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে তাহার মুখ মাছে খাইয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু তাহার পরিধেয় বস্ত্রাদি দেখিলে তাহা যে উক্ত মৃত ব্যক্তির শরীর, তাহা চিনিতে আর কোন কষ্ট হয় না, চাকর সেই দেহ তাহার মনিবের দেহ বলিয়া চিনিল।

ব্রজগোপালের নিজের তরবারি উক্ত মৃত আত্মীয়ের ঘরের মধ্যে লুক্কায়িত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে ও মৃতদেহের আঘাত উক্ত তরবারি দ্বারা আঘাতের মত বটে দেখা গেল। এই সকল অবস্থায় ব্রজগোপালও চমকিত ও বিমূঢ় হইলেন ও এই সকল সাক্ষ্য ও তরবারি ঐ স্থানে থাকা প্রভৃতির কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তিনি নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রকাশ করিলেন মাত্র। বিচারপতি এই সকল প্রমাণ পাইয়া ব্রাহ্মণকে নির্দ্দোষ বলিতে পারিলেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণের অতি নির্ম্মল চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দণ্ড স্থির করা বন্ধ রাখিলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই অন্য এক সাক্ষ্য জুটিল, সে বলিল আমি ঘটনার দিন সন্ধ্যা-কালে উক্ত মৃত ব্যক্তির ঘরের জানালার নিকটে দাঁড়াইয়াছিলাম, দুইজনের স্বর বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিলাম। ব্রজগোপালকে তাহার আত্মীয় বলিতেছে, বাবা আর কেন ছাড়িয়া দেও। ব্রজগোপাল তাহা না শুনিয়া তাহাকে তরবারির আঘাত করিতে লাগিল ও শেষে দেখিলাম, ব্রজগোপাল একটা থলি পৃষ্ঠে করিয়া বাহির হইয়া নদীর দিকে যাইতেছে। তাহার মুখে ভয়ের চিহ্ন ও কাপড়ে রক্তের দাগ রহিয়াছে। ব্রজগোপালের একটি রক্তাক্ত জামাও আদালতে উপস্থিত করা হইল।

বিচারপতি তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে বাধ্য হইলেন ও বলিলেন, ব্রজগোপালের মত ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত লোকের ক্রোধান্ধ হইয়া এরূপ

নৃশংস কার্য্য অতি গর্হিত হইয়াছে। ব্রজগোপাল প্রমাণ দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন ও বলিলেন, "আমার বিশ্বাস আমার উক্ত আত্মীয় মরে নাই, তিনি নিরুদ্দেশ থাকিয়াই আমার প্রাণনাশক হইলেন।" প্রহরীরা ব্রজগোপালকে কারাগারে লইয়া গেল। পরদিন প্রত্যূষে তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে।

জনৈক মিশরদেশীয় সন্ন্যাসী ভারতের নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে একদা ব্রজগোপালের বাটীতে অতিথি হয়েন। তৎফলে ব্রজ-গোপাল তাঁহার নিকট গুপ্তবিদ্যাসম্বন্ধে অনেক শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন ও হিন্দুদের ও মিশরীদের মধ্যে গুপ্তসাধনের সাদৃশ্য বুঝিয়া বড়ই পুলকিত হইতেন। উক্ত সন্ন্যাসী অকস্মাৎ রাত্রে কারাগারে ব্রজগোপালকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "বৎস তুমি ভয় করিও না, তুমি প্রাণঘাতক নহ, তোমার উক্ত আত্মীয় মরেন নাই, জীবিত আছেন। তোমার এই দণ্ডের জন্য তুমি মনে ক্ষোভ করিও না, তোমার অন্য জন্মের কর্ম্মের ফল এই জন্মে এই দণ্ডের দ্বারা ক্ষয় হইল। এই ঋণশোধ দ্বারা সাধনমার্গে তোমার পথ পরিষ্কার হইয়া আসিল। প্রাচীন ঋণ শোধ হইতেছে বলিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে তোমার এই ঋণশোধ করা উচিত। যদিও এই দণ্ড অন্যায় হইয়াছে ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা অন্যায় নহে। এই দণ্ড তোমার আত্মীয়ের মৃত্যু জন্য নহে, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের তোমার অপরাধের জন্য। যাঁহার আদেশ কেহ অমান্য করিতে পারে না, তাঁহার আদেশ তোমাকে জানাই-বার জন্য আদিষ্ট হইয়া আমি তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আমাকে এক সময় অতিথিসৎকারে সন্তুষ্ট করিয়াছ। আমি নিজে তোমাকে হাত ধরিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইতে থাকিব, অতঃপর তোমার পথে কষ্ট রহিল না। যিনি আমাকে এই কার্য্যের ভার দিয়াছেন, তাঁহার আদেশ কেহ লঙ্ঘন করিতে পারে না, তজ্জন্য ভয় করিও না। যাহাদের

তুমি এই জন্মে ভালবাস, তোমার মৃত্যুতে তাঁহাদের কোন কষ্ট হইবে না। উপস্থিত যদিও ইহা দেখিতে মন্দ; কিন্তু ইহা তোমার পক্ষে অতিশয় ভাল হইতেছে।" এই বলিয়া সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন।

পরদিন ব্রজগোপালের প্রাণদণ্ড করা হইল।

তৃতীয় দিবসে রাজপ্রহরীগণ একজন লোককে ধরিয়া রাজসমীপে উপস্থিত করিল। ইনি ব্রজগোপালের কথিত মৃত আত্মীয়। তখন সকল ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি বলিলেন, আমি ইচ্ছা করিয়া লুকাইয়া থাকি নাই। ব্রজগোপাল কর্ত্তৃক হত সেই মৃত ধনী ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আমার নিকট প্রকাশ হইয়া আমাকে লুকাইয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছিল, এবং ব্রজগোপালের উপর দোষ চাপাইতে যাহা কিছু যোগাড় করিতে হইয়াছিল তাহা তাহার সাহায্যেই হইয়াছিল। রাজা ইহা শুনিয়া উক্ত মকদ্দমার সাক্ষ্যদের ডাকাইলেন এবং প্রত্যেককে অন্যের অসাক্ষাতে জবানবন্দী লইলেন। সকলেই উক্ত মৃত ব্যক্তির প্ররোচনায় এই বলিতে বাধ্য হইয়াছিল, স্বীকার করিল। ধার্ম্মিক মহৎ ব্রাহ্মণকে বিনা অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে বুঝিয়া, দেবতাদের পূজা দিলেন ও ব্রজগোপালের স্ত্রী-পুত্রদের সংসারনির্ব্বাহের জন্য ব্যবস্থা করিলেন। আর সেই ব্রজগোপালের কনিষ্ঠা কন্যা, যাহার জন্য এত গোল-যোগ তাহাকেও যথেষ্ট অর্থ দিলেন। অজ্ঞানে ব্রহ্মহত্যার আদেশ দেওয়া দেওয়া হেতু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া রাজা কতকটা শান্তি পাইলেন। এই বিবরণ হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে শত্রু মরিয়াও অনিষ্টসাধনে ক্ষান্ত হয় নাই এবং লোকের মনে কুচিন্তা উৎপাদন করিয়া সেই চিন্তা এত বলবতী করিয়া দিয়াছিল যে, তাহারা হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া একজন দেশপ্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক নিরীহ ব্রাহ্মণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করাইতে পশ্চাৎপদ হইল না। এই ব্যাপার অর্থাৎ লোকের মনে সৎ বা অসৎ

চিন্তার উদয় করাইবার শক্তি সকলেরই আছে। যেরূপ এস্থলে মৃত ও প্রত্যাখ্যাত পাত্র ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করিল, সেইরূপে কেহ কাহারও মঙ্গল করিতে ইচ্ছুক হইয়া অভীষ্ট ব্যক্তির মঙ্গল করিতে পারে। ইহা হইতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আমরা কেবলমাত্র চিন্তাশক্তির সাহায্যে বিপন্ন জীবের কত উপকার করিতে পারি। আবার লোকের মনে কষ্ট দিয়া তাহাকে শত্রু করিয়া তাহার দ্বারা আমাদের কতই না অপকার হইতে পারে। বেশ্যাপল্লী, মদের দোকান প্রভৃতি স্থানে কামচিন্তার ও পানাসক্তি-ঘটিত চিন্তা নিয়ত হওয়ায় ঐ সকল চিন্তা মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া সেই সেই স্থানের শূন্যে বিচরণ করিতেছে। ঐ সকল স্থানে যাইলে লোকের মনে উহারা উক্তরূপ চিন্তা উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে, একটু আসক্ত লোক পাইলে একেবারে তাহাদের মস্তিষ্কে উক্তরূপে চিন্তার উদয় করিয়া তাহাদিগকে লোভসংবরণে অসক্ত করিয়া ফেলে। যাহা চিন্তামূর্ত্তিসম্বন্ধে অনেক বলা আবশ্যক তাহা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয় বলিয়া এস্থলে ক্ষান্ত থাকা গেল।

চিন্তাস্রোতপরিচালনা অর্থাৎ স্বয়ং এক প্রকার চিন্তা করিয়া সেই চিন্তা অপরের মনে উদয় করান অতি সহজ; কেবল অভ্যাসসাপেক্ষ। দুইজনে দুই ঘরে বসিয়া সামান্য একটি বিষয় লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। এস্থলে আধুনিক একটী ঘটনা আমরা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

যাঁহারা সৎগুরু লাভ করিয়া পরিব্রাজকদীক্ষা লাভ করিয়াছেন, এরূপ সাধকদের অধীনে অনেকগুলি করিয়া যুবককে কাজ করিতে দেওয়া হয়, এই নিয়োগ সৎগুরুগণই করিয়া থাকেন। ইহার উদ্দেশ্য যাঁহারা ভবিষ্যতে শিষ্যত্ব লাভ করিবেন এরূপ যুবকদের শিক্ষা দেওয়া ও তাঁহাদের কর্ম্মফল শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় করান। এই শ্রেণীর যুবকদের দৈবী-সেবক বলে।

নিদ্রাবশে ইহাদের শরীর গৃহে পড়িয়া থাকে, সূক্ষ্মদেহে ইহারা শিষ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আদেশমত বিপন্ন জীবের বিপদুদ্ধার, সত্ত্বমৃত লোককে শান্তিদান প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন।

এইরূপ একজন দৈবী-সেবক উক্তরূপ একজন শিষ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি নয়টা। শিষ্য তখনও লিখিতেছেন, বিলম্ব আছে দেখিয়া দৈবী-সেবক বঙ্গোপসাগরের উপর বেড়াইতে লাগিলেন। সূক্ষ্ম দেহে আসিয়াছেন কাজেই সর্ব্বত্র অবাধে যাতায়াতে সমর্থ, সমুদ্রের উপর শূন্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন একটি জাহাজ যাইতেছে, তন্মধ্যে এক প্রকার নীলবর্ণের আলোক দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের জানা আছে, এই আলোক যে স্থান হইতে বাহির হয় সেই স্থানেই সাহায্য আবশ্যক। তিনি জাহাজের ভিতর অবতরণ করিয়া যে স্থানে আলোক দেখা যাইতেছে, সেই কেবিন মধ্যে যাইয়া দেখিলেন জনৈক কর্ম্মচারী বন্দুক সম্মুখে রাখিয়া আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ঈশ্বর স্মরণ করিয়া লইতেছেন।

এই নীল আলোক চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না। আমাদের কথিত দৈবী-সেবকটি নূতন ব্রতী, এস্থলে কি করা আবশ্যক স্থির করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ শিষ্যের নিকট যাইয়া তাঁহাকে অবস্থা বলিলেন, তিনি বিলম্বে কার্য্যহানি বুঝিয়া নিজ কর্ম্ম বন্ধ রাখিয়া যে চেয়ারে বসিয়া লিখিতেছিলেন, তদুপরি উপবেশনাবস্থায় নিজ স্থূলশরীর সমস্ত দেখিয়া বুঝিলেন, অর্থাৎ লোকটার চিন্তা দেখিয়াই শিষ্য বুঝিলেন কোন যুবতীর প্রেমে পড়িয়া প্রকাশ হইয়া পড়িবার সম্ভব হওয়ায়, বদনাম অপেক্ষা প্রাণত্যাগ শ্রেয়ঃ বোধে আত্মহত্যায় ব্রতী হইয়াছেন।

যাহা হউক, অবিলম্বে প্রতীকার না করিলে কার্য্য দণ্ড হয় দেখিয়া শিষ্য মহাশয় দেখিলেন, লোকটির বৃদ্ধা মাতা বাটীতে আছেন। তাঁহার

উপর ইহাঁর যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা আছে বুঝিয়া লোকটির মনে তাঁহার মাতৃভক্তির ও তাঁহার দেহত্যাগে মাতার কিরূপ শোক ও ক্লেশ হইবে এই ভাব প্রবেশ করাইয়া দিলেন, তাহাতে লোকটি একটু ইতঃস্তত: করিয়া শেষে হত্যার বাসনা ত্যাগ করিয়া বন্দুক দূরে রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শেষে ইহাঁর মনে এই ভাব দেওয়া হইল তুমি ক্যাপ্টেনের নিকট যাইয়া সমুদয় কথা খুলিয়া বলিয়া তাহার আশ্রয় লও, ইহাতে তিনি দয়া করিলেও করিতে পারেন।

লোকটির মনোমধ্যে এই ভাব দৃঢ়ীভূত হইলে তিনি উঠিয়া সেই রাত্রেই ক্যাপ্টেনের কেবিনে যাইলেন। শিষ্য মহাশয়ও তাঁহার অধীনস্থ দৈবী-সেবক দুইজনেই ক্যাপ্টেনের ঘরে যাইলেন। ক্যাপ্টেন সমুদয় শুনিলেন ও শুনিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন, তহবীল ভাঙ্গার বিষয় তিনি প্রকাশ করিবেন না, ক্রমশঃ কর্ম্মচারীর বেতন হইতে কাটিয়া লইয়া তাহা পূরণ করা হইবে, স্থির হইল।

এইরূপে লোকটিকে আত্মহত্যার কবল হইতে রক্ষা করা হইল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটিতে ব্রজগোপালকে যে মিসর দেশীয় সন্ন্যাসী দেখা দিয়াছিলেন, তিনি একজন ঋষি ও মুক্ত পুরুষ। ব্রজগোপালের মৃত্যুর পর হইতে সর্ব্বদাই তাঁহাকে নিজের নজরে রাখিয়া সাধনের পথে ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তী করিতেছেন। পরজন্মে ব্রজগোপাল পারস্য নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং পারস্য দেশের জোরোয়াষ্ট্রীয়ান ধর্ম্মসংস্কার জন্য তৎকালে জারা থুষ্ট্রানামক যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তাহার পর ব্রজগোপালের ভারতবর্ষে জন্ম হয়; ব্যাসাবতার বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব লাভে এই জন্মে ইহার অত্যধিক উন্নতি হইয়াছিল। ইহার পরেও তিনি বৌদ্ধকুলে ভারতবর্ষে

জন্ম লইয়া বিখ্যাত বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক আর্য্যসঙ্ঘের সহিত দেশে দেশে ধর্ম্ম সংস্কার ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান জন্মে ইহার নাম কৃষ্ণমূর্ত্তি, অধুনা তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তদশ হইবে, এবারে তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত গুরুদেবের সাহায্যে পরিব্রাজক-দীক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাহার স্থূল শরীর চতুর্দ্দশ দিন কাল বন্ধুদের দ্বারা যত্নে রক্ষিত ছিল। সূক্ষ্ম শরীরে হিমালয়ে যাইয়া দীক্ষা লাভ করেন। এই দীক্ষার ফলে তিনি মুক্তির স্রোতে ভাসিতেছেন। কোন প্রলোভনে তাঁহার পতনের আর আশঙ্কা নাই।

সৎগুরুর যাঁহার উপর লক্ষ্য পড়ে তাঁহার উন্নতি এইরূপেই হইয়া থাকে ও তাহাদের বিপদ আপদ আপাততঃ দেখিতে অন্যায় বোধ হইলেও ভবিষ্যতের ভালর জন্যই হইয়া থাকে। এইরূপ গুরুই জীবনে মরণে জন্ম হইতে জন্মান্তরে শিষ্যকে চিনিয়া লইয়া তাহাকে সাধনমার্গে অগ্রবর্ত্তী করাইতে থাকেন।

শাস্ত্রে যাঁহাকে জগৎগুরু বলে, যিনি পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের রক্ষার কার্য্যের ভার লইয়া আছেন, সেই ভগবন মৈত্রেয় ঋষি সম্প্রতি জগতে নরদেহে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া উক্তও সাধকমণ্ডলী ঘোষণা করিতেছেন। এতদুপলক্ষে তাঁহার আবির্ভাবে যাহাতে তাঁহার কৃপালাভে ধন্য হইতে পারেন এই আশায় ভক্তমণ্ডলী মধ্যে Order of the Star of the East নামক একটি সমিতি বারাণসী পুরীতে স্থাপিত হইয়াছে। জগতের নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোক সেই সমিতিতে যোগদান করিয়া ভগবানের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তন্মধ্যে অনেকের মনে এইরূপও ধারণা হইতেছে যে, ভগবান মৈত্রেয় যে আধারে পৃথিবীতে প্রকাশ হইবেন, সেই পবিত্র আধার বোধ হয় ব্রাহ্মণ শরীরই

হইবে, কারণ এরূপ নিষ্পাপ ও পবিত্র দেহ জগতে অন্যত্র দুর্লভ। এমনই উন্নত অবস্থা আমাদের ঘটনায় লিখিত ব্রজগোপালের হইয়াছে।

পরিশেষে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, উপরি-উক্ত দুইটি বিস্ময়কর ঘটনা জনৈক দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন সাধক কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া তাহা 'থিয়সফিষ্ট' পত্রে প্রকাশিত হয়। শেষোক্ত ঘটনার সৎগুরুশিষ্য তিনি স্বয়ং এবং ইহা তাঁহার অধীনস্থ একটি দৈবী-সেবকসম্বন্ধীয় ঘটনা।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

প্রেতের ক্রীড়া।

কলিকাতারই কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যে একবার প্রেতের ক্রীড়া আমরা দেখিয়াছিলাম। তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

ঐ পরিবারের * * বাবুর পত্নীবিয়োগ হয়। * * বাবু শিক্ষিত এবং সাধুচরিত্র লোক। তাঁহার বয়স ৩১।৩২ এর বেশী হইবে না। তাঁহার দুইটি মাত্র শিশুপুত্র বিদ্যমান। পাছে পুত্রদের কষ্ট হয়, সেইজন্যও বটে ও দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহে ইচ্ছা না থাকায় তিনি আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। মৃতা পত্নীর ছায়ামূর্ত্তি একদিন রাত্রিতে * * বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে অনুরোধ করে এবং কাহাকে বিবাহ করিতে হইবে, তাহাও বলিয়া দেয়। ছায়ামূর্ত্তি আরও বলে, "বিবাহ না করিলে আমাদের ছেলেদের কে যত্ন করিবে? যদি তুমি বিবাহ না কর, তাহা হইলে আমার ছেলেদের আমি নিজের কোলে টানিয়া লইব।"

পরদিন প্রাতে এই কথা * * বাবু বাড়ীর গুরুজনদিগকে বলিলেন। তাঁহারা মৃতা বধূর এই আকস্মিক আবির্ভাবে ও কথাবার্ত্তায় খুবই বিস্ময় ও আশঙ্কা বোধ করিলেন।

সেই দিন রাত্রিতে আবার ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব। ছায়ামূর্ত্তি আবার তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি বিবাহ করিতে অসম্মত ?"

স্বা। দ্বিতীয়বার বিবাহে আমার ইচ্ছা নাই। সে হয়ত আমার ছেলে দুটিকে কষ্ট দিবে। তার উপর তুমিও হয়ত উপদ্রব করিবে।

ছা। না—না। আমি কোন অত্যাচার করিব না। বরং আমি তার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব, তাকে রক্ষা করিব। আগামী বৈশাখ মাসেই তাহা হইলে তুমি তাকে বিবাহ কর।

স্বা। আচ্ছা কাল আমি এ কথার জবাব দিব।

তাহার পরদিন সকালে * * বাবু গুরুজনদিগের সমক্ষে এই কথা আনুপূর্ব্বিক বলিলেন। তাঁহারাও এই বিবাহে সম্মতি দিলেন। বিশেষ ছেলে দুইটির অনিষ্ট হইবে,—এই আশঙ্কায় * * বাবুকে বিবাহ করিতে বলিলেন।

আবার সেইদিন রাত্রিকালে ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব। এই কয়দিন * * বাবু শুধু ছায়ামূর্ত্তির কথাই শুনিয়াছিলেন, আজ তাঁহার সমক্ষে তাহাকে দেখিতে পাইলেন। সহাস্যবদনে ছায়ামূর্ত্তি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। তখন * * বাবু মূর্ত্তিকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"হাঁ আমি বিবাহ করিব। কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর, তোমার সুবিধা-মত এবং আমার অনুরোধ-মত তুমি আমায় দেখা দিবে।

ছা। আচ্ছা তাহাই হইবে।

অবশেষে বৈশাখ মাসে * * বাবুর বিবাহ হইয়া গেল। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীও রূপে গুণে লক্ষ্মীর মত। বয়সও ১২ বৎসরের উপর।

স্বামীর ঘরে আসিয়া মাতৃহীন শিশু দুইটীকে খুবই যত্ন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন চলিয়া গেল। একদিন আমি ও আমার এক বন্ধু * * বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। অনেক কথাবার্তার পর বলিলাম, "কি ভায়া তোমার প্রথমা পত্নীর ছায়ামূর্ত্তির কোন কাজ আমাদের দেখাইতে পার কি?"

* * বাবু উত্তর করিলেন, "কাজ আর কি দেখাইব? সে ত কোন উপদ্রব অত্যাচার করে না। আচ্ছা তোমরা ঘণ্টা দুই বস, সন্ধ্যাটা উত্তীর্ণ হউক, তখন দেখাইব।"

আমরা বসিয়া রহিলাম। তার পর * * বাবু ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "এস হে তোমরা উপরে এস।" আমারা উপরে উঠিলাম। উপরের দালানে * * বাবুর পুত্র দুইটি খেলা করিতেছে। তাহারা একটা কাঠের গোলা লইয়া গড়াইয়া গড়াইয়া খেলিতেছিল। আমরা দুইজন ও * * বাবু একটু তফাতে চেয়ারে বসিয়া খেলা দেখিতে লাগিলাম। একটু পরে দালানের উপর সেই খেলার জায়গায় ঠক্‌ঠক্ শব্দে কয়েকটা কাঠের কাশীর খেলনা পতিত হইল। বোধ হইল, যেন কড়িকাঠের নীচে থেকে কে ফেলিয়া দিতেছে। আবার ২।৪টি করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। পুনরায় পড়িল। তাহার পর কোথাও কিছু নাই, কতকগুলি বেল, যুঁই, জবা প্রভৃতি ফুল পড়িল। সব শেষে একটা চমৎকার মাটীর ময়ুর কে যেন বসাইয়া দিয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয়, ছেলে দুইটির কাছে তখন অন্য কেহ ছিল না; বুড়া ঝি কাছে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল ও মাঝে মাঝে হাই তুলিতেছিল।

আমরা ত সেই দিন সন্ধ্যার একটু পরে এই ঘটনা আপনাদের চোখে দেখিয়া আসিলাম। আরও শুনিয়া আসিলাম প্রায় প্রতিদিন প্রেতমূর্ত্তি

শিশুদ্বয়ের ও বাটীর অন্যান্য সকলের অলক্ষ্যে থাকিয়া এইরূপভাবে খেলা করে। * * র শুইবার ঘরের মশারী ফেলিয়া দেয়; ছবি গুলির ধূলা ঝাড়িয়া দেয় এবং মাঝে মাঝে ঘরও ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কৃত করে।

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

অদ্ভুত ভৌতিক কাণ্ড।

আমি আমার বহরমপুরের বাটীতে সপরিবারে ১২৮৫ সাল হইতে বাস করিতেছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন ভৌতিক কাণ্ড আমি কি আমার পরিবারবর্গের কেহই দেখে নাই। সম্প্রতি আমার বাটীতে যে সকল কাণ্ড হইতেছে তাহা দেখিলে হৃদয় কম্পিত হয়, এবং ঘোর নাস্তিককেও স্তম্ভিত হইতে হয়।

আমার বাটীতে চাকর, চাকরাণী, পাচক, ব্রাহ্মণ এবং নিজের আত্মীয়-স্বজন লইয়া মোট ৩৫।৩৬ জন লোক। তন্মধ্যে আমার মাতুলের প্রায় ৬৭ বৎসর বয়সে পুরাতন জ্বরে প্রায় ১ বৎসর ভুগিয়া গত ২৪শে মাঘ তারিখে মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যুর সময়ে তিনি আমার বাহির প্রকোষ্ঠের একটী ঘরে উচ্চ কাষ্ঠাসনে ছিলেন এবং নিকটে কেহই ছিল না, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে ঐ ঘর হইতে বাহির করিয়া সৎকারাদি করা হয়।

আমার মাতুলের মৃত্যুর ৫।৬ দিন পরে আমার বাটীর ভিতরের রান্না ঘরের একটী জানালার উপর একটী রিঙ্গে লাগান ৪।৫টী চাবি বেলা ১২টার সময় রাখা হয়, তৎপর বেলা ৪টার সময় ঐ সকল চাবির অনুসন্ধান

করিতে যাইয়া পাওয়া গেল না, প্রায় ১ ঘণ্টা অনুসন্ধানের পর দেখা গেল যে, ঐ সকল চাবি ও রিং অন্য একটি জানালার উপর দিকে একখণ্ড কাষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করান আছে। তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম যে, হয়ত ইন্দুরে লইয়া গিয়া ঐ স্থানে রাখিয়াছে।

তাহার দুই দিন পরে আমার বাটীর স্ত্রীলোকেরা দোতলার ছাদের উপরে তিল-সংযুক্ত বড়ী প্রস্তুত করিয়া তাহা ছাদের উপর শুকাইতে দিয়াছিল। ঐ সকল বড়ী শুকাইলে পর ৭।৮টী বড়ী ভাঙ্গিয়া দেখা গেল যে, তাহাদের মধ্যে মাছের কাঁটা; আমরা মনে করিলাম হয় ত যখন বড়ী কাঁচা ছিল, তখন বাতাসে মাছের কাঁটা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

তাহার পর আমার বাড়ীর চাকরেরা আমাকে মধ্যে মধ্যে বলিত, যে ঘরের মধ্যে আমার মাতুলের মৃত্যু হইয়াছে, ঐ ঘরের মধ্যে রাত্রিতে তাহারা কাশির শব্দ শুনিত এবং তামাক খাওয়ার গড় গড় শব্দ শুনিতে পাইত। কিন্তু আমি তাহা তাহাদিগের মনের ধাঁধা বলিয়া উড়াইয়া দিতাম।

তাহার পর একদিন আমার একজন চাকর আমাকে বলিল যে, সে অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিল যে, একটী ১২ বৎসরে বালক, যে ঘরে আমার মাতুলের মৃত্যু হইয়াছিল, ঐ ঘরের একটী দরজার নিকট দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি তখন মনে করিলাম যে, আমার চাকর নিদ্রাভঙ্গের পরই দেখিয়াছে হয়ত তাহার দৃষ্টির বিকৃতি হইয়া থাকিবে।

তাহার পরে আমার একটী কন্যার একখানি ভাল কাপড় প্রায় দেড় হস্ত ছেঁড়া দেখা গেল, ও তাহার পর দিন আমার এক ভাইঝির একটী বডি দুই খণ্ড করিয়া ছেঁড়া দেখা গেল। তাহাতে আমরা মনে করিলাম যে, কোন বালকবালিকা তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।

আমার বাটীতে দোতলার উপরে পরস্পর-সংলগ্ন তিনটী পায়খানা আছে, তাহার একই ছাদ, তাহার সংলগ্ন একটী পাকা সূতিকাঘর আছে। আমার একটী ভাইঝির পুত্রসন্তান ঐ সূতিকাঘরে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল ও ঐ ভাইঝি সূতিকাঘরে ছিল। গত ৮ই চৈত্র, বৃহস্পতিবার রাত্রি আন্দাজ ১২টার সময় ঐ সূতিকাঘরের ছাদের উপর একজন মানুষ লাফাইয়া পড়িলে যেরূপ শব্দ হয় সেইরূপ শব্দ আমার ভাই-ঝি শুনিতে পাইয়াছিল। তাহার পরদিন অর্থাৎ ৯ই চৈত্র তারিখে আমার এক ভ্রাতার স্ত্রী রাত্রি ১১টার সময় পায়খানায় গিয়াছিল এবং পায়খানায় দরজায় ২।৩ জন বাড়ীর লোক দাঁড়াইয়াছিল, এমন সময়ে ঐ পায়খানার পশ্চাৎদিকে অবস্থিত একটী শজিনা গাছের ডাল কাটিয়া মাটিতে পড়িলে যেরূপ শব্দ হয়, ঐরূপ শব্দ তাহারা শুনিতে পাইয়াছিল।

তাহার পর ১০।১১।১২ই চৈত্র তারিখেও আমার ভ্রাতার স্ত্রী ও বাটীর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরাও পায়খানার ছাদের উপর ঢিল পড়ার শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। কিন্তু ৮ই চৈত্র হইতে ১২ই চৈত্র পর্য্যন্তের ঘটনাগুলি আমাকে বাটীর স্ত্রীলোকেরা কেহ জানায় নাই।

গত ১৩ই চৈত্র, মঙ্গলবার রাত্রি ১১টার সময় আমি আহারের পর পায়খানায় গিয়াছিলাম। আমি পায়খানায় থাকার সময় পায়খানার ছাদের উপরে তিনটী ঢিল পড়িল। আমি পায়খানা হইতে বাহির হইয়া দেখি যে, বাটীর ২।৩ জন স্ত্রীলোক ঐ তারিখে ঢিল পড়ে কি না জানিবার জন্য পায়খানার বাহিরে ৮ হাত তফাতে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারাও বলিল যে, ৩টী ঢিল পড়ার শব্দ শুনিয়াছে। তখন আমরা ৪ জন পুরুষ একটী আলো লইয়া পায়খানার ছাদের উঠিয়া দেখিলাম যে, বাস্তবিকই অনেকগুলি ঢিল পড়িয়াছে।

তাহার পর রাত্রি ১২টার সময় আমার বাটীর ১৫।১৬ জন স্ত্রীলোক

ও পুরুষ আমার বাটীর ভিতর প্রকোষ্ঠে দোতলায় বারান্দার কাঠের রেলিংএর নিকট দাঁড়াইলাম, প্রথমে একটি বড় ঢিল ঐ প্রকোষ্ঠের নীচের তলার রান্নাঘরের বারান্দায় একখানি থামের উপর ভয়ঙ্কর শব্দে পতিত হইল। তৎপর ২।৩ মিনিট পর ১টী করিয়া ছোট ছোট ঢিল কাহারও বা গায়ে ও কাহারও বা সম্মুখে পড়িতে লাগিল। প্রায় ১ ঘণ্টা কাল ঐরূপ ঢিল পড়িতে লাগিল। তখন আমার বাটীর স্ত্রীলোকেরা বলিল যে, বোধ হয় ভূতে ব্রাহ্মণের গায়ে ঢিল ফেলিবে না। তাহাতে আমার গুরুপুত্রকে বাহির প্রকোষ্ঠ হইতে দোতলার উপরে আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, ঐ স্থানে লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহার গায়েও ২।৩টী ঢিল পড়িল। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আমরা কায়স্থ ও উপবীতধারী নহি, তজ্জন্য আমার মাতুলের শ্রাদ্ধ ১ মাসে সম্পন্ন হইয়াছিল।

রাত্রি ১টার সময় আমার মাতুলপুত্রকে আমরা যেখানে ছিলাম ঐ স্থানে লইয়া যাওয়া হইল, এবং আমার ভগ্নী বলিল যে "যদি তুমি আমার মামার প্রেতাত্মা হও তবে শরতের (আমার মাতুলপুত্রের নাম শরৎ) গায়ে ঢিল ফেল, তাহার পরই তাহার গায়ে ও সম্মুখে ৩টী ঢিল পড়িল। তখন আমরা দোতলার ছাদে ও অন্যান্য স্থানে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম; কিন্তু কোন মনুষ্যের সন্ধান পাইলাম না বরং যখন আমরা দোতালার ছাদের উপর তখন সেখানে ৩টী ঢিল পড়িল। ঢিলগুলি ছোট ছোট, এবং মাটীর ও বালিচুণমিশ্রিত গোটা গোটা রকমের।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা মনুষ্যের কার্য্য বলিয়া অনায়াসেই অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু পাঠকবর্গ ইহার পর যে সকল ঘটনা শুনিবেন, তাহাতে শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় স্পন্দিত হইবে।

যখন আমরা ১৫।১৬ জন রেলিংএর নিকট দাঁড়াইয়াছিলাম, সেই সময় আমার এক ভগিনীপতি ও আমার ১২ বৎসর বয়স্ক একজন ভাগিনেয়

ও ১৫ বৎসর বয়স্কা এক ভাগিনা-বৌ একটী ঘরের ভিতর মশারির মধ্যে ছিলেন। তিনি বলিলেন, "কিরূপ ভূত। হরিদ্রা পোড়াইয়া দিলে পলায়ন করিবে।" তাহাতে ঐ ঘরের মধ্যে ক্রমাগত ১৫।১৬টি ঢিল উপর্য্যুপরি পড়িতে লাগিল এবং ঐ ঘরের একটী আলমারীর উপরে একটী ঔষধের শিশি ও ছোট কাঁচের গেলাস ছিল, তাহা আলমারীর উপর হইতে পড়িয়া গেল, গেলাসটী ভাঙ্গিয়া গেল; কিন্তু শিশির কাঁচ খুব পুরু ছিল বলিয়া শিশিটী ভাঙ্গিল না। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, ঐ ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ ছিল। কেবল একটী দরজা সামান্য খোলা ছিল, কিন্তু ঐ দরজার বাহির হইতে কোন লোক ঢিল ফেলিতে পারে না; কারণ তাহার নিকটেই আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম। তখন তাহারা সকলে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া আমাদের নিকট আসিল, এবং রাত্রি প্রায় ২॥টার সময় আমার বাটীর সকলে ৩।৪ ঘরে শুইয়া থাকিলাম। যে ঘরে কাঁচের গেলাস ভাঙ্গিয়াছিল, শিশি ও ঢিল পড়িয়াছিল, ঐ ঘরে ভয়ে কেহই থাকিল না। সেই ঘরের সমস্ত দরজা ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া রাখা হইল।

১৪ই চৈত্র বুধবার প্রাতঃকালে ঐ ঘর খুলিয়া দেখা গেল যে, সমস্ত ঘরের মধ্যে মিছরি ছড়ান আছে এবং মিছরীর ভাঁড়টী একটী বালিসের নীচে রাখিয়া দিয়াছে। তখন ঐ ঘর পরিষ্কার করিয়া পুনরায় সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া রাখা গেল, কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলিয়া দেখা গেল যে, ঐ ঘরের কতকস্থানে কাগজ কুচি কুচি করিয়া ছড়ান আছে। আমি নিজে ঐ কাগজের কুচিগুলি দেখিতে গেলাম, ঠিক সেই সময়ে ঐ ঘরের একটী তক্তার উপরে একখানি কাগজ ছিল তাহা বিদ্যুৎ সঞ্চালিতের ন্যায় নড়িয়া উঠিল। তখন আমি ঐ কাগজখানি স্বহস্তে তুলিয়া দেখিলাম যে তাহার নীচে ইন্দুর কি টিকটিকী, কি তেলাপোকা কিছুই নাই; কি তাহার নিকটে কোন ইন্দুরের গর্ত্ত নাই। তখন ঐ ঘরের সমস্ত দরজা পুনরায়

বন্ধ করিয়া রাখা হইল। বেলা ১০টার সময় দেখা গেল যে, ঐ ঘরের ২টী দরজা হঠাৎ খুলিয়া গেল এবং ঐ ঘরের মধ্য হইতে ৪।৫টী বালিস ও ৪।৫ খানি লেপ ও তোষক উপরতলা হইতে নীচের উঠানে পড়িয়া গেল, কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখা গেল যে ঐ ঘরে কোন লোক নাই।

ঐ ১৪ই তারিখেই প্রাতঃকালে বেলা ৭টার সময় আমার একজন চাকরাণী একখানি থালায় চাউল ধুইয়া আমার ভ্রাতৃবধূর সম্মুখে রান্নাঘরে রাখিয়া দিল। তাহাদের সম্মুখে থালসমেত চাউল শূন্যে উঠিয়া ঐ ঘর হইতে দরজা দিয়া বাহির হইয়া সবেগে ঐ ঘরের বাহিরে যাইয়া পতিত হইল। তাহার কিছুক্ষণ পরে ঐ রান্নাঘরের একটী কোলঙ্গা হইতে একটী মাটীর হাঁড়ী (যাহাতে তেজপাতা ও লঙ্কা ছিল) শূন্যে উঠিয়া রান্নাঘরের মেজেতে পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়া সমস্ত ঘরে তেজ পাতা ও লঙ্কা ছড়াইয়া পড়িল। তাহার পর ঘর পরিষ্কার করিয়া আমার ভ্রাতৃবধূ উনানের উপর ভাত চাপাইয়াছিল; ভাত ফুটিতেছে, এমন সময় ঐ রান্না-ঘরের বারান্দা হইতে একটী মাটীর প্রদীপ শূন্যে উড়িয়া যাইয়া ঐ ভাতের হাঁড়ীর মধ্যে পতিত হইল। তাহার পর আমার ভ্রাতৃবধূ ভাত নামাইয়া একটী লোহার কড়াইয়ে আলুর দম রান্না করিতে আরম্ভ করিল। আমার ভ্রাতৃবধূ খুব ভয় পাইয়াছিল। তখন রান্নাঘরের মধ্যে ৪।৫ জন লোক উপস্থিত। তাহাদের সম্মুখে রান্নাঘরের একটী কোলঙ্গাতে একটী নারি-কেলের মালাতে ঝালের গুঁড়া ছিল। ঐ ঝালের গুঁড়া সমেত নারিকেলের মালা শূন্যে উড়িয়া যাইয়া আলুর দোমের কড়াইয়ে পতিত হইল।

তখন প্রাতঃকাল, বেলা প্রায় ৯টা। এই সকল অলৌকিক ঘটনা দেখি-বার জন্য আমার বাটীর ভিতর প্রকোষ্ঠের বারান্দায় ও উঠানে স্ত্রীলোক ও পুরুষে প্রায় ৫০।৬০ জন উপস্থিত। আমি নিজেও একটী বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলাম। এই সকল অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া আমার ভাগিনা-

বৌ ভয়ে এত আড়ষ্ট হইয়াছিল যে, তাহাকে আমার বিমাতা চাপিয়া ধরিয়া কোলের মধ্যে লইয়াছিলেন এবং তাহার শ্বশুর অর্থাৎ আমার ভগ্নীপতি তাহার নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন। এমন সময়ে আমারও ঐ ৫০।৬০ জন লোকের সম্মুখে তাহার গলা হইতে সোণার কড়িহার জোরে খুলিয়া যাইয়া শূন্যে উড়িয়া যাইয়া ১০।১২ হাত তফাতে আমার মাতুলের পৌত্রের হাতের উপর পতিত হইল এবং আমি তৎক্ষণাৎ যাইয়া তাহা কুড়াইয়া লইলাম। ইহার অব্যবহিত পরেই তাহার অঙ্গুলী হইতে সোণার অঙ্গুরী খুলিয়া গিয়া ৫।৬ হাত তফাতে পতিত হইল। তাহার একটু পরেই আমার ভাগিনা-বৌ এই বলিয়া কাঁদিতে লাগিল যে, ভূতে আমাকে কিল মারিতেছে। যখন এই ঘটনা হয় তখন বেলা ১০টা, তখন রান্নাঘর হইতে ভাত, আলুর দম আনিয়া অন্য একটী ঘরে রাখা হইল এবং সেখানে ৪।৫ জন লোক সতর্কভাবে থাকিল, তখন সেখানে একটী পাথরের নোড়া শূন্যে উঠিয়া ৪।৫ হাত তফাতে পড়িত। একটী ঘটনা ইহার পূর্ব্বেই হইয়াছে তাহা লিখিতে ভুলিয়াছি, তাহা এই :—যখন রান্নাঘরে একটী পিত্তলের গামলাতে ভাত ঢালিয়া একখানি থালা দিয়া ঢাকিয়া রাখা হইয়াছিল এবং দুইজন লোক তাহা দেখিতেছিল, তখন ঐ ভাতের গামলা শূন্যে দুই হাত উঠিল, তাহাতে আমার একজন চাকরাণী "ভূতে ভাত লইয়া গেল" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন ঐ গামলা সজোরে মাটীতে পতিত হইল।

ঐ দিন বেলা ১২টার সময় অন্য একটী ঘরে একটী পাথরের বাটী একটী আলমারীর উপরে ছিল, উহা সেই স্থান হইতে শূন্যে উঠিয়া মাটীতে পতিত হইল, এবং ভাঙ্গিয়া গেল এবং বৈকালে বেলা ৪টার সময় রান্না-ঘরের একটী কোলঙ্গা হইতে একটী মাটীর হাঁড়ী যাহাতে তিলেবড়ী ছিল তাহা শূন্যে উঠিয়া মাটীতে পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সন্ধ্যার কিছু

পূর্ব্বে দুইখানি ফর্ম্মা ইট ভিতর প্রকোষ্ঠের উঠানে সজোরে পতিত হইল এবং ছোট ছোট ঢিল পড়িতে লাগিল।

ঐ দিন বেলা ৯টার সময় আমার ভাগিনা-বৌএর পরিধানে যে কাপড় ছিল, তাহা অনেকটা ছিঁড়িয়া গেল এবং আমার একজন ভগিনীর পরিধানের কাপড় ছিঁড়িয়া গেল এবং তাহার কিছুক্ষণ দেখা গেল যে, ৩।৪ খানি কাপড় যে সব শুকাইতে দেওয়া হইয়াছিল সে বস ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

ঐ দিন বেলা ১টার সময় দোতলার একটী ঘরের মধ্যে আলমারীর উপর একটী মাটীর ভাঁড় ছিল, তাহা শূন্যে উঠিয়া ঘরের মেজেতে পতিত হইল এবং একটী কাষ্ঠের হাত বাক্স আলমারীর উপর হইতে উত্থিত হইয়া একটি দস্তার নিকট খাড়াভাবে পতিত হইল। বৈকালে একটী কাঁসার গেলাস শূন্যে উঠিয়া ৩।৪ হাত তফাতে পতিত হইল এবং আমার বাড়ীর ভিতরের প্রকোষ্ঠের উঠানে দুইখানি ফর্ম্মা ইট পতিত হইল।

ঐ দিন বৈকালে আমার ঢেঁকিশালার প্রকোষ্ঠ হইতে একটী ঢিল প্রথমতঃ শূন্যে পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া তৎপর দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া উত্তরাভিমুখে যাইয়া রান্নাঘরের দরজা দিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার ভাগিনা-বৌ যেখানে দণ্ডায়মান ছিল, তাহার নিকট পতিত হইল।

ঐ দিন সন্ধ্যার সময় একটী ঘরে আমার স্ত্রী, ভ্রাতৃবধূ, ভাইঝি ও ৩।৪ জন লোক ছিল, হঠাৎ একখানি বাক্সভাঙ্গা কাষ্ঠের টুকরা বাহির হইতে সজোরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একজনের গায়ে লাগায় মাটীতে পতিত হইল। তাহার পরক্ষণেই আমার স্ত্রীর ও ভ্রাতৃবধূর পৃষ্ঠে সজোরে চিমটা কাটিল, তখন বাটীর সকলে ভয়ে জড়ীভূত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, তাহার পর রাত্রিতেও ঢিল পরা এবং সামান্য সামান্য ঘটনা হইয়াছে।

পাঠকগণ আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ভয়ে এক্ষণে বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলির উল্লেখ করিব। সামান্য সামান্য ঘটনাগুলির উল্লেখ করিব না।

১৫ই চৈত্র বৃহস্পতিবার বেলা ৭টার সময় আমার ঢেঁকীশালের প্রকোষ্ঠের একটী ঘরে গরুর খাইবার জন্য নাড়া ছিল, তাহা ঈষৎ দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং ঐ ঘরের তিন জোড়া কপাট ও চৌকাট পোড়াইয়া দিল। অনেক লোকজন জুটিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করাতে আর ক্ষতি হইল না। ঐ দিন বেলা ৩টার সময় আমার ভিতর প্রকোষ্ঠের দোতলায় একটী ঘরের খাটের উপরে বিছানা ছিল, তাহা হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। তখন সকলে মেলিয়া অনেক কষ্টে ঐ অগ্নি নির্ব্বাণ করিল।

তাহার পর প্রতিদিনই কিছু কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছে।

ইহার পর তিন দিন প্রেতাত্মাকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। একদিন খান নাই; দুই দিন খাইয়াছিলেন, উহার বিবরণ এই:—একদিন আমাদের রান্নাঘরের মধ্যে বেলা ১॥টার সময় একখানি কাষ্ঠাসন দিয়া ও একগ্লাস জল দিয়া একটী বাটিতে দুধ ও ভাত দেওয়া হইল, এবং একখানি কাগজে চিনি দেওয়া হইল এবং রান্নাঘরের দরজাগুলি ভাল করিয়া বন্ধ করা হইল, বেলা ৪টার সময় দরজা খুলিয়া দেখা গেল যে, দুধ ভাত উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে এবং কাগজে যে চিনি ছিল, তাহাতে আঙ্গুলের চিহ্ন আছে এবং গ্লাসের গায়ে দুধ ও জলের দাগ আছে. আর একদিন ঐ রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মাছ ভাত ও আম্রের টক দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও খাইয়াছিলেন।

গত কল্য প্রাতঃকালে কলিকাতা হইতে আমার এক ভাইপো, এক ভাগিনেয় ও তাহাদের বাসার দুইজন কলেজের ছাত্র এই সকল অলৌকিক ঘটনা দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। গত কল্য রাত্রিতে প্রথমতঃ তাঁহাদের সম্মুখে কয়েকটী ঢিল পড়িল, তাহার পর তাঁহারা আহারাদি করিয়া আমার

ভিতর বাটীর প্রকোষ্ঠে বারান্দার উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের সম্মুখে ৫।৬ খানি নারিকেলের ছোবড়া ও কয়েকটী ঢিল ভিতর বাটীর উঠানে পতিত হইল, এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, আমার ভিতর বাটীর উঠানে কাকের উৎপাত নিবারণের জন্য দড়ীর জাল দেওয়া হইয়াছে, বাহির হইতে নারিকেলের ছোবড়া ফেলিলে নিশ্চয়ই ঐ জালের উপর পতিত হইবে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে দড়িতে না আটকাইয়া এখানে পতিত হইল, তখন তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল যে, ইহা অলৌকিক কাণ্ড।

আমি ৺ গয়াধামে পিণ্ডদান করিবার জন্য গত কল্য লোক পাঠাইয়াছি। যেরূপ ফলাফল হয়, পরে জানাইব। এক্ষণে আমারা জিজ্ঞাস্য এই যে বিংশ শতাব্দীতে সহরের উপর ৫০।৬০ জন লোকের সম্মুখে এরূপ অলৌকিক ঘটনা কেহ দেখিয়াছেন কি ?

শ্রীতরণীমোহন রায়, বি-এল, উকিল;

বহরমপুর।

প্রত্যক্ষ আত্মাদর্শন।

গত কার্ত্তিক মাসে আমাদের কারখানার কোনও কার্য্য-উপলক্ষে আমি ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কলিকাতা যাইয়া ৭০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে থাকি। একদিন সন্ধ্যাবেলা (কোন্ তারিখে আমার ঠিক স্মরণ নাই) বৌবাজারের কোনও গলির একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আসিয়া আমাকে অনুসন্ধান করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ সে সময় আমরা কেহই বাসাতে

ছিলাম না। রাত্রি প্রায় ৮ ঘটিকার সময় মাত্র বাসাতে পঁহুছিয়াছি, এমন সময় সেই ভদ্রলোকটী আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমার সহিত কোনও গোপনীয় আলাপ আছে বলিয়া আমাকে রাস্তায় ডাকিয়া আনিলেন।

এ ভদ্রলোকটী আমার অনেক দিনেরই পরিচিত। ইনি কোনও গবর্ণমেণ্ট অফিসে চাকুরী করেন। লোকটী খুব বিনয়ী ও ধর্ম্মভীরু। বাহিরে আসিয়াই খুব লম্বা চৌড়া বিষয়ের ভূমিকাসহ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"আমাদের আফিসের একটী বাবুর কন্যার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে তিনি কয়েকটী কথা জানিতে ইচ্ছা করেন, যদি আপনি একবার সে ভদ্রলোকের বাড়ী যাইতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হইব। বাড়ী অধিক দূর নহে, শ্যামবাজারের * * * গলিতে। আগামী কল্য ভোরে আপনাকে সেখানে লইয়া যাইব।" এই কথার পর উক্ত ভদ্রলোকটী তাঁহার বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। আমি প্রায় ১৫।২০ মিনিট রাস্তার ফুটপাথে দাঁড়াইয়া ঐ বিষয়টী চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটুকু পরেই আমার শরীরটী যেন বড়ই দুর্ব্বল বোধ হইতে লাগিল এবং যেমন একটা নেশার ভাব বোধ করিলাম। যেন শরীর অবসন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে। মনে করিলাম বাহিরের ঘরে বসিব, কিন্তু তাহাও পারিলাম না। কে যেন আমাকে আমার শয়নকক্ষের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমার শয়নকক্ষ উপরে। নীচের তলায় আমার যথেষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল; তাহা করিতে যাইব মনে করিতেছি, কিন্তু পারিতেছি না। যাহা হউক, আমার কর্ত্তব্যের ভার, আমার কনিষ্ঠ শ্রীমান্ সতীশচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া উপরে আমার শয়নকক্ষে গেলাম। কেন গেলাম তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কারণ, তখন আমার অর্দ্ধচেতনাবস্থা। উপরে যাইয়াই সার্টের পকেট হইতে পেন্‌সিল খুলিলাম এবং এক টুকরা

কাগজ লইয়া কতকগুলা কথা লিখিলাম। কেন লিখিলাম এবং কাহার জন্ত লিখিলাম, মোটেই বুঝিতে সময় হইল না, লেখা শেষ হইলে পর যেন হঠাৎ আমার শরীর খুব সুস্থ বোধ হইল। আকস্মিক কোন শব্দ শ্রবণ করিলে যেমন ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, আমারও যেন তেমনই হইল। কি লিখিলাম তাহা তখন পড়িয়া দেখিলাম এবং পকেটেই পূরিয়া রাখিলাম।

শরীর বেশ সুস্থ বোধ করিলাম, পরে নীচের তলায় আসিয়া পাইখানাতে গেলাম। পাইখানাতে বসিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ দেখিলাম যেন একখানা স্ত্রীলোকের খুব বড় পাড়ওয়ালা কাপড় আমার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া গেল। প্রথমতঃ একটুকু ভীত হইলাম, কিন্তু উহাকে চোখের ধাঁধা বলিয়া নিজেই নিজেকে প্রবোধ দিয়া চলিয়া আসিলাম।

একটা কথা বলিতে ভুল হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে যখন আমি লিখিতে-ছিলাম, তখন যেন একটী স্ত্রীলোককে আমি আমার পার্শ্বে, ডানদিকে দাঁড়াইতে দেখিয়াছি। তাহার বয়স অনুমান ১৬৷১৭ বৎসর হইবে। মুখের আকৃতি আমার ঠিক স্মরণ আছে। আর পায়খানাতে বসিয়া যে বস্ত্রখানা দেখিয়াছি তাহার পাড়ের রংও আমার ঠিক মনে আছে।

পরদিন প্রভাতেই খুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মনে করিলাম, এ সময়ে হয়ত তিনি আসিবেন না ; কিন্তু প্রায় সাড়ে সাতটার সময় তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখনই বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া উক্ত ভদ্রলোকের সহিত পূর্ব্ব দিবসের কথিত স্থানে, ট্রামযোগে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

আমরা যাইয়াই সেই ভদ্র লোকটীর বৈঠকখানাতে বসিয়া আছি, এমন সময় তিনি আমাদের জন্ত চা আনিতে বাড়ীর ভিতর গেলেন। ঐ সময়ে একটী ১৬৷১৭ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক আসিয়া আমাকে প্রণাম করিয়া গেলেন। পূর্ব্ব দিবস রাত্রিতে যে মুখখানা প্রত্যক্ষ করিয়া ছিলাম, ইহার মুখের আকৃতি ঠিক সেইরূপ। পরণের কাপড়খানা ও

আমার খুব পরিচিত। কারণ, যে কাপড়খানা পায়খানাতে বসিয়া আমার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম, স্ত্রীলোকটীর পরিহিত বস্ত্রখানাও ঠিক সেইরূপই।

যাঁহার সহচর হইয়া সেখানে যাই, সেই ভদ্রলোকটীকে এ মেয়েটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার কথা শুনিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কারণ, তিনি কাহাকেও দেখিতে পান নাই। অথচ আমরা দুইজন এক জায়গাতেই বসিয়াই আছি, আমাদের ব্যবধান দেড় হাতের অধিক হইবে না।

একটুকু পরেই বাটীর কর্ত্তা "চা" লইয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটী ৭।৮ বছরের বালিকাও আসিল। চা পান করিতে করিতে উক্ত স্ত্রীলোকটীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, "এই মেয়েটি ত নয়!" আমি যাহাকে দেখিয়াছিলাম তাহার বয়স ইহার চেয়ে অনেক বেশী এবং দেহের আয়তন অনেক পুষ্ট এবং পরিহিত বস্ত্র অন্য রকম।

ইহাতে ভদ্রলোকটী মনে করিলেন যে; হয় তাঁহার স্ত্রী আমাকে প্রণাম করিয়াছেন। কিন্তু বাড়ীর ভিতরে যাইয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এই উত্তর দিলেন যে, "অপরিচিত ভদ্রলোকদের বাহিরের ঘরে প্রণাম করতে যাব কেন?" এ কথা তখন তিনি আমাদের নিকট প্রকাশ করিলেন না। তবে এইমাত্র বলিলেন যে, "বাড়ীর লোকই কেউ হবে।" কিন্তু সে বাড়ীতে যে, ঐ বালিকা, তাঁহার স্ত্রী এবং ঝি ব্যতীত অন্য স্ত্রীলোকই নাই, সে কথা আমাদিগকে জানিতে দিলেন না।

এই কথার পর হঠাৎ গত পূর্ব্ব দিবসের লিখিত কাগজখানার কথা মনে হইল। কাগজখানা খুলিয়া তাঁহাকে দিলাম। পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, সে সমুদয় প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য আমাকে আহ্বান

করিবার প্রয়োজন, তাহার সবই উহাতে লিখিত আছে। তবে একটি মাত্র কথা ঠিক হয় নাই। উহা তাহার নামের আগুক্ষর।

প্রায় দুই ঘণ্টা প্রেততত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনার পরে আমরা চলিয়া আসিলাম। পর দিবস ঐ ভদ্রলোকের মুখেই জানিতে পারিলাম যে, তাঁহার বাড়ীতে ঐরূপ ১৬।১৭ বৎসর বয়স্কা কোন স্ত্রীলোক নাই। যে স্ত্রী লোকটীকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, উহা নিশ্চয়ই তাহার মৃতা কন্যার প্রেতাত্মা।

আমার জীবনে এই তৃতীয় বার প্রত্যক্ষ আত্মাদর্শন করিলাম। ইহার মধ্যে একবার রীতিমত আলাপও হইয়াছিল। পূর্ব্ব দিনের রাত্রিতে যখন ঐ স্ত্রীলোকটীকে দেখি এবং তাহার কথা লিখিয়া লই, তখন তাহার বস্ত্রের দিকে লক্ষ্য করি নাই এবং ভবিষ্যতে দেখা দিলে হয়ত তাহাকে চিনিতে পারিব না, এইজন্যই বোধ হয় পায়খানাতে যাইয়া বস্ত্র দেখাইয়া আসে। যখন আমি দেখিতেছিলাম, তখন কাহারও কোন কথা শুনিতে পাই নাই; কিম্বা আমি কিছু চিন্তা করিয়াও লিখি নাই। আমার হাত যেন আপনিই চলিতেছিল। এ অবস্থা আমার জীবনে এইবারই প্রথম হয়। ইহার পর হইতেই আত্মার সাহায্যে লিখিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করি। সম্প্রতি আমার সে চেষ্টা কতক পরিমাণে সার্থক মনে করিতেছি। কারণ, একটী মহাপুরুষের আত্মা আমাকে একখানা পুস্তক লিখিয়া দিতেছে। উহা সম্পূর্ণ হইলে, এই পত্রিকাতেই ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইবে। উহার নাম রাখিয়াছি—"পরলোকে মানব"।

শ্রীসুরেশচন্দ্র গাঙ্গুলী।
চাঁদপুর।

পুনরাগমন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(৪২)

এই সাতদিনে সাতবৎসরের ঘটনা সংঘটিত হইল। এই সাতদিন ক্রমাগত নিয়তির সঙ্গে যুদ্ধ করিলাম। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ঘরে ফিরিলাম। গোপালকে ফিরাইবার আশা জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি। কুক্কুর-তাড়িত শশক যেমন প্রান্তর হইতে প্রান্তরান্তরে প্রাণরক্ষার্থ ছুটাছুটি করিয়া, অবশেষে অবসন্নদেহে চক্ষু মুদিয়া, নিজের শক্তিহীনতার উপাধানে মাথা রাখিয়া নিশ্চিন্ত হয়, আমিও সেইরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছি।

নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে ফিরিলাম। মনে করিলাম, আর গোপালকে ফিরাইবার ধৃষ্টতা করিব না। প্রতিশ্রুতিমত গোপাল নিজে আমাদের গৃহে আসিয়া যদি কখন আমার সহিত দেখা করে, তবেই তাহার সহিত দেখা ঘটিবে, নহিলে বোধ হয়, আর তাহার রহিত দেখা পর্য্যন্ত হইবে না।

আর দেখা হইলেই বা লাভ কি? এ ভগ্ন স্নেহের মৈত্রী—ইহার মূল্য কি! এ দেখার সঙ্গে পূর্ব্বের সে আত্মীয়তা আর কি ফিরিয়া আসিবে? আমি আত্মীয়তা দেখাইতে গেলে সে কি আর তাহাতে বিশ্বাসস্থাপন করিবে? আমিও কি আর তাহার সহিত সেইরূপ কথাবার্ত্তায় সুখ পাইব! তখন গোপালের উপর ঈর্ষাতেও মমতার একটী প্রাণস্পর্শী তরঙ্গ বহিত। এখন এই সাতবৎসর পরে তাহার প্রতি মমতাও বুঝি মরুভূমিবৎ শুষ্ক। তাহাতে একটু প্রাণের ইঙ্গিত থাকিলেও গোপালকে না লইয়া কি ফিরিতে পারিতাম!

বাটীতে যখন ফিরিলাম, তখন রাত্রি নয়টা। বাটীতে প্রবেশমুখে পিতার সঙ্গেই সর্ব্বপ্রথম আমার দেখা হইল। চিন্তার ভারে অবনত-মস্তকে আমি গৃহপ্রবেশ করিতেছিলাম। সুতরাং আমি তাঁহাকে প্রথম দেখিতে পাই নাই, তিনিই প্রথম আমাকে দেখিলেন। ফটক পার হইয়া বাটীর সম্মুখের বাগানে যেমন পা দিয়াছি, অমনি তিনি আমার নাম ধরিয়া ডাকিলেন। আমি মাথা তুলিতেই তিনি বলিলেন—"শীঘ্র আসিয়া ভালই করিয়াছ। আমি তোমার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলাম।"

আমি বলিলাম,—"যদি আমার জন্য এত আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করিবেন জানিতেন, তবে এমন আগ্রহের সঙ্গে আমাকে পাঠাইবার কি প্রয়োজন ছিল?"

পিতা আমার উত্তর শুনিয়া ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলিলেন—"কি ছিল, না ছিল, সে কথা বলিবার এ সময় নয়। আগে ঘরে যাও, বেশপরিবর্ত্তন করিয়া বিশ্রাম কর? তার পর যাহা শুনিবার শুনিও।"

আমি বলিলাম—"আমি কোথায় গিয়াছিলাম, মা কি শুনিয়াছেন?"

"শুনিয়াছেন।"

"তা হ'লে আমি কোন্ মুখে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব?"

"এই মুখেই দেখা করিবে। তিনি তোমাকে কোনও প্রশ্ন করিবেন না।"

"আপনি কেমন করিয়া জানিলেন?"

"আমি তাঁর মুখে শুনিয়াই বলিতেছি।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন না করিয়াই মায়ের সঙ্গে দেখা করিলাম। বাস্তবিক মা আমাকে গোপালের সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। কিন্তু জীবনের প্রথম আমি মায়ের মুখের কিছু পরিবর্ত্তন দেখিলাম। দেখিয়া

যেন কোন অনাগত বিপদের ভয়ে আমার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা একেবারে দূর হইল না। মায়ের চিরপ্রফুল্ল মুখ, চিরশান্ত নয়ন-সৌন্দর্য্য কেমন যেন একটা ঘন বিষাদ-কালিমায় ঢাকিয়া দিয়াছে। মায়ের নিকট হইতে চলিয়া আসিবার পরে সেই ভাব মুহুর্মুহুঃ আমার অন্তরে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল—এতদিন পরে মাকে বুঝি হারাইলাম।

সে রাত্রি একরূপ নীরবেই কাটিয়া গেল। পিতার সঙ্গে আর কোন কথা হইল না। মায়ের সঙ্গেও আর কোন কথা হইল না। আহারান্তে শ্রান্তদেহে আমি শয্যায় শুইলাম; এবং শয়নমাত্রেই ঘোর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রত্যূষে জাগরিত হইয়া দেখিলাম, সস্ত্রীক ডাক্তারবাবু মায়ের কাছে বিদায় লইতেছেন। তিনি কখন আসিয়াছেন জানিতে পারি নাই। মায়ের সঙ্গে তাঁর কি কি কথা হইয়াছিল, তাহাও শুনি নাই।

যাইবার সময়ে ব্রাহ্মণ-দম্পতী মাকে প্রণাম করিলেন, মা প্রণাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা আমাকেও প্রণাম করিতে আসিলেন, মা প্রণাম করিতে দিলেন না। পিতাকে প্রণাম করিতে চাহিলেন, মা বলিলেন—"প্রয়োজন নাই। তাঁহার শয্যাত্যাগে বিলম্ব হইবে। অপেক্ষা করিলে কার্য্যহানি হইবার সম্ভাবনা। এ লৌকিকতা দেখাইবার সময় নয়। আর সংসারের দিকে না তাকাইয়া, পিছু না ফিরিয়া এখনি এই শুভ মুহূর্ত্তে যাত্রা কর।"

ডাক্তারবাবু মায়ের আদেশে অমনি স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

আমি নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিলাম। নীরব—অপরাধীর মত নীরব—সাহস করিয়া মনের মধ্যেও কোন কথা আনিতে পারিলাম না।

আমার অবস্থা বুঝিয়াই যেন মা কথা কহিলেন। বলিলেন—"তোমার কপালে আঘাত লাগিয়াছে, আমি শুনিয়াছি, কিন্তু দেখিবার অবকাশ পাই নাই।"

মাথার আঘাতের কথা আমার মনেই ছিল না। মায়ের কথায় মনে পড়িল। মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম মাথার বাঁধা খসিয়া গিয়াছে। তবে কালীঘাটের সেই ডাক্তার বন্ধুর তৎকালীন শুশ্রূষায় যথেষ্ট কাজ হইয়াছে। মাথার দুই এক স্থানে সামান্য ক্ষত থাকিলেও তাদৃশী বেদনা নাই। বুঝিলাম, পতনজনিত আঘাত তেমন গুরুতর নয়, উপরে উপরে কাটিয়া কতকটা রক্ত পড়িয়াছে মাত্র! মস্তক-পরীক্ষান্তে মাকে বলিলাম—"আঘাত সামান্য, এখন সারিয়া গিয়াছে।"

শুনিয়া আশ্বস্ত হইয়া মা চলিয়া যাইতেছিলেন! আমি ডাকিয়া তাহাকে ফিরাইলাম। মর্ম্মযাতনা আমার পক্ষে দুঃসহ হইয়াছে। এ যাতনার কথা প্রকাশ করিতে না পারিলে হয় পাগল হইব, না হয় মরিয়া যাইব। সুতরাং যা থাকে অদৃষ্টে মাকে আজ গোপালের কথা জিজ্ঞাসা করিব, এই ভাবিয়া মাকে ডাকিলাম। মা ফিরিলেন! জিজ্ঞাসা করিলেন—"ডাকিতেছ কেন?"

আমি। যদি কিছু মনে না কর, অথবা আমাকে ক্ষমা কর, তাহা হইলে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

মাতা। কি জিজ্ঞাসা করিবে বুঝিয়াছি।

আমি। অপরাধ যদি না লও তাহা হইলে—

মা আমাকে কথা শেষ করিতে দিলেন না। প্রশ্নমুখেই বাধা দিয়া বলিলেন—"প্রথমে প্রতিশ্রুত হও, আমার পুত্রের নাম তুমি মুখে আনিবে না।"

আমি। মা! আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি?

মাতা। কেহ কোন অপরাধ কর নাই। আমিত কাহাকেও অপরাধী বলিতেছি না। তবে তাহার নাম আমি তোমাদের মুখে শুনিতে চাহি না। আমার এই অনুরোধ যদি তুমি রাখিতে চাও, তাহা হইলে কি জিজ্ঞাসা করিবে কর। আমি যেমন জানি, তেমন উত্তর করিব।

আমি। আমি তাহাকে আনিতে গিয়াছিলাম।

মাতা। আমি তাহা জানিয়াছি।

আমি। ভাল, আর কিছু না বল, এইটী বল, পিতা কাল প্রাতঃকালে তাহাকে আনিতে ব্যাকুল হইয়া আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন। আমি জানিতে চাই, আজ আবার এত আগ্রহে আমাকে ফিরাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন কেন?

মাতা। কেন পাঠাইয়াছিলেন জানি না, তবে তোমাকে ফিরাইবার জন্য আমিই তাঁহাকে দরোয়ান পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছি। আমারই কথামত তুলা সিং তোমাকে আনিতে গিয়াছে।

আমি। অপরাধের কি ক্ষমা নাই? পিতা ত সর্ব্বস্ব তাহাকে দিবেন বলিয়া আমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

মাতা। তোমাদের সর্ব্বস্ব তোমাদের কাছেই মূল্যবান হইতে পারে, সকলের কাছেই কি তাহা মূল্যবান হইবে গোপীনাথ! সে যাহা হারাইয়াছে, সহরের সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিলেও তার প্রতিমূল্য হইবে না।

আমি। তাহাই তাহাকে দিব অঙ্গীকার করিতেছি। মায়ের স্নেহই আমি তাহাকে ফিরাইয়া দিব।

"হতভাগ্য! একথা আগে বল নাই কেন?" এই কথা বলিতে বলিতে মায়ের গণ্ড দিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইয়া গেল।

আমি বলিলাম—"এমন কি সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে?"

"আর কয়দিন সে সে স্নেহভোগ করিবে।" এই বলিয়াই একটী দীর্ঘ

নিশ্বাস ফেলিয়া মাতা স্থানত্যাগ করিলেন। আমার আর একটী প্রশ্নেরও অপেক্ষা করিলেন না।

উত্তরের ভাবে বুঝিলাম, মাতা অধিক দিন জীবিত থাকিবেন না। অর্দ্ধভগ্নহৃদয়ে আমি বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলাম।

একটু বেলা হইলে পিতার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"সকাল সকাল স্নানাদি সারিয়া প্রস্তুত হও। আজই তোমাকে বড় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। কলিকাতা ও তাহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কাজ, সাহেবের সঙ্গে দেখা না করিলে এরূপ শুভ সুযোগ আর ঘটা অসম্ভব।

আমি বলিলাম—"আমি কোথায় ছিলাম আপনি জানিতেন না। যদি তুলা সিং আমার সন্ধান না পাইত ?"

পিতা। সন্ধান পাইয়াছে, তোমার ভাগ্য। যে সময় তোমার নিয়োগপত্র পাইলাম, সে সময় তুমি কোথায় গিয়াছ না জানিয়া আমি চিন্তিত হইয়াছিলাম, এমন সময় তোমার কালীঘাটের বন্ধু লোক দিয়া এই পত্রখানি আমার কাছে পাঠাইয়া দেয়। সেইপত্র পাঠে বুঝিলাম তোমার কোথায় থাকা সম্ভব।

এই বলিয়া পিতা তাকিয়ার তলা হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া আমাকে দেখাইলেন। পত্র পড়িয়া বুঝিলাম, মুখুয্যে মহাশয় গোপালের বিবাহ-সম্বন্ধে পিতাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। কিন্তু পিতা ত এ নিমন্ত্রণের মর্য্যাদা রাখেন নাই ; মনে বড়ই ক্ষোভ হইল। অসুস্থতার অছিলায় পিতা সে বনদেশে না যাইতে পারেন ; কিছু অর্থব্যয় করিয়া লৌকিকতা ত রক্ষা করিতে পারিতেন ! পত্রসম্বন্ধে নীরব রহিতে পারিলাম না। পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ পত্র পাইয়া ত আপনি এ বিবাহের কোনও তত্ত্ব লইলেন না।"

পিতা। কেমন করিয়া লইব! গোপালের বাপ ত আমাকে পত্র লিখে নাই। এক অপরিচিত ব্যক্তির আহ্বানে আমি কি তত্ত্ব লইব!

আমি। আমি জানি গোপালের পিতাও এ বিবাহ-সম্বন্ধে পূর্ব্বে কিছু জানিতেন না। তিনিও আপনার মত এক নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছেন।

পিতা। সে তুমি জান, আমি ত জানি না।

আমি। তথাপি আপনার তত্ত্ব লইতে দোষ কি ছিল? গোপালের ত বিবাহ!

পিতা। লইবার প্রয়োজন দেখি নাই! তাহারা অকৃতজ্ঞ নরাধম। কি এক সামান্য কথার দোষ ধরিয়া চলিয়া গেল—আমি আছি কি মরিয়াছি, পিতাপুত্রে এই সাত বৎসরের মধ্যে একবারও খোঁজ লইল না।

আমি। তাহারা আছে কি মরিয়াছে আপনি খোঁজ লইয়াছিলেন কি?

পিতা। তাহারা সহজে মরিবার নয়—এখনও কতকাল আমার গলগ্রহ হইয়া থাকিবে তার ঠিক কি? মাসে মাসে রীতিমত মাসোহারা পাঠাইতেছি, আবার কি করিয়া খোঁজ লইতে হইবে? এদিকে ত জ্ঞাতিত্বের অভিমান তাহারা কড়ায় গণ্ডায় বজায় রাখিয়াছে, কিন্তু টাকাটা লইবার বেলায় অভিমান রহিল কই?

আমি। আপনি কি ঠিক জানেন, টাকা তাহারা পাইতেছে?

পিতা। রীতিমত রসিদ পাইতেছি, আবার কেমন করিয়া জানিতে হইবে?

আমি। আমি জানিয়াছি, টাকা তাহারা পায় নাই।

কথাটা শুনিবামাত্র পিতা কিয়ৎক্ষণের জন্য স্তম্ভিতের ন্যায় নীরব রহিলেন। কিছুক্ষণ কি মনে চিন্তা করিলেন। তারপর বলিলেন—"তুমি বিষয়-বুদ্ধিহীন, কেহ তোমাকে হয়ত এই কথা বলিয়াছে। কিন্তু

আমি এ ভিত্তিহীন কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। একদিন পয়সার অভাব হইলে পিতাপুত্রে কলিকাতায় ছুটিয়া আসিত।

বুঝিলাম, আমার কথা শুনিয়াই পিতা চমকিত হইয়াছিলেন। একটু চিন্তা করিতেই সে ভাব তাঁহার দূরীভূত হইয়াছে। শ্যামকে দিয়া আমরা মাসে মাসে রীতিমত টাকা পাঠাইয়াছি। শ্যাম যে এই সাত বৎসর ধরিয়া টাকা আত্মসাৎ করিতেছে, এ যে নিজ চক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস করিবার যো নাই! সুতরাং আমার কথায় পিতার অবিশ্বাসে আমি দোষ দিতে পারিলাম না। সময়ান্তরে একথা পিতাকে বুঝাইব, ইহা মনে করিয়া টাকার কথা আর পুনরুত্থাপন করিলাম না। পিতার পূর্ব্ব দিনের বিস্ময়জনক আচরণের কারণ জানিবার এই উপযুক্ত সময় বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তবে গোপালকে আনিবার জন্য কাল ব্যাকুলতা দেখাইলেন কেন?

পিতা আমার প্রশ্ন শুনিয়া হাসিলেন। তার পর বলিলেন, "ইহার কারণ আছে। পূর্ব্বদিনে নানা কারণে মস্তিষ্ক পীড়িত হইয়াছিল, সেই অবস্থায় রাত্রিতে এক বিশ্রী স্বপ্ন দেখি। সে স্বপ্নে প্রভাত পর্য্যন্ত আমার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়াছিল, সেই সময়ে আমি তোমাকে কি বলিয়াছিলাম।"

আমি। আপনি বলিয়াছিলেন, 'যদি সর্ব্বস্ব দিলেও গোপাল ফিরিয়া আসে, তাহ'লে সর্ব্বস্ব দিয়াও গোপালকে ফিরাইয়া আন।' আপনি আমাকে গৃহে আহার করিবার অবকাশ পর্য্যন্ত দেন নাই। গোপালের অনুসন্ধানে আমি পৃথিবী ঘুরিতে আদিষ্ট হইয়াছিলাম।

পিতা। তা হইতে পারে। তখন আমার মস্তিষ্ক ঠিক ছিল না। স্বপ্নের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হইতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। তখন আমার মনে হইল, তোমাকে যেন কোথায় পাঠাইয়াছি। ক্রমে অল্পে

অপ্নে অনেক কথাই আমার স্মরণে আসিল। তখন আমার মনে হইল, স্বপ্নের মোহে আত্মহারা হইয়া এক ভিত্তিহীন অলীক চিন্তার তাড়নায় তোমাকে গোপালের সন্ধানে পাঠাইয়া অন্যায় করিয়াছি। কি করিব স্থির করিতে পারিতেছিলাম না, এমন সময় তোমার গর্ভধারিণী আসিয়া আমার সাহায্য করিলেন। তিনি তোমার তত্ত্ব লইতে আমার কাছে আসিলেন; আমি তাহার কাছে তোমার অনুপস্থিতির কারণ বলিলাম। শুনিবামাত্র তিনি তোমাকে ফিরাইয়া আনিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। ঠিক এই সময়ে দুই স্থান হইতে দুইখানি পত্র আসিল। এক খানি তোমার নিয়োগপত্র, আর একখানি তোমার ভাবী শ্বশুরের পত্র; উপযুক্ত সময়ে পত্র দুইখানি আসিয়া আমার যথেষ্ট সাহায্য করিল। আমি তোমাকে আনাইতে তুলা সিংকে পাঠাইব স্থির করিলাম। কিন্তু তুমি কোথায় গিয়াছ, তাহা জানি না। দৈবের খেলা, তোমার বন্ধু সেই সময়ে এই পত্রখানা আমার কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তুলা সিংকে সেইজন্য সর্ব্বাগ্রে এই ব্রাহ্মণের গৃহে পাঠাইয়াছি। সেখানে তোমার দেখা না পাইলে সে আমাদের গ্রাম পর্য্যন্ত যাইত।

আমি। আমি যদি গোপালকে সঙ্গে আনিতাম।

পিতা। আনিলে তাহার ভাগ্যে কিছু প্রাপ্য হইত, তাই দিয়া তাহাকে বিদায় করিতাম। তবে সে কালসর্প শিশুকে আর ঘরে স্থান দিতাম না।

কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম গোপাল ও ছোট ঠাকুর দাদার সম্বন্ধে পিতার মনোভাব সেই একরূপই রহিয়াছে; বরং বাল্যকাল হইতে একত্র বাসে উভয়ের মধ্যে মমতার যৎকিঞ্চিৎ যাহা বন্ধন ছিল, সাত বৎসরের বিচ্ছেদে তাহার শেষ ক্ষীণ সূত্রটাও টুটিয়া গিয়াছে।

পিতা আমাকে সাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন, এবং প্রাতঃকৃত্য সমাধান করিতে গৃহত্যাগ করিলেন।

সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া পিতা আমাকে যে আদেশ করিয়াছিলেন, ভাবিলাম সেই আদেশমত কার্য্য করিলে, গোপালকে গৃহে ফিরাইলে, গৃহে আবার নূতন মূর্ত্তিতে অনর্থের সৃষ্টি হইত। নিমন্ত্রণ করিয়া ঘরে আনিয়া গোপালের অপমান মা কোন মতেই সহ্য করিতে পারিতেন না। আমিও আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাইতে পারিতাম না। তখন আমার মনে হইল, অন্তর্য্যামী ভগবান আমার মানরক্ষা করিবার জন্য গোপালের সঙ্গে আমার মিলনে নিজেই প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন।

কিন্তু পিতার আচরণে আমি মর্ম্মাহত হইলাম। একদণ্ডের সাধুসঙ্গে আমার মনের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দুই দণ্ডের আলাপে বুঝিয়াছি, আমার খুল্লপিতামহের চরিত্রের মহত্ত্ব আমাদের ন্যায় নীচ স্বার্থপর ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্গারের বোধের অগম্য। যথার্থই বোধের অগম্য! নহিলে কি এত লোকে মিথ্যা কথা কহিতেছে! এক ক্ষুদ্র জ্ঞানহীনা বালিকা কেমন করিয়া প্রজ্ঞাময়ী হইল! এক অনাচারী নাস্তিক ব্রাহ্মণ-চিত্ত, কেমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে ধর্ম্মের দিকে পরিবর্ত্তিত হইল! প্রচণ্ড দম্ভে এমন বিনয় কে ঢালিয়া দিল যে, সে আমাকে দেখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে? কোন্ জ্যোতিসিন্ধু ক্ষণস্পর্শে তাহাকে জ্যোতির্ম্ময় করিল, তাঁহার শান্ত-সৌম মুখের পানে আমি চাহিতে পারিলাম না? এক পল্লিবাসী ব্রাহ্মণের ভগ্নগৃহে, ঐশ্বর্য্যবান, বিদ্বানের পুত্র হইয়া আমি চোরের ন্যায় ভয়ে সঙ্কোচে কাটাইয়া আসিলাম; একটা নীচ জাতীয় ভৃত্যের কাছেও ভাল করিয়া মুখ তুলিতে পারিলাম না?

ভাবিতে ভাবিতে, যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনাগুলা ঘটিয়াছিল, সেগুলা পরম্পরাগত শ্রেণীবদ্ধ চিত্রাবলীর ন্যায় আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া চলিয়া গেল। আমি শিহরিয়া উঠিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কল্প করিলাম; খুল্লপিতামহ ও গোপালসম্বন্ধে পিতার এই অসদভাব যেমন করিয়া পারি

দূর করিব ! অন্য সময় হইলে পিতার উপর ঘৃণা আসিত, কিন্তু সাধুসঙ্গের ফলে তাহা আর হইতে পাইল না। মনে করিলাম, ঐশ্বর্য্য ও মান-গর্ব্বিত পিতার পাণ্ডিত্যের মোহ দূর করিয়া, সেই নিরক্ষর ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা আনাইয়া আমাকে পুত্রোচিত কার্য্য করিতে হইবে।

সঙ্কল্প ত করিলাম, কিন্তু সঙ্কল্পসিদ্ধি করিবার শক্তি কই ? শক্তিহীনতার কথা মনে উঠিতে না উঠিতে স্বপ্নাবিষ্ট ডাক্তারবাবুর কথাটা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। স্মৃতির উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিভীষিকাময়ী বুড়ীটাকে উদ্দেশে একটা প্রণাম করিলাম। আর সেই সঙ্গে প্রণাম করিলাম,—দামোদর-আখ্যাধারী সেই নুড়ীটাকে। প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে নুড়ীর সেই ক্ষুদ্র ছিদ্রটা আমার চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল। আমি যেন দেখিলাম, সেই সূক্ষ্মছিদ্রপথ-অবলম্বনে অনন্ত দূরে আকাশ হইতে আমার জন্য আশ্বাস ভাসিয়া আসিতেছে।

বাস্তবিক কি জানি কেন, আমি যেন আপনাকে আশ্বস্ত বোধ করিলাম। মনে হইল, সময় না আসিলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সে সময় নিশ্চিত আসিবে।

আহারান্তে আমি চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে তাঁহার আপিসে গমন করিলাম।

(ক্রমশঃ)

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা পূর্ব্বে মানবরূপ বৃক্ষে অবস্থিত দুইটী পক্ষীর বিষয় বলিয়া আসিয়াছি। তাঁহাদিগের মধ্যে একটি সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করেন, অপরটী কিছুই ভক্ষণ করেন না, কেবল দেখেন। ভোক্তা পক্ষী নিম্নতর শাখা হইতে ফল ভক্ষণ করিতে করিতে উচ্চতর শাখায় অধিরোহণ করেন। এই যে উচ্চতর শাখায় অধিরোহণ, ইহাই জীবাত্মার অভিব্যক্তি বা বিকাশ। কিন্তু প্রকৃত আত্মার বিকাশ নাই, তিনি দ্রষ্টামাত্র। শাস্ত্রে যে বলা হয়, আত্মার বিকাশ নাই, আত্মা পূর্ণ, তিনি ঈশ, তিনি 'জ্ঞ' ইহা সেই দ্রষ্টামাত্র পুরুষ, সেই প্রকৃত আত্মার কথা। জীবাত্মা আত্মা-বুদ্ধি-মন-সমন্বিত ; তিনি পূর্ণ-চৈতন্যময় প্রকৃত আত্মার বীজ বা স্ফুলিঙ্গস্বরূপ। ইহাতে ভগবানের সমস্ত শক্তি ও বীর্য্য সুপ্ত বা সম্ভাব্যরূপে নিহিত থাকে। সাধারণের পক্ষে তিনি এখন বদ্ধ, তিনি অজ্ঞ ও সহায়হীন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যিনি প্রকৃত আত্মা তিনি শক্তিমান, তিনি প্রাজ্ঞ।* শাস্ত্রে ত জীবকে

---

* This Spiritual Triad, as it is often called, Atma-Budhi-Manas, the jivatma, described as a seed, a germ, a divine life, containing the potentiality of its own heavenly Father, its Monad, to be unfolded into powers in the course of evolution

And now the nature, which was free in the subtle matter of his own plane, becomes bound by the denser matter, and his powers of consciousness cannot as yet function in this blinding veil. He is therein as a mere germ, an embryo power

ব্রহ্মের অংশ বলা হয়, তবে তাঁহার এইরূপ বন্ধ, জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোহিত ভাব হয় কেন? শঙ্কর ইহার বেশ যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়াছেন। কি নিমিত্ত এইরূপ হয়? কারণ দেহসম্বন্ধবশতঃ। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া জীবের ঈশ্বর ভাব তিরোহিত হয়; যেমন কাষ্ঠগত বা ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির দহন ও প্রকাশ করিবার শক্তি দেখা যায় না, ইহা সেইরূপ। অতএব, জীব ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন না হইলেও দেহযোগবশতঃ বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। যেমন তিমিররোগগ্রস্ত ব্যক্তির দর্শনশক্তি নষ্ট হইয়া, আবার যেমন ঔষধের গুণে সেই শক্তি ফিরিয়া আসে; আপনা হইতে আসে না; সেইরূপ নষ্টশক্তি জীব ব্রহ্মের অভিধ্যানে যত্নশীল হইয়া, তাঁহার প্রসাদে সিদ্ধিলাভ করিলে আপন নষ্ট ঐশ্বর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত হন। *

তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, জীবাত্মার বিকাশ হয়। আমরা পূর্ব্বে জীবাত্মাকে পরমাত্মার আভাস বলিয়া আসিয়াছি। বুদ্ধিতে পরমাত্মার যে প্রতিবিম্ব তাহাই জীবাত্মা। এখন জীবাত্মার পূর্ণভাবে

---

less, senseless, helpless, while the Monad on his own plane is strong. conscious, capable.........This at present embryonic life will evolve into a complex being, the expression of the Monad on each plane of the universe.

Annie Besant's "Study In Consciousness."

* কস্মাৎ পুনর্জীবঃ পরমাত্মাংশ এব সংস্তিরস্কৃতজ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি? সোপি তু জ্ঞানৈশ্বর্য্যতিরোভাবো দেহযোগাদ্ দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি বিষয়বেদনাদিযোগাদ্ ভবতি। অস্তিচাত্র চোপমা। যথা চাগ্নেদহনপ্রকাশনসংপন্নস্যাপি অরণিগতস্য দহনপ্রকাশনে তিরোহিতে ভবতো যথা বা ভস্মাচ্ছন্নস্য।—অংশাংশিনস্য এবেশ্বরাজ্জীবঃ সন্ দেহযোগাৎ তিরোহিত জ্ঞানৈশ্বর্য্যো ভবতি।—তৎপুনস্তিরহিতঃ সৎ পরমেশ্বরম্ অভিধ্যায়তো যতমানস্য জন্তোর্বিধূতধ্বান্তস্য তিমিরতিরস্কৃতেব দৃকশক্তিরৌষধবীর্য্যাদ্ ঈশ্বরপ্রসাদাৎ সংসিদ্ধস্য কস্যচিদ্ আবির্ভবতি ন স্বভাবত এব সর্ব্বেষাং জন্তুনাং।

ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।৬ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য।

বিকাশ, এই কথার অর্থ কি? যাঁহার প্রতিবিম্ব এই জীবাত্মা তাঁহাতে মিলিত হইয়া এক হওয়া। তখন কি হয়, "অনাহতনাদ" গ্রন্থে (Voice of the Silence) সুন্দরভাবে উক্ত হইয়াছে,—"এখন তোমার আত্মা পরমাত্মায় লয় পাইবে, তুমি তোমাতে লয় পাইবে, তোমার আত্মা যাঁহার প্রতিবিম্ব এখন তাঁহাতে নিমজ্জিত হইবে। এখন তোমার ভেদাত্মক আমি জ্ঞান কোথায়? এখন তুমিই বা কোথায়? অগ্নিকণা এখন অগ্নিতে মিশিয়াছে, বারিবিন্দু মহাবারিধিতে মিলিয়াছে। *

জীবাত্মার এই বিকাশ কিরূপে হয়, এইবার আমরা তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। সূর্য্যের রশ্মি একখণ্ড দর্পণে পতিত হইলে, দর্পণে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। দর্পণে সূর্য্যপ্রতিবিম্ব বিকশিত হইল সত্য, কিন্তু দর্পণে পতিত সমস্ত সূর্য্যরশ্মিগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হয় না, তাহাদিগের কিয়দংশ দর্পণকর্ত্তৃক গ্রাসিত (absorbed) হইয়া তাহার উত্তাপ বৃদ্ধি করে, কিয়দংশ পরাবৃত্ত হইয়া (reflected) দর্পণখানিকে আমাদিগের নয়ন গোচর করিয়া দেয়, কিয়দংশ আবার দর্পণ হইতে বিকীরিত (radiated) হইয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া পড়ে। দর্পণখানি পূর্ণ-প্রতিফলক হইলে সূর্য্য আর প্রতিবিম্বে ভেদ থাকে না, তাহা আর কোনও কার্য্য না করিয়া কেবল সূর্য্যকেই সম্পূর্ণভাবে দেখায়। এই জীবাত্মারও ঠিক তাহাই হয়। আমাদিগের বুদ্ধিই উদাহরণের প্রতিফলক দর্পণ, পরমাত্মা সূর্য্যস্থানীয় এবং জীবাত্মা দর্পণে প্রতিফলিত সূর্য্যবিম্ব। বুদ্ধি দর্পণ যখন সম্পূর্ণভাবে পরমাত্মাকে প্রতিফলিত করে, যখন তাহা পরমাত্মা-"রশ্মিকে" পরাবৃত্ত করিয়া আমাদিগের ভেদাত্মক বিশিষ্ট "আমি" কে সৃষ্টি না করে,

---

* And now thy self is lost in Self, thyself unto Thyself, merged in that Self from which thou first didst radiate.

Where is thy individuality Lanoo, where the Lanoo himself? It is the spark lost in the fire, the drop within the ocean.

যখন তাহাতে পরমাত্মা-"রশ্মি" গ্রাসিত হইয়া আমাদিগের ভেদাত্মক "আমি"র সুখদুঃখবোধ জন্মাইয়া না দেয়, যখন তাহা হইতে পরমাত্মা-"রশ্মি" চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইয়া আমাদিগের ভেদাত্মক "আমি"র ভেদাত্মক "কর্ম্ম" করায় না, তখনই পরমাত্মার ও জীবাত্মার সম্পূর্ণ যোগ সংসাধিত হয়। ইহাই জীবাত্মার বিকাশ এবং পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ইহার জন্যই মানব-জন্ম।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে, রঙ্গালয়ে গোপালের প্রতিরাত্রের যে অভিনয়-বেশ তাহা অতিশয় অস্থায়ী। এই অস্থায়ী লক্ষ্মণ, চৈতন্য বা নারদাদি বেশের অভ্যন্তরে অভিনেতা গোপালের যে "আমি"-ভাব উহা একটি স্থায়ীভাব। আমরা উহাকে অধিদৈব বা (Individuality) বলিয়া আসিয়াছি। যেমন মানব একখানি জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বস্ত্রান্তর গ্রহণ করেন, সেইরূপ ইনি দেহের পর দেহান্তর গ্রহণ করেন। ইহার যে স্থায়ী প্রকৃত দেহ তাহার নাম "কারণ শরীর"। সমস্ত মানবের এই কারণ শরীর আছে, কিন্তু মানবেতর আর কোনও জীবের তাহা নাই। ইহাই মানবের বিশেষত্ব। আমরা পূর্ব্বে এ কথা আলোচনা করিয়াছি। কারণ-শরীর সকলের আছে সত্য, কিন্তু ইহা সকলের সমানভাবে বিকশিত নয়। সূক্ষ্মদর্শী যোগসিদ্ধিযুক্ত সাধকের নেত্রে তাহা গোচরীভূত হইতে পারে এবং তাঁহারা বিভিন্ন মানবের কারণ-শরীরের বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। অনুন্নত মানবের কারণ-শরীর বর্ণহীন লূতাতন্তুর মত অতি সূক্ষ্ম, ইহার অস্তিত্ব অতি কষ্টে কোনও ক্রমে অনুমিত হয়।

মানবের বুদ্ধি জ্ঞান ও অধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধির সহিত তাহার কারণ-শরীরের আকার, তাহার বর্ণ ও দীপ্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে। আমরা পূর্ব্বে মানবের সূক্ষ্ম শরীরের কথা বলিয়া আসিয়াছি। কারণ-শরীর তাহা হইতে আরও সূক্ষ্ম এবং সুন্দর। ইহার দীপ্তির নিকট সূক্ষ্মদেহের উজ্জ্বল বর্ণ নিষ্প্রভ বলিয়া মনে হয়।

সূক্ষ্মদেহ হইতে ইহার আর একটী বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে পাপাচার, নীচতা বা দুষ্টতা বলি সেই সমস্ত ইহাকে কোনও প্রকারে রঞ্জিত করিতে পারে না। সূক্ষ্ম দেহের কিন্তু ব্যবহার যে অন্য প্রকার তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ক্রোধে ঘৃণায়, ইন্দ্রিয়লালসায় হিংসায় তাহার বর্ণ ও দীপ্তি পরিবর্ত্তনশীল। সৎভাব, অসৎভাব, মানসিক উত্তেজনা ও মানসিক অবসাদ সূক্ষ্মদেহে নানা তরঙ্গ তুলে। কাহারও মনে কি ভাব খেলিতেছে, তাহা তাহার সূক্ষ্মদেহ দেখিলেই বলিতে পারা যায়। কারণ-শরীরে কিন্তু তাহা হয় না। সৎভাব, সৎচিন্তা এবং ধর্ম্মের সাধনায় কারণ-শরীর বর্দ্ধিত আয়তন হয়। অসৎ চিন্তা বা অসৎ ভাবের খেলায় কারণ-শরীরের কোন দৃষ্টতঃ বিকার হয় না। মানবের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা মহাপাপী তাহারও কারণ-শরীরে পাপের কোনও রঞ্জন বা অঞ্জন দৃষ্টি-গোচর হয় না। সূক্ষ্মদর্শী দেখেন যে তাহার কারণ-শরীর আদৌ বিকশিত হয় নাই।

আবার অন্যদিকে যিনি ধর্ম্মপথে চলেন তাঁহার কারণ-শরীর সুন্দর ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়। উন্নত ব্যক্তিদিগের কারণ-শরীর অতিশয় সুন্দর দর্শন ও দীপ্তিশালী। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদিগের কারণ-শরীর দিগন্তব্যাপী মণ্ডলাকৃতি। তাহা বিবিধ জীবন্ত বর্ণের রঞ্জনে অতি মনোহর। মানব-ভাষা তাহার সৌন্দর্য্য বর্ণনে অসমর্থ। যিনি তাহা একবার দেখিয়াছেন এবং যিনি অনুন্নত লোকদিগের অর্দ্ধস্ফুট বা অস্ফুট কারণ-শরীর অবলোকন করিতে পারেন, তাঁহার নিকট জীবাত্মা যে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়েন এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষীভূত সত্য।

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি মানবের স্থূল সূক্ষ্মাদি অনেকগুলি দেহ আছে। এই সমস্ত দেহের সবগুলি সকল মানবের স্বায়ত্তে নাই। যে দেহের যতখানি স্বায়ত্তে আসে, সেই দেহর ততটুকুকে "দেহ" বলিয়া

আমাদিগের প্রতিপন্ন হয়। যাহা হইতে আমাকে বিশ্লিষ্ট করিতে পারি না, তাহাই আমার "আত্মা" বলিয়া মনে হয়। স্থূল দেহাভিমানী স্থূল দেহকেই "আত্মা" বলিয়া ভাবে; যাহার কেবল স্থূল দেহ স্বাধিকারে, তাহার কামদেহে যে চিদাভাস তাহাকে আত্মা বলিয়া মনে হয়। এইরূপ মনে বা বুদ্ধিতে যে প্রতিবিম্ব তাহাকে আত্মা বলিয়া মনে হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে ইহার বেশ আলোচনা দৃষ্ট হয়। প্রথমে অন্নরসময় পুরুষ আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়; পরে দেখি প্রাণময় পুরুষ অন্নময় পুরুষের ভিতর অধিষ্ঠিত; অতএব প্রাণময় পুরুষই অন্নময়ের সম্বন্ধে আত্মা। তদভ্যন্তরে "মনোময়" অবস্থিত আছেন; এই মনোময় পুরুষই প্রাণময়ের সম্বন্ধে আত্মা। তদভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় পুরুষ, অতএব বিজ্ঞানময় পুরুষই মনোময়ের আত্মা। ইত্যাদি, ইত্যাদি। ভৃগূপনিষদেও সেই কথা আছে। ভৃগু পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করুন।" তিনি তাহা তপস্যার দ্বারা জানিতে উপদেশ করিলেন। ভৃগুও পিতার কথামত তপস্যা করিলেন। তাহার প্রথমে অন্নময় দেহকে ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা হইল। আবার তিনি তপস্যা করিলেন এবং তাহাতে জানিলেন প্রাণই ব্রহ্ম। এইরূপ তপস্যা দ্বারা তিনি মন, বিজ্ঞান ও আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।

সাধারণ মানবের কাম ও মনের উপর সংযম নাই; সেইগুলি প্রায় স্বাধীনভাবে কার্য্য করে। তাহারা সেইগুলি বশীভূত করিতে চেষ্টাও করে না; কাম ও মন মানবকে যেই দিকে লইয়া যায়, সে অন্ধভাবে তাহারই অনুসন্ধান করে। কিন্তু মানুষ বলিলে বস্তুতঃ তাহার শরীরকে বুঝায় না; শরীর যাহা চায় আসল মানুষ ত সব সময় তাহা চায় না। আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে প্রকৃত "আমি" ঈশ্বরের কণা, অতএব ঈশ্বরের যাহা যাহা অভিপ্রায় আমারও তাহাই অভিপ্রায় হওয়া উচিত। এই স্থূলদেহও

আমি নয়, সূক্ষ্মদেহও আমি নয়, কারণদেহও আমি নয়; কিন্তু প্রত্যেক দেহই "আমিই তোমার আত্মা" বলিয়া, আমাদের কাছে ভাণ করে এবং আমার দ্বারা নিজেদের অভাব পূরণ করিয়া লয়।

স্বপ্ন ও নিদ্রাবস্থায়ও তাহাই হয়। অতএব কোনও স্বপ্ন বিচার করিতে হইলে স্বপ্নাবিষ্টের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরূপ তাহা জানা আবশ্যক তাহা না হইলে অনেক সময়ে ভুলসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মৃতের পুনরাগমন।

মানুষ মরিয়া কি হয়? আত্মা কি মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দেহান্তর আশ্রয় করে? এই সকল প্রশ্নের সমাধান আবশ্যক। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই যদি মানবাত্মা দেহান্তর গ্রহণ করে, তবে সময় সময় আমরা মৃতের পঞ্চ-ভূতাত্মক দেহের অবিকল প্রতিকৃতি দেখিতে পাই কেন?

আমাদের পরিচিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল শ্রীযুক্ত যুগলগোপাল সিংহ মহাশয় এইরূপ একটী অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঘটনাটী অসাধারণবোধে 'অলৌকিক রহস্যে' পত্রস্থ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

যুগলবাবুর মোহরার ৺কালীপদ দত্ত বিগত আশ্বিন মাসে সপ্তমী পূজার দিন অহিফেনসেবনে আত্মহত্যা করেন। যে সময়ে এই ঘটনা ঘটে, সে সময় যুগলবাবু কান্দীতে ছিলেন না। কান্দী হইতে ৫ মাইল দূরবর্ত্তী খোসবাসপুর গ্রামে স্বীয় আবাস-ভবনে পূজাবকাশ যাপন করিতে ছিলেন। পূজার ছুটির পর কাছারী খুলিলে তিনি পুনরায় কর্ম্মস্থানে আসিলেন। তাঁহার মোহরারের শোচনীয় মৃত্যু-সংবাদ তিনি খোসবাস-পুরেই পাইয়াছিলেন। কান্দীতে আসিয়া তিনি স্বীয় কাজ কর্ম্ম করিতে

লাগিলেন। বিগত ১৯শে কি ২০শে কার্ত্তিক রাত্রি ৪টার সময় তিনি শৌচাগারে যান। তখন তাঁহার ভৃত্যেরা নিদ্রিত ছিল; সে জন্য কাহাকেও না ডাকিয়া নিকটস্থ একটী পুষ্করিণীতে হস্তপদাদি প্রক্ষালনার্থ গমন করেন। একটী গুরুতর মোকর্দ্দমার চিন্তায় তিনি তন্ময় ছিলেন, তৎপর দিন আদালতে সেই মোকর্দ্দমাটী উঠিবার কথা। কাজেই সে বিষয়ের চিন্তায় তিনি যে একান্ত নিমগ্ন ছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। হস্তপদাদি প্রক্ষালন করিতে করিতে সহসা তিনি দেখিলেন তাহার পার্শ্বে অনতিদুরে সেই মৃত মোহরার কালীপদ দাঁড়াইয়া আছে। যুগল বাবু তখন সেই মোকর্দ্দমার চিন্তায় এত দূর বিভোর যে কালীপদ যে মৃত, তাহা চিন্তা করিবার অবসর মাত্র তখন তাহার ছিল না।

তিনি কালীপদকে তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে কালী" ?

কালী উত্তর করিল "আজ্ঞা হাঁ"।

যুগলবাবু। তুমি এখানে এত সকালে ?

কালী। আমি আপনার ভাইপোকে পড়াইতে আসিয়াছি।

চকিতে যুগলবাবুর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে তাহার সমস্ত ঘটনাই স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তিনি আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিলেন "কালী, তুমিত কিছু দিন পূর্ব্বে মরিয়াছ"।

কালী। কে বলিল আমি মরিয়াছি? আপনি কি আমায় মরিতে দেখিয়াছেন ?

যুগল। না; আমি সে সময় বাটীতে ছিলাম; কিন্তু তোমার মৃত্যু সংবাদ আমি সেইখানেই পাইয়াছিলাম।

কালী। মিথ্যা কথা; আমি হাঁসপাতাল হইতে আসিতেছি। আপনার ভাইপোকে পড়াইব।

যুগলবাবুর একটী ভ্রাতুষ্পুত্রকে কালীপদ পড়াইত।

যুগল। যাহাই হউক কালী, তুমি যে মৃত তাহা নিশ্চিত, কিন্তু আমি তোমাকে যাহা বলিব শুনিবে কি?

কালী। কি বলিতে চান বলুন।

যুগল। প্রতিজ্ঞা করিতে পার আমি যাহা বলিব তাহা শুনিবে।

কালী। কি বলিবেন বলুন।

যুগল। তুমি এখানে আর কখনও আসিও না। আর প্রতিজ্ঞা কর, আমার পরিবারেই কাহারও কোনও অনিষ্ট করিবে না।

কালী। শপথ করিতেছি, তাহাই হইবে। কিন্তু আপনিও একটী প্রতিজ্ঞা করুন; আমার সহিত আপনার এই সাক্ষাতের কথা এবং কথোপকথনের বিবরণ অন্ততঃ তিন দিন আপনি কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না।

যুগল। আচ্ছা।

পর মুহূর্ত্তে আর কালীপদকে তথায় দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সহসা কোথায় যেন সে লীন হইয়া গেল।

যুগলবাবু বলেন যে, যে সময় তিনি এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন, তখন ভোরের তারার উজ্জ্বল আলোকে স্থানটী বেশ আলোকিত। প্রাতঃকাল আগতপ্রায়। পূর্ব্বাকাশ অরুণকিরণে অনুরঞ্জিত। তিনি বলেন যে, চকিতের মধ্যে এই ব্যাপার হইয়া গিয়াছিল। ভয় ও বিস্ময় যুগপৎ তাহার হৃদয়কে আন্দোলিত করিয়াছিল।

ঘটনাটী যুগলবাবুর নিকট যেরূপ শুনিয়াছি অবিকল, তাহাই বিবৃত করিলাম। এইরূপ মৃতের পুনরাবির্ভাব-রহস্য অনেকেরই নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। এ রহস্যভেদের উপায় আছে কি? অলৌকিক রহস্যের লেখক ও পাঠকগণের নিকট আমি এই প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছি যে, কেহ শাস্ত্রীয় বা বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রশ্নের সমাধান করিলে অনুগৃহীত হইব।

প্রশ্ন প্রথমেই উক্ত হইয়াছে। তথাপি উপসংহারেও পুনরুল্লেখ করিতেছি;—মৃত্যুর পর মানবাত্মা কিরূপ অবস্থায় অবস্থান করে? মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কি আত্মা দেহান্তর আশ্রয় করে? আত্মঘাতীদিগের সহিত স্বাভাবিক মৃতের মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থার কি কিছু তারতম্য আছে।

শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায়।

অলৌকিক রহস্য।

১১শ সংখ্যা।] তৃতীয় বর্ষ। [জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯।

ভৌতিক-কাণ্ড।

(প্রত্যক্ষদৃষ্ট ঘটনা)

যশোহরের মধ্যে জঙ্গলবাঁধাল একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। বিস্তর কুলীন ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাস বলিয়া গ্রামটী সুপরিচিত। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তক-বিক্রেতা এস, সি, বসুর বাটী এই গ্রামে। গ্রামটী একটী দ্বীপ-বিশেষ। ইহার তিন দিকে ভৈরব নদ, অন্যদিকে ২।৩ শত হাত কাটা খাল। এই খালের উপরেই সাধু মালোর বাটী। তাহার স্ত্রীর বয়স ১৬।১৭ বৎসর। তাহাকে ভূতে আশ্রয় করিয়াছে ও সেই ভূত ছাড়াইতে এক ওঝা উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া কতিপয় সহকারী শিক্ষকসহ অপরাহ্নে নদী পার হইয়া তাহার বাটী গেলাম।

গিয়া দেখি, সাধুর বাটীর প্রাঙ্গণে বসিবার স্থানটুক পর্য্যন্ত নাই। দিনের বেলায় ঝাড়াইবার আয়োজন হওয়ায় গ্রামের লোক ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে। মাঝে এক অন্ধ ওঝা ও তাহার সম্মুখে একখানি পিঁড়ির উপর আবিষ্টা উপবিষ্টা। ঘোমটা নাই, যেন স্ত্রীজন-সুলভ লজ্জা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, আমরা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ঝাড়ন আরম্ভ হইয়াছে।

ওঝা নানারূপ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার পরিচয় চাহিতেছিল, রোগিণীও যথেচ্ছাভাবে কত নাম বলিতেছিল। কিছুতেই প্রকৃত পরিচয় দিল না।

ওঝার ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটিল। ওঝার কেন, আমাদেরও বিরক্তি জন্মিল। সে তখন পুনরায় মন্ত্র-পূত সর্ষপ সবলে আবিষ্টার মুখে নিক্ষেপ করিল এবার রোগিণী বড় অস্থির হইল এবং বলিল, "আর আমাকে মারিবেন না, আমি সত্য কথা বলিতেছি। আমার নাম বিপিন দাস × × বৈরাগীর পুত্র। তিনি আমার পিতা নহেন। আমার মা আমাকে ও আমার ছোট ভাইকে লইয়া, ইহাকে বৈষ্ণব করেন। তবে তিনি আমাকে বড় ভালবাসিতেন। আমারই শোকে মরিয়াছেন।"

ওঝা।—তুমি কোথায় কি ভাবে মরিয়াছিলে?

আবিষ্টা।—১২৯৬ সালে বড় বন্যা হয়; তাহাতে আপনাদের এই খালে ভীষণ বেগ হয়। আমি একদিন এই গ্রাম হইতে ডোঙ্গায় চড়িয়া পার হইতে গিয়া ডুবিয়া যাই। আর উঠিতে পারি না। তদবধি খালধারে আছি।

ওঝা।—বেশ। ইহাকে কিরূপে ধরিলে?

আবিষ্টা।—মহাশয়, আমার কোন দোষ নাই, আমার বয়স ১৬ বছর মাত্র। ইনি সময় অসময় না বুঝিয়া খালে যাইতেন, তাহাতেও কিছু বলি নাই; কিন্তু বস্থ-বাটী বিবাহের দিন আর থাকিতে পারিলাম না।

ওঝা।—কেন? সেদিন কি সুযোগে ধরিলে?

আবিষ্টা।—তাই শুনিবে? যখন বাদ্যকরগণ বাজাইতে বাজাইতে বর ও বধূর পাল্কির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিল, তখন ইনি ভাত খাইতেছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাত-মুখ না ধুইয়াই ঘরের পিছনে কলা বাগানে গেলেন ও একটা কলাগাছ ঠেস দিয়া শুনিতে লাগিলেন। আমিও

তখন সেখানে ছিলাম। তাঁহার আঁচল ঝুলিতে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না।

ওঝা।—তবে এখন যাও, ইহাকে ছাড়।

আবিষ্টা।—আমি কাহারও কোন অনিষ্ট করি না। এখানে বেশ সুখেই আছি। আপনি কেন লাগিয়াছেন?

ওঝা।—তাহা হইবে না। ছাড়িতেই হইবে। যাবে কি না বল?

আবিষ্টা।—আচ্ছা, একটা কীর্ত্তন করিতে বলুন।

ওঝা।—তাহা হইলে যাইবে?

আবিষ্টা।—আচ্ছা, আগে গান শুনি।

ওঝার কথামত কয়েকজনে মিলিয়া একটা সংকীর্ত্তন করিল। রোগিণী তাহাতে বড়ই হৃষ্টা হইয়া নাচিতে উদ্যতা হইল, কিন্তু ওঝার শাসনে পারিল না।

ওঝা।—আর কেন? এখন যাও।

আবিষ্টা।—মহাশয়, না গেলে হয় না? আমি বালক বৈ ত নই!

ওঝা।—হাঁ, বুঝেছি। সহজে ছাড়িবে না। বৈষ্ণবের ছেলে বলিয়া কিছু বলি নাই; কিন্তু তাহাতে হইল না। এই বলিয়া যেমন আবার সর্ষপ লইল, অমনি আবিষ্টা কহিল "কোথায় থাকিতে বলেন? এখনই যাইতেছি।"

ওঝা।—যাও * * বাঁওড়ের ধারে ১টী তালগাছ আছে, আজ হইতে তথায় থাকিবে। এই জুতাটি মুখে করিয়া যাইতে হইবে?

আবিষ্টা।—আমি বৈষ্ণবের ছেলে, জুতা লইতে পারিব না। আর যাহা বলেন, করিতে পারি।

ওঝা।—তবে এই জল-কলসী লইয়া যাও; দাঁতে করিয়া লইতে হইবে। রোগিণী যেন কষ্ট না পায়।

আবিষ্টা।—তাহাই করিল। তিন ডাকের পর সে উত্তর দিল ও ঘোমটা দিয়া মহালজ্জিত হইয়া গৃহমধ্যে গেল। ওঝা একটী কবচ দিয়া বিদায় হইল।

ভূতের পরিচয়মত বাসুয়াড়ীতে তাহার মাতার সন্ধান লইলাম। কিছুদিন পূর্ব্বে তাহার কনিষ্ঠ পুত্রও সর্পাঘাতে মরিয়াছে। জননী কাতর ভাবে সমস্ত পরিচয়ই দিল। সমস্তই মিলিয়া গেল।

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ।

একখানি পত্র।

"অলৌকিক রহস্য"-সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

আপনার পত্রিকার বৈশাখ-সংখ্যা পাঠে স্তব্ধ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এতদিন "অলৌকিক রহস্য" নিরীহ প্রেতাদির ব্যাপার লইয়া চলিয়া আসিতেছিল। এক্ষণে বোধ হয়, সাধারণ অভিব্যক্তি নিয়মে অলৌকিকত্তার উচ্চতর স্তরে এতই দ্রুত গতিতে চলিয়া যাইতেছে, যে আমাদের মত 'সেকেলে' মানুষের তাহার অনুগমন করা অসম্ভব। আপনাদের "অশ্রুত-পূর্ব্ব প্রতিশোধ"-নামক প্রথম প্রবন্ধে নানাপ্রকার ভাবের সমন্বয় হইয়াছে। লেখকটীকে নূতন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু নূতন হইলে কি হয়? তিনি অকুতোভয় ও তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তি ও বিশ্বাস প্রভৃতি সন্দর্শনে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি প্রবন্ধ আপনাদের থিওসফি সম্প্রদায়ের পরমবেদ

স্বরূপ থিওসফিষ্ট পত্রিকার উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন, এবং তাঁহার মতামতগুলি যদি ঐ সম্প্রদায়ে সর্ব্ববাদি-সম্মত হয়, তাহা হইলে নব্য থিওসফি এবং প্রাচীন 'ব্রহ্ম-বিদ্যা' এতদুভয়ের মধ্যে থিওসফির প্রতিষ্ঠা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

আমরা শাস্ত্রোপজীবী-বংশোদ্ভব সেকেলে মানুষ এবং কথঞ্চিৎ ভাবে ইংরাজি শিক্ষা করিয়াও ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করিতে পারি নাই। সেই জন্য প্রবন্ধের সন্নিবিষ্ট কয়েকটি বিষয়ের সমাধান করিতে সমর্থ হই নাই। আশা করি, আপনারা বিষয়গুলি পরিষ্কার করিয়া দিয়া মৎসদৃশ ব্যক্তিগণের মোহান্ধকার দূর করিবেন এবং আপনাদের দলের দত্ত, বসু, চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ মহানুভব ব্যক্তিগণ একটু আলোক দান করিয়া আমাদের মনের মালিন্য দূর করিবেন।

তারপর লোকপরম্পরায় ও আপনাদের সম্প্রদায়ের অন্তরঙ্গ সভ্য দুই একজন বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে, আপনাদের মধ্যে লেডবিটার না কি বিটার (?) নামক অভিনব তত্ত্বদর্শী প্রকট হইয়াছেন এবং তিনি তাঁহার সূক্ষ্মদর্শন ও প্রতিভাবলে দুর্ভেদ্য কাল-যবনিকা নানাস্থান ভেদ করিয়া জন্ম-জন্মান্তরীণ সঠিক সংবাদ দিতেছেন। তিনি না কি কতকগুলি বালক ও যুবাপুরুষকে আপনার মতে শিক্ষিত করিয়া এক 'সেবক সম্প্রদায়' স্থাপিত করিয়াছেন। যদিও বর্ত্তমান রাজনৈতিক সন্ধিস্থলে নানা কারণে আমরা সর্ব্ব প্রকার সেবক-সমিতিকে কিছু ভয় করি; তত্রাচ আপনাদের সেবক সমিতির সম্বন্ধে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, আপনারা নিশ্চয়ই কোন প্রকার অভিনব যোগক্রিয়ার উদ্ভব করিয়া সভ্য যুবকগণের এত উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ঐ সেবক সমিতির নিয়মাবলী প্রকাশ করিতে যদি কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, তদ্দারা আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের বিশেষ উপকার

সম্ভব। অতএব আপনাদিগের নেতা সাহেবের বর্ত্তমান নামধাম এবং সেবকগণের কর্ত্তব্যাদি প্রকাশ করিলে সাধারণের মঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই। শুনিলাম ঐ মহানুভব সাহেবটী হঠাৎ মান্দ্রাজ হইতে দৈবাদেশে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

এক্ষণে নিম্নে কয়েকটী বিষয়ে আমার একটু সংশয় জন্মিয়াছে।

১ম। লেখকের মতে বোধ হয় যে, মৃত ও হত ব্যক্তিগণের দ্বারা আমাদের মনে যত কুভাবের উদয় হয় এবং তাহারা আমাদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে এবং এমন কি, নিজ নিজ প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য স্থূল জগতেও কার্য্য করিতে সমর্থ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণগণের মনোকল্পিত যমরাজার ন্যায় আপনাদের প্রেতাত্মাগণের সংযমনের জন্য কোন রাজা বা রাজ-শক্তি আছে কি না? না থাকিলে, লেখক-বর্ণিত যথেচ্ছাচারের হস্ত হইতে আমাদের মত দুর্ব্বল-চিত্ত মানবকে রক্ষা করিবার কোন ঐশ্বরিক বিধান আছে কিনা? জগতের নিয়ন্তা, সকল কল্যাণগুণের আধার ঈশ্বর-তত্ত্বে আপনারা বিশ্বাস করেন কি না? প্রবন্ধপাঠে অনুমান হয় যে, আপনাদের কথিত মহাপুরুষগণই এই সমস্ত জগৎ-ব্যাপার লইয়া থাকেন। কিন্তু বোধ হয় বেদান্তে পড়িয়াছিলাম যে, জীবন্মুক্তগণের জগৎ-ব্যাপারে কোনও হস্ত নাই। হয় ত আপনাদের মহাপুরুষগণ বেদান্তের জীবন্মুক্ত পুরুষগণ অপেক্ষা উচ্চতর মর্য্যাদাপ্রাপ্ত; এই বিষয়ের রহস্যোদ্ঘাটন করিয়া বাধিত করিবেন।

২য়। মিশরদেশীয় সন্ন্যাসীর উপদেশগুলি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। অবশ্য কর্ম্মের গতি গহন। ব্রজগোপালের সহিত তাহার আত্মীয়ের মরণ ব্যাপারের কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও ব্রজগোপালের প্রাণদণ্ডে কি প্রকারে কর্ম্মের ঋণ পরিশোধ হইল, তাহা বুঝা গেল না। ঋণে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ আছে। কিন্তু এই প্রাণ-দণ্ডব্যাপারে কোন উত্তমর্ণ দেখিতে

পাইলাম না। লেথক বা উচ্চতর ব্যক্তিগণ এই অত্যাশ্চর্য্য কর্ম্মের নিয়মটী বুঝাইয়া দিলে উপকৃত হইব। আমি রামকে মারিলাম; কিছুদিন পরে শ্যাম আমাকে মারিল, আমারও ঋণশোধ হইল। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। তাহার পর "যাহার আদেশ কেহ অমান্য করিতে পারে না" এই উক্তিতে লক্ষিত 'যিনি' কে? তাহা কি আমরা জানিতে পারি?

৩য়। যে পরিব্রাজক দীক্ষার কথা বলিয়াছেন, তাহা কি আমাদের শাস্ত্রোক্ত পরিব্রাজক অবস্থা? প্রবন্ধপাঠে বোধ হয় যে সদ্‌গুরু নামধেয় একপ্রকার অদ্ভুত গুরুর কৃপালাভ করিলে দীক্ষাও লাভ হয়। তাহা হইলে সদ্‌গুরুলাভের পথ কি? প্রবন্ধে দেখা যায় যে, মিশর দেশীয় সন্ন্যাসীকে এক সময়ে অতিথি-সৎকারে সন্তুষ্ট করিয়াই ব্রজগোপালের দীক্ষা লাভ হইল। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আপনাদের জানিত ঐরূপ কোন সন্ন্যাসী আছেন কি না এবং কোথায় যাইলে তাঁহার সৎকার করিতে পারা যায়? আপনারা গুরুপ্রাপ্তি ও তত্ত্বজ্ঞান যেরূপ স্বাভাবিক করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের চক্ষু কেন যে ফুটে না তাহা বুঝিতে পারি না। বোধ হয় ইহাই কলির প্রতাপ; এরূপ সহজ ও সুগম পথ ছাড়িয়া 'প্রত্যাহার' 'ধ্যান' 'ধারণা' করিতে সবাই ব্যস্ত। এমন কি সে দিন একজন বিদ্বান বন্ধুর সহিত এ বিষয়ের আলোচনা করিতে যাইলে তিনি উচ্চ হাস্য করিয়া Theosophy made easy (তরলীকৃত ব্রহ্ম-বিদ্যা) এবং দীক্ষামার্গকে 'Theosophical Æro-plane' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করিয়া আমাকে মর্ম্মাহত করিলেন।

আপনাদের দৈবীসেবকসমিতিতে যে প্রকার অভিনবভাবে যুবকদিগের কর্ম্মফল শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় করান হয়—তাহা কিরূপ? আমার একটী বন্ধুর পুত্র স্বাধীন প্রেমে পড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা যে পুত্রের কর্ম্মটী শীঘ্র শীঘ্র

ক্ষয় করাইয়া দেন, তবে ভয় এই যে পাছে কর্ম্মের সহিত শরীরও ক্ষয় হয়। কারণ শাস্ত্রে বলে শরীর কর্ম্ম-জন্য। সুতরাং আপনাদের প্রক্রিয়াতে শরীরাদি ক্ষয় হয় কি না লিখিলে বাধিত হইব। বিষয়টী বড়ই জরুরী।

জাহাজের উপাখ্যানে আত্মহত্যায় কৃতসঙ্কল্প কর্ম্মচারীটীর কেন ঐ প্রকার প্রবৃত্তি হইয়াছিল? লেখক প্রথমে বলিলেন যে, "সে যুবতীর প্রেমে পড়িয়া প্রকাশ হইয়া পড়িবার সম্ভব হওয়ায় আত্মহত্যায় ব্রতী হইয়াছিল," কিন্তু পর পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে, তহবিল ভঙ্গ জন্যই ঐ ব্যাপার হইয়াছিল। কামিনী কাঞ্চনের প্রতাপ কি সর্ব্বত্রই আছে, ইহা কি সত্য? পূর্ব্বোক্ত ঘটনায় আপনাদের 'পরিব্রাজক শিষ্য' মহাশয় যে উপায়ে কর্ম্মচারীর ভিতরে কি রূপে ভাব-প্রবেশ করাইয়া দিলেন তাহা বুঝাইয়া দিলে আমার বিশেষ উপকার হয়। শুনিয়াছি আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পর-শরীরে ভাবাদি প্রবেশ করাইতে পারেন। সম্প্রতি আমার 'বেয়ান' ঠাকরুন আমার প্রতি অত্যন্ত বিরূপা হইয়াছেন; উহা কোন উপায়ে নিবারিত হইতে পারে কি? আর এক কথা সম্মতি বা অসম্মতিক্রমে পর-শরীরে ভাবাদি প্রবেশ করাইয়া যে কোন প্রকার কর্ম্মের দায়ী হইতে হয় কি না, এবং তাহাতে কর্ম্মফলের তারতম্য হয় কি না?

বুদ্ধদেব যে 'ব্যাসাবতার' এ শুভ সংবাদে আমার মন হইতে একটি ভার নামিয়া গেল। গোঁড়া বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে বেদদ্বেষীদিগের মোহ উৎপাদনের জন্য অবতার বলে; অপর দিকে বৌদ্ধগণ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু লেখক যে তাঁহার একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ইহাতে হিন্দু এবং বৌদ্ধগণ উভয়েরই খুসী হওয়া উচিত। তবে কোন্ শাস্ত্র হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল জানিতে পারিলে আমাদের তৃপ্তি হয়।

লেখক যে "ভগবান কৃষ্ণমূর্ত্তি"র উপাসনার সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, তাহা লইয়া না কি একটা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের থিওসফিক রাজা বাবু ভগবানদাস না কি ঐ সকল মতের উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, চতুর্দ্দশ দিন কাল প্রভু কৃষ্ণমূর্ত্তির সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান এবং হিমালয়গমন ব্যাপারটী অতীব বিস্ময়কর। শুনিয়াছি, একজন পাশ্চাত্য সম্মোহনকারী (mesmerist) ব্যাপারটীকে সম্মোহন নিদ্রা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ঐ মতের খণ্ডন বা পরিজ্ঞাপনবিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষেরা কেহই অগ্রসর হন নাই কেন ? ভগবান মৈত্রেয় ঋষিকে কোন্ শাস্ত্রে "জগদ্গুরু" বলে তাহা আমি জানি না। এ বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাস্য রহিল।

লেখকের প্রবন্ধটী জনসমাজে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেবের উপাসনা-প্রচার জন্য এবং Star in the East নামক সমিতির তথ্যঘোষণার জন্য লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ থাকিতে আর "কৃষ্ণমূর্ত্তি"র আবশ্যকতা অনেক হিন্দু বুঝিতে পারেন না এবং শঙ্করাবতার শঙ্কর ভিন্ন বিষ্ণু ব্যতীত অন্য কাহারও অবতারের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। এ বিষয়টীরও মীমাংসা করিয়া দিবেন। আজ এই পর্য্যন্ত।

শ্রীফলতলা।
১লা জ্যৈষ্ঠ।

আপনার বশম্বদ—
শ্রীহিরণ্ময় মুখোপাধ্যায়।

মূকং করোতি বাচালং।

"মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং,
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।"

ভগবৎ কৃপায় "বোবায় বলে, পঙ্গু চলে. অন্ধ মানুষ দেখ্‌তে পায়" এই কথা ভক্তদের গ্রন্থে দেখিয়া আসিতেছি। এ সম্বন্ধে কিছু লেখা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা পাঠকবর্গের একটি মহৎ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া এই প্রবন্ধে হস্তক্ষেপ করিলাম।

অন্ধের চক্ষুদান, পঙ্গুকে চালান, বোবাকে কথা বলান রূপ দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করিবার শক্তি আমাদের সকলেরই আছে, অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছে, তাহা বিকাশ করিবার জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত, চেষ্টাও অসাধ্য বা বেশী ব্যয়সাধ্য নহে। এই শক্তিলাভে জগতের যে অশেষ কল্যাণ করিতে আমরা সমর্থ হইব তাহার আর সন্দেহ নাই, তবে আমরা নিশ্চেষ্ট কেন? আমরা 'অলৌকিক রহস্যে'র প্রায় সহস্র পাঠক হয়াছি, কৈ কয়জন আমরা এই শক্তি চালনা করিতে সমর্থ হইয়াছি ও চক্ষের সম্মুখে পঙ্গু, মূক, বধির, অন্ধ ত অসংখ্য পড়িতেছে, একটিকেও কি আমরা ব্যাধিমুক্ত করিতে পারিয়াছি! আহা, এই বিপন্নদের অবস্থা একবার ভাবিয়া দেখিলে কি মনে হয় বলুন ত? আমাদের নিজেদের ঐরূপ অবস্থা ঘটিলে কি বিপদে পড়িতে হইবে, তাহা একবার ভাবিলে আর কূলকিনারা কিছুই পাওয়া যায় না। কতকটা নিজে অনুভব করিয়াছি; বুঝিয়াছি এ অবস্থায় পড়িলে শারীরিক যন্ত্রণা অপেক্ষা মানসিক যন্ত্রণাই বড় বেশী হয়, লোককে মনঃপীড়ায় উন্মত্ত করিয়া তুলে, শেষে আত্মহত্যাই একমাত্র যন্ত্রণানিবারণের উপায় বলিয়া বোধ হয়। এই

রূপ বিপন্নের উদ্ধারশক্তিলাভে কাহার না বলবতী বাসনা হইয়া থাকে? তবে আমরা নিশ্চেষ্ট কেন?

বোধ হয় এখন অনেকেই বলিবেন এমন শক্তি আমরা কি করিয়া লাভ করিতে পারি? তদুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, রোগ আরোগ্য-শক্তি আপনাদের সকলেরই আছে, অবশ্য ন্যূনাধিক পরিমাণে; প্রকৃত প্রস্তাবে এই শক্তি বিকাশ করিতে হইবে। বিকাশ করিতে হইলে অভিজ্ঞ লোকের কয়েক দিন সাহায্য লওয়া আবশ্যক। যাঁহারা এই শক্তি বিকাশ করিয়া লোকহিতে ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহাদের কথিত প্রণালী-মত ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। আমি নিজে এ ব্যাপারে সিদ্ধ-হস্ত না থাকায়, আমার দ্বারা এই তত্ত্ব বিশেষ ভাল আলোচিত হওয়া সঙ্গত মনে করি না। তবে পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ মোটামুটি ভাল দুই একটী তত্ত্ব এস্থলে লিপিবদ্ধ করা গেল মাত্র।

নিজ শক্তি বিকাশ করিয়া তৎসাহায্যে লোকের রোগ আরোগ্য করার নাম পাশ্চাত্যভাষায় সাইকোপ্যাথিক হিলিং। মেস্‌মেরিজম্—যাহার আধুনিক নাম হিপ্‌নটিজম্ এ ব্যাপারে অনেক অগ্রসর করাইয়া দেয়। বিনা ঔষধিতে উপরিউক্ত রূপ দুরারোগ্য রোগ আরাম করিতে ইচ্ছুক হইলে আমাদের মেস্‌মেরিজম্ শিখিতে হইবে; ইহার সাহায্যে শনৈঃশনৈঃ অগ্রসর হইবার পক্ষে অনেক সহজ পন্থা জানিতে পারা যাইবে। মেস্‌মেরিজম্ শিক্ষা ও নানাপ্রকার দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য করিতে শিক্ষালাভ করা নিজের ঘরে বসিয়াই হয়। মেস্‌মেরিজম্ না শিখিলে যে হয় না, এমন কথা আমি বলি না।

আমরা জীব মাত্রেই ব্রহ্মের অংশ, তবে আমরা ব্রহ্মকে জানিতে না পারা হেতু আমাদের ব্রহ্মের যাবতীয় শক্তি নিজ দেহসাহায্যে বিকাশ করিতে পারি নাই। এই ব্রহ্মশক্তি অসীম কাজেই, আমাদের প্রচ্ছন্ন

শক্তিও অসীম সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি আরোগ্য করার শক্তি আমাদের আলোচ্য হওয়ার—তৎসম্বন্ধে মূল এবং প্রথম কথা এই যে, আতুর লোকের ব্যাধি হেতু সমবেদনা, সহানুভূতি (Sympathy) আমাদের নিজ মনে উৎপাদন করিতে হইবে। আমাদের ব্যাধিপীড়িত লোকটির ব্যাধিহেতু মনে কষ্ট বোধ করিতে হইবে। সে যেরূপ কষ্ট বোধ করিতেছে, তাহা অনুভব করিয়া তাহার বিপদে নিজেকে বিপন্ন বোধ করিতে হইবে, আরোগ্যশক্তিবিকাশপক্ষে ইহাই আমাদের মূল ভিত্তি (Keystone) বলিতে হইবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, আমাদের আরোগ্য করিবার শক্তি যে আছে, তাহার উপর আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস রাখিতে হইবে, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিলে চলিবে না।

রোগীর সহিত সমপ্রাণ হইয়া, তাহার রোগ দূরীকরণ-শক্তি আমার আছে এই বিশ্বাস মনোমধ্যে বদ্ধমূল করিয়া, মনে কোনরূপে সন্দেহ আসিতে না দিয়া, তাহার রোগ দূর করিতে আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে, ইহাতে মনস্থির হইয়া আসিবে। এই কয়েকটি অবস্থা হইলে পর রোগীর দেহে তাহার আক্রান্ত স্নায়ু ও পেশী প্রভৃতি শরীরের রুগ্ন যন্ত্রাদিতে নিজ শক্তি চালিয়া দিতে হইবে। ইহাতে নিজের শক্তি ক্ষণকালের জন্য কম হইবে বটে, কেহ কেহ একটু আধটু দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি বোধ করিতে পারেন, কিন্তু কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর, প্রায়ই রাত্রের নিদ্রার পর তাহা আবার পূরণ হইয়া যায়। সমুদ্রজলে স্নান করিলে মুহূর্ত্তমধ্যে এই শক্তির পূরণ হইয়া গিয়া থাকে, একথা ভুক্তভোগীরা বলিয়া থাকেন।

আমরা সংক্ষেপে এই বুঝিলাম যে, সহানুভূতি, সন্দেহশূন্যতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা এবং শক্তিদান, এই কয়েকটি এই ব্যাপারে আবশ্যক। সুস্থদেহী মাত্রেরই দানোপযোগী শক্তি আছে এবং অপর তিনটি গুণও সকলেই করিয়া লইতে পারেন। এই সমস্ত কার্য্যে যে বিশেষ গুরুতর ও কঠোর

সাধনসাপেক্ষ তাহা নহে, তবে অভিজ্ঞ লোকের নিকট এই কয়েকটি চর্চ্চার পন্থা জানিয়া লওয়া চাই, তাহা ডাকযোগেও হয়; সাক্ষাতে তো হইবেই।

এই যে নিজের শক্তিদান, ইহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা এস্থলে বলিলে, বোধ হয় বড় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই শক্তিসম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় বাবু কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'স্বপ্নতত্ত্ব' প্রবন্ধে বেশ সহজ করিয়া লিখিয়াছেন। কিরূপে মানবদেহে প্লীহাস্থানের চক্রমধ্য দিয়া জীবনীশক্তি সূর্য্যমণ্ডল হইতে বাহির হইয়া শূন্যে উড়িবার কালে শরীরে প্রবেশ লাভ করে ও তাহা পরে কোন্ চক্র দিয়া কোথায় যায় ও কি বর্ণ লাভ করে, তাহা তিনি পাঠকদের গোচর করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এইরূপে জীবনীশক্তি চক্র হইতে চক্রান্তরে গিয়া শরীর মধ্যস্থিত যন্ত্রাদিকে সঞ্জীবিত করিয়া, তাহার উদ্বর্ত্ত অংশ দেহের চতুর্দ্দিকে ধূমাকারে বেষ্টন করিয়া থাকে। সূক্ষ্মদর্শী সাধকগণ দেখাইয়াছেন যে, এই উদ্বর্ত্ত জীবনীশক্তি যাহাকে ওজঃ বা তেজঃ বলে, তাহা আমাদের দেহ হইতে আঠার হইতে চব্বিশ ইঞ্চ পর্য্যন্ত প্রশস্ত হইয়া আমাদের বেড়িয়া থাকে। এই তেজোময় অংশের কিছু কিছু এক দেহ হইতে অন্য দেহে আপনা হইতেও গিয়া থাকে। অথর্ব্ববেদে এক স্থানে এই কারণে সুস্থ লোককে রোগীর দুই হস্ত দূরে থাকিতে আদেশ দেখা যায়। সুশ্রুত সংহিতাতেও পীড়িত ও সুস্থ মধ্যে এই তেজোময় অংশ যাতায়াত করার কথা দেখা যায়। এই কারণেই একজনের আসন ও বসন অন্যের ব্যবহার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। এই তেজোময় অংশ লইয়া ব্রাহ্মণাদিজাতিভেদ প্রথা চলিত হয়। এই শক্তি অঙ্গুলির শেষ দিয়া ও মুখবিবর দ্বারা দেহ হইতে বাহিরে প্রদান করা সুসাধ্য।

যাহা হউক, এই তেজোময় অংশকে (ইংরাজীতে 'Aura' কহে) আমরা শক্তি বলিতেছি, ইহা আপনা হইতে এক দেহ হইতে অন্য দেহে যাইয়াও

থাকে; আবার আমরা সহানুভূতি ও ইচ্ছাশক্তিবলে অভিলষিত দেহে নিজ দেহ হইতে চালনা করিতেও পারে। রোগীর অভাব বুঝিয়া দিতে হয়, এই অভাব বুঝিয়াও চালনা করার ধারাবাহিক নিয়ম শিক্ষা করিতে হইবে। তবেই আমরা কথিত শক্তিবিকাশে সমর্থ হইব। ইহা ব্যতীত রোগীর মনে বিশ্বাস উৎপাদন (Suggestive aids) দ্বারাও অনেক দূর আমার কৃতকার্য্য হইতে পারি।

এইবারে আমরা মূক, বধির আরোগ্য সম্বন্ধে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

(১) "একটি পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের যুবককে তাহার পিতা আমার নিকট লইয়া আসিল। তিন বৎসর হইল তাহার বাক্‌রোধ হইয়াছে। আমার চতুর্দ্দিকে লোকে লোকারণ্য, আদৌ স্থান না থাকায় মন্দিরের দেবসিংহাসনের তলে যে পীঠ ছিল তাহার উপর আমি রোগীকে লইয়া উঠিলাম। রোগীর গাত্রে হস্ত দিয়া তাহার মস্তকের চতুর্দ্দিকে সাতবার হস্ত চালনা করিলাম, পরে সাতবার দীর্ঘভাবে হস্ত চালনা করিলাম, মোটে পাঁচ মিনিট সময়ও লাগিল না, তাহার বাক্‌শক্তি হইল। আমি তাহাকে রামগোপাল, রামচন্দ্র প্রভৃতি দেবতাদের নাম উচ্চারণ করিতে বলিলাম, সে তার স্বরে চীৎকার করিয়া ঠাকুরদের নাম বলিতে লাগিল। লোক সকল চতুর্দ্দিকে উচ্চরবে বাঃ বাঃ করিতে লাগিল।" (Colonel Olcott's Old Diary Leaves Vol. II. Page 445.)

(২) "নেগাপটমের একটি উকিল, বধির, দুইহাত দূরে বলিলে শুনিতে পাইত না। তাহাকে আধ ঘণ্টাকাল হস্ত চালনা করিবার পর আমার কথা সে ৭০ ফুট দূর হইতে শুনিতে পাইল, অবশ্য আমি লোকে যেরূপে পরস্পর কথাবার্ত্তা কয় সেইরূপ জোরে কথা বলিয়াছিলাম।" Ibid. Page 462.

(৩) "একটি একাঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর এক হাত ও এক পা পড়িয়া গিয়াছিল। লোকটি বলিল, পোনের শত টাকা ব্যয় করিয়া এ কাল পর্য্যন্ত চিকিৎসা করিয়া কোন ফল হয় নাই। তাহার হাতটি প্রথমে চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। হাতের পেশী ও স্নায়ুর উপর দিয়া হস্তচালনা করিতে লাগিলাম। আধঘণ্টার মধ্যে তাহার হাত নাড়িবার শক্তি হইল, সে আঙ্গুল নাড়িতে মুড়িতে পারিল, হাত মাথার উপর দিয়া ঘুরাইতে পারিল, কলম ধরিতে এমন কি আলপিন কুড়াইয়া লইতে পারিল। আমি একটু ক্লান্ত থাকায় লোকটিকে বিশ্রাম করিতে বলিলাম। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় আধঘণ্টা হস্তচালনা করিয়া তাহার পা ভাল করিলাম; সে হাঁটিয়া বাটী চলিয়া গেল।"

(৪) "কৃষ্ণ শঙ্করের পুত্র নিগম শঙ্কর, বয়স ষোল বৎসর। ছয় মাস বয়সের সময় উপরি উপরি তিনবার হাম হইয়া চক্ষু দুইটি নষ্ট হয়। নানা প্রকার চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। বোম্বাই নগরীর জিমসেট্‌জি জিজিভয় হাঁসপাতালের ডাক্তার ম্যাক্‌নচি, ডাক্তার প্রভাকর ও আরও তিন চারিজন ডাক্তার দেখিয়া সকলেই একমত হইয়া রোগ দুরারোগ্য বলিয়া মত দেন। গ্র্যাণ্ট মেডিকেল কলেজের ডাক্তার হাঠাটও ঐ কথা বলেন। পরে বোম্বাইএর চক্ষু চিকিৎসক ডাক্তার এস, বি, নায়কও রোগ সারিবে না, দৃষ্টিশক্তিলাভের উপায় নাই বলিয়া ছাড়িয়া দেন।"

"প্রোফেসর এস, এন, বসু ৬।৭ নং পদ্মপুকুর স্কোয়ার, খিদিরপুর, কলিকাতা, রোগীকে দেখিতে অনুরুদ্ধ হয়েন। তিনি পরীক্ষায় দেখিলেন, রোগীর চক্ষুর অতি নিকটে কোন জিনিষ ধরিলে সে তাহা দেখিতে পায় না। চক্ষু হইতে চারি ইঞ্চ দূরে কোন জিনিষ ধরিলে একটু ঝাপসা বোধ করে। কিন্তু কি জিনিষ ধরা হইয়াছে, তাহা বলিতে পারে না। প্রথম দিন মেসমেরিক চিকিৎসার পর চক্ষের এক ফুট দূরে আঙ্গুল নাড়িলে

দেখিতে পাইল, কয়টা অঙ্গুলে ধরা হইয়াছে বলিতে পারিল। একটি টুপি বেশ দেখিতে পাইল।

"দ্বিতীয় দিন ঐরূপ চিকিৎসার পর সাতফুট দূরে মানুষ দেখিতে পাইল, টুপি দেখিতে পাইল, লালবর্ণ চিনিতে পারিল। অধিক দূরে অঙ্গুলি দেখানয় গণিতে পারিল।

"তৃতীয় দিন চিকিৎসার জন্য আমার কাছে আসিবার কালে রাস্তায় লোক, ট্রামগাড়ী, গাড়ী প্রভৃতি দেখিয়া আসিয়াছে বলিল। দিয়েশলাইয়ের বাক্স প্রভৃতি ছোট ছোট জিনিষ দেখিতে পাইল, পরে দিয়েশলাইয়ের কাটি গুণিতে পারিল।

"চতুর্থ দিন চিকিৎসায় রোগী আরও দূরে আরও স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। ইহাকে আরও তিন দিন চিকিৎসা করা হয়। শেষে রোগীর দৃষ্টিশক্তি বেশ হইল, আরও দূরে দেখিতে পাইল ও বেশ বলিতে লাগিল।"

উপরিউক্ত বসুজা মহাশয় হিপনটিজম্ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আমেরিকা হইতে সার্টিফিকেট পাইয়াছেন, এবং তিনি এই বিদ্যাকে অর্থকরীরূপে ব্যবহার করিতেছেন।

যদিও আমরা যে কয়েকটি আরোগ্য সংবাদ উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎসমস্তই হিপ্‌নটীজম্-বেত্তা লোকের-দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে, তথাপি এরূপ মনে করা উচিত নয় যে হিপ্‌নটীজম্ না শিখিলে এ শক্তি লাভ হয় না। কেবল এই শক্তিচালনের ধারাবাহিক কৌশল পরিজ্ঞাত হওয়া যায় মাত্র। চিকিৎসা শাস্ত্র, শরীরতত্ত্ব ও রোগতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া যাঁহারা চিকিৎসা করেন, তাহারা যেরূপ রোগ আরাম করেন, হাতুড়েরাও অনেক স্থলে নানা প্রকার ঔষধ দ্বারা তাহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর রোগ আশ্চর্য্যরূপে আরাম করিয়া থাকে। অনেকস্থলে হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে পাশ করা ডাক্তার দাঁড়াইতে পারে না। শক্তি পরিচালন পক্ষেও

তাহাই বলা যাইতে পারে, বিশেষ এস্থলে মানসিক শক্তির উপর বেশী নির্ভর করিতে হয়, তাহারা পরিচালন শিক্ষা করিতে বা লাভ করিতে গ্রন্থাদি দেখিবার তত প্রয়োজন হয় না।

চাই কেবল সহানুভূতি। একদা স্বামী সচ্চিদানন্দ বালকৃষ্ণ মহাশয় কোন শিব্যালয়ে থাকিবার কালে শুনিলেন যে, একটি স্ত্রীলোক আফিম খাইয়া যায়-যায় হইয়াছে। এই ব্যাপার শুনিয়া স্বামীজীর স্ত্রীলোকটীর উপর বিশেষ দয়া হইল, তাহার বিপন্নাবস্থায় স্বামীজী প্রায় ক্রন্দনোন্মুখ হইয়া পড়িলেন। কয়েকটি লোক যাহারা স্বামীজীর অতি নিকটে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাঁহারা কিছু পরে স্বামীজীর গাত্র হইতে এক প্রকার তাপ বাহির হইতেছে, অনুভব করিলেন ও স্বামীজী—কিছুক্ষণ এক প্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থার মত হইয়া রহিলেন! কি যেন ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, তাহা বাহিরের লোকে বুঝিতে পারিল না।

পরদিন প্রাতে সংবাদ পাওয়া গেল, স্ত্রীলোকটি রক্ষা পাইয়াছে। অবশ্য ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসাও হইয়াছিল। সাধু ব্যক্তিরা এইরূপে নিজে অপরের ভোগ লইয়া ভুগিয়া রোগীদের যন্ত্রণা লাঘব করিয়া থাকেন; এক্ষেত্রে স্বামীজীর দ্বারা ঐ যে রোগীটী রক্ষা পাইল তাহা স্থির বলা না যাইলেও স্বামীজীর সমবেদনায়ও অনেকটা তাহার আরোগ্যের পথ উন্মুক্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

আমরাও পরের ভোগ নিজে লইতে সক্ষম না হইলেও এইরূপ সহানুভূতি করিয়াও তাহার আরোগ্যাশা করিয়া তাহার অনেক উপকার করিতে পারি।

শক্তিপরিচালনসম্বন্ধে দেখা যায় পুরুষকে স্ত্রীলোক ও স্ত্রীলোককে পুরুষে শক্তিদান করিলে শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। নিজ স্ত্রী, মাতা, ও আত্মীয়বর্গের দ্বারা এই কার্য্য করিলে আরও সত্বর ফল পাওয়া গিয়া

থাকে। ইহার কারণ ইহাদের মন স্বতঃই আরোগ্য জন্য কাতর ও একাগ্র থাকে ও সহজেই মন স্থির হইয়া পড়ে। নিজ শক্তির উপরও সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলে প্রভূত উপকার পাওয়া যায়।

যদ্যপি আমরা কেহ মেসমেরিজম্ শিক্ষা করিবার সুযোগ না পাই, তবে কি আমাদের শক্তিবিকাশ করা ভাগ্যে ঘটিল না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? কখনই না। শক্তি যখন আমাদের রহিয়াছে এবং শক্তি ঢালিয়া দিবার পথ—আমাদের মুখ ও হাত রহিয়াছে, তখন অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য পাইলাম না বলিয়া বিকাশের চেষ্টা না করা অলসতার পরিচয় মাত্র। অনাথ বিপন্ন রোগীকে চিকিৎসায় তাহাদের সাহস না হইলে বাটীর স্ত্রী-পুত্রের পীড়ায় এই শক্তিপরিচালন করিতে আরম্ভ করিতে হইবে, কি উপায়ে কত ফল হয় লক্ষ্য করিতে হইবে ও ক্রমশঃ নিজে জ্ঞান সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতে ক্রমশঃ কৌশলাদি আয়ত্ত হইয়া যাইবে। সৎ যাহার উদ্দেশ্য, ভগবান তাহার সহায়। আমাদের পশ্চাতে যে সকল দৈবীশক্তি রহিয়াছেন, তাঁহাদের অলক্ষ্য সাহায্য আমরা পাইতেও পারিব ও ক্রমে একজন বিজ্ঞ আরোগ্যকারক হইয়া উঠিতে পারিব সন্দেহ নাই। মেস্মেরিজমের গ্রন্থে যে সকল তত্ত্ব ইঙ্গিত আছে, তাহা আমরা নিজ ভূয়োদর্শনে ঘরে বসিয়াই জানিতে পারিব।

সময়ান্তরে আরও একটু এ সম্বন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রেততত্ত্ব।

হিষ্টিরিক ফিট ও ভূতাবেশ।

১৯০৮ সালের ৩রা জুলাই রাত্রিতে আমার একটী বিশেষ বন্ধুর স্ত্রীর ফিট হয়। সংবাদ পাইয়াই আমরা (আমি, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ সতীশ ও অন্যান্য আরও দুই একজন) ৩।৪ জন লোক তাড়াতাড়ি সেখানে গেলাম এবং যথারীতি তাঁহাকে (আবিষ্টাকে) বেষ্টন করিয়া কুণ্ডলী বদ্ধ করিলাম।

এই আবিষ্টার ফিট-সম্বন্ধে আরও দুই বার এই পত্রিকায়ই লেখা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে বহুবারই লেখা হইবে। এইজন্য এই আবিষ্টার একটি চিহ্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে * * বাবুর স্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করিলাম এবং করিব। হিষ্টিরিয়ার রোগীদিগকে কি ভাবে আবদ্ধ করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়, তাহাও পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে যথারীতি প্রকাশ করিয়াছি। সুতরাং এ প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে নূতন করিয়া কোনও আলোচনার ইচ্ছা করি না। যাহা হউক, কুণ্ডলীবদ্ধ করিয়াই প্রশ্ন করিলাম।

প্রঃ। আজ আস্‌লে কেন ?

উঃ। এ'কে (আবিষ্টাকে) দেখ্‌তে এসেছি।

যে আত্মা এই আবিষ্টার দেহ, আশ্রয় করিতেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি এই আবিষ্টার গর্ভধারিণী। অনেক প্রমাণের দ্বারা পরিণামে আমরাও তাহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।

প্রঃ। শরীরে ঢুক্‌লে কেমন করে !

উঃ। একটুকু পূর্ব্বে যখন পাইখানাতে গিয়েছিল, তখন আমি এর বাতি নিবিয়ে দেই, তাতে ভয় পেয়ে দৌড়িয়ে আস্‌তেই আমি একে ধরেছি।

প্রেতাত্মাদের দেহাশ্রয়ের ভিতরে কতকগুলি সুন্দর নিয়ম দেখিতে পাই, যাহা তাহারা প্রতিপালন করিতে বাধ্য। তাহারা কখনও কাহারও মানসিক স্বাভাবিক স্থির ও গম্ভীর অবস্থায় দেহ প্রবিষ্ট হইতে পারে না। যে সমুদায় অবস্থায় মানব আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়, অথবা আত্মার বল হ্রাস প্রাপ্ত হয়, সেই সব অবস্থাই তাহাদের দেহপ্রবেশের উপযুক্ত সময়। যথা—হর্ষ, বিষাদ, ভয়, অভিভূতি ও অজ্ঞানাবস্থা। মানব যতক্ষণ তাহার স্বাভাবিক প্রতিভা ও আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল রহে, ততক্ষণ এমন কোনও শক্তিমান আত্মা জগতে নাই, যিনি কোনও মানবদেহে প্রবেশ করিতে পারেন। এইজন্যই অনেক আত্মা ভয় দেখাইয়া কিম্বা দূর হইতে অভিভূত করিয়া কিম্বা চিত্তবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায়ই দেহপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে। তবে হর্ষান্বিত ও বিষণ্ণ অপেক্ষা ভীত ও অভিভূত ব্যক্তির দেহাশ্রয়কারী আত্মার সংখ্যা অধিক। আজ পর্য্যন্ত যতগুলি হিষ্টিরিয়া রোগীর ভূতাবেশ প্রমাণ করিয়াছি, তন্মধ্যে বোধ হয় ২।৪টি ব্যতীত প্রায় সবই ভীত হইয়াই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু প্রথম দিবসই আত্মাকে যত কষ্ট করিয়া দেহাশ্রয় করিতে হয়, তৎপরে আর সে কষ্টের কোনও প্রয়োজন থাকে না। কারণ, একদিন যিনি যে কোন রকমেই অভিভূত হইবেন, অন্যান্য দিন তাঁহাকে অভিভূত করিবার সময়, সামান্য ইচ্ছার সহিত দৃষ্টি করিলেই যথেষ্ট।

প্রঃ। এখন বাসাতে কোনও লোক নাই, এ অবস্থায় ম'রেও ত যেতে পারে ?

উঃ। আমিত একে নিতেই আসি।

প্রঃ। তাতে আর তোমার লাভ কি ?

উঃ। আমার সন্তান আমার কাছেই রাখব।

জগতের কি রীতি ? সকলেই তাহাদের প্রিয়বস্তুসমূহকে আপনার

সন্নিহিত করিয়া রাখিতে ভালবাসে এবং অনুভূতির আরম্ভ হইতে চিত্তের লয় পর্য্যন্ত যেন এই একই চিন্তা, চেষ্টা ভিন্ন আর দ্বিতীয় ভাব নাই। জড় পরমাণু হইতে চৈতন্য শক্তির পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্তি মানব পর্য্যন্ত সকলেরই এই একই ভাবনা ও একই সাধনা।

মানুষ মরিয়াছে কিম্বা তাহার জড় জগতের দেহবন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, কিন্তু প্রাণে প্রাণে ভাবিয়া ও ভালবাসিয়া যে মায়ার বন্ধনটুকু সৃজন করিয়াছিল, আজি প্রেতজীবনেও সেইটুকু ছিন্ন কিম্বা শিথিল হয় নাই। তাই মা সন্তানের জন্য, স্বামী স্ত্রীর জন্য, স্ত্রী স্বামীর জন্য ও বন্ধু বন্ধুর জন্য, সেই চর্ম্মচক্ষুর অদৃশ্য জগতে যাইয়াও অপেক্ষা করিতেছে এবং ভালবাসা কিম্বা মায়ার দৃঢ় রজ্জু ধরিয়া এখনও বসিয়া আছে। বিশ্বাস একদিন নিশ্চয়ই সে তাহার ভালবাসার বস্তুকে বক্ষে লইয়া তৃপ্ত হইবে। তবে আর মনুষ্য ও প্রেতলোকে চিত্ত-বৃত্তির প্রকারভেদ রহিল কোথায়?

মানুষ মনের কথা মুখে কহিয়া অপরের কর্ণকুহরে তাহাই প্রতিধ্বনিত করে, এবং এইরূপেই একে অপরের ভাবে ভাবপ্রবণ হয়। আর— প্রেতাত্মার দেহ ধ্বংস হইয়াছে বলিয়া তাহার বাক্যও মনে লয় হইয়াছে, এখন সে তোমার কর্ণে কথা পঁহুছাইতে পারে না। কিন্তু, তাহার প্রবল মনঃশক্তি তোমার মস্তিষ্কে আলোড়িত করিয়া প্রাণে প্রাণে তাহারই প্রাণের কথা গাঁথিয়া দিতেছে; তাই, মরিয়াও সে তোমাকে এবং তুমি তাহাকে আপনার জন বলিয়াই আকড়িয়া ধরিতে প্রয়াসী। যদি এই মর জগতের ও প্রেতলোকের মধ্যে কোনও অন্তরায় না থাকিত, তবে কি আর প্রাণপ্রিয়ের মুখচ্ছবিখানি নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাই না বলিয়া কাহাকেও আকুলপ্রাণে কাঁদিতে হইত?

এ ধাঁধাঁ বড়ই সুন্দর! আহা! কেহ তাহার প্রাণপ্রিয়কে হাতের কাছে পাইয়াও প্রতিনিয়ত হৃদয় ভরিয়া দেখিয়াও কাঁদে, আর কেহও

না দেখিয়া ও অতি দূরতর ব্যবধানের অন্তরালে আচ্ছন্ন জানিয়া কাঁদে। কিন্তু, মূলতঃ উভয়ই সমান দুঃখী। একজন তাহার প্রিয় বস্তু হাতের কাছে অথবা দৃষ্টির অতি সান্নিধ্যে লইয়াও পাইতেছে না, যে হেতু তাহার প্রাণের কথা ও সুন্দর মুখচ্ছবি মরজগতের প্রিয়জনের প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি নাই। তাহার প্রেতজীবনের উচ্চতম কণ্ঠ-স্বরও মনুষ্যের স্থূল কর্ণপটহকে শব্দায়িত করিতে পারিতেছে না এবং তাহার সূক্ষ্মদেহের পবিত্র সৌন্দর্য্য, এ রক্তমাংসের চক্ষু অনুভব করিবার সামর্থ্যে বঞ্চিত। তাই প্রেতাত্মা তাহার প্রিয়জনের অতি সন্নিহিত হইয়াও মনের দুঃখে ফিরিয়া যাইতেছে।

মনুষ্যের পক্ষেও তাহাই। দুঃখ দু'জনেরই সমান। তাই প্রেতাত্মা ও মানব উভয়ই তাহার প্রিয়বস্তুর সুখস্পৃষ্ট লালসায় পরকালের প্রতীক্ষায় দিন গণনা করিতেছে। দু'জনই তাহাদের হাতের কাছে ও নয়নের অতি সান্নিধ্যেও প্রাণপ্রিয় ও নয়নরঞ্জন ভালবাসার বস্তু পাইয়াও বিরহের অরুন্তুদ দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতেছে।

প্রেতাত্মার দুঃখটা বড়ই রহস্যজনক। কারণ—বধির প্রিয়জনের নিকট প্রাণের কথা কহিতে যাইয়া যেমন হতাশ প্রাণে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়, এ অবস্থাও ঠিক তেমনই। অতীন্দ্রিয়-জ্ঞানহীন সাধারণ মানব আত্মার দর্শনে কিম্বা মনোগত ভাবানুভূতিতে সম্পূর্ণ অন্ধ কিম্বা বধির। আত্মা কি বৈচিত্রময় সৃষ্টি ও কি সুন্দর রহস্যময় প্রহেলিকা।

প্রঃ। সন্তান ব'লে যদি এতই মায়া থেকে থাকে, তা' হ'লে আর কষ্ট দাও কেন?

উঃ। এর স্বভাব পরিবর্ত্তনের জন্য।

এই সময়ে কোনও প্রশ্নের প্রতীক্ষা না করিয়াই বলিলেন "তোমাদের একটা বিপদ আসছে।"

প্রঃ। কি বিপদ?

উঃ। বল'ব না।

প্রঃ। কেন বল্‌বে না?

উঃ। আমার ইচ্ছা।

প্রঃ। তবে আর এমন ভাবে আভাষ দিলে কেন?

উঃ। না না, তোমাদের ফাঁকি দিয়েছি।

প্রঃ। তা' হইলে তুমি এখন চ'লে যাও?

উঃ। ছে'ড়ে দিলেই যে'তে পারি।

প্রঃ। এর শরীরে কোনও গ্লানি থাক্‌বে না, ব'লে যাও।

উঃ। হাঁ, আজ ভালই থাক্‌বে।

এই সময়ে আত্মাকে ছাড়িয়া দিলাম এবং সঙ্গে আবিষ্টাও চৈতন্যলাভ করিলেন। সে দিন তিনি শরীরে কোনও গ্লানি অনুভব করেন নাই। বিপদ আসিবে বলিয়া, যে কথার আভাষ দিয়াছিলেন, কয়েক দিবস পরে তাহার সত্যতা উপলব্ধি হইল। কারণ এই ঘটনার ১৫।২০ দিন পরেই আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার একটি শিশু পুত্রসন্তানের মৃত্যু হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী,

চাঁদপুর, ত্রিপুরা।
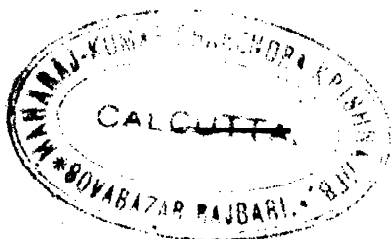
ভূতের আত্মকাহিনী।

কয়েকবৎসর পূর্ব্বে আমার জনৈক বন্ধু একব্যক্তিকে সম্মোহিত করিয়া, তাঁহার দেহে ভূত আনয়ন করেন। সেই ভূতের মুখে নরকের কাহিনী এবং তাহার আত্মজীবনী শুনিয়াছিলাম; এক্ষণে তাহাই 'অলৌকিক রহস্যে'র পাঠকগণকে উপহারস্বরূপ প্রদান করিলাম। আত্মার সহিত কথাবার্ত্তা অবশ্য প্রশ্নোত্তররূপেই হইয়াছিল; কিন্তু সেরূপভাবে দিলে হয়ত পাঠকগণের মনোমত না হইতে পারে, সেইজন্য গল্পচ্ছলেই লিখিলাম। নরক কি প্রকার আমার বন্ধুকে তাহা জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিতে লাগিল:—

"নরক বড়ই ভয়ানক; যন্ত্রণার সঙ্গে তার যেন কি একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। নরকের নাম করিলেই যন্ত্রণার কথা আসিয়া পড়ে, তাই বুঝি লোকে যন্ত্রণা পাইলেই বলে নরকযন্ত্রণাভোগ! বাস্তবিকই. লোকের নরক ভীষণ বলিয়া যে ধারণা আছে, তাহা বড় মিথ্যা নয়; বরং আমরা নরককে যে ভাবে কল্পনা করি, তাহা সত্য নরকের তুলনায় স্বর্গবিশেষ। সে নরক আমাদের ধারণায়ই আসিতে পারে না! সে যে ভীষণ, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে বুঝা যায় না।

তোমরা জান, আলো না হইলে মানুষ একদণ্ডও বাঁচিতে পারে না? কিন্তু সেদেশে (নরকে) আলো নাই, অথচ আমরা বাঁচিয়া আছি, আমাদের পোড়া প্রাণ কিছুতেই বাহির হইতে চাহে না। অন্ধকারে থাকিয়া আমরা কি রকমে কাল কাটাই, তাহা তোমরা জানিতে পারিবে না—সে যে কি কষ্ট, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহই অনুভব করিতে পারে না।

গরীব লোকে বড়মানুষের চৌঘুড়ি গাড়ী দেখিয়া মনে করে.পৃথিবীতে যদি কেউ সুখী থাকে, তবে সে জানে না যে অত সাজসজ্জার অন্তরালে

থাকিয়াও বড়মানুষের প্রাণ কিরূপ অশান্তিময়। মরণও ঠিক সেইরকম দিল্লীর লাড্ডু বিশেষ—যে কখন খায় নাই, সে মনে করে, এমন জিনিষ বুঝি জগতে আর নাই; কিন্তু একবার খাইলে আর খাইতে ইচ্ছা হইবে না। লাড্ডু যে খায় সেত পস্তায়ই, যে না খায় সেও পস্তায়।

লোকে মনে করে, মরণই শান্তি—কি ভুল বিশ্বাস! ইহার মতন ভুলও মানুষে করিতে পারে! সত্য কথা বলিতে কি, সেখানে শান্তির লেশমাত্র নাই, অশান্তি, শুধু অশান্তি! সুখের কথা বলিতেছ? সুখ? সুখের নামও কেহ জানে না! সেখানে সুখ শুধু কবির কল্পনাতেই শোভা পায়। তোমাদের কাছে যেমন শূন্যে বাড়ী তৈয়ারী করা অসম্ভব, আমাদের সুখের আশাও সেইরকম। সেদেশে রাতদিন অসুখ—শুধু অসুখ, অসুখ ছাড়া আর কথা নাই; কেহ কখন সুস্থ থাকিতে পারে না, একটা না একটা রোগ ধরিয়াই আছে। যদি শুধু রোগই ভোগ করিতে হইত, তাহা হইলে বরং ভাল ছিল; কিন্তু শুধু কি তাই? তাহার উপর আবার প্রায়ই হাত-পা ভাঙ্গিয়া যায়, সে যে কি যন্ত্রণা তাহা আর কি বলিব! একরোগের যন্ত্রণাতেই রক্ষা নাই, তার উপর আবার গোদের উপর বিষফোড়া—হাত-পা-ভাঙ্গার যন্ত্রণা!

তোমরা হয়ত বলিবে, আমাদের হাত পা-ই নাই, তা হাত-পা ভাঙ্গিবে কি করিয়া? যার মাথা নাই, তার মাথা ব্যথা! তোমরা বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করিবে না। ঐটা কিন্তু তোমাদের ভুল। তবুও বিশ্বাস হচ্ছে না? তোমরা বুঝি ভাবছ, ভূতের আবার শরীর কি? না গো না, আমাদেরও শরীর আছে, সে শরীর তোমাদের মত হাড়মাস দিয়ে তৈয়ারী নয়, তাহাতে পঞ্চভূতের লেশমাত্র নাই। তোমাদের মত আমাদের দেহে জীবাণু, রোগাণু কিছুই নাই, আমাদের দেহ এক অদ্ভুত জিনিষ দিয়া তৈয়ারী, তাহা এত সূক্ষ্ম যে তোমরা তাহা ধারণাতেও

আগেই বলিয়াছি, নরকে আলোকের চিহ্নমাত্র নাই—সে দেশে শুধু অন্ধকার। উত্তরে দক্ষিণে যে দিকেই চাহ না কেন, আর কিছুই দেখিতে পাইবে না—অন্ধকার, খালি অন্ধকার; যেখানেই যাও না কেন, সেই একঘেয়ে অন্ধকার। আমাদের পৃথিবী কেমন চমৎকার; তোমরা দুঃখে পড়িয়াছ, কিন্তু আশা আছে যে এ দুঃখ একদিন শেষ হইবে—আবার সুখ আসিবে; দুঃখের পর সুখ, অন্ধকারের পর আলোক, ইহাই তোমাদের দেশের নিয়ম। কিন্তু এখানে?—এখানে খালি দুঃখ, আর খালি অন্ধকার—দুঃখও অনন্ত, অন্ধকারও অনন্ত। হায়, সে কষ্ট, সে অন্ধকার কবে শেষ হইবে, কে জানে?—কে বলিতে পারে, কবে আলোর মুখ দেখিতে পাইব!

বুঝিতেছ কি এদেশের আর পৃথিবীর মধ্যে কত তফাৎ? এখানে দুঃখের পর সুখ আসে না, অন্ধকারের পর আলোক আসে না। তুমি আজি কষ্টে পড়িয়াছ? তোমার চিরদিনই কষ্ট থাকিবে, সুখের আশা নাই। তুমি আলোর আশা করিতেছ, হায় হতভাগ্য! তুমি পৃথিবী হইতে যখন আলোক ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছ, তখনই যে তোমার সঙ্গে আলোকের সম্পর্ক মিটিয়া গিয়াছে। ইহাও বুঝিতে পার না, যে আলো আর অন্ধকার এক জায়গায় মিশ খায় না? তুমি অন্ধকার, আলো কেমন করিয়া দেখিবে?"

বলিতে বলিতে হঠাৎ সে থামিয়া গেল, আর তাহার কথা শুনিতে পাইলাম না, বোধ হইল যেন সে ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছে। আমার বন্ধু ন—বাবু বলিলেন "তোমার যদি কষ্ট হয়, তাহ'লে বলতে হবে না—তোমার ইচ্ছা হয়, চলে যেতে পার।" কিন্তু সে চলিয়া গেল না, আবার ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—

"প্রায় শতকরা নিরানব্বই জন লোককে নরকে যাইতে হয়, আমা-

কেও যাইতে হইয়াছিল—হইয়াছিল বলি কেন, আমিত এখনও সেখানেই রহিয়াছি; কখনও নরকের কবল থেকে মুক্তি পাব কি না, ভগবানই বলিতে পারেন—আমি ত আশা-ভরসা সমস্তই ছাড়িয়া দিয়াছি। নরকের কষ্ট ঠিক সাহারা মরুর মতন নিরবচ্ছিন্ন, তাহাতে সুখ নাই, ভোগ নাই, আশা নাই, কিছুই নাই—আছে কেবল দুঃখ—চিরদুঃখ! তোমরা অন্ততঃ সুখের আশা করিতে পার, আমাদের কিন্তু সে আশাও নাই; মহাকবি Byronএর কথায় বলিতে গেলে—

"There still are many rainbows in your skies,
But mine have vanished."

হায়! মরিলেই যদি সব ফুরাইয়া যাইত—সমস্ত কষ্টের অবসান হইত, তাহা হইলে মৃত্যু কি সুখেরই হইত! কি এ মৃত্যু, এ মৃত্যু ঠিক উহার বিপরীত—ইহা বিস্মৃতি নয়, জাগন্ত স্মৃতি; কষ্টের অবসান নয়, কষ্টের আরম্ভ; শান্তি নয়, অশান্তির আধার। এমন মৃত্যুরও কেহ সাধ করিয়া কামনা করে? যাহারা করে, তাহারা পাগল।"

এই সময়ে ন—বাবু তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন "এতক্ষণ ত নরকের কথাই বল্‌লে, তোমার নিজের জীবনী বল্‌বে কে?

"আমার জীবনী?—আমার আবার জীবনী! তাহা শুনিয়া তোমাদের কোনও লাভ নাই, তাই আমি বলি নাই; তবে তোমরা যদি একান্তই শুনিতে চাও, তাহা হইলে বলি। আগে আমার পরিচয়টা দেওয়া যাক্; এই গ্রামেই আমার বাড়ী—বড় সাধের, বড় আদরের পৈতৃক ভিটা। অল্পবয়সে পিতৃমাতৃহীন হওয়ায় কাকার স্কন্ধে চাপিলাম। তিনি আমায় লেখাপড়া শিখাইতে লাগিলেন; আমারও বুদ্ধি প্রখর ছিল, দেখিতে দেখিতে বি-এ পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইলাম।

একদিন আমার স্ত্রী—না, না সে কথা বলিব না। একদিন কাকার

কাছে বিনাদোষে তিরস্কৃত হইলাম। তাহাতে আমার বড়ই রাগ হইল—আমি রাগের মাথায় বিষ খাইলাম!

ক্রমে আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল—ষোল আনা ইচ্ছা থাকিলেও, নিশ্বাস লইতে পারিতেছিলাম। আমার বোধ হইতেছিল, যেন কে আমার গলায় পা দিয়া আমার নিশ্বাস চাপিয়া ধরিয়াছে—আমার এমন ক্ষমতা নাই যে, আমি তাহার কবল হইতে মুক্তি পাই। সে যে কি যন্ত্রণা, কি কষ্ট, তাহা মনে করিতে গেলেও গা শিহরিয়া উঠে। তখন বেশী নয়, একবার—শুধু একবার নিশ্বাস ফেলিতে পাইলে, পৃথিবীর আর কোন সুখই চাহিলাম না।

আমার দেহের ভিতর আইঢাই করিতে লাগিল—প্রাণ যেন বাহির হইয়াও বাহির হইতে চাহে না। আমার শরীর ক্রমে অবশ হইয়া পড়িল—গা-হাত-পা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল—বোধ হইল, কে যেন একখানি বিশ মণ পাথর আমার মাথার ভিতরে পূরিয়া দিয়াছে। আমার ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল; কিন্তু হায়, বৃথা চেষ্টা—কাঁদিয়া যে বুকের বোঝা নামাব তাহারও যো নাই। আমার মতন হতভাগ্য কি জগতে দুটী আছে? আমার চক্ষুও ঘোলা হইয়া আসিতেছে, আমি যা কিছু দেখিতেছি, তা সমস্তই অস্পষ্ট; পৃথিবীটা যেন দূরে—দূরে—আরও দূরে, কে জানে কত দূরে সরিয়া যাইতেছে। এক্ষণে সমস্ত জিনিষই যেন ছায়া বলিয়া বোধ হইতেছে—স্পষ্ট আর কিছুই দেখা যায় না: যাঃ যাও দেখিতেছিলাম, তাও আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল। তখন আমার অবস্থা যে কি রকম, তা' তোমরা বুঝিতে পারিবে না। সে অবস্থা—অতি বড় শত্রুরও যেন সে অবস্থায় পড়িতে না হয়।

আমার চারিদিকে বন্ধুরা সকলে দাঁড়াইয়াছিলেন; আমার বড় ইচ্ছা তাদের সঙ্গে কথা কই, কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে কি হয়—উপায় নাই, আমার

কথা কহিবার ক্ষমতা চিরতরে চলিয়া গিয়াছে! দুঃখে, ক্ষোভে আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম, আমার চোখ দিয়া টস্‌টস্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমি হাত দিয়া জল মুছিতে গিয়া দেখি আমার না আছে হাত, না আছে মুখ, কিছুই নাই। তখন আমার বড়ই ভয় হইল। আমি চারিদিক হাতড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম; দেখিলাম ঘরের মধ্যে অনেক লোক জমা হইয়াছে—আমার মা, কাকা সকলেই কাঁদিতেছেন; আমি কিন্তু কান্নার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না।

শেষে দেখিলাম, আমার দেহ মাটীর উপর পড়িয়া রহিয়াছে; তখন আমার ভারী সন্দেহ হইল যে, ঐ দেহটী আমার, কি এই অশরীরী দেহটা আমার? আমি কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না; সন্দেহ মিটাইবার জন্য ভূমিতে যে দেহটী পড়িয়াছিল, উহার নিকটে গমন করিলাম—গিয়া দেখি, উহা আমারই শব!

এইত কিছুক্ষণ আগে আমি সকলের মতন হাত পা নাড়িয়া বেড়াইতে-ছিলাম, আর এখন?—এখন আমি মড়া! কয়েক মিনিট পূর্ব্বে আমি, আমি ছিলাম; এখন আমার, আমার বলিতে কিছুই নাই এক মুহূর্ত্তের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন! একি সত্য না স্বপ্ন দেখিতেছি? না, সত্যই বটে, তা নইলে আর কি হবে? স্বপ্ন? তাই বা কি করি বলি?—যা নিজে স্বচক্ষে দেখিতেছি (আমাদের এখনকার চক্ষু অবশ্য পার্থিব চক্ষু নয়) তা কিরূপে অবিশ্বাস করি?

আমার মাতা স্ত্রী প্রভৃতিকে কাঁদিতে দেখিয়া, আমার ভারী কষ্ট হইতে লাগিল, আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল একবার সবাইকে সান্ত্বনা দিই—একবার সবাইকে ডাকিয়া বলি "ওগো, আমি এইখানেই আছি, কোথাও যাই নাই,"—একবার বলি "তোমরা আর কাঁদিও না, আমি ত তোমাদের সম্মুখেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছি।" হায়, আমার বলিবার ক্ষমতা কৈ? তোমরা

কেউ কথা কহিবার শক্তি দিতে পার গা ? আমি এক ঘণ্টার জন্য চাহি না, একদিনের জন্য চাহি না—শুধু, শুধু একটিবার ; একটিবার কথা কহিতে চাই ; একবার গো একবার—কেবল একটিবার, তার বেশী চাহি না। আমার যা কিছু আছে সবই তোমাদের দিব, আমার কষ্টের ধন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জয়পত্র, তাও তোমাদের দিতে পারি—যদি একবার, শুধু এক-বার কথা কহিবার ক্ষমতা দাও। আর আমি কিছু চাহি না গো, কিছু চাহি না—আমায় প্রাণ খুলে কথা কহিতে দাও ; আমার বুকের বোঝা নামাতে দাও ; কেবল আমি যে এখানে আছি, তা সবাইকে বুঝিয়ে বলতে দাও। তারপর আবার মেরে ফেলতে হয় ফেলো, আমার তাতে কোনও আপত্তি নাই।

কিন্তু কৈ ? কেহই ত আমার শক্তি আমায় ফিরাইয়া দিল না ; কৈ, আমার মনের ব্যথা ত কাহারই নিকট প্রকাশ করিতে পারিলাম না! তবে কি আর কথা কহিতে পারিব না—এই কি আমার শেষ ; আমার জীবন-রঙ্গভূমির যবনিকা কি চিরতরে পড়িয়া গিয়াছে ?”

এইখানে বলিতে বলিতে সে আবার থামিয়া যাওয়ায়, ন—বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন “তারপর ?”

“তারপর ?—তারপর আর কি, যা দেখিতেছেন তাই ; সেই হইতে আমি—ভূত।” এই বলিয়া সে একটা বিকট দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল ; বোধ হইল, তাহার দুঃখ এত বেশী যে সে যদি ভূত না হইয়া মানুষ হইত, তাহা হইলে বুঝি এত দুঃখ বহন করিতে পারিত না। ওঃ, সে কি মর্ম্ম-ভেদী দীর্ঘনিশ্বাস! এখনও যেন আমার কাণে বাজছে, এখনও যেন মনে হচ্ছে সে যেন এখনও বলছে” তারপর ?—তারপর আর কি সেই হইতে আমি—ভূত!”

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়।

গোপালদাদার কথা।

কলিকাতার কোন গভর্ণমেণ্ট অফিসে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস হেড ক্লার্ক। বাল্যকাল হইতে তিনি সংসার-সুবর্ণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন নাই। তাই এখনও অর্থাৎ ৪৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি অনূঢ়। তাই বলিয়া তিনি যে সংসারী লোকের উপর বীতশ্রদ্ধ, এ কথা কেহ মনে করিবেন না। পরন্তু তাহাদের দুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হয়, তাহাদের সুখে আনন্দে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হয়। বিপন্নকে সাহায্য করিতে তিনি কখনও পরাঙ্মুখ নহেন, এমন কি এমন সময় গিয়াছে, যখন দেখিয়াছি যে তিনি স্বয়ং ঋণ করিয়াও দান করিতেছেন। তিনি যে কেবলমাত্র দিনান্তে ২।১ বার পুঁথিতে জপমন্ত্রোচ্চারণ করিয়াই নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করেন না, এ দৃষ্টান্ত অনেকবার দেখিয়াছি। সুতরাং এইরূপ অমায়িক পরোপকারী ধার্ম্মিক ব্যক্তির কথায় আস্থা স্থাপন করিবে না, এমন লোক নাই বলিয়াই মনে হয়। তাই তাঁহার মুখের কথার ২।১টী অলৌকিক কাহিনী 'অলৌকিক রহস্যের' পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

সে আজ ছয় বৎসরের কথা। একদিন আমি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হই। জ্বর ১০৪ ডিগ্রী হইতে ১০৯ অবধি উঠিতেছিল। গরমে আমি ছট্‌ফট্ করিতেছিলাম। আমার ভাগিনেয়কে কহিলাম, আমার মাথা জল দিয়া ভিজাইয়া দাও, দারুণ গরমে মাথা পুড়িয়া যাইবার মত হইতেছে। আমার ভাগিনেয় আমার কথা মত আমার কপালে একটি জলপটি দিয়া ধীরে ধীরে পাখার বাতাস দিতে লাগিল। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হইলে আমি সামান্য তন্দ্রাভিভূত হইলাম। হঠাৎ গহনার সংঘর্ষণ-শব্দে আমার তন্দ্রা কাটিয়া গেল, দেখিলাম আমার বিছানার পার্শ্বে একখানি কেদারার উপর বসিয়া আমার ভাগিনেয়ী আমায় বাতাস করিতেছে এবং নিদ্রার

ঢুলিয়া পড়িতেছে। আমি তাহাকে আমার ভাগিনেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,—"তার বড় ঘুম পেয়েছে সেইজন্য আমাকে বাতাস করতে বলে সে শুতে গেছে।" আমার এখন একটু অভিমান হইল, কারণ—আমাকে সারারাত্রি বাতাস করিবার জন্য ভাগিনেয়কে বলিয়াছিলাম। আমি ভাগিনেয়ীকে বলিলাম, "তুমি সারাদিন সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়াছ, তুমি এখন শোওগে, নাহলে তোমার ব্যারাম হইতে পারে।" সে যাইতে অস্বীকার করিলে আমি তাহাকে আমার বিছানার পাশে যে জানালাটা আছে, তাহা খুলিয়া তাহাতে একটা তাকিয়া দিয়া বসিতে বলিলাম। বার বার তাহাকে এ কথা বলায় সে জানালায় একটা তাকিয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল, আমিও সেই তাকিয়ার উপর মাথা রাখিয়া পুনরায় তন্দ্রাভিভূত হইলাম। এইরূপে অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইবার পর মনে হইল কে যেন আমার শয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছে! চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম—আমার স্বর্গীয়া মাতুলানী। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—মুখে কোন কথা সরিল না। তিনি বলিলেন, "বাবা তোমার বড় জ্বর হয়েছে! কালই বোধ হয় জ্বরত্যাগ হ'বে। কল্‌কেতার জল-হাওয়া তোমার বেশ সহ্য হচ্ছে না। তুমি পার ত রাঁচীতে গিয়াই থাক, আর তা যদি না পার, দিনকতকের জন্য বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে সেখানে যাও।" যখন তিনি বাঁচিয়াছিলেন, তখন তিনি আমায় খুব ভালবাসতেন, দেহমুক্ত হইবার পরও তিনি আমাকে সেইরূপ স্নেহ করিতেছেন, আমাকে ভুলেন নাই দেখিয়া আনন্দে আমার দুই নয়নে অশ্রু ভরিয়া আসিল। আমার পৃষ্ঠদেশে কি একটা যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম, সে কথা মাতুলানীকে কহিলাম। তিনি আমাকে পাশ ফিরিয়া শুইতে বলিলেন। আমি পাশ ফিরিয়া শুইলে সেই প্রদাহস্থানে যেন একটা

স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলাম, যন্ত্রণার পরিবর্ত্তে আরামে আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, আমি পুনরায় তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ পরে বলিতে পারি না, চাহিয়া দেখি আমার স্বর্গগতা পূজনীয়া মাতুলানী আমার পার্শ্বে আর নাই! কত কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল, তাহা মনের মধ্যেই রহিয়া গেল। জীবনে আরও কয়টা ঘটনা ঘটিয়াছে ক্রমশঃ বলিবার ইচ্ছা রহিল।"

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

স্বচক্ষে প্রেতাত্মা-দর্শন।

আমাদের পুরোহিত অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন সরস্বতী মহাশয় স্বচক্ষে প্রেতাত্মা দর্শন করিয়া যাহা আমাদের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম।

১৩০৫ সালে যখন পশ্চিম বঙ্গে বিশেষতঃ কলিকাতায় প্লেগের আবির্ভাব হয়, তখন সরস্বতী মহাশয় প্লেগভয়ে ভীত হইয়া স্বীয় জন্মভূমি ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়া পরগণার উনশিয়া গ্রামে গমন করেন। সরস্বতী মহাশয়ের বাটী হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে এক প্রসিদ্ধ দেবীমন্দির বিদ্যমান। ঐ মন্দিরে এক কালিকা মূর্ত্তি স্থাপিত আছেন, উহা বোধ হয় অতি প্রাচীনকালে পুরন্দর আচার্য্য নামে কেহ প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি সাধারণ লোকে ঐ কালীমন্দিরকে পুরন্দরাচার্য্যের কালীবাড়ী বলিয়া অভিহিত করে। সরস্বতী মহাশয়ের বাটী

হইতে ঐ কালীবাড়ী যাইতে হইলে একটী বংশ-বিনির্ম্মিত সেতুবিশিষ্ট ক্ষুদ্র খাল পড়ে।

চৈত্রের প্রথম ভাগে এক জ্যোৎস্না-রজনীতে ৯টার সময় উক্ত মন্দিরে বিশেষ ভাবে গীতবাদ্যের আয়োজন থাকায় সরস্বতী মহাশয় তাঁহার অগ্রজ ও ৭।৮ জন ভদ্রলোকের সহিত উক্ত মন্দিরে গীতবাদ্য শ্রবণার্থ গমন করিতেছিলেন।

শিশুকাল হইতেই সরস্বতী মহাশয়ের গীতবাদ্যের প্রতি বিশেষ আসক্তি প্রযুক্ত তিনি তাঁহার দল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। যখন তিনি প্রায় সেতুর নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সেতুর সম্মুখদিকস্থ প্রান্তরে, ত্রিশ বৎসর বয়স্কা এক সুন্দরী রমণী একখানি রক্তবর্ণ পাড় বিশিষ্ট শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক স্বীয় কেশরাশি উন্মুক্ত করিয়া সুমধুর মৃদুমন্দ বায়ুতে শুষ্ক করিতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আর একটু অগ্রসর হইবামাত্রই ঐ স্ত্রীলোকটি রমণী-সুলভ চপলতা প্রদর্শন করতঃ সেতুর অপর প্রান্তে গিয়া উপবেশন করিল। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনে করিলেন যে এত রাত্রে নির্জ্জন পথে একাকিনী কে এ রমণী বসিয়া আছে? আর কেনই বা আমাকে দেখিয়া সেতুর অপর প্রান্তে গিয়া উপবেশন করিল? কি কারণেই বা এরূপ চপলতা প্রদর্শন করিতেছে। নিশ্চয়ই এই স্ত্রীলোকটি ভ্রষ্টা। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৌতূহলপরবশ হইয়া ক্ষিপ্রতার সহিত সেদিকে অগ্রসর হইলেন। যখন তিনি সেতুর মধ্যভাগে উপস্থিত হইলেন, তখন ঐ স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত ত্বরিত পদে একেবারে খালের জলের মধ্যে অবতরণ করতঃ বিকট অট্টহাস্য ধ্বনিতে সেই স্থান পরিপূরিত করিয়া তুলিল এবং তৎক্ষণাৎ বৃক্ষমার্জ্জারবৎ দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া খালের তীরস্থ ১।০ দেড় ফিট বেড়বিশিষ্ট একটা গাবগাছের সরু শাখায় গিয়া মনুষ্যবৎ পা ঝুলাইয়া উপবেশন করিল। ঐ

সরু ডালে কিছুতেই একটি মানুষ উপবেশন করিতে পারে না, কিন্তু উহাকে এরূপ অমানুষিক কার্য্য করিতে দেখিয়া ভয়ে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় চীৎকার পূর্ব্বক অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চীৎকার-শ্রবণে তদীয় ভ্রাতা এবং পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য ৭।৮ জন ভদ্রলোক উৎকণ্ঠিতভাবে দ্রুতপদে আগমন করতঃ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ভূমিতে অজ্ঞানাবস্থায় পতিত দেখিয়া চৈতন্য-সম্পাদনার্থ সচেষ্ট হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের জ্ঞান সঞ্চার হইল। তখন তিনি সমস্ত ঘটনা আমূল জানাইলেন, তৎপরে তাঁহাকে বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল। তৎপরদিন প্রাতে সকলে সমবেত হইয়া উহার কারণ-নির্ণয়ার্থ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইল। অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইল যে, ঐ সেতুর নিকট একটি পোড়ো বাটী আছে, উহাকে সাধারণে "উকিলের বাড়ী" বলে। ঐ বাড়ীর সকল লোক একই সময়ে ওলাউঠা রোগে মারা যাওয়ায় তাহাদের জন্য পারলৌকিক উন্নতিবিষয়ক কোন কার্য্য করা হয় নাই। তাহাদেরই আত্মা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এখানে বসবাস করিতেছে।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন, কবিরাজ।

সম্পাদকের দপ্তর।

এবার আমাদের "দপ্তরে" কয়েকটি অলৌকিক ঘটনাবলীর বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। যে যে স্থান হইতে এইগুলি সঙ্কলিত হইল, তাহাদের নামও আমরা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম :—

১। দৈবদুর্ঘটনা।

বিগত ১১ই বৈশাখের 'নায়ক' পত্রে শ্রীযুক্ত সূর্য্যকান্ত মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন :—

অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিত বাবুর দল দৈব মানেন না, দৈব ঘটনা বিশ্বাস করেন না, কোন দৈব ঘটনার বিষয় শুনিলে হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যান, তাঁহাদের বিজ্ঞানে যাহা আবিষ্কৃত হয় নাই, তাহা তাঁহারা গাঁজাখোরের গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেন। অদ্য তাঁহাদের নিকট একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করিব, যদি তাঁহাদের বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ তাঁহারা যেন নিম্নের ঘটনাটীর সম্বন্ধে সন্ধান করিয়া দেখেন; তাহা হইলে ইহার সত্যাসত্যতা বুঝিতে পারিবেন। ঘটনাটী এইরূপ :—

খুলনা সাতক্ষীরার অন্তর্গত সোণাবেড়িয়া পোষ্ট অফিসের, সোণাবেড়িয়া গ্রামে খাতের মণ্ডল নামক একঘর সঙ্গতিপন্ন কৃষক গৃহস্থ মুসলমানের বাস। তাহারা ৩।৪ সহোদর। উহাদের সংসারে অনেকগুলি পরিবার। কি কারণে ভগবান জানেন, গত কয়েক মাস হইতে উহারা দৈব বিড়ম্বনায় বড়ই বিপন্ন হইতেছে। প্রতি মাসে ১০।১২ দিন ৫।৭ বার করিয়া গৃহাদিতে অগ্নি লাগিতেছে এবং পরিবারস্থ প্রায় সকলেই নানা প্রকার বিকট স্বপ্ন দেখিতেছে। একদিন রাত্রে খাতেরের এক কন্যা, তাহার ভ্রাতাকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিল, বছির! বছির! শীঘ্র আসিয়া দেখ, আমার সম্মুখে এক বিকটাকার জটাজুটধারী সয়তান দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এইরূপ নানা প্রকার ঘটনা প্রায়ই সংঘটিত হইয়া থাকে; উহারা বলে "জেন পরী"তে (চাষা লোকে ঐ সকল কার্য্যকে "জেন পরী"-কৃত বলিয়া থাকে) ঐ প্রকার অত্যাচার করিতেছে। উহা নিবারণের জন্য অনেক অনেক বিখ্যাত মৌলবী সাহেবগণের নিকট হইতে "দওয়া" (কবচ)

লিখিয়া লইয়া আসে। যে দিন ঐ প্রকার "দওয়া" ও ঔষধাদি লইয়া আসে, সেই দিন অত্যাচারের মাত্রা আরও অধিক হয়।

কিছুদিন অতীত হইল, একদিন বিলের একখণ্ড জমী নির্দ্দেশ করিয়া স্বপ্ন হইল যে, "ঐ জমিতে লাঙ্গল চষিলে তোর যথাসর্ব্বস্ব পুড়াইয়া দিব; এখন ত সামান্য সামান্য ক্ষতি করিয়া তোকে সাবধান করিতেছি, এখনও সাবধান না হইলে ভালরূপ শিক্ষা দিব সাবধান। ইত্যাদি ইত্যাদি।" ঐ স্বপ্ন দেখিয়া সে বিখ্যাত ফুরফুরিয়ার মৌলবী সাহেবদিগের নিকট হইতে এক "দওয়া" ও ঔষধ আনয়ন পূর্ব্বক, বাটীর চতুর্দ্দিকে পুতিয়া দিয়া মহা আড়ম্বর করিতে লাগিল! "দওয়া" আনিতে বায়াদিও বেশ পড়িল। সেই দিন রাত্রেই স্বপ্ন হইল, 'আগামী কল্য তোরা সকলেই বাটীতে উপস্থিত থাকিস্, কল্য তোদের বাটীতে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইবে রক্ষা করিস্ দেখা যাইবে। আর "দওয়া" আনিয়াছিস্ দেখি তাহাতে কি হয়।" বাস্তবিক সেই দিন ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় একযোগে তাহাদের সমদয় ঘর, ধান্যের গোলা, গোয়াল ঘর, ধান্যের গাদা ইত্যাদিতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে সকল দ্রব্যাদি ঘর হইতে বাহিরে আনিয়াছিল, সেগুলিও ভস্মসাৎ হইল; একখানি চৌকি দূরে আনা হইয়াছিল, স্পষ্ট দেখা গেল, চৌকির ভিতর হইতে যেন অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া চৌকিখানি দগ্ধ করিল। আরও বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয়, যে সকল প্রতিবেশিগণ অগ্নিনির্ব্বাপন করিবার জন্য সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদের গৃহেও অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, উল্লিখিত গৃহস্থের বাটীর পার্শ্বেই একঘর সেখের বাস ছিল তাহাদের কণামাত্রও ক্ষতি হয় নাই; অথচ দূর হইতে যাহারা সাহায্য করিতে আসিয়াছিল তাহাদের গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইল। খাতেরের সমস্ত ধান্য পুড়িয়া গিয়া সামান্য আধ পোড়া কিছু ধান্য ছিল, অল্প মূল্যে তাহা বিক্রয় করিল, যে ব্যক্তি উহা ক্রয় করিল,

সে দেখিল বাটীতে গিয়া সে ধান্যগুলিও পুড়িয়া গিয়াছে। যে সময়ে গৃহদাহ হয় সেই সময়ে ঐ বাটীর দুইজন পূর্ণ গর্ভবতীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়; ভয়ে কোন গৃহস্থই স্থান না দেওয়ায় এক বাগানে যাইয়া প্রসব হয়; প্রসবের অব্যবহিত পরেই ভয়ানক শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হয়। এখনও তাহারা নিরাশ্রয়; যদি কাহারও বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে সেইখানে গিয়া জানিলেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

২। সাহেব ভূত।

আমাদের সাপ্তাহিক সহযোগী "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহে" প্রকাশ:—

সত্য মিথ্যা জানি না, সহরে বিষম জনরব যে, চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বরতলা-নিবাসী ৺ভগবানচন্দ্র পালের বাটীতে এক সাহেব ভূতের আবির্ভাব হইয়াছে! ভূত কেমন দেখি নাই, তবে দেখিবার জন্য আমরা স্বয়ং ভগবান বাবুর বাটীতে গিয়াছিলাম। তথায় শুনিলাম, যাঁহারা তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে চান, তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাহ্নে জানাইয়া সেলাম করিয়া আসিতে হয়। হুগলীর উকীল বাবু এককড়ি দে ও আমরা সেলাম করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এখনও আমাদের ডাক হয় নাই চুঁচুড়া ষণ্ডেরতলানিবাসী অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী স্কুল ইন্সপেক্টর বাবু হীরালাল পাল বি-এ মহাশয়ের মুখে শুনিলাম যে তিনি ভূতের সহিত ইংরাজী ভাষায় নানারূপ কথাবার্ত্তা করিয়াছিলেন। ভূত বাঙ্গালাও জানেন। শুনিলাম, তিনি ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন। আরও শুনিলাম, জমিদার বাবু রমেশচন্দ্র মণ্ডল ও ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ ঘোষাল ভূতের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। ভূত মহাশয় যদি আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, তাহা হইলে বারান্তরে আমরা ভূতের সম্বন্ধে অন্যান্য কথা প্রকাশ করিব।

৩। পরলোকের সংবাদ।

মৃত ষ্টেড সাহেবের কথা।

সম্প্রতি এক শ্বেতাঙ্গ মহিলা "লাইট" নামক একখানি ইংরেজি সংবাদপত্রে এক পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, গত ২৩শে এপ্রিল তাঁহার নিকটে পরলোকস্থিত মিঃ ষ্টেড সাহেবের আত্মা আগমন করেন। তিনি যে যে কথা ঐ মহিলাকে বলিয়াছিলেন, তাহা তিনি লিখিয়া লইয়াছিলেন। "লাইট" পত্রের সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, এই মহিলা আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্রী। নিম্নে আমরা ঐ মহিলার বিবরণের সারাংশ প্রদান করিলাম।

মহিলাটি বলিতেছেন :—

মিঃ ষ্টেডের আত্মা আমার নিকট আসিবার পূর্ব্বে আমার বোধ হইল কে যেন আমাকে কাগজ ও পেন্সিল লইতে বাধ্য করিল। আমি বুঝিলাম, কোন পরলোকস্থিত আত্মার কথা আমাকে লিখিতে হইবে। আমি পূর্ব্বে প্রায়ই এইরূপভাবে পরলোকগত ব্যক্তিগণের আত্মার মুখের কথা লিপিবদ্ধ করিতাম বটে কিন্তু এখন কয়েক মাস ধরিয়া আমি আর এরূপ করি নাই। তবুও অদ্য প্রাতঃকালে (২৩শে এপ্রিল, ১৯১২) এইরূপ লিখিবার জন্য আমাকে বাধ্য হইয়া বসিতে হইল এবং আমি নিম্নের সংবাদটি পাইলাম।

ষ্টেড সাহেবের আত্মা।

কয়েকটি হিজিবিজি লেখার পর লেখা আরম্ভ হইল :—

আমিই ষ্টেড। সত্য সত্যই আমি তোমার নিকট আমার মনোভাব প্রকাশ করিতে আসিয়াছি। (তাহার পর আরও জোরে কলম চলিতে

লাগিল)। তোমার নিকট আমাকে অনেক কথাই বলিতে হইবে। তুমি বেশ প্রস্তুত হইয়া থাক। ইহা আমার নিজের অনুরোধমাত্র নহে; পরন্তু ইহা একটা আদেশ বলিয়া জানিবে। বহুসংখ্যক আত্মা সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে, ইহা তাহাদেরই আদেশ। সম্ভবতঃ আমার এই কথাগুলি প্রকাশ করিবার জন্য কেহ অনুরোধ করিবে না; আমি এ কার্য্যের জন্য অন্য ব্যক্তিগণের সাহায্য লইব; কিন্তু আমি তোমার সাহায্য ও দ্রুত-লিখনশক্তি পাইতে ইচ্ছা করি।

মহিলা।—আপনি কি রবিবারে আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন?

ষ্টেড। হাঁ; তোমার বন্ধু আমাকে তোমার কাছে লইয়া আসিয়াছিলেন। আমি তোমায় পরলোকগত আত্মাদের জন্য বিশেষতঃ যে সমস্ত আত্মা পাপকালিমাময়, দুঃখী, অন্ধ এবং পৃথিবীর মায়ায় এখনও আবদ্ধ, তাহাদের জন্য আরও বিশেষভাবে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। আমি অনুরোধ করিতেছি, প্রত্যহ একটা সময় নির্দ্ধারণ করিয়া তুমি তাহাদের জন্য প্রার্থনা কর; এবং অন্যান্য সৎপ্রকৃতি লোকদিগকেও তাহাদের জন্য প্রার্থনা করিতে বল। তুমি কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগের সঙ্গে রহিয়াছ এবং আমাদিগকে এই কার্য্যে সাহায্য করিতেছ। "লাইটে" এই পত্র বাহির হইলে ভাল হইবে। আমার এই কথাগুলিও প্রকাশ করিও। তুমি সন্দেহ করিতেছ কেন? আমার ইচ্ছা—যাঁহারা পরলোকগত আত্মাদের সহিত কথাবার্ত্তার আদান-প্রদান করেন বা তাহাদের মাধ্যমিকরূপে (Medium) কার্য্য করেন, তাঁহারা সকলেই একটা দল বাঁধিয়া এই সকল আত্মার জন্য (যাহাদের আয়ু থাকিতেও মৃত্যু হইয়াছে,) প্রার্থনা করুন। এই আত্মাদিগের মধ্যে অনেকে আনন্দে অভিভূত হইয়া হাসিতে হাসিতে ঊর্দ্ধগতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু অনেকে

পরজগতে থাকিয়া যে কিরূপ দুঃখভোগ করিতেছে, তাহা বলিতে পারি না। তাহাদের দুঃখ দেখিলে হৃদয় ফাটিয়া যায়। তাহারা এখনও পৃথিবীর আকর্ষণ কাটাইতে পারে নাই বলিয়া একটা অন্ধকারের মত মায়ার আবরণ তাহাদের ঘেরিয়া আছে। তাহা কাটাইয়া তাহাদিগকে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতে হইবে। সেইজন্যই তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতে বলিতেছি।

আমি খুব জোর করিয়াই তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমার এই কথাগুলি লোকসমাজে শীঘ্রই প্রচার করিয়া দাও। যদি তুমি এই সকল আত্মাদের দুর্দ্দশা তোমার চক্ষু দ্বারা দেখিতে সমর্থ হইতে, যদি তুমি তাহাদের যাতনাধ্বনি তোমার এই কর্ণের দ্বারা শুনিতে সমর্থ হইতে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, তোমরা বিপন্ন জীবিত ব্যক্তিদিগকে বাঁচাইবার জন্য যেরূপ আকুলভাবে ছুটিয়া গিয়াছিলে, ইহাদের সাহায্যের জন্যও তোমরা সেইরূপভাবে ছুটিয়া যাইতে।

তুমি আমার এই কথাগুলি "লাইটে" প্রকাশার্থ পাঠাইয়া দাও অথবা তোমার নিজের ভাষায় এইগুলি লিখিয়া পাঠাইয়া দিও। আমার তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমিই ডবলিউ. টি. ষ্টেড্।

আমি আমার সহি ও মোহর অপর একজনের দ্বারা তোমার নিকট পাঠাইয়া দিব! এ যুগের অবিশ্বাসী ও সন্দিগ্ধমনা লোকেরা আবার স্বাক্ষর চায়! আমাদের দেবতা জোনার স্বাক্ষরই যথেষ্ট।

আমি এক্ষণে এই সকল আত্মার দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য এতই ব্যস্ত রহিয়াছি যে, আমার পরিচিত ও ভালবাসার লোকদিগের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে সময় পাইতেছি না। আমি তাহাদিগকেও এই প্রার্থনাকার্য্যে যোগদান করিতে বলিয়াছি। আর আমি এই কার্য্য প্রত্যেক সহৃদয় ও বিশ্বাসী লোককেই করিতে বলিতেছি।

মহিলা।—আপনি স্পষ্ট করিয়া বলুন কি কার্য্য করিতে হইবে!

ষ্টেড।—দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও অজ্ঞান আত্মাদিগের সহায়তা ও সুখবর্দ্ধন, শান্তি ও জ্ঞানলাভ এবং ঊর্দ্ধগতি ও উন্নতির জন্য তোমরা অনবরতঃ প্রার্থনা করিতে থাকিবে। তোমাদিগের মধ্যে যাঁহারা এই কার্য্য করিতে সমর্থ, তাঁহারা তাঁহাদের আত্মিক দেহ (astral selves) আমাদের নিকট প্রেরণ করুন। পরলোকের নানা তথ্য তাঁহারা তাহা হইলে বিশ্লেষণ করিতে পারিবেন, সঙ্গে সঙ্গে অনেক অজ্ঞানমোহাচ্ছন্ন যাতনাগ্রস্ত আত্মার মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিতে পারিবেন। এই কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে চাই; এমনভাবে চাই—যেন মিশনরীদের মত তাঁহারা কার্য্য করেন। এই অনন্ত শূন্য দিয়া তোমাদের সূক্ষ্মদেহকে আমাদিগের নিকট প্রেরণ কর, এবং তাহাহইলে তাহারা আমাদের নিকট আসিতে পারিবে। তাহা হইলে আমরা দল বাঁধিয়া সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য করিতে পারিব। প্রত্যেক কর্ম্মীকে কোথায় কখন কার্য্য করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া দিব।

আমার এই বাণী—আমার এই কথা তুমি ত লিখিয়া লইলে। এইবার তুমি ইহা প্রচার কর। ভগবানের নামে, খ্রীষ্টের নামে, যাহা তুমি পবিত্র, সৎ এবং শুভদায়ক বলিয়া জান, তাহার নামে তুমি আমার এই কথাগুলি জনসমাজে প্রচার কর।

"তবে এখন আজকার মত আমি বিদায় লইয়া আমার কার্য্যে নিযুক্ত হই। আমার পৃথিবীস্থ সকল বন্ধুকেই প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন করিতেছি তবে আসি!"

ডবলিউ, টি, ষ্টেড।

*উপরের ঐ আত্মিক বিবরণ "লাইট" নামক পত্র হইতে সহযোগী "পত্রিকা" তুলিয়া দিয়াছেন। ষ্টেড সাহেব পরলোকের তথ্যালোচন

করিতেন, মৃত আত্মার সহিত সম্পর্ক রাখিতেন। পার্থিব শরীরে তিনি দুঃখী ব্যথিতের ক্লেশমোচনের জন্য পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এখন পর-লোকেও তাঁহার সে কার্য্যের বিরাম নাই।—(নায়ক)

৪। প্রেতাত্মার অত্যাচার।

কোলাঘাট ষ্টেশনের নিকট গোপালনগর গ্রামে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অত্যন্ত ভূতের উপদ্রব হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ভূতের অত্যাচারে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। বহু অর্থব্যয় ও চেষ্টাতেও ব্রাহ্মণ নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিতেছে না। গৃহের তৈজসপত্রাদি অন্তর্হিত হইতেছে, রাশি রাশি লোষ্ট্র ইষ্টকাদি নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণ-পরিবার সুস্থির হইয়া শয়ন ভোজন করিতে পারিতেছেন না। কখনও বা রমণীগণ রন্ধন করিতেছেন, চুল্লী হইতে কাষ্ঠ আপনা আপনি বাহির হইয়া পড়ে, হয়ত বা হাঁড়ি শূন্যে উঠিয়া যায়, ইত্যাদি। প্রেতাত্মাকে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিলে অত্যাচার বেশী হয়। এমন কি ইষ্টকাদি প্রহারে পরিজনগণকে আহত করে। বাটীর কর্ত্তার হস্তে ইষ্টকাঘাতে ভীষণ প্রহার করিয়াছে। শুনিতেছি প্রেতাত্মা একটী মুসলমান রমণী। প্রায় দুই শতাধিক বৎসরকাল উক্ত ব্রাহ্মণ-গৃহের সন্নিহিত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একজন শিক্ষক থাকেন। তিনি ত্রিপদবিশিষ্ট টেবিলে চক্র করিয়া প্রেতাত্মা আনয়ন করেন। এক দিন উক্ত রমণী আগমন করেন, কিন্তু তাহার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করা হয় বলিয়াই সে এমন অত্যাচার করিতেছে। ব্রাহ্মণের বিশ্বাস উক্ত শিক্ষক মহাশয় যতগুলি প্রেতাত্মাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহারা এবং অনাহূত অনেক প্রেতাত্মা তাহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিতেছে। উক্ত শিক্ষকের স্ত্রীও নাকি দুরস্থিত

তাঁহার পল্লী জন্মভূমিতে উক্ত প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। বহুকষ্টে প্রেতাত্মা দয়া করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

আমাদের বিবেচনায় ব্রাহ্মণ-পরিবার উদ্বিগ্ন ভাব পরিত্যাগ করুন। তাহাকে তাড়াইবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করুন। প্রেতাত্মার কিছু বিশেষ বক্তব্য আছে তাহা শ্রবণ করিয়া তাহার উপকারের চেষ্টা করুন, উপদ্রব প্রশমিত হইবে।

আমরা জানি, এই প্রকার অপূর্ণ অধিকারী বা অবিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা দ্বারা আত্মা আনীত হইলে অনেক সময় সে আপনাকে ও গৃহস্থকে বিপন্ন করে।—মেদিনীপুর-হিতৈষী।

মৃতের পুনর্জ্জীবন।

প্রায় ১৫।১৬ বৎসর অতীত হইল, নিম্নলিখিত ঘটনাটী আমাদের চক্ষের উপর ঘটে। পূর্ব্বে এইরূপ ২।১টী গল্প যে না শুনিয়াছিলাম, এমত নহে। কিন্তু বলিতে কি, কোনটীর প্রতিই আস্থাস্থাপন করিতে পারি নাই। এই ঘটনার পরেও মনে নানা বিতর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু নিয়মিত রূপে "অলৌকিক রহস্য"-পাঠে অনুরূপ গল্প পড়িয়া ও স্বনাম-ধন্য পরলোক-গত মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের Spiritual Magazine পাঠে মনের গতি ফিরিয়াছে। বর্ণনীয় বিষয়টা এখানকার অনেকেই অবগত আছেন।

এখানকার বাজারে কয়েক ঘর ভুজাওয়ালা বাস করে। তাহাদের এক ঘরে একটা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের জ্বর হয়। কয়েক দিন চিকিৎসা চলিল,

কোন ফল হইল না। একদিন অপরাহ্ণ ৪টার সময় স্কুল ছাড়িয়া বাসায় যাইতেছি, এমন সময় বাজারে কান্নার রোল উঠিল। আমাদের বাসাও বাজার-সংলগ্ন, উক্ত ভুজাওয়ালার দোকানের সম্মুখ দিয়াই যাইতে হয়। যাইবার কালে দেখি, বৃদ্ধা মারা গিয়াছে। তাহার শবদেহসহ খাটিয়া বাহিরে রাখিয়া ছেলে মেয়ে চারিদিকে কান্নাহাটি লাগাইয়াছে। বলা বাহুল্য, শবটী আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত।

আমরা বাসায় আসিয়া বিশ্রাম করিতেছি। সহসা কান্নার রোল থামিল। একটু পরেই সেই দোকানের দিকে জনস্রোত চলিয়াছে, দেখিলাম। মুহূর্ত্ত পরেই শুনিলাম, গঙ্গার মা বাঁচিয়াছে। এই গঙ্গা আমাদের স্কুলেও পড়িত। কৌতূকাবিষ্ট হইয়া আমরাও দোকানে গেলাম। যাইয়া দেখি, সন্তানগণের মুখ প্রসন্ন, খাটিয়াখানি ঘরে উঠাইয়াছে। বৃদ্ধার মুখের বস্ত্র উন্মুক্ত, গঙ্গার এক ভগিনী পার্শ্বে বসিয়া একটু একটু করিয়া রসগোল্লা মাকে খাওয়াইতেছে। জিজ্ঞাসায় গঙ্গা বলিল, মুখের উপর একটু একটু নাড়তে দেখিয়া বস্ত্রখানা উঠাইয়া দেখি, মার চক্ষের পাতা নড়িতেছে। একটু একটু নিঃশ্বাস বহিতেছে। যেন কি বলিবার উদ্যোগ করিতেছেন, পারিতেছেন না। ঘন ঘন মুখ ফাঁক করিতেছেন, দেখিয়া একটু জল দিলাম। ক্রমে হস্তপদ নাড়িতে লাগিলেন ও রসগোল্লা খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তাই রসগোল্লা একটু একটু করিয়া দিতেছি। এখন জ্ঞান হইয়াছে।" বিশেষ যত্নের সহিত সেবা শুশ্রূষা করিতে বলিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। প্রাতে শাখা-প্রশাখায় নানা কথা নানা মুখে রচিত হইল।

রোগিণীর স্বমুখে শুনিবার ইচ্ছায় আমি জনৈক বন্ধুসহ গঙ্গার দোকানে হাজির হইলাম। তখন তাহার মা খাটিয়ার উপরে বসিয়া আছে।

সহসা আমাদিগকে দোকানে উপস্থিত দেখিয়া গঙ্গার মা আমাদিগকে বত্ন অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। আমরা নিকটে বসিয়া বৃদ্ধাকে বলিলাম, "নানা জনে নানা কথা বলিতেছেন, আমরা তোমার নিজমুখে শুনিব বলিয়া আসিয়াছি। তোমার যাহা মনে থাকে, ধীরে ধীরে বল, কিরূপে বাঁচিলে?"

বৃদ্ধা একটু হাসিয়া বলিল, "বাবু, আয়ু থাকিলে কি মরে? আমার মনে হইল, যেন কয়েকজন প্রকাণ্ডকায় বেহারা আমায় খাটিয়া সহিত লইয়া যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছি না। মহাবেগে একটা বিশাল ফটকের মধ্যে তাহারা আমাকে লইয়া প্রবেশ করিল। একটা দালানের মধ্যে একজন দিব্যদেহ পুরুষ যেন কি লেখাপড়া করিতেছিলেন। সহসা আমাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গভীর তিরস্কারব্যঞ্জক স্বরে ব্যস্ততার সহিত বলিলেন, "কি করিয়াছিস্? উহাকে আনিলি কেন? শীঘ্র রাখিয়া আয়, উহার ছেলে মেয়ে কাঁদিয়া খুন হইতেছে।" সভয়ে উহারা পুনরায় আমাকে লইয়া সেই ফটক পার হইল। সে সময় আমার একটু পিপাসা হওয়ায় জল চাহিলাম। কেহই কর্ণপাত করিল না। হন্ হন্ করিয়া কিয়দ্দূর যাইয়া "যা" বলিয়া আমার পিঠে সজোরে এক ধাক্কা মারিল। তার পর দেখি, সত্য সত্যই ছেলে মেয়ে পড়িয়া কাঁদিতেছে। তাহারা আমার মুখে একটু জল দিলে ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিলাম। একটু খাইতে দাইতে পারিলেই সবল হইতে পারি, কোন অসুখ নাই।"

ইহার পর গঙ্গার মা প্রায় ৮।৯ বৎসর জীবিতা ছিল। একদিন পরিবারস্থ মেয়েরাও তাহাকে আনিয়া এই কাহিনী শুনিয়াছিল। এখন পাঠক ইহার টীকা টিপ্পনী করুন।

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ।

অলৌকিক রহস্য।

১২শ সংখ্যা] তৃতীয় বর্ষ। [আষাঢ়, ১৩১৯।

পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত।

"হারবিঞ্জার অফ্ লাইট" নামক প্রেত-তত্ত্বসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা শ্রীমতী এনি ব্রাইট ডাক্তার কোট সাহেবের প্রণীত "অদৃশ্য আত্মার ফটোগ্রাফি" নামক নূতন পুস্তকের সমালোচনায় যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম। ঐ পুস্তক হইতে জানা যায় যে, ১৮৪৮ সালে আমেরিকার নিউ ইয়র্কের রচেষ্টার সহরে প্রথম "প্রেত-তত্ত্ব" আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং তদবধি আমেরিকায় ইহার এতদূর উন্নতি সাধন হইয়াছে যে, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বোষ্টন সহরে মিষ্টার মথ্লার নামক সাহেব একখানি প্রেতের চিত্র পাইয়াছিলেন এবং এক্ষণে ডাক্তার কোট ৯০টী প্রেতাত্মার চিত্র সহ এই পুস্তক* মুদ্রিত করিয়াছেন। ডাক্তার কোট ইতিপূর্ব্বে অদৃশ্য আত্মা দর্শন নামক এক পুস্তিকা বাহির করিয়াছিলেন। যাহা হউক, যতদূর জানা গিয়াছে প্রেতচিত্র আর কিছুই নহে, কেবল স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ মাত্র; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যেক স্থানেই ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া

* Photographing the invisible by James Coates Ph. D. F. A. S. with 90 photographs. Fowler & Co., Chicago, U.S.A. The Advanced Thought Publishing Co.

যাইতেছে। পণ্ডিত ইমানুয়েল ডাউচেজ বিবেচনা করেন যে, ভবিষ্যতে চিত্র দ্বারাই যাঁহারা স্থূল জগৎ হইতে প্রেরিত হইয়া সূক্ষ্ম শরীরে বর্তমান আছেন, ইহা প্রমাণিত হইবে এবং অনেক বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু মনীষিগণ এক্ষণে এই মতের পোষকতা করিয়া থাকেন।

এক্ষণে যে সকল প্রেতের ফটোগ্রাফ লওয়া হইয়াছে, সে সমস্তই কোন মাধ্যমিক (medium) লোক দ্বারা লওয়া হইয়াছে। ফ্রান্সে এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান হইতেছে এবং ফ্রেঞ্চ সভা সংপ্রতি প্রেতচিত্রের যন্ত্র আবিষ্কারের জন্য পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন অর্থাৎ যে কেহ বিনা মিডিয়মের সাহায্যে প্রেতের ফটোগ্রাফ যন্ত্র প্রচার করিবেন, তিনি পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্ক পুরস্কার পাইবেন। আমাদের দেশে পূর্ব্বে প্রেততত্ত্বের অনুসন্ধান সম্বন্ধে অনেক চেষ্টা হইত, কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ সমস্ত বিজ্ঞানই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমাদের মধ্যে এমন অনেক মহাত্মা আছেন, যে পরকালের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করেন না এবং কেহ কেহ যদিও পরকাল মানেন, কিন্তু প্রেতলোক যে আছে এবং তাহাদিগকে বিজ্ঞান যাহারা দর্শন করা যাইতে পারে, ইহার কিছুই বিশ্বাস করেন না। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে এ সকলের আন্দোলন লইয়া এক্ষণে খুব ধূমধাম চলিতেছে এবং সেই আন্দোলনের ফলে অনেক অলৌকিক বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে। আমাদের "অলৌকিক রহস্যে"র উদ্দেশ্যও তাহাই। যখন প্রত্যেক ঘটনার মূল কারণ নির্দ্দেশিত হইবে, তখন পাঠক জানিতে পারিবেন যে, বিষয়টী কত গুরুতর এবং কি কঠিন ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করিয়াছি। তখন বিষয়গুলি "অলৌকিক রহস্য" বলিয়া গণ্য হইবে না, বরং বৈজ্ঞানিক সত্য ঘটনা বলিয়া বোধ হইবে এবং তাহার ফলে জগৎ সত্যপ্রতিষ্ঠ ও পৃথিবীতে সত্যের জয় ঘোষণা হইবে।

"সত্যং বলং কেবলম্"।

আমরা এক্ষণে নিম্নে একটা যথার্থ ঘটনা যাহা আমাদের নিজের জীবনে ঘটিয়াছে, তাহা বিবৃত করিলাম। পাঠক মহাশয়, ইহার বিশেষ কারণ বিবেচনা করিবেন।

আমি একদিন দামোদর নদীর পশ্চিমকূলে বেড়ুগ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন ময়দানে কার্য্যোপলক্ষে গিয়াছিলাম। আমার সঙ্গে আমার সহকারী অফিসার ও একজন পদাতিক ছিল। আমরা ক্ষেত্র মাপিতে মাপিতে যাইতেছিলাম, হঠাৎ দূর হইতে দেখিলাম যে, নদী পার হইয়া আমি যে দিক হইতে আসিয়াছিলাম, তাহার বিপরীত দিক হইতে একজন যুবা একটী বালকের হস্ত ধরিয়া দ্রুতপদে আমার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে আসিতেছে অর্থাৎ দুর্গাচরণ "বাবা" তুমি একটু দাঁড়াও, আমি তোমাকে দর্শন করিব ও প্রণাম করিব। তুমি পূর্ব্বজন্মে আমার পিতা ছিলে, অদ্য ভাগ্যক্রমে তোমার দর্শন পাইলাম" ইত্যাদি। আমি শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম, বিশেষ তাহার দাড়ি গোঁপ দেখিয়া আমার বোধ হইল যে, সে ব্যক্তি মুসলমান, আমাকে পূর্ব্বজন্মের পিতা বলিয়া সম্বোধন করাতে আরও বিস্মিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলাম। ক্রমে সে নিকটস্থ হইলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে দেখিতেছি তুমি অন্ধ, তুমি কি করিয়া জানিতে পারিলে যে, আমি এখানে আসিয়াছি এবং আমি তোমার পিতা? তুমি কি জন্মান্ধ? তুমি কি আমার নিকট ভিক্ষা যাচ্ঞা কর? আমার বোধ হয়, তোমাকে কেহ আমায় এই স্থানে আসার সংবাদ বলিয়া দিয়াছে সেই কারণে কিছু ভিক্ষা প্রার্থনার কারণ দৌড়িয়া আসিয়াছ। এই লও, লইয়া প্রস্থান কর।" আমি এই বলিয়া একটী টাকা তাহার নিকট ফেলিয়া দিলাম। সে বলিল, আমি টাকার প্রার্থী নহি। আমার জীবনবৃত্তান্ত আপনি শ্রবণ করুন এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন, পরজন্মে আমি পুনরায় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিতে পারি।

"আমি নিকটস্থ একটি গ্রামের প্রজা, প্রায় দশবিঘা জমী জায়গা আছে, আমি জাতিতে মুসলমান। অদ্য ৫।৬ বৎসর হইল, একদিন তুই প্রহরের সময় আমি মাঠ হইতে কাজ করিয়া বাটীতে আসিয়া স্নানভোজনের বন্দোবস্ত করিতেছি, আমার গৃহিণী রন্ধন করিতেছে এবং আমার ১২ বৎসর বয়স্ক পুত্রও সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত আছে, এমন সময়ে ষোড়শবর্ষীয়া সধবা পরমাসুন্দরী এক ব্রাহ্মণকন্যা আমার বাটীতে আসিয়া কাতরস্বরে কহিল, "বাবা আমার জাতি রক্ষা কর, আমি শ্বশুরালয়ে একাকী যাইতেছি, এই গ্রামের কয়েকজন তুষ্ট আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে, আমি দৌড়িয়া তোমার আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।" আমি তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য দিয়া আমার আর একখানি ঘরে তাঁহাকে বসিতে দিলাম। পরে আহারাদি করিয়া আমার মনে হইল ব্রাহ্মণকন্যা ও ঘরে বসিয়া কি করিতেছে দেখিয়া আসি। পরে সেই ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণকন্যাকে অপূর্ব্ব সুন্দরী দেখিয়া আমার মনে কুভাব উদয় হইল ও আমি তাহার নিকটে ঘরের ভিতর যাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ঘরের মধ্যে যেমন প্রবেশ করিলাম, অমনি আমার তুটী চক্ষু অন্ধ হইল। আমি আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না এবং ব্রাহ্মণ কন্যার আর কিছুই অনুসন্ধান পাইলাম না। ক্রমে এই ছয় বৎসরের মধ্যে আমার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে ও সন্তানটী মারা গিয়াছে। আমি আত তুঃখে কালযাপন করিতেছি। কল্য আমি মেমারীর নিকট আমার ভগ্নীপতির বাটী গিয়াছিলাম। তথায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই। কেবল মা কালীর ধ্যান করিয়াছি। পরে আমার প্রতি আদেশ হইল, 'তুমি সত্বর তোমার বাটী ফিরিয়া যাও। সেখানে তোমার পূর্ব্ব জন্মের পিতা কল্য প্রাতে আসিয়া জমি মাপ করিবেন। তুমি তাঁহার চরণে প্রার্থনা কর। তুমি পূর্ব্বজন্মে তাঁহার অবাধ্য হইয়া মুসলমান পত্নীর প্রণয়ে আসক্ত ছিলে, এ কারণে এ জন্মে মুসলমান হইয়াছ

এবং এ জন্মে সাধ্বী ব্রাহ্মণকন্যার প্রতি কুদৃষ্টি করিয়া অন্ধ হইয়াছ। তিনি তোমাকে ক্ষমা করিলে তুমি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরজন্মে চক্ষুষ্মান্ হইয়া ব্রাহ্মণকুলে জন্মিবে।” আমি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে সে চলিয়া গেল।

শ্রীদুর্গাচরণ বিদ্যাভূষণ।

শেষ পাহারা।

শ্রীযুক্ত “অলৌকিক রহস্য”-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

মহাশয়, নিম্নলিখিত ঘটনাটি আমার জনৈক আত্মীয় স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাই তত কৌতূহলপ্রদ না হইলেও, কেবল সত্য বলিয়া পাঠাইয়া দিলাম। যদি উপযুক্ত বোধ করেন, তাহা হইলে আপনার পত্রিকায় স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

সে আজ প্রায় উনিশ বৎসর আগেকার কথা, আমার আত্মীয় তখন প্রথম পুলিশে ভর্ত্তি হইয়াছেন। সেই সময় তিনি যে থানায় ছিলেন, সেই থানায় আবদুল নামে একজন পাহারাওয়ালা সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া মারা যায়। লোকটী অত্যন্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিল, কেহ কখন তাহাকে কার্য্যে গাফিলি করিতে দেখে নাই। তাহার জগতে আপনার বলিতে কেহই ছিল না; সে থানাটীকেই আপনার ঘরবাটী করিয়া লইয়াছিল। মরিবার পর তাহাকে যথারীতি গোর দেওয়া হইলে, সেই রাত্রে একজন পাহারাওয়ালা আসিয়া বলিল, সে আবদুলকে দেখিয়াছে। থানার সকলে তাহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল, তাহার কথা কেহই বিশ্বাস করিল না, আত্মীয়ও করেন নাই।

তাহার পরদিন রাত্রে, আমার আত্মীয় বোঁদ হইতে ফিরিতেছিলেন ; তখন রাত্রি একটা হইবে। রাস্তার পাশেই গোরস্থান ; পল্লীগ্রামের রাস্তা, বুঝিতেই পারিতেছেন রাস্তার দুই পাশেই নিবিড় জঙ্গল, তার মধ্য দিয়া রাস্তা। সে দিন আবার অমাবস্যার রাত্রি, আকাশ মেঘে ঢাকা, টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। কোথাও কোনও শব্দটিমাত্র নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটা শৃগাল হুয়া হুয়া রবে রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। এমন সময় তিনি দেখিলেন, দূরে একজন পাহারাওয়ালা আলোকহস্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চেহারা ভাল দেখা যাইতেছে না। তাহার লণ্ঠনটার যেন আলোক দিবার ক্ষমতা নাই, কেবল মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে, সে আলোক যেন অন্ধকার রাশি ভেদ করিতে না পারিয়া, নিজের রশ্মিগুলিকে ফিরাইয়া লইয়াছে। চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সে আলোকও অন্ধকারে মিশিয়া গেল। আমার আত্মীয় মনে করিলেন বুঝি বা কোন পাহারাওয়ালা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। বোধ হয় তাহার আলো নিবিয়া গেল। এই মনে করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ হ্যায় ?" আবার আলোক জ্বলিয়া উঠিল, আবার দূরে মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা দিল। সেই মূর্ত্তি ক্রমে ক্রমে নিকটে আসিল ; সেলাম করিয়া বলিল, "খবর আচ্ছা হ্যায়।" এই কথা বলিয়াই কোথায় মিলাইয়া গেল। আমার আত্মীয় সাহসী হইলেও তাঁহার মনে ভয় হইল, তিনি ভাবিলেন এই এইখানে ছিল, কোথায় গেল! আবার দেখিলেন, দূরে আলো দেখা গেল ; তিনিও সেইখানে গেলেন, গিয়া দেখেন, সেখানে কেহই নাই। তিনি আবার ডাকিলেন "কোন্ হ্যায় ?" আবার আলোক দেখা দিল, আবার উত্তর করিল, "খবর আচ্ছা হ্যায়।" এই সময়ে বিদ্যুৎ চমকাইল, সেই বিদ্যুতালোকে তিনি দেখিলেন; কি সর্ব্বনাশ, আবদুল আলোকহস্তে দণ্ডায়মান! এই দেখিয়াই তিনি থানার দিকে

ছুটিতে লাগিলেন। আবার দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে আবদুল। ভয়ে তিনি রাস্তার ধারে একটী ছোট খানা ছিল, তাহার মধ্যে পড়িয়া গেলেন এই সময়ে দুইজন পাহারাওয়ালা সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, আমার আত্মীয়ের চীৎকার শুনিয়া আসিয়া তাঁহাকে সেই গর্ত্ত হইতে উত্তোলন করিল।

এই ঘটনার পর আবদুলকে আর কেহই দেখিতে পায় নাই। সেই তার শেষ পাহারা।

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়।

আকর্ষণ।

আকর্ষণতত্ত্ব অতি বিশাল, প্রত্যেক পরমাণু হইতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত আকর্ষণবলে পরিচালিত হইতেছে। এত বিস্তীর্ণ ব্যাপারের আলোচনার স্থান ইহা নহে, সামর্থ্যও তাদৃশ নাই। আমরা এস্থলে আকর্ষণসম্বন্ধে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক সত্য ঘটনার উল্লেখ করিয়াই খালাস।

(১) বেঙ্গল নাগপুর রেললাইনের সাঁখরাইল ষ্টেশনে নামিয়া পশ্চিম দিকে যাইতে হইলে একটি ক্ষুদ্র জলা পার হইতে হয়, এই জলাভূমি বর্ষাকালে জলমগ্ন থাকে, লোকের যাতায়াতের জন্য একপ্রকার ক্ষুদ্র নৌকা এই সময়ে যথেষ্ট জমা হয়, এই নৌকাকে সালতি বলে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ বর্ষাকালে সালতিযোগে যাইতে যাইতে এক স্থানে একটি উচ্চ ডাঙ্গা জমির উপর একটি শাঁখামুটি সাপ চীৎকার করিতেছে শুনিয়া আমার জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র তথায় সালতি থামাইয়া ব্যাপার দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে।

প্রায় পাঁচমিনিট পরে পার্শ্ববর্ত্তী জল হইতে একটি জলঢোঁড়া সাপ একটি সরল পুঁটিমুখে করিয়া শাঁখামুটি সাপটির নিকট আসিয়া মাছটি তাহাকে দিবার মত ভাবে সম্মুখে ধরিল। শাঁখামুটির ডাক তাহাতে থামিল না, সে একবার মাত্র মাছটির দিকে তাকাইয়া পূর্ব্ববৎ ডাকিতেই থাকিল। জলঢোঁড়া সাপটি মাছটিকে মুখে করিয়া শাঁখামুটির মুখের নিকট পুনঃ পুনঃ ধরিতে লাগিল ও শেষে উহার গায়ের উপর ফেলিতে লাগিল, যেন উহাকে মাছটি লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

এইরূপে কয়েক মিনিট কাটিয়া গেল, শেষে মাছটিকে রাখিয়া জলঢোঁড়া সাপটি নিজে শাঁখামুটির গায়ে পড়িতে লাগিল, তাহাতেও উহার ডাক থামিল না; অগত্যা জলঢোঁড়া নিরস্ত হইয়া উহার মুখের নিকট নিজের মুখ রাখিয়া লম্বা হইয়া পড়িল এবং শাঁখামুটী উহার মুখের দিক হইতে উহাকে গিলিতে লাগিল, পোনের মিনিট মধ্যে প্রায় সব গিলিয়া ফেলিল ও চীৎকার বন্ধ করিল।

হাবড়া জেলায় শাঁখামুটি সাপকে রাজ সাপ বলে, এবং ইহার দুই মুখ আছে, সকলে বলিয়া থাকে। এই জাতীয় সাপ ঈষৎ হরিদ্রাভ এবং দুই ফিট অন্তর একটি করিয়া কাল দাগ কাটা আছে। দীর্ঘে প্রায় দুই হাতের অধিক হয়। লেজের দিকে বৃশ্চিকের হুলের মত দুইটি হুল থাকে, লোকে ইহার দুই মুখ বলিয়া থাকে। এই জাতীয় সাপ সচরাচর দেখা যায় না।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কৃত ঋজুপাঠ প্রথম ভাগে সিংহ ও শশকের গল্পে পড়িয়াছি, পশুরাজ ভাসুরককে প্রত্যহ একটি করিয়া পশু দিতে হইত। আমাদের ঘটনাতেও দেখিতেছি ডাকে বাধ্য হইয়া আসিয়া বেচারাকে জলঢোঁড়া নিজ দেহ সর্পরাজকে বলি দিতে হইল। তাহার প্রদত্ত পুঁটিমাছ রাজাবাহাদুরের গ্রাহ্য হইল না, কাতরে প্রাণভিক্ষার প্রার্থনা গ্রাহ্য

হইল না; এমনি সর্পরাজ্যের নিয়ম, এমনি আকর্ষণের শক্তি যে, জলঢোঁড়ার পলাইবার উপায় নাই, যেন পলাইতে চেষ্টা করিতে কোন শক্তিবলে একবারে অসমর্থ,—এই ভাবে জল হইতে উঠিয়া আসিয়া নিজ শরীর রাজভোগে অর্পণ করিল।

ঘটনাটি প্রকৃত, ইহার কোন অংশ মিথ্যা নহে, শেষ অবস্থায় আমিও তথায় উপস্থিত হই, এবং সংবাদ-বাহক ও উক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রের বর্ণিত পূর্ব্বাংশ শ্রবণে তাহা আমার কিছুমাত্র অতি রঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় নাই।

(২) নীলগিরি পর্ব্বতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে মলকুরুম্বা নামে ক্ষুদ্রকায় কৃষ্ণবর্ণ এক জাতি আছে। এই জাতি গুপ্তবিদ্যার মন্ত্রতন্ত্র সাহায্যে লোকের অনিষ্ট করিতে বড়ই পটু। ক্রুদ্ধ হইলে ইহাদের চক্ষুর ভাব বড়ই ভয়ানক হয়, চক্ষু হইতে যেন অগ্নি বাহির হইতেছে বোধ হয়; কিন্তু এই অগ্নি শীতল, এই অগ্নি-দৃষ্টি যাহার উপর পড়িবে তাহার জীবনাশা আর থাকে না। ইহারা পক্ষী ধরিতে বড়ই পটু। কিছু পয়সা দিলেই ইহারা গাছের যে কোন পক্ষি দেখাইয়া দিলে তাহা ধরিয়া দিতে সমর্থ ও একটা টাকা দিলে সর্ব্বসমক্ষে পাখীটি পালক হাড়গোড়-সহ গোটা খাইয়া ফেলিয়া থাকে।

বেটর নামক জনৈক আমেরিকাবাসী অরনিথলোজিক্যাল সোসাইটির পক্ষ হইতে নীলগিরি পর্ব্বতে আসিয়া পক্ষিতত্ত্ব বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া পক্ষিসম্বন্ধে দুইখানি পুস্তক লেখেন। তাঁহারই পুস্তক-লিখিত এক ঘটনার আমরা এস্থলে উল্লেখ করিব।

একটি পাখী আপনি দেখাইয়া দিন, সে অমনি এক টুকরা কাঠ কুড়াইয়া লইয়া তাহা দুই হাতের মধ্যে রাখিয়া বেশ করিয়া ঘসিতে থাকিবে, ইহাতে কাঠটি যেন পালিস করা মত হইয়া যায়। পরে সেই কাঠখানি নিকটস্থ কোন আগাছার ডালে মাটি হইতে প্রায় দুই ফুট উপরে ঝুলাইয়া

দিবে। পরে কয়েক পদ পশ্চাৎ হাঁটিয়া গিয়া মাটিতে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িবে ও কথিত পাখীটি গাছের যে স্থানে আছে তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিবে। কয়েক মিনিট কাল নিশ্চলভাবে পড়িয়া থাকিবে ও পাখীর দিকে চাহিয়া থাকিবে। এই দৃষ্টি সেই শীতল অগ্নিময় দৃষ্টি। এই দৃষ্টি দেখিলে ইহাতে আকর্ষণ ও দূরীকরণ দুই ভাবই যেন প্রকাশ পাইতে দেখা যায়, এরূপ ভয়ানক দৃষ্টি বেটর সাহেব বলেন তিনি মানুষে কখনও দেখেন নাই। মহীশুর দেশে একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ ভেক আছে, শীকার ধরিবার সময় তাহাদের চক্ষুর দৃষ্টি এইরূপ অগ্নিময় হয় তিনি দেখিয়াছেন, শীকার ধরিবার কালে সাপেদের দৃষ্টি অনেকটা এইরূপই হইয়া থাকে।

যাহা হউক, কথিত পাখীটি স্বচ্ছন্দ ভাবে এ ডাল ও ডাল করিয়া বেড়াইতেছিল, এই দৃষ্টির বলে আর তাহার রক্ষা নাই, সহসা একটু থামিল, ক্ষুদ্র মস্তকটি হেঁট করিয়া দুই এক সেকেণ্ড থাকিল ও ডানা ঝাড়া দিয়া উড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কুরুম্বার শক্তিতে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সে আকর্ষণ ছাড়িয়া পলাইবার শক্তি পাখীর নাই। ক্রমশঃ পাখীটি যন্ত্রণাসূচক চীৎকার করিতে করিতে, এ ডাল হইতে ও ডাল করিয়া নামিয়া কুরুম্বার সেই ঝুলান কাষ্ঠখণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। বেচারার পালকগুলি এবড়ো খেবড়ো হইয়া পড়ে। শেষে কাষ্ঠ খণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে একেবারে লাফাইয়া কাষ্ঠখণ্ডে আসিয়া পড়ে ও কুরুম্বা যাইয়া ধরিয়া ফেলে।

(৩) দ্বিতীয়টির ন্যায় এইটিও আমাদের ধার করা, নিজস্ব নহে। তন্ত্রে আকর্ষণ সম্বন্ধে নানা প্রকার মন্ত্র ঔষধির উল্লেখ আছে, ইহা ষটকর্ম্মের মধ্যে বশীকরণোক্ত প্রধানকর্ম্মের অংশ, দত্তাত্রেয় প্রভৃতিতে ইহার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র অধ্যায় আছে। সাধারণতঃ পুরুষ কর্ত্তৃক স্ত্রীলোক আকর্ষণই ইহার

উদ্দেশ্য। আমরা কর্ণেল অলকট্ কথিত একটি ঘটনা সত্য বলিয়া এস্থলে প্রকাশ করিলাম। কর্ণেল লোকটির নিজমুখে তাঁহার ঘটনা শুনিয়াছেন ও লোকটিও সম্ভ্রান্ত মুসলমান, বেশ শিক্ষিত ও তাহার কয়েকখানি সদ্‌গ্রন্থও আছে।

উক্ত শিক্ষিত ও গ্রন্থকার মুসলমানটির একটি কোন সুন্দরী ললনার উপর দৃষ্টি পড়ে। স্ত্রীলোকটিও অতি নির্ম্মলচরিত্রা, বিশেষ শিক্ষিতা ও বড় ঘরের ছিলেন, অনেক চেষ্টায় তাঁহাকে মৌলবী সাহেব টলাইতে পারিলেন না। শেষে কোন লোকের পরামর্শে আকর্ষণী বিদ্যার আশ্রয় অন্বেষণ করিতে করিতে মন্ত্রবিৎ লোকের সাহায্য মিলিল। একটি স্বচ্ছ-দর্পণের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যহ কিয়ৎকাল ধরিয়া কোন একটি মন্ত্রজপের শিক্ষা পাইয়া মৌলবী সাহেব একমনে তাহা সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েকদিন দর্পণের দিকে দৃষ্টি করিয়া মন্ত্র জপ করিবার পর উক্ত দর্পণ মধ্যে একটি শক্তির মূর্ত্তি দেখা যাইতে লাগিল। ঐ শক্তিকে পিশাচ বা যক্ষ ইত্যাদি কোন নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ঐ শক্তি মৌলবী সাহেবের ইচ্ছামত নিজ তীব্র ইচ্ছাশক্তি অসহায় রমণীর উপর প্রয়োগ করিতে লাগিল। রমণীটি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া ঐ শক্তির বেগ রোধ করিতে পারিল না। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কুকর্ম্ম করিতে যাইতেছে, বেশ জানিয়া শুনিয়াও কোন এক অদম্য আকর্ষণবলে মৌলবী সাহেবের সম্মুখীন হইলেন। রমণীর সর্ব্বনাশ হইল। মৌলবি সাহেবের অদম্য কল্পনার তৃপ্তি হইল। মৌলবী সাহেব রমণীকে লইয়া ঘর করিতে লাগিলেন।

ঐ শক্তি কিন্তু মৌলবী সাহেবের উপর তদবধি বেশ আধিপত্য করিতে লাগিল। ক্রমে মৌলবী সাহেবের জীবন উহার তাড়নায় অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি নিজকৃত দুষ্কর্ম্মের ফল হাড়ে হাড়ে বিঁধিতেছে বুঝিলেন, সেই

দর্পণ মধ্যস্থিত শক্তি এড়াইয়া তাঁহার কোন কার্য্যের সামর্থ্য রহিল না, তিনি একেবারে ঐ শক্তির গোলাম হইয়া নানা প্রকারে পীড়িত হইতে লাগিলেন। শেষে অনেক সময় তাহার আত্মহত্যার বলবতী বাসনা হইতে লাগিল ও মনোবেদনায় দিবারাত্র জ্বলিতে লাগিলেন। কি প্রকারে সেই শক্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তাঁহার অনেক সন্ধান করিলেন। কিছুই ফল হইল না।

মহাপাপীর আবার শান্তির আশা কে তাহাকে শান্তি দিবে! এই অবস্থায় নিজ অবস্থা মৌলবী সাহেব কর্ণেলের নিকট বর্ণনা করেন।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

(১) মহামায়া আমার মধ্যম সহোদরের কন্যা ; সন ১৩১৭ সালের শ্রাবণ মাসে জন্ম হয় এবং সন ১৩১৮ সালের আষাঢ় মাসে মৃত্যু হয়। মৃত্যু অকস্মাৎ হয়। মেয়েটি দেখিতে আমার মৃতা সহোদরা সরস্বতী দেবীর ন্যায়। আমাদের সকলে বলিত যে সরস্বতীই আসিয়াছে। ২৪শে আষাঢ় রাত্রে মেয়েটীর কাশি দেখা দিল, কাশি তত গুরুতর বোধ না হওয়ায় পরদিন প্রাতে ঔষধ আদির ব্যবস্থা হইবে ভাবিয়া শ্রীমান্ গণেশচন্দ্র নিশ্চিন্ত থাকে। পরদিন প্রাতে যথারীতি ঔষধ আদি সেবন করিতে দিয়া সে রোগী দেখিতে চলিয়া যাইল। মধ্যাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে, কাশি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, পরীক্ষায় মেম্‌ব্রেনস্ ক্রুপ হইয়াছে ধার্য্য হইল, ঔষধাদি নানাপ্রকার ব্যবস্থা হইতে লাগিল। কিছুতেই পীড়ার বৃদ্ধি রোধ করা গেল না। সন্ধ্যায় অবস্থা খারাপ বুঝা গেল।

কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীমান্ মহাদেব ভায়ার অতি কোমল প্রকৃতি; বিপদাপদ দেখিলেই নিজে অতিশয় অধৈর্য্য হইয়া পড়ে। এ সময়ে তাহার শরীরের বর্ণ শাক মত ও বিমলিন। সে বাটীর বাহির হইয়া বহির্বাটীতে যাইয়া শুইল। মেয়েটীকে সে বড়ই ভালবাসিত, নিয়তই কোলে লইয়া বেড়াইত, সম্মুখে থাকিয়া দম আটকান যন্ত্রণা দেখিতে একান্ত অপারগ হইল।

রাত্রি প্রায় ভোর হইয়াছে; নিদ্রাও হয় না, স্থিরভাবে শুইয়া আছে। এমন সময় কে যেন মহাদেবের নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাকে বলিল, "আমার সময় হইয়াছে চলিলাম, আর আমি থাকিতে পারিলাম না।" ভায়া চমকিয়া উঠিল, এদিকে বাটীতেও কান্নার রোল উঠিল। মহামায়ার জীবন-লীলা শেষ হইয়াছে।

(২) আমি কয়েক মাস ধরিয়া পক্ষাঘাতের মত রোগে ভুগিতে-ছিলাম। সাত আট মাস গত হওয়ায় কেবলমাত্র দাঁড়াইবার ক্ষমতা মাত্র হইল। পরিশেষে নান্নায় শ্রীশ্রী৺ পঞ্চাননদেবের মাটী মাখিতে গত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ হইতে আরম্ভ করি। ছয় দিন মাটী মাখিতে থাকা কালে কতদিনে না ধরিয়া চলিয়া ফিরিতে পারিব, তাহা জানিবার জন্য উৎকণ্ঠা হওয়ায় ঐ প্রশ্ন মনে করিয়া একটী চাউল, সুপারি ও পয়সা দিয়া পুঁটলি বাঁধিয়া তাহা গণককারের বাটীতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। অতি প্রত্যূষে আমাদের ঝি আসিয়া উক্ত পুঁটলি লইয়া গণকের নিকট চলিয়া গেল। তখন ভোর পাঁচটা বাজিয়াছে, আমি মাটীমাখা অবস্থায় কম্বলাসনে ব্রহ্মচারীর মত মেজেতে শুইয়া আছি, ঝিয়ের কথায় নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ঝি চলিয়া যাইলে মনে হইল গণককারদের কথা সকল সময় ঠিক হয় না, আমি ত-ঠাকুরের স্মরণ লইয়া তাঁহার মাটী মাখিতেছি, ঠাকুরকেই একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাক না। এই ভাব মনে লওয়ায় মনে মনে ঠাকুরকে

বলিলাম, "ঠাকুর আমি ত তোমার শরণ লইয়াছি, তুমিই আমাকে বলিয়া দাও, আমি কবে না ধরিয়া চলিতে ফিরিতে পারিব, আমি বড়ই বিপন্ন।" এইরূপ মনে মনে বলিয়া পূর্ব্বদিকে মস্তক রাখিয়া উত্তরমুখ হইয়া শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। আধ ঘণ্টা পরে একটি সুমিষ্ট স্বর শুনিতে শুনিতে নিদ্রাভঙ্গ হইল। কথা কয়েকটি অতি স্পষ্ট ও মিষ্ট, তাহা এই "একমাস, অভ্যাস—অভ্যাস।" কে যেন ঈশান কোণ হইতে বলিতেছেন শুনা গেল। বলা বাহুল্য, একমাস কাল মধ্যেই, অর্থাৎ উহার শেষে বরাবর দেখিলাম আমি না ধরিয়া প্রায় শতাধিক হস্ত চলিতে ও ফিরিতে পারিতেছি।

এই কথা শুনিয়া আমার মধ্যম সহোদর শ্রীমান্ গণেশ ভায়া বলিল "দাদা আপনি যাহা শুনিয়াছেন, তাহা প্রকৃত। বাবা পঞ্চাননই আপনাকে চলাইয়া দিয়াছেন। স্বপ্নের আদেশ ঐরূপ ভোর বেলা এবং ঈশান কোণ হইতেই শুনা যায়। ইতিপূর্ব্বে আপনার যে অসুখ হয় ও বাবা তারকনাথের ঔষধ ধারণ করান হয়, তৎকালে আমিও একদিন এই ঘরে ঈশান কোণ হইতে বলিতে শুনিয়াছিলাম, স্বরও অতি স্পষ্ট ও মধুর; কথা কয়েকটি এই "হাওয়া খাইতে যাবি, তত বেশী পয়সা কি আছে? পোনের দিনের মধ্যে ভাল হইয়া যাইবে।" যথার্থই সেইবার ঐ সময়ের মধ্যেই আমি সুস্থ হইয়া কার্য্যক্ষম হই।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূতের কথা।

আজ যে গল্প দুইটী বলিতেছি, তাহার প্রথমটীর নায়ক এবং লেখক উভয়েই আমার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। নায়কের নিজের মুখে বৃত্তান্তগুলি শুনিতে যেমন ভাল লাগে, অপরের মুখে তেমন লাগে না; তাই তাহাকে দিয়াই ঐ গল্পটী লিখিয়া লইলাম—রচনা আমারই লিখিত, তবে পাঠকগণের চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য উহা নায়ক যেন নিজেই বলিতেছেন এরূপভাবে লিখিত হইয়াছে।

পাঠকগণ দেখিবেন যে দ্বিতীয় গল্পের শিক্ষিত ব্যক্তিটী আদৌ প্রেতাত্মা মানিতেন না, কিন্তু আমার ভ্রাতা ঠিক উহার বিপরীত; সে চিরকালই ভূতের ভয়ে কাঁটা। বাটীর সকলেই পূর্ব্বে তাহাকে ঠাট্টা করিত, কিন্তু সেই স্বপ্নের পর হইতে আর কেহ ও বিষয় লইয়া তাহার সহিত রহস্য করে না; আর স্বচক্ষে অমন আশ্চর্য্যজনক ঘটনা দেখিয়া কেহ অবিশ্বাস করিবেই বা কেমন করিয়া?

নিম্নে গল্প দুইটি প্রদত্ত হইল—

১। স্বপ্নে দেখা।

আমি ছেলেবেলা হইতেই একটু ভয়তরাসে, ভূতের ভয় আমার এত বেশী যে এমন কি সন্ধ্যার সময় পর্য্যন্ত আমি একাকী ঘরের বাহির হইতে পারি না, আর অন্ধকার রাত্রির ত কথাই নাই; যদি একান্তই বাহিরে যাইতে হয় ত আর একজনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাই। আমাদের বাড়ীর আর কাহারই ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস ছিল না, তাঁহারা আমায় উপহাস করিতেন, কিন্তু একদিন এমন একটী বিশেষ ঘটনা ঘটিল, যাহা হইতে তাঁহারাও আমার মতন ভূতে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হন।

সে আজ প্রায় আড়াই বৎসর আগেকার কথা, একদিন আমার মাসতুতো ভাইকে একটা পাগলা কুকুরে কামড়ায়; তার পর যেমন হইয়া থাকে, ডাক্তার আসিয়া দংশিত স্থান পুড়াইয়া দিল, ও তাহার পরদিনই তাঁহাকে কুনূরের (মাদ্রাজ) পাস্তর চিকিৎসালয়ে পাঠান হইল। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন, মাস খানেকের মধ্যেই ঘাটা সব শুকাইয়া গেল; ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে যে কুকুরে কামড়াইয়াছিল এ কথাও সকলে ভুলিয়া গেলেন।

* * * * * * *

তারপর প্রায় দেড় বৎসর চলিয়া গিয়াছে। একদিন আমি সন্ধ্যার সময় জানালার ধারে বসিয়া আমাদের বাড়ীর সম্মুখে যে ঘাটটী ছিল, তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম,—একমনে জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত ধরণীর শ্যামল বক্ষের শোভা দেখিতেছিলাম। আমাদের ঘরের মধ্যেও খানিকটা চন্দ্রালোক প্রবেশ করিয়াছিল। তারপর একলাটী বসিয়া থাকিলে যা হয় আমারও তাই হইল, একটু একটু করিয়া তন্দ্রা আসিল,—ক্রমে সেই তন্দ্রা নিদ্রায় পরিণত হইল।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম—দেখিলাম যে আমি আমার মাস্তুতো ভাইয়ের দেশে বাগ আঁচড়ায় (যশোর) উপস্থিত হইয়াছি—এক পা কাদা ভাঙ্গিয়া গ্রাম্যপথ দিয়া চলিতেছি। কিছুদূর যাইতে না যাইতেই দেখিলাম, সম্মুখেই আমার মাস্তুতো ভাই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমি বলিয়া উঠিলাম "কি, হেমন্ত দাদা যে, কেমন আছেন? এইখানে বলিয়া রাখা ভাল, আমায় মাস্তুতো ভাইয়ের নাম "হেমন্তকুমার গাঙ্গুলী (ইনি প্রসিদ্ধ স্বর্ণলতা লেখক তারক গাঙ্গুলীর ভ্রাতুষ্পুত্র)

২। বিষম শিক্ষা।

আমি আধুনিক কলেজীয় যুবক—সভ্য, ভব্য, নব্য বাবু; ইহা হইতেই বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন, আমি কুসংস্কারের ধার ধারি না; ভূতটুত মানা আমার কোষ্ঠিতে লিখে নাই। নিজে ত ভূত বিশ্বাস করিতামই না, অপরকে বিশ্বাস করিতে দেখিলে তাহাকেও ঠাট্টা করিতে ছাড়িতাম না। কিন্তু আমার সে অবিশ্বাস বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই, কেমন করিয়া গেল তাহাই এক্ষণে বলিতেছি।

আমি কলিকাতায় যাঁহার বাড়ীতে বাসা করিয়াছিলাম, তিনি একদিন হঠাৎ কলেরা হইয়া মারা যান। সেই হইতে বাড়ীর লোকেরা তাঁহার প্রেতাত্মাকে দেখিতে পায় বলিয়া আমায় বিরক্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু প্রেতাত্মা প্রভু আমাকে একদিনও দর্শনসুখ দান করেন নাই, কাজেই আমি সাধারণতঃ যেমন করিয়া থাকি, তাঁহাদেরও কথা তেমনি অবিশ্বাস করিলাম। আমি তাঁহাদের অনেক বুঝাইলাম, কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে চাহিলেন না, রাতদিন ঘরের আনাচে কানাচে ভূত দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে একদিন সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করিলেন যে, এই ভূতুড়ে বাড়ীতে মানুষের তিষ্ঠান দায়, অতএব এ বাড়ী ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া যাক্। কথায়ও যা, কাজেও তাই হইল, তাঁহারা সকলেই আর একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে চলিয়া গেলেন; কিন্তু আমি চিরকালই একটু গোঁয়ার (দোহাই পাঠক, তা বলিয়া আমাকে সত্যসত্যই যেন গোঁয়ার মনে করিবেন না, তবে লোকে আমায় ঐ মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন, তাই এখানে বাধ্য হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত উপাধিই ব্যবহার করিতে হইল) আমি তাঁহাদের সঙ্গে গেলাম না—মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ও পুত্রের সহিত আমি সেই বাটীতেই বাস করিতে

লাগিলাম। এখানে বলা বাহুল্য, বাটীর গৃহিণী তাঁহার স্বামীর বাটী ত্যাগ করেন নাই, তাঁহার পুত্রও তাঁহার সহিতই ছিলেন।

তাহার পর প্রায় এক সপ্তাহ চলিয়া গেল,—ইহার মধ্যে বিশেষ কোন ঘটনা হইল না। একদিন আমি নাট্যপুস্তকখানি সম্মুখে রাখিয়া ঝিমাইতেছিলাম; তখন রাত প্রায় বারটা। চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও কোনও শব্দটীমাত্র শুনা যাইতেছিল না; দুই একটী কাক কেবল সকাল হইয়াছে মনে করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এমন সময়ে, হঠাৎ সমস্ত গৃহটী বিকট হাস্যধ্বনিতে পূর্ণ হইয়া গেল। আমি চমকিয়া উঠিলাম; চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম কেহই কোথাও নাই, কে হাসিতেছে বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, কে ওখানে? ঘরের দেওয়ালে সে কথাগুলি প্রতিহত হইয়া আবার ফিরিয়া আসিল, প্রতিধ্বনিও উত্তর দিল কে ওখানে? কোন উত্তর না পাইয়া, ঘরের বাহিরে কে হাসিতেছে দেখিতে গেলাম; বেশী দূর যাইতে হইল না, দেখিলাম আমার ঠিক সম্মুখেই সেই মৃত বাড়ীওয়ালা দাঁড়াইয়া বিকট মুখভঙ্গী করিয়া হাসিতেছে। আমাকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "তোরা এখনও এ বাড়ীতে রহিয়াছিস্? জানিস না কি আমি একলা থাকিতে ভালবাসি? যদি ভাল চাস ত এখনি বাড়ী ছেড়ে চলে যা।"

আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম, কতক্ষণ যে এই ভাবে ছিলাম, তা বলিতে পারি না। জ্ঞান হইলে দেখিলাম, বাড়ীর গৃহিণী আমার শুশ্রূষা করিতেছেন। আমি তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলে তিনি তাহার পরদিনই সেইবাটী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন; আমিও সেখান হইতে তল্পীতাল্পা তুলিলাম।

সেই হইতে আর কখনও ভূত নাই বলিয়া তর্ক করি নাই। আমার বন্ধুরা এখনও আমায় ঠাট্টা করিতে ছাড়েন না, বলেন কেমন ভূত নাই

না? আমি উত্তর দিই, "সেবার যা বিষম শিক্ষা পাইয়াছিলাম তাই যথেষ্ট; আবার কি নাই বলিয়া সত্যিকার ভূতের হাতে পড়িব?"

শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়।

পুনরাগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সেই দিনেই আমার চাকরী হইল। আমি একেবারেই আড়াই শত টাকা বেতনে এসিষ্ট্যাণ্ট ইন্‌জিনিয়ারের পদ পাইলাম। উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত যে খাল গিয়াছে, সে সময় তাহার সংস্কারের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাহারই তত্ত্বাবধানের ভার আমার উপর পড়িল। সুতরাং পিতা পত্রে যে লিখিয়াছিলেন, আমার চাকুরী কলিকাতায় হইবে, কার্য্যতঃ তাহা হইল না। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইলেও, কার্য্যস্থান হইতে কলিকাতায় নিত্য আসার আমার সম্ভাবনা রহিল না।

তবে সংস্কারকার্য্য আরম্ভ হইতে তখনও মাস দুই বিলম্ব ছিল। সেই কার্য্যসম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হইবার জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু শিক্ষানবিশী করিবার জন্য আমি সেই দুই মাসের জন্য কলিকাতা থাকিতে আদিষ্ট হইলাম। পূজার অবকাশের পরেই আমাকে কার্য্যে যোগ দিতে হইবে।

নূতন চাকরী, শীঘ্র ছুটি পাইবার সম্ভাবনা নাই জানিয়া, পিতা পরবর্ত্তী মাসেই আমার বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। মাতাও আমাকে বিবাহিত দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মুখে দুই একবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও বিবাহে আমার একান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমি তখন ইংরাজী পড়া শেষ করিয়া একরূপ সুশিক্ষিত হইয়াছি। ইংরাজদের বিবাহপদ্ধতি, চক্ষে না দেখিলেও, পুস্তকে পড়িয়া পড়িয়া আমার সুপরিচিতই হইয়াছিল। উপন্যাসপাঠে তন্ময়ত্বের অবকাশে বিকারিণী কল্পনা কতবার কোন্ আকাশের কোন্ কুঙ্কুমবরণা সন্ধ্যায় সুশীতল তরল কাঞ্চন হিল্লোলিনী-তীরে আমাকে দাঁড় করাইয়া কোন্ দিগন্তাগতা বরবর্ণিনীর নীলনলিনাভ নয়নের কটাক্ষ আমাকে দান করিয়া গিয়াছে! আমার ইচ্ছা ছিল পাত্রীকে নিজে দেখিয়া বিবাহ করি।

বিশেষতঃ দুর্গার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সত্য কথা বলিতে কি ঘটনাচক্রে তাহার সঙ্গে আমার অন্যরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত না হইলে, আমি দুর্গার মত বালিকাকে স্ত্রীরূপে পাইলে আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বিবেচনা করিতাম। যদি ভাবী পত্নী তাহার মত রূপবতী না হয়, তাহা হইলে, তাহাকে গৃহে আনিবার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখকে পাছে সহযাত্রী করিয়া আনিতে হয়, এই ভয়ে বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রীকে দেখিতে আমার অভিলাষ হইয়াছিল।

তবে পিতার দৃষ্টির সমালোচক হইয়া পত্নীনির্ব্বাচনকার্য্যে অগ্রসর হইতে তখনও পর্য্যন্ত শিক্ষিত যুবকগণের সাহস হয় নাই। সুতরাং পিতার নির্ব্বাচন উপেক্ষা করিয়া নিজে পাত্রী দেখিবার ধৃষ্টতা করিতে আমারও কোন মতে সাহস হইল না।

কিন্তু অন্তর্য্যামিনী মা আমার মনের কথা যেন শুনিতে পাইলেন। বিবাহে আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তিনি আমাকে পাত্রী দেখিয়া

আসিতে আদেশ করিলেন, এবং পিতাকে এ কার্য্যে সম্মতি দিতে অনুরোধ করিলেন। বলিলেন,—"আজিকালিকার ছেলে কলিকাতায় থাকিয়া সমাজের নূতন ধরণের রীতি-নীতি দেখিয়া উহাদের মনের ভাব আলাদা হইয়াছে। আমার ইচ্ছা গোপীনাথ নিজে দেখিয়া পছন্দ করিয়া বিবাহ করিলে ভাল হয়, কেন না তাহা হইলে তোমার আর কোন দায়িত্ব থাকে না।"

আমার সম্মুখে পিতার কাছে মাতাকে এইরূপ প্রস্তাব করিতে শুনিয়া লজ্জায় আমার মস্তক অবনত হইল।

মাতা আমাকে তদবস্থ দেখিয়াই বলিলেন—"মাথা হেঁট করিতে হইবে, আমি এমন কথা বলি নাই, এ ধর্ম্মের কথা, লজ্জার কথা নয়, তোমার সংসারের প্রতিষ্ঠা হইবে। তাহার সুখ-দুঃখ সমস্তই তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। তুমি যদি নিজে দেখিয়া, আপনার পছন্দমত স্ত্রী ঘরে আনিতে পার, তাহাতে দোষ কি?"

পিতা এ কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না, আমিও এ কথার কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না। মায়ের একটা কথা শুনিয়া আমি চিন্তিত হইলাম। সেই একটি বাক্যেই আমার ভাবীপত্নীকে দেখিবার আগ্রহ অনেকটা দূর হইয়া গেল। দায়িত্ব,—নিজ চক্ষে পাত্রী দেখিয়া বিবাহের পর যদি আমি অসুখী হই! আমি শুধু রূপ দেখিতে অভিলাষী। একদিনের একদণ্ডের দেখায় তাহার স্বভাবচরিত্র বুঝিবার আমার অবসর কই? অথচ দায়িত্ব পিতা মাতা পাত্রী নিরূপণ করিয়া পুত্রের ভাবী সুখদুঃখের দায়িত্ব,—গ্রহণ করেন। সুতরাং পুত্রকে সুখী রাখিবার জন্য তাঁহারা সৎশিক্ষায় বধূকে গৃহধর্ম্মের উপযোগিনী করিবার চেষ্টা করেন। রূপদর্শন-প্রলোভন ও কর্ত্তব্য-পালন, এতদুভয়ের বিভিন্ন-মুখ আকর্ষণে আমি উত্তরদানে ইতস্ততঃ করিতেছি, ইত্যবসরে মাতা

পিতার মত জানিতে চাহিলেন, বলিলেন, "গোপীনাথ কি করিবে বল ?"

পিতা বলিলেন—"পুরুষানুক্রমে কেহই আমাদের একার্য্য করে নাই। বরাবর গুরুজনেরাই পাত্রী স্থির করিয়া থাকেন।

মাতা উত্তর করিলেন—"কিন্তু তাহাতে ত সুফল হয় নাই। তুমি ত আমাকে লইয়া সুখী হইতে পার নাই। আমি তোমার সংসারে একমাত্র অশান্তির কারণ হইয়াছি।"

কথা গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। মায়ের কথায় পিতার মুখ গম্ভীর হইল। আমি বুঝিলাম, এরূপ অবস্থায় এখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়। ভাবী স্ত্রীকে দেখিবার ইচ্ছা আমার মন হইতে একেবারেই দূর হইয়া গিয়াছে। এইজন্য স্থানত্যাগের পূর্ব্বে নিজের অভিপ্রায় মাতাকে জানাইলাম। বলিলাম—"আমি যে নিজে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছি, একথা তোমাকে কে বলিল !"

মাতা। কেহ বলে নাই, আমি অনুমান করিয়াছি।

আমি। আমার কি দেখিয়া এরূপ উদ্ভট অনুমান করিলে ?

মাতা। তোমার আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়াছি।

আমি। তুমি ভুল বুঝিয়াছ।

মাতা। তবে কি জন্য বিবাহে অমত করিতেছ ?

আমি। আমি এখন বিবাহ করিতে ইচ্ছা করি না।

মাতা। আমি একথা বিশ্বাস করিতে পারি না।

কথাটা শুনিবামাত্র আমার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। নিরক্ষরা মা শিক্ষিত সন্তানকে এক প্রকার মিথ্যাবাদী বলিলেন। শিক্ষার অভিমান জাগিয়া উঠিল। সত্যের অপলাপ করিতেছি জানিয়াও আমি বলিলাম—

"তোমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে আমার কিছু আসে যায় না। আমি যহা সত্য তাহাই বলিতেছি।"

মাতা চিরাভ্যস্ত প্রশান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভবিষ্যতে ত বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে!"

আমি। এখন তাহা কেমন করিয়া বলিব? ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে। অর্থ উপার্জ্জন না করিয়া বিবাহ করা আমি গর্হিত কার্য্য মনে করি।

মাতা। তোমার অর্থের ত অভাব নাই।

আমি। সে ত পিতার উপার্জ্জন, আমি ত করি নাই।

পিতা প্রথম হইতে নীরব ছিলেন। এতক্ষণ পরে তিনি কথা কহিলেন, আমাকে স্থানত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন।

মাতা সে কথায় কান না দিয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন,—"এ সংসারে সকলেই অর্থ উপার্জ্জন করিতে আসে না। কেহ আজন্ম পরিশ্রমে উপার্জ্জন করে, কেহ ভোগ করে। তোমার ত অর্থ উপার্জ্জন করিবার কোনও প্রয়োজন দেখি না। তুমি যে চাকুরীর জন্য কেন গৃহত্যাগ করিতে চলিয়াছ, আমি বুঝিতে পারি না।"

পিতা বলিলেন—"তবে কি অলসভাবে ঘরে বসিয়া যুবক আমার উপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করিবে?

আমি বলিলাম,—"উপার্জ্জনের শক্তি থাকিতে আমিই বা তাহা করিতে যাইব কেন?"

মাতা। কথা মানুষের মত বটে। তবে কথা এক, কাজ আর। কথা আমি তোমাদের অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু কাজ দেখি নাই। তোমরা কথায় যাহা বলিতেছ, যদি কাজে তাহা দেখাইতে পার, তাহা হইলে মরণ-সময়ে তাহা দেখিয়া অন্ততঃ একদণ্ডের জন্যও সুখী হইয়া মরিতে পারি।

পিতা। আমার জ্ঞানে যাহা কর্ত্তব্য, চিরদিনই তোমার সম্বন্ধে আমি তাহা করিয়া আসিয়াছি ; ইহাতেও যদি তুমি অসুখী হও, তাহা হইলে আমি কি করিতে পারি।

মাতা পিতার কথার কোনও উত্তর দিলেন না, আমাকেই বলিতে লাগিলেন,—"শুন গোপীনাথ, তুমি যাহা বলিলে তাহা যদি তোমার অন্তরের কথা হয়, তাহা হইলে আমি তোমাকে বিবাহে অনুরোধ করিতে পারি না। বাস্তবিকই যদি পৈত্রিক সম্পত্তি তুমি লোভের বিষয় না করিয়া নিজের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা কর, সে কার্য্য আমি গর্হিত মনে করিতে পারি না। মনের অবস্থা সেরূপ হইলে এখন বিবাহ না করাই কর্ত্তব্য। কেন না এ সংসারের ভবিষ্যৎ কি হইবে, তোমার সঙ্গে ইহার কি সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা আমি বলিতে পারি না। তুমি বুঝ, বুঝিয়া কার্য্য কর। আমার বক্তব্য বলিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইলাম।

এই বলিয়া মাতা গৃহত্যাগ করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে পিতা বলিলেন, "তোমার মাতার মস্তিষ্ক-বিকার ঘটিয়াছে। নতুবা এরূপ প্রস্তাব তাহার মুখ হইতে বাহির হইবে আমি প্রত্যাশা করি নাই।"

ঘটনাচক্রে পড়িয়া আমি অনেকটা সাহসী হইয়াছি। আমি সাহস করিয়া পিতার কথার উত্তর দিলাম, বলিলাম,—"যদিই মায়ের মস্তিষ্ক-বিকার ঘটিয়া থাকে, সে মস্তিষ্ক-বিকারের কারণ আপনি।"

কথা শুনিবামাত্র পিতার মুখ রক্তিমাভ হইল। তথাপি আমি বলিতে বিরত হইলাম না। বলিলাম—"মায়ের কথায় বুঝিয়াছি, মা আমার অধিক দিন বাঁচিবেন না। আর মা যদি না থাকেন, তাহা হইলে এ গৃহ আমার পক্ষে শ্মশানতুল্য হইবে। শুনুন পিতা, মা প্রাণত্যাগ করিলে আমিও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গৃহত্যাগ করিব।"

পিতা বলিলেন—"একমাত্র আত্মহত্যা ব্যতিরেকে মানুষের ইচ্ছামত ত আর মৃত্যু আসে না।"

আমি বলিলাম,—"আমার মা আত্মহত্যা করিবেন, সে ভয় আমার নাই ; তবে মা অধিক দিন বাঁচিবেন না, আপনি জানিয়া রাখুন।"

পিতা ঈষৎ ক্রোধের সহিত বলিলেন—"আমি তোমার প্রলাপ বাক্য শুনিবার জন্য বসিয়া নই। এখন বিবাহ সম্বন্ধে কি করিবে স্থির কর। তোমারও প্রকৃতি সহসা এরূপ পরিবর্ত্তিত হইবে জানিলে, আমি আগে হইতে সাবধান হইতাম ; এ বিবাহসম্বন্ধ স্থির করিতাম না। তোমার পিতৃভক্তিতে সন্দেহ ছিল না বলিয়াই আমি নিজে পাত্রী দেখিয়া মনোনীত করিয়াছি, এখন যদি তুমি নিজে পাত্রী দেখিতে যাও, তাহা হইলে আমার মাথা হেঁট হইবে।"

আমি বলিলাম,—"আপনার মাথা হেঁট হইবে এমন কাজ আমি কখন করিব না। আপনি এ বিবাহসম্বন্ধে যাহা আমাকে আদেশ করিবেন তাহাই আমার শিরোধার্য্য।"

"তাহা হইলে পাকা দেখার জন্য তাহাদের পত্র লিখি ?"

"লিখুন।"

পিতা বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমিও মায়ের কাছে ছুটিয়া গেলাম।

মা পিতার গৃহ ছাড়িয়াই ঠাকুরঘরে গিয়া বসিয়াছেন—ধ্যানস্থার মত বসিয়াছেন। দেখিয়া বোধ হইল, মা যেন নিজের কথার সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য নিমীলিতনেত্রে ভবিষ্যতের চিত্র নিরীক্ষণের প্রয়াস করিতেছেন। মায়ের কথা শুনিয়া আমার মনে একটা বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। আমার মনে হইয়াছে, মায়ের দেহত্যাগের পর পিতা আবার বিবাহ করিবেন। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই আমি পিতার পর হইয়া যাইব, পিতার সমস্ত সম্পত্তি হইতে আমি বঞ্চিত হইব, মনে হইতেই

পিতার সংসারের একটা অপ্রীতিকর ছবি কল্পনায় জাগিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। আমি যেন দেখিতে পাইলাম, অদূর ভবিষ্যতে আমি মাতৃহীন ও পিতৃপরিত্যক্ত অবস্থায় বিষাদময় জীবন লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। সেই অবস্থায় পড়িয়া আমি একবার গোপালের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করিলাম। তুলনায় বুঝিলাম, আমি গোপালের অপেক্ষাও দুঃখী। স্বর্গারোহণের সময়ে জননী যে পবিত্র স্নেহটুকু গোপালের জন্য রাখিয়া যাইবেন, সেটী ধর্ম্মের মূর্ত্তি ধরিয়া গোপালকে ইহজগতে সর্ব্ব বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। তাহার দেবোপম পিতার আশিষ তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিবে। দেবীরূপিণী জননী হইতে বঞ্চিত হইলে আমার কি থাকিবে! চাকরী করিয়া অগাধ উপার্জ্জন করিলেও আমার দুঃখের অবধি থাকিবে না। ঘটুক আর নাই ঘটুক, সে অবস্থা কল্পনায় আনিতেই আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমি ডাকিলাম,—"মা।"

সুপ্তোত্থিতা জননী আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাহার পর কি জানি কি বুঝিয়া আমাকে কাছে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন—কথা কহিলেন না।

ইঙ্গিতমাত্রেই আমি মায়ের সমীপে উপস্থিত হইলাম। অনেক কথা কহিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার কাছে উপস্থিত হইবামাত্র সহসা আমার বাক্য রুদ্ধ হইয়া আসিল। শত চেষ্টাতেও মাকে আমি একটি কথাও বলিতে পারিলাম না। আমি মায়ের পদপ্রান্তে পতিত হইলাম।

মা আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন—"বাপ, আমার উঠ। আমি তোমার মনের কথা সকলি বুঝিতেছি।"

আমি তদবস্থায় রহিয়াই বলিলাম,—"অসংখ্য অপরাধ করিয়াছি। ক্ষমা চাহিলে আমার দুখ নাই। তবু বল মা, তুমি এ পাপিষ্ঠ সন্তানকে ক্ষমা করিলে?"

মা করুণামাখা স্বরে বলিলেন—"সন্তানের অপরাধ লইতে মায়ের যে ক্ষমতা নাই গোপীনাথ! জগজ্জননী এ ক্ষমতা যে নিজে ত্যাগ করিয়াছেন।"

এই বলিয়া আবার আমার মস্তকে হস্ত দিয়া মা আমাকে উঠিতে আদেশ করিলেন।

আমি উপবিষ্ট হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলাম—"সত্য সত্যই তুমি কি আমাকে ছাড়িয়া যাইবে?"

"কেন বাপ্, তুমি ত সমস্তই নিজ চক্ষে দেখিয়াছ।"

"দেখিয়াছি, কিন্তু বিশ্বাস করিতে আমি সাহস পাইতেছি না।"

"বিশ্বাস কর। আমি যে দিন জীবনের অধিকার ছাড়িয়াছি। সেই দিনেই আমার মৃত্যু হওয়া উচিত ছিল, কেন যে বাঁচিয়া আছি তা মা জানেন, গুরু বলিতে পারেন। বুঝি গোপালকে—"

বলিতে বলিতে মাতা নীরব হইলেন। আমি বলিলাম—"বল না, পায়ে ধরি, বলিতে বলিতে নীরব হইও না। আর একবার গোপালের নাম কর, তোমার মুখে শুনি। সাত বৎসর আমার কানে তোমার মুখ হইতে গোপালের নামের ধ্বনি প্রবেশ করে নাই। আমিও গোপালের নাম মুখে আনিতে সাহস করি নাই। একবার নাম করিয়া তোমাকে হারাইতে বসিয়াছিলাম। ভবিষ্যৎ না বুঝিয়া স্বেচ্ছায় গোপালকে বিসর্জ্জন দিয়াছি। কিন্তু গোপালকে ছাড়িয়া অবধি কি মর্ম্মবেদনায় এ সাত বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি, তাহা তোমাকে কি বলিব!"

মা বলিলেন—"তাহা আমি বুঝিয়াছি এবং সেই জন্য দারুণ মর্ম্ম-বেদনাতেও তোমাকে লইয়া আমি অনেক আশ্বস্ত ছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, আমি অযোগ্য সন্তান গর্ভে ধরি নাই। নহিলে কোন্ দিন মরিয়া জীবনের যন্ত্রণা এড়াইতাম তার ঠিক কি! গোপীনাথ! গোপাল ত শুধু আমার

স্নেহের ধন নয়, আমার ধর্ম্ম। আমার শ্বাশুড়ী ধর্ম্মের নামে গোপালকে আমার হাতে সঁপিয়া গিয়াছেন।”—বলিতে বলিতে মা নীরব হইলেন! বুঝিলাম, শোকের প্রচণ্ড আবেগে মায়ের মুখে আর কথা সরিতেছে না। ধর্ম্ম! ইহা তো আমরা পিতাপুত্রে কেহই বুঝি না! এ ত শুধু দেহ লইয়া কথা নয়; গোপালের সেবা মায়ের ধর্ম্ম; ধর্ম্মত্যাগী আমরা কেহই মায়ের এ মহত্ত্বের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। শুধু মমতার অছিলা ধরিয়া মাকে আমি এত দুঃখ দিতেছি!

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মা আবার বলিতে লাগিলেন,—“গোপালকে একটীবার দেখিবার জন্যই বুঝি এতকাল বাঁচিয়া আছি। তাই মরিয়াও বুঝি আমি মরিতেছি না। তবে, নানা কারণে আর আমার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।”

“সে কারণও আমি জানি। দুর্ভাগ্যবশে তোমার প্রতি পিতার সেই কঠোর বাক্য আমার কর্ণগোচর হইয়াছে।”

“তুমি শুনিয়াছ?”

“শুনিয়াছি, আর শুনিবামাত্র পিতার প্রতি আমার অভক্তি হইয়াছে।”

“ছি! অমন ভাব কখনও মনে আনিও না। পিতার মত গুরু ইহ-সংসারে আর নাই। সমস্তই অদৃষ্টের খেলা। আমার অদৃষ্ট আমি স্বামীকে সুখী করিতে করিতে পারিলাম না। তাঁহারও অদৃষ্ট তিনি আমাকে লইয়া সুখী হইতে পারিলেন না। তবে কি জান বাপ্, স্ত্রীজাতি স্বামীর সকল উৎপীড়ন হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু সতীত্বের অবমাননা সহ্য করিতে পারে না। দুর্ভাগ্য গোপীনাথ! আমার এতই মর্ম্মবেদনা যে, সন্তান তুমি, তোমারও কাছে আমি এই হীন কথার আলাপ করিতেছি। ইহার জন্য গুরুর কাছেও তিরস্কার খাইয়াছি। তুমি তাহা শুনিয়াছ।

"শুনিয়াছি। কিন্তু মা তোমার এত মর্ম্মবেদনা তখনও বুঝিতে পারি নাই! আমি জানিতাম তোমার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমাগুণবশে পিতার এ কথা অগ্রাহ্য করিয়াছি।"

"মর্ম্মবেদনার কথা কি বলিব গোপীনাথ, যাহা মনে করিতেও পাপ, আমি সেই কার্য্য করিতেও ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তোমার পিতা রুগ্ন না হইলে, বোধ হয় আমি আত্মহত্যা করিতাম। অন্তর্য্যামী গুরুও বুঝি তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই সে মহাপাপের কার্য্য হইতে আমি রক্ষা পাইয়াছি।" তবে মা দুঃখিনী কন্যার দুঃখ দূর করিয়াছেন, এ ঘরে বাস আমার উঠিয়াছে।"

"একান্তই মরিবে!"

"এই ত সমস্ত কথাই তোমাকে আগে বলিয়াছি বাপ্। মরিবার পূর্ব্বে একবার গোপালকে দেখিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার অদৃষ্টে তা বুঝি আর হইল না। কাল রাত্রে আমার মুখে রক্ত উঠিয়াছে। সেই জন্যই তোমাকে ববাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছি। ইচ্ছা, মৃত্যুর পূর্ব্বে বৌমাকে দু'টা উপদেশ দিয়া যাইব। দামোদরের কৃপায় যদি সদ্বংশের কন্যা বধূরূপে ঘরে আসে, তাহা হইলে তাহার দ্বারা আবার হারাণো ধর্ম্ম সেই সঙ্গে ফিরিয়া আসিতে পারে।"

"তুমি এ ঘর ছাড়িলে, আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গে এ ঘর পরিত্যাগ করিব।"

"আমার মনে হয়, তুমি না ছাড়িতে ইচ্ছা করিলেও তোমাকে বাধ্য হইয়া ছাড়িতে হইবে।"

"তুমি কি ঠিক বুঝিয়াছ, পিতা তোমার অবর্ত্তমানে আবার বিবাহ করিবেন?"

"ঠিক বলিতে পারি না। তবে আমার তাই মনে হয়। ঐশ্বর্য্যে

অতি কম লোকেই মাথা ঠিক রাখিতে পারে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ধন দ্বারা যত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এত আর কোনও জাতি হয় না। আমার গুরু বলেন, গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী অর্থসঞ্চয়ই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। তার অধিক সঞ্চয় করিতে গেলেই ব্রাহ্মণত্বের হানি হয়। যাহা অধিক হইবে ব্রাহ্মণ তখনই তাহার সদ্ব্যয় করিবে। ইহাই হইতেছে ব্রাহ্মণ গৃহস্থের ধর্ম্ম। ইহা আমি নিজের চক্ষেই দেখিতেছি। উদাহরণ খুঁজিবার জন্য আমাকে দূরে যাইতে হয় নাই। আমি আমার শ্বশুরকে দেখিয়াছি, খুড়শ্বশুরকেও দেখিতেছি। হায়, আমার স্বামীও কি এইরূপ ছিলেন! গোপীনাথ, কি মানুষ আজ কি হইয়াছে! আমার দরিদ্র স্বামীর গর্ব্বে একদিন আমি আমাকে বিশ্বেশ্বরী মনে করিয়াছিলাম। আর আজ আমি সেই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বসিয়া কাঙ্গালিনী হইয়াছি।" দুর্ব্বলতায় তিনি ভূমিতে শুইয়া পড়িলেন।

আমি মাকে অধিকক্ষণ ঐ প্রশ্নে উত্যক্ত করিতে ইচ্ছা করিলাম না। মায়ের পদধূলি লইতে লইতে কেবলমাত্র একবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মা, একটীবার বল, গোপালকে অন্ততঃ একটী দিনের জন্যও তোমার কাছে লইয়া আসি।"

মা বলিলেন,—"প্রয়োজন নাই। তুমি তাহাকে আনিবার জন্য যাহা যাহা করিয়াছি, তাহা আমি ডাক্তারবাবুর কাছে শুনিয়াছি। দামোদর ইচ্ছা না করিলে কেহ কিছু করিতে পারিবে না। তাঁহার ইচ্ছা হয়, আমার মরণের পূর্ব্বে গোপাল আপনিই আসিয়া দেখা দিবে। তাহাকে আনিবার আর স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন নাই।"

সমস্ত অপরাধের ক্ষমা লইয়া আমি তখনকার মত মায়ের কাছ হইতে বিদায় হইলাম। মা আবার আমার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন? এবং সেই সঙ্গে বিবাহের কথাটা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মায়ের

প্রস্থানান্তে পিতার সঙ্গে আমার যাহা যাহা কথা হইয়াছিল, সমস্তই তাঁহাকে বলিলাম। মা বলিলেন—"তাঁহার কার্য্যে আর অসম্মতি প্রকাশ করিও না। তাহার প্রতি ভক্তি অটুট রাখ, সকল বাধা কাটিয়া যাইবে। ভবিষ্যতে তোমার ভালই হইবে।"

ভৌতিককীর্ত্তি।

আমাদের পরম পূজনীয় প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত ধ্রুবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "অলৌকিক রহস্যের" গল্পাদির আলোচনা-প্রসঙ্গে কয়েকটী গল্প বলেন। তিনি বলেন "পূর্ব্বে ভূতের কত গল্প শুনিয়াছি বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ না দেখায় কোনটাতেই বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারি নাই। কিন্তু দিবালোকে যাহা চক্ষের উপর ঘটিতে দেখিলাম, তাহা আর কেমন করিয়া উড়াইব? সন্ধান লইয়া আপনারাও নিঃসন্দিগ্ধ হইতে পারেন।" তাঁহার মুখে যেরূপ শুনিয়াছি. তাহারই কথায় তাহাই নিম্নে বিবৃত করিলাম।

"বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বৈঁচী ষ্টেশনের ৩ ক্রোশ দূরে গোপালদাসপুর নামে একটি গ্রামে আমি প্রথমে বিবাহ করি। ৭।৮ বৎসর হইল, আমি শ্বশুরবাটী গিয়াছিলাম। আমার তথায় পৌঁছিবার পরদিন প্রাতে একটী বালিকা আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিল, শুনেছেন জামাইবাবু, রাত্রে বঙ্ক গোঁসাইর বাটীতে চোর আসিয়াছিল। আমি হাসিয়া বলিলাম সে আর বিচিত্র কি? আমি আসিয়াছি বলিয়া নাকি? বালিকা হাসিয়া বলিল—না তা নয়। ঘরের দ্বার বন্ধ অথচ থালা, ঘটী বাহিরে ছড়াইয়াছে, লয় নাই। আমি বলিলাম, এইটুকু বিচিত্র বটে।

ইতিমধ্যে আর একটী বালিকা ছুটিয়া আসিয়া বলিল—জামাইবাবু মজার কথা শুনেছেন? বঙ্ক গোঁসাইর স্ত্রীকে ভূতে পেয়েছে। চলুন দেখে আসি। বালিকার মুখে শুনিয়া সত্য সত্যই আমরা ২।৩ জনে তাহাদের বাটীতে গেলাম। দেখিলাম পাড়ার আরও অনেকে উপস্থিত। গোঁসাইর স্ত্রী স্নান করিয়া আসিতেছিলেন, সঙ্গে বঙ্কের ভগিনীও ছিলেন, এমন সময়ে স্ত্রীর মস্তকের উপর হইতে যেন কে বিষ্ঠা ফেলিয়া দিল। ২।৩ জনে সঙ্গে করিয়া পুনরায় স্নান করাইয়া আনিতেছেন।

স্ত্রীটীর বয়স ২২।২৩ বৎসর। বাটীতে বঙ্কের বিধবা ভগিনী ভিন্ন আর লোক নাই। দুইটী বিধবা যুবতী এক বাড়ীতে থাকে। এ অবস্থায় কোন দুষ্টপ্রকৃতি লোক এরূপ করিয়া থাকিবে, এই বিশ্বাসে বড় বেশী কিছু বলিতে পারিলাম না। বঙ্কের মৃত্যু ২ মাস হইয়াছে, আর কোন দিন কিছু টের পায় নাই। হঠাৎ আজ এইরূপ দেখিয়া অনেকেই স্তম্ভিত হইলেন।

এরূপ উপদ্রব-মাঝে কিরূপে দুইটী যুবতী এক বাড়ীতে থাকিবে ভাবিয়া অপরাহ্নে সকলে, অন্য বাড়ীতে উহাদিগকে রাখিবার পরামর্শ করিলেন। স্ত্রীটীকে অন্যান্য কয়টী স্ত্রীলোকের মধ্যে করিয়া আমরা কয়েক-জন পুরুষও সঙ্গে চলিলাম। একটী আম্রবৃক্ষের নীচে যেই উহারা গিয়াছে, অমনি বৃক্ষোপর হইতে যুবতীর মস্তকে বিষ্ঠা পড়িল। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। আমরা সঙ্গে করিয়া স্নান করাইয়া আনিলাম ও প্রতি-বাসী ব্রাহ্মণের এক ঘরে উঠাইয়া অন্য ঘরের বারান্দায় সকলে বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে মেয়েদের একজন চীৎকার করিয়া বলিল,—বউটীর মাথার কাপড় জ্বলিতেছে। আমরা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখি, সত্যই তাঁহার বস্ত্র জ্বলিতেছে। কিন্তু নিবাইয়া দেখা গেল, একটী চুলও পুড়ে নাই, অগ্নির অভিনয় হইল মাত্র।

এত লোকের মাঝে, রাত্রি না হইতেই এরূপ উৎপাত দেখিয়া প্রতিবাসী ব্রাহ্মণের ভয় হইল। তিনি স্থান দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। যুবতাদ্বয়ও বলিলেন,—"যখন সৰ্ব্বত্রই উপদ্রব, তখন নিজের বাড়ী অরক্ষিত ফেলিয়া লাভ কি? বাটীতে থাকাই ভাল।" তাহাই স্থির হইল। তাঁহারা বাটীতে গেলেন, সকলে যুবতীকে পরামর্শ দিলেন, পুনরায় কোন উপদ্রব হইলে যেন তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন ও কেনই বা এরূপ উপদ্রব করেন এবং কি করিলেই বা ক্ষান্ত দেন ত তাহাও যেন জিজ্ঞাসা করেন? বলা বাহুল্য, ভয়ে কোন পুরুষ আমাদের মধ্য হইতে সে বাটীতে, রাত্রিকালে থাকিতে সম্মত হইলেন না। উপদেশই সৰ্ব্বস্ব!

প্রাতে কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া আমরা অনেকে গোঁসাই বাটী হাজির হইলাম। জিজ্ঞাসায় জানিলাম—ভূতের উত্তর স্পষ্টই তাহারা শুনিয়াছে। সে অন্য কেহ নহে, বঙ্ক নিজেই ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। সে বলিয়াছে, "আমাকে এখনও চিনিতে পারিস্ নাই? আমি বঙ্ক। আমাকে যাহা দিতে চাহিয়াছিলি, দিস্ নাই। আমি মরিলে শয়ানে রোপিত তুলসী-পত্র আমার মাথায় দিয়াছিস্, তাহাতেই আমার অগতি হইয়াছে। মুখাগ্নি করিতে গিয়া আমার চক্ষে আগুণ দিয়াছিস্, চক্ষুর জ্বালায় আমি কষ্ট পাইতেছি। শ্রাদ্ধও অতি অশ্রদ্ধার সহিত করিয়াছিস্। আচ্ছা, আমি ইহার প্রতিফল না দিয়া ছাড়িতেছি না। ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছি।" ইত্যাদি।

সেদিন তাঁহার ভগিনী দুগ্ধ এক বাটী ভাল করিয়া জ্বাল দিয়া গৃহমধ্যে রাখিয়া কহিলেন,—"দাদা, ক্ষুধা পাইয়াছে, এই দুগ্ধ খাও, তাহা হইলে আমরা প্রাণে শান্তি পাইব।" এই বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহিরে বসিলেন। ইতিমধ্যে গৃহের ভিতরে "চড়াৎ" করিয়া বড় একটা শব্দ হইল। ঘরের মধ্যে যাইয়া দেখেন, বাটী হইতে সমস্ত দুধ মেজেতে পড়িতেছে।

তখন সকলে স্থির করিলেন,—উদ্ধার করাই কর্ত্তব্য। অদ্য পুনরায় উৎপাৎ আরম্ভ হইলে উহা বলিয়া শান্ত করিবে। রাত্রিতে যক্ষের স্ত্রী তাহাকে বলে,—"আপনার উদ্ধার জন্য শীঘ্রই গয়ায় যাইতেছি, আর উপদ্রব করিবেন না।" উত্তর হইল, "তোকে যাইতে দিলে ত যাবি।"

প্রতিবাসীরা উত্তর শুনিলেন, কিন্তু পিছাইলেন না। সকলে চেষ্টা করিয়া যুবতীকে গয়ায় পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন, এখানে সচরাচর মহিষের গাড়িতেই যাতায়াত করে। বৈঁচী যাইবার জন্য গাড়ী আনা হইল, রমণী সাজিয়া গুজিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন। গাড়ি চলে না। অনেক চেষ্টা করিয়াও শকট-চালক মহিষদ্বয়কে অগ্রসর করাইতে পারিল না। অগত্যা ভূতের কথায় সায় দিয়া সকলকে বিরত হইতে হইল। রমণী উৎকণ্ঠা লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। আমরাও নানা জল্পনা-কল্পনা লইয়া ঘরে ফিরিলাম। ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। আমি স্বয়ংই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

২।৩ দিন পরে কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলাম। পরে তথাকার বন্ধুকে লিখিয়া জানিলাম—কোথা হইতে একজন সাধু আসিয়া বাড়ী বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তদবধি বাটীর মধ্যে থাকিলে কোন অত্যাচার হয় না। কিন্তু উক্ত স্ত্রীলোকটী যেই বাটীর বাহির হয়, অমনি গাত্রে বিষ্ঠাদি নিক্ষিপ্ত হয়।"

ইচ্ছা করিলে কেহ ইহার সন্ধান লইতে পারিবেন বলিয়া নামাদি ঠিকরূপে প্রকাশিত করা হইল। ধ্রুব বাবুর কথিত, তাঁহার প্রত্যক্ষ আরও ২।৩টী গল্প ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ।

গোপালদাদার কথা।

(১)

গত মাসের অলৌকিক রহস্যে গোপালদাদার পরিচয় দিয়াছি; এবার একটী সত্য ঘটনার কথা পাঠকগণকে উপহার দিলাম :—

আমাদের দেশে বন্ধু রমেশের ভাল ছেলে বলিয়া বেশ খ্যাতি ছিল। লোকে বলিত রমেশ হীরার টুকরা, কারণ সে প্রবেশিকায় ও এফ্ এ পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিল। দেশের মধ্যে বন্ধুর মত ছেলে ছিল না। এফ্ এ পাশ হইবার পর বন্ধুর মাতা তাহার বিবাহ দিবার জন্য ঠিক করিলে, গ্রামের মাতব্বর লোকে বলিলেন, কর কি! ছেলেটার ভবিষ্যৎ মাটি হয়ে যাবে যে! এখন বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। ভবিতব্য কারও দাস নহে, সে কারও পরামর্শ শুনে না, কলের পুতুলের মত সে নিজ কর্ত্তব্যসাধন করে। তার গতিরোধ করা মানবের সাধ্যাতীত; যথাসময়ে বন্ধুবরের শুভোদ্বাহক্রিয়া-সম্পাদন হইয়া গেল। বিবাহের দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই বি-এ পরীক্ষায় রমেশ ফেল হইল। গ্রামের ঠাকুরদাদা রাখাল ভট্টাচার্য্য এই সংবাদে রহস্য করিয়া বলিলেন, 'এলের পরই ত রমেশের বিয়ে পাশ হয়ে গেছে, এ দ্বিতীয় পক্ষে নাকি সে ফেল হয়েছে?" বলা বাহুল্য, এই সব টীপ্পনীতে বন্ধু রমেশের হৃদয় বিদ্ধ হইল। সে বি-এ পাশ না করিলে দেশে ফিরিবে না, এইরূপ কৃতসঙ্কল্প হইল এবং তাহার পত্নী সুকুমারী নিজেকেই স্বামীর অকৃতকার্য্যতার হেতু ভাবিয়া অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিল!

(২)

রমেশ আর বাড়ী আসে না, সুকুমারীর কোন পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেয় না, সতীসাধ্বী সুকুমারীর প্রাণে ইহা শেলসম বিদ্ধ হইল। সমবয়স্কার

মধ্যে কেহ কেহ রঙ্গ করিয়া বলিত তাহার স্বামী অন্য রমণীতে অনুরক্ত, সরলা সুকুমারী তাহাতে অবিশ্বাস করিতে পারিত না। নিজের দেহের মধ্যে তুষানল সৃজন করিয়া মনকে পুড়াইয়া মারিত। অভিমানিনী শেষে এই যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিল। রমেশের কাছে টেলিগ্রাফ পৌঁছিল। সে যথাসময়ে দেশে ফিরিয়া আসিয়া আঁখিজলের বান ডাকাইল।

(৩)

সুকুমারীর মৃত্যুর পর হইতে রমেশের মনটা কেমন খারাপ হইয়া গেল। সে বাড়ী যাইতে ভয় পাইত, কিন্তু না যাইলেও নয়; কারণ এক বৎসরের শিশু-পুত্রকে দেখিবার জন্য তাহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিত। বলা বাহুল্য, রমেশের বৃদ্ধা জননীকেই এই শিশুর লালনপালনভার লইতে হইয়াছিল। এইস্থলে রমেশের সংসারের একটু বিশেষ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন বোধ করি। রমেশের দুই অগ্রজ ছিল। জ্যেষ্ঠের নাম উমেশ, মধ্যমের নাম যোগেশ, রমেশের সাংসারিক অবস্থা বেশ সচ্ছল। কোন কাজকর্ম্ম না করিলেও ভাত-কাপড়ের জন্য তাহাদিগকে চিন্তা করিতে হয় না। জ্যেষ্ঠ উমেশের কন্যার হৃদ্‌রোগ হইয়াছিল, তাই তিনি পত্নী পুত্র ও কন্যাকে লইয়া মধুপুরে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য গিয়াছিলেন এবং সুকুমারীর আত্মহত্যার একমাস পূর্ব্ব হইতে এখন অবধি সেইস্থানে অবস্থান করিতেছেন। বাড়ীতে উপস্থিত পরিবারের মধ্যে যোগেশ, যোগেশের স্ত্রী, তাহার মাতা ও দুইজন পরিচারক ও পরিচারিকা। একদিন গোধূলি সময়ে যোগেশের স্ত্রী অর্থাৎ রমেশের জ্যেষ্ঠ বৌদিদি তাঁহার কন্যার মাথার চুল বাঁধিতেছেন, এমন সময় লাল কস্তাপেড়ে সাড়ী পরিয়া, পায়ে আলতা পরিয়া, এক অনিন্দ্য সুন্দরী ষোড়শী যুবতী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

মেজ বৌদিদি আগন্তুককে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু রমণী হইলেও তাঁহার সাহস খুব বেশী রকম ছিল। তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ফিরে আবার কি মনে করে এসেছিস্? দড়াদড়ী বেঁধে এখানকার শিকল ছিঁড়িলি, আবার কি মনে করে মায়া বাড়াতে এসেছিস্? নূতন মতলব কিছু আছে নাকি?"

আগন্তুক রমণী খুব বিনয় নম্র বচনে ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "দিদি আমায় মাপ কর। গ্রহের ফের না থাক্‌লে মানুষের সাধ্য কি যে সে দেহত্যাগ করতে পারে? আমি তোমাদের কোনও অনিষ্ট করতে আসি নাই—একবার পুত্রকে (তাহার পুত্র) আর ওঁকে দেখবার জন্য প্রাণটা বড় ব্যাকুল হয়েছে, সেইজন্য ছুটে এসেছি।"

"বটে তোর এত মায়া! তা তুই এক কাজ কর। ছোট ঠাকুরপোর শোবার ঘরে গিয়ে দেখ্‌গে যা, বোধ হয় সেইখানেই শুয়ে আছে।"

"না দিদি তিনি ওখানে নাই, আমি তাঁকে দেখে আসছি। তিনি বৈঠকখানায় তাস খেল্‌ছেন। তুমি দিদি তাঁকে একবার ডাকৃতে পাঠাও।"

"ও শ্যামীর মা ও শ্যামীর মা একবার ছোট ঠাকুরপোকে ডেকে আন্‌গে বাছা।"

মেজ বৌদিদি এইরূপ আজ্ঞা দিলে শ্যামীর মা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে চলিল। বলা বাহুল্য, শ্যামীর মা পরলোকগত ছোট বৌকে দেখে নাই বা দেখিতে পায় নাই এবং মেজ বৌদিদিও তাহার আগমনবার্ত্তা তাহাকে জ্ঞাপন করে নাই যতক্ষণ শ্যামীর মা বন্ধুকে ডাকিতে গেল এবং ফিরিয়া না আসিল, ততক্ষণ মেজ বৌদিদির কাছ হইতে একটু তফাতে গিয়া সে পথপানে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

যখন দেখিল শ্যামীর মা একাকিনী ফিরিতেছে, তখন সে মেজ বৌদিদির নিকট গিয়া বিমর্ষভাবে বলিল—"কই তিনি ত এলেন না!" মেজ বৌদিদি

বলিলেন—"তুই আর একদিন এসে দেখা করিস!" অতি কাতরভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগের সহিত 'তাই হবে'—এই বলিয়া বন্ধু-পত্নীর মুক্ত আত্মা হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া গেল, মেজ বৌদিদি এ সংবাদ যথাসময়ে তাঁহার শ্বাশুড়ীর গোচরে আনিয়াছিলেন। বৃদ্ধা ভীতা হন নাই, কাঁদিয়াছিলেন মাত্র।

মধুপুরে একখানি নির্জ্জন কক্ষে ভবেশের পত্নী তাঁহার কন্যাকে বাতাস করিতেছিলেন, কন্যা তন্দ্রাভিভূত হইয়াছিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। বন্ধুর বড় বৌদিদি (উমেশের পত্নী) গৃহমধ্যে একটা শব্দ শুনিতে পাইল, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, গৃহমধ্যে কে যেন প্রবেশ করিয়াছে, তাহার কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ হইতেছে। ল্যাম্পের আলোটা ভাল করিয়া বাড়াইয়া দিয়া বড় বৌদিদি দেখিলেন, গৃহের কোনে ঘোমটা দিয়া একটী রমণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পরিধানে লালপেড়ে সাড়ী। কি জানি কি একটা অজানিত আশঙ্কায় তাঁর প্রাণটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। তিনি গম্ভীর অথচ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঘরে কে?" অবগুণ্ঠনাবৃত রমণী তখন কাঁদিতে লাগিল বলিয়া বোধ হইল। দয়ার্দ্রচিত্ত বড় বৌদিদি কন্যার শয্যাত্যাগ করিয়া রমণীর নিকট আসিল। রমণী তখন হাতছানি দিয়া বড় বৌদিদিকে ঘরের বাহিরে ডাকিয়া আনিল এবং একটু অপেক্ষাকৃত নিভৃত স্থানে বসিয়া বলিল, 'দিদি আমাকে কি চিন্তে পাচ্ছ না?'

'ওমা কে? কে ছোট বৌ?' এই বলিয়া ভয়ে বড় বৌদিদির কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল!

"হ্যাঁ দিদি আমি। আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ কেন! এমন দিন গেছে যখন খেতে খেতে আদর ক'রে মুখের গ্রাস আমার মুখে তুলে দিয়েছ! এমন ভালবাসার সামগ্রী আমি আমাকে দেখে ভয় কি দিদি! ঈশ্বরের দিব্য আমি তোমাদের ইষ্ট বই অনিষ্ট করতে আসিনি!"

সুকুমারীর কথায় বড় বৌদিদি একটু আশ্বস্ত হইয়া অতি কষ্টে বলিলেন, "তুমি গেছ কেন আবার এসেছ!"

"তোমার এই তিনটী কথার জবাব দিতেই আমি আজ এসেছি। সংসার থেকে এসেছি গ্রহের ফেরে। যে বাড়ীতে আমরা বাস করি এবং তোমরা এখন কিনতে যাচ্ছ, ওটা হানা বাড়ী; তাই নিষেধ করতে এসেছি বাড়ীখানা কিনো না। ঐ বাড়ীতে অনেক প্রেতাত্মা আছে তাহারাই প্রলোভন দেখাইয়া আমাকে আত্মহত্যা করিয়েছে। দেহত্যাগ করবার পর তাদের চাতুরী বেশ বুঝতে পারছি। ছেলের উপর, স্বামীর উপর তোমাদের উপর মায়া এখন কাটিয়ে উঠতে পারি নাই। তাই তোমাকে বলতে এসেছি এখানে থাকলে সুশীলা (বড় বৌদিদির পীড়িত কন্যা) আরোগ্য হবে না, ওকে নিয়ে আমাদের দেশের বাটীতে গিয়ে যদি এই ঔষধটী সাহস করে খাওয়াতে পার, তাহা হলে সদ্য সদ্য ফল পাবে।" এই বলিয়া সুকুমারী বড় বৌদিদির হাতে একটা শিকড়ের মত কি একটা দিল এবং কোনও উত্তরের আশা না করিয়া চলিয়া গেল।

বড় বৌদিদি এই প্রেতাত্মার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া সেস্থানে পড়িয়াছিল। পরে উমেশ বাড়ী আসিয়া পত্নীকে সেস্থানে দেখিতে পায় এবং মুখে জলসিঞ্চন করিয়া তাহার সংজ্ঞা সম্পাদন করে। যথাসময়ে বড় বৌদিদি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা উমেশকে জ্ঞাপন করে এবং উভয়ে পরামর্শ করিয়া প্রেতাত্মার চিকিৎসায় নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, শত শত মুদ্রা ব্যয় করিয়াও তাঁহার রোগের কোনও উপশম করিতে পারিলেন না, প্রেতাত্মা-প্রদত্ত ঔষধে তাহা হইল। সুশীলা সে যাত্রা রক্ষা পাইল!

বন্ধু রমেশের রাত্রি ১টা-২টা পর্য্যন্ত পাঠ করা অভ্যাস আছে। বাড়ীতে আসিয়াও তাহার সে বিষয়ে বিশ্রাম বা আলস্য আসে না। পল্লীগ্রামে

সর্ব্বসময়ে বিশেষ বর্ষাকালে বড়ই মশকের দৌরাত্ম্য হয়। সেইজন্য মশারি খাটাইয়া, শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রমেশ গ্রন্থাদিপাঠে নিমগ্ন থাকে, অবশ্য মশারির নিকটে এক জুয়েল ল্যাম্প জ্বলে। মেজবৌদিদির নিকট পত্নী সুকুমারীর আনুপূর্ব্বিক কথা শ্রবণ করিয়া অবধি রমেশ তাহার মামাত ভাই নরেনকে সেই ঘরে একটী স্বতন্ত্র বিছানায় শয়ন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন, ঘরে আর একেলা শয়ন করিতে সাহস করিত না। ভয় হইত যদি নিদ্রিত অবস্থায় সুকুমারী তাহার গলা টিপিয়া মারে। এ আশঙ্কার হেতুও ছিল। রমেশ জানিত এবং সকলেই জানে যে রমেশকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াই অভিমানিনী আত্মহত্যা করে।

একদিন হঠাৎ কি একটু শব্দে রমেশের দৃষ্টি পুস্তক হইতে কক্ষের দ্বারে আকৃষ্ট হইল। সে দেখিল, একটি অবগুণ্ঠনবতী রমণী। বৌদিদিদের মুখে সে যেরূপ তাহার পত্নীর প্রেতাত্মার পরিধেয় বস্ত্রাদির বর্ণনা শুনিয়াছিল, ইহা তাহার সহিত অবিকল মিলিয়া গেল! ভয়ে রমেশ "নরেন, নরেন" বলিয়া তাহার ভাইকে ডাকিতে লাগিল।

ইহাতে রমণী বিরক্ত হইয়া ভ্রূকুটি করিয়া কহিল—"ন্যাকামী দেখে আর বাঁচিনে, কাছে স্ত্রী এসেছে দুটো কথা কইতে, উপযুক্ত ভাইকে ডেকে তাকে তাড়াইবার চেষ্টা হচ্ছে। নরেন উঠ্‌লে ওর সামনে কি তোমার সঙ্গে কথা কইব?" পত্নীর প্রেতাত্মার মুখে মানুষের মত কথা শুনিয়া, রমেশ কতকটা আশ্বস্ত হইল, বলিল—"তুমি!" "হ্যাঁ গো আমি, তোমাকে আর ছেলেকে দেখ্‌তে এসেছি!" এই বলিয়া সুকুমারী শয্যার উপর উপবেশন করিল! এইরূপে প্রত্যহ রাত্রিতে সুকুমারীর প্রেতাত্মা তাহার নিকট আসিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, রমেশ একেবারে ভয়মুক্ত হইয়াছিল এবং পত্নীর জীবিতাবস্থায় তাহার সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা কহিত, এখনও ঠিক সেইরূপ কহিতে

লাগিল। অনেক বিষয়ে সুকুমারীর প্রেতাত্মার নিকট বন্ধু উপকৃত হইয়াছিল।

একদিন সুকুমারী আসিয়া বলিল—'বড় কষ্ট, বড় কষ্ট।" রমেশ অনেকবার জিজ্ঞাসা করিল, তাহার কষ্ট কিসের এবং তাহার দ্বারা উহার অপনোদন হইতে পারে কি না। কোনও উত্তর না দিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সুকুমারীর প্রেতাত্মা প্রস্থান করিল। সেই তাহার শেষ প্রস্থান। তদবধি অনেক চেষ্টা করিয়াও রমেশ তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

পরে রমেশ তাহার পত্নীর আত্মার সদগতির জন্য গয়াধামে প্রেতশিলায় পিণ্ডদান করিয়াছিল এবং তাহার আত্মার প্রীত্যর্থ ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব ও অতিথিভোজন করাইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

মৃতের মায়া।

প্রায় দুই বৎসর গত হইল, আমার স্ত্রী কয়েকটী পুত্র কন্যা রাখিয়া পরলোকগতা হয়েন। সর্ব্ব কনিষ্ঠা দুইটী জমজ কন্যা, প্রায় দুই বৎসর বয়স্ক ছিল। তাহারা অত্যন্ত শিশু ছিল বলিয়া ২।৩ সপ্তাহ মধ্যেই তাহাদের গর্ভধারিণীকে বিস্মৃত হইয়াছিল। তদবধি এ পর্য্যন্ত আর কখন তাহাদের মাতৃস্মরণের কোন আভাষ দেখা যায় নাই। সংসারে অপরাপর স্ত্রীলোক-গণ দ্বারা আদরে প্রতিপালিতা হইয়া উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধিসহ পূর্ণস্বাস্থ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ তন্মধ্যে একটীর নাম "সরযূ" থাকিলেও, যদু নামক কোন লো॰ সহিত চেহারার সাদৃশ্য থাকাতে সকলে তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া "যদু" বলিয়া ডাকিত। সেই যদু আমার মাতা-

ঠাকুরাণী অর্থাৎ তাহার ঠাকুরমার বড়ই অনুগতা ও আদরণীয়া হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিত এবং আহার-শয়নাদিও তাঁহার সঙ্গেই হইত। বিপত্নীকাবস্থায় শিশু পুত্রগণ লইয়া সর্ব্বদা নিজে বিব্রত হইলেও উক্ত কন্যাটীর ভার মাতাঠাকুরাণী লওয়ায় আমার ক্লেশের কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছিল। মাতাঠাকুরাণীও যখন কলিকাতায় বা যেখানেই অবস্থান করিতেন, সেই কন্যাটীও সর্ব্বত্র তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

পত্নী-বিয়োগান্তে এতাবৎ আমার স্বপ্নাবস্থায় যেন কয়েকবার তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছি এবং তাহা যেরূপভাবে বা যাহা ঘটিয়াছে তাহা বিচ্ছিন্ন-ভাবে সামান্যরূপে স্মরণ থাকিলেও খুব ভালরূপ আনুপূর্ব্বিক স্মরণ করিতে পারি না। যাহা হউক, সে সমস্তের আলোচনা এখানে প্রয়োজন নাই। সম্ভব হয় তো পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল।

বিগত ৬ই আষাঢ় অম্বুবাচীর পূর্ব্ব দিবস অপরাহ্নে আমার মাতা-ঠাকুরাণীর কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় যান। আমার দুরদৃষ্টবশতঃ সেইদিন প্রাতঃকালে কোন সামান্য সাংসারিক কার্য্যোপলক্ষে মাতা-ঠাকুরাণীর সহিত কথান্তর হওয়ায় তিনি আমার উপর একপ্রকার রাগ করিয়াই কলিকাতায় আমার এক ভ্রাতার বাসায় যান এবং সে কারণে অথবা যে জন্যই হউক অন্যান্য বারের ন্যায় এবার আর তাঁহার সঙ্গে যদুকে লইয়া যান নাই। আমিও সে সম্বন্ধে প্রকাশ্যতঃ উপেক্ষা করিলেও বস্তুতঃই আরও কিছু ভারাক্রান্ত ও বিব্রত বোধ করিলাম। মাতৃহারা কন্যাটীও তাহার ততোধিকা স্নেহময়ী ঠাকুরমাতার অভাবে বড়ই ম্রিয়মানা হইয়া পড়িল। সমস্ত দিবস ও রাত্রি পর্য্যন্তও ভালরূপে আহার বিহারাদি করে নাই; কেবল কাঁদ-কাঁদ ভাবে বায়না করিয়াছে। রাত্রিতে আমারই শয়নগৃহে অন্যান্য পুত্রকন্যাগণ সহ শয়ন করে কিন্তু সকলে নিদ্রিত হইলেও সে একটীবারও চক্ষু মুদ্রিত করে নাই ও অনবরতঃ কাঁদিয়া অপর

ভ্রাতাভগ্নীদের জাগাইতে লাগিল এবং আমারও নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইতে লাগিল। অবশেষে রাত্রি ১॥০ কি ২টা আন্দাজ সময়ে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে একটা চড় মারিলাম ও নানারূপ ভয়প্রদর্শনদ্বারা ধম্‌কাইলে গুম্‌রিয়া কাঁদিয়া শেষে নিদ্রিতা হইল। আমিও অতঃপর সম্ভবতঃ নিদ্রিত হইলাম।

ঠিক ভোরের সময় দেখি আমার স্বর্গীয়া সহধর্ম্মিণী আসিয়া বলিতেছেন, "যুগপৎ দুইটী ক্ষুদ্র শিশু পর্য্যবেক্ষণ করা অত্যন্ত কষ্টকর ; বিশেষতঃ পুরুষদিগের পক্ষে একেবারে অসাধ্য ; তবে মা একটীকে রক্ষণাবেক্ষণ করায় আমি নিশ্চিন্তা ছিলাম, তিনিও তাহাকে ফেলিয়া গেলেন এবং তুমিও উহাকে লইয়া যারপরনাই বিরক্ত হইতেছ—বিনা দোষে প্রহারও করিলে ; অতএব সকলেরই সুবিধার্থ আমি ইহাকে লইয়া যাই।" আমি বলিলাম, "তদপেক্ষা কি তুমি ঐ অবস্থায় এখানে কোন প্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান ও আদর-যত্ন করিতে পার না ?" তাহাতে বোধ হইল যেন একটু শ্লেষাত্মক হাস্য করিয়া তিনি অদৃশ্যা হইলেন। আমি চমকিয়া উঠিয়া দেখিলাম, প্রভাত হইয়াছে। মনও খুব খারাপ হইল। এই অবস্থায় বাহিরে আসিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি ও প্রাত্যাহিক কার্য্যাদি শেষ করিলাম। যথাসময়ে স্নানাহার-সমাপনান্তে মধ্যাহ্নে আমার সমস্ত পুত্রকন্যাগণসহ বাহিরের ঘরে অভ্যাসমত খবরের কাগজ লইয়া শয়ন করিলাম। তাহারা খানিক বালসুলভ ঝগড়া গোলমাল করতঃ ঘুমাইয়া পড়িল। আমারও কাগজ ফেলিয়া সবে মাত্র তন্দ্রাবেশ হইয়াছে, দেখি, সেই পূর্ব্বরাত্রির মত বেশে ও ভাবে পত্নী আমার আসিয়াছেন ও উক্ত কন্যার কতকগুলি অভাব অভিযোগ ও অযত্নের বিশেষতঃ সেইদিনকারই কতকগুলি যত্নের মারাত্মক ত্রুটী উল্লেখে (যাহা আমিও জানিতাম না) তাহাকে তৎসকাশে লইবার বিশেষ আগ্রহ করিতে লাগিলেন ও আমার অনুমোদন যাচ্ঞা করিলেন। আমিও

পূর্ব্বরাত্রের মত তাঁহার কাছে প্রার্থনা করায় সেইরূপই যেন অসম্ভব বলিয়া অদৃশ্য হইলেন।

ক্ষণপরে আমার উক্ত কন্যাটীর বমি করার শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি,—বিছানায় বমি করিয়াছে। গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম খুব জ্বর হইয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ এবং যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দও করিতেছে। ইহাতে আমার অত্যন্ত ভয় হইল। যথাসাধ্য ঔষধাদির ব্যবস্থাসহ সমস্ত দিবস ও রাত্রি সেবাশুশ্রূষা চলিতে লাগিল। জ্বরের উপসর্গ অন্য কিছুই ছিল না, কেবল কিছুমাত্র গলাধঃকরণ করাইতে পারা যাইত না। এক চামচ মাত্র সাগু কি দুগ্ধ খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ তাহার চতুর্গুণ পরিমাণ অত্যন্ত কষ্টের সহিত বমি করিয়া ফেলিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি এইরূপে কাটিয় গেল। রাত্রিমধ্যে আমি এক একবার অন্যত্র একটু শয়ন করিবামাত্র সেইরূপই যেন আমার স্ত্রী আসিতে লাগিলেন ও ঐরূপ ভাবেই তাঁহার কন্যাকে লইবার সনির্ব্বন্ধ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমিও অবশ্য কিছুতেই তাহার অনুমোদন করিতে পারি নাই, বলা বাহুল্য।

পর দিবস প্রাতে কন্যাটী অপেক্ষাকৃত সুস্থবোধ হওয়ায় আমিও আশান্বিত হইলাম। এমন কি আমাদের প্রাতঃকালীন চা খাইবার সময় কন্যাটী ইচ্ছাসহকারে আমার কোলে বসিয়া প্রায় আধ পেয়ালা চা খাইতে পারিল। দু'এক খানা জেম্‌বিস্কুটও খাইল; অথচ পূর্ব্বের ন্যায় বমি করিল না দেখিয়া যারপরনাই আহ্লাদিত হইলাম। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম ও কন্যার মাতা আমার কথা রাখিয়াছেন ভাবিয়া উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম।

মধ্যাহ্নে স্নানাহারের পর শুনিলাম ঔষধ সময়মত খাওয়ান হইয়াছে এবং অল্প দুগ্ধপানান্তে আর বমি না করিয়া বেশ ঘুমাইতেছে। আমিও আর ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেখিবার আবশ্যক নাই ভাবিয়া প্রত্যাবর্ত্তন-

অভিপ্রায়ে সবেমাত্র ফিরিয়াছি, হঠাৎ কে যেন পশ্চাতে "দেখে গেলে না" বলিয়া উঠিল। ফিরিয়া কাহাকেও দেখিলাম না বা স্বর কোথা হইতে আসিতেছে বুঝিতে পারিলাম না। কাজেই শঙ্কিতমনে যথারীতি বহির্বাটীতে যাইয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিলাম। কয়েক দণ্ড পরে সবেমাত্র তন্দ্রাবেশ হইয়াছে, দেখি,—সেই প্রিয়ামূর্ত্তি সম্মুখে দণ্ডায়মানা! অধিকন্তু ক্রোড়ে আবার একটী কে? হঠাৎ বিস্ফারিতচক্ষে দেখিলাম—সেই পীড়িতা যদু। আমি একেবারে রোমাঞ্চিতকলেবরে স্পন্দিতহৃদয়ে উঠিয়া বসিলাম। বোধ হয় যেন ধরিয়া ফেলিতে বাসনা ছিল, কিন্তু উঠিয়া তো কাহাকে বা কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে বসিয়া আছি, ৪।৫ মিনিটের বেশী হইবে না—আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা ব্যস্তত্রস্ত ভাবে বাটীর ভিতর হইতে ডাকিল। আমিও কম্পিতকলেবরে ছুটিয়া গিয়া দেখি—কন্যা আমার মুমূর্ষু অবস্থায় একটী স্ত্রীলোকের ক্রোড়ে শয়ানা। দৃষ্টি স্থির, ডাকিলে সাড়া নাই, নিশ্বাস দ্রুত। নাড়ী দেখিলাম ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ। বলকারক ঔষধ খাওয়াইতে চেষ্টা করিলাম। দাঁতি লাগায় সম্ভবতঃ একটুও গলাধঃ করাইতে পারিলাম না। যেন চতুর্দ্দিকে কোন অশরীরীর গতিবিধি অনুভূত হইতে লাগিল। মনে মনে কাঁদিয়া বলিলাম—"তুমিই শেষে এই করিলে?" অন্যের অশ্রুতভাবে যেন কর্ণে ধ্বনিত হইল, "আমি বলিয়াই তো করিলাম।" তখন সবই বুঝিলাম—ইষ্টবীজমন্ত্রসহ "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" কন্যাটীর কাণে বলিলাম। বুকে তুলসী, মুখে গঙ্গাজল দিলাম। তারপর অনেক দিন বিচ্ছেদের পর কন্যা আবার মাতৃক্রোড়ে স্থান পাইল! আমারও ইহজন্মের মত সেই কন্যা দর্শন ফুরাইল!

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মৈত্র।

স্বপ্নাদিষ্ট দেবতার আগমন।

(প্রত্যক্ষ সত্য ঘটনা)

অলৌকিক রহস্যের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই শুনে থাকিবেন যে, স্বপ্নে দর্শন দিয়া অনেক দেবতা অনেক ভদ্রলোকের বাটীতে অলৌকিক উপায়ে আগমন করিয়া, সেই বংশের উন্নতি-সাধন করেছেন। সম্প্রতি আমাদের বাটীতে সেইরূপ স্বপ্নে দর্শন দিয়া একটি সুন্দর মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা মূর্ত্তি আগমন করিয়াছেন। গত মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্ব দিবস আমি স্বপ্ন দর্শন করি যে, আমার ঠাকুর ঘরে চতুর্ভুজা একটি অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি পূজিতা হোচ্ছেন ; আমিও সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আনন্দে পুলকিত হোচ্চি ও মার পদে পূজারী মহাশয় ভক্তিভরে পূজা দিচ্ছেন। স্বপ্ন দর্শন করিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ উপস্থিত হইল। অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইল ও আমি পূর্ব্ব রাত্রে দৃষ্ট স্বপ্নের কথা ভাবিতে লাগিলাম। স্নানান্তে আমি আমি ঠাকুর ঘরে গিয়া নিজ প্রতিষ্ঠিতা দেবীকে পূজা করিলাম। তারপর দিন আমাদের পুরাতন পুরোহিতটি হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদ শুনে মনটা বড়ই খারাপ হোল। তারপর দিন একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাদের বাটিতে পূজা কোর্‌তে এলেন। দু'দিন পূজা কোরে তিনি আবার নিজের দেশে গমন কোল্লেন। তাঁর দেশ মেদনীপুর জেলার অন্তর্গত কোলা গ্রামে। তাঁর দেশে যাবার দু'চার দিন পরে একরাত্রে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বপ্নে দর্শন কোল্লেন, "যেন একজন তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা দেবী, আমাদের বাটীর মধ্যে প্রবেশ কোরে বোলছেন, আমি লক্ষ্মী তোমাদের বাটীতে শীঘ্রই আস্‌ছি। আর তোমাদের কোনও প্রকার কষ্ট থাকিবে না, তোমার সংসারে খুব ভাল হবে। এই কথাগুলি

বোলেই সেই দেবীমূর্ত্তি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হোলেন। আমার ভ্রাতা বড় একটা এ সব বিষয়ে বিশ্বাস করেন না। তিনি এই স্বপ্নটী দর্শন কোরেই তারপর দিন আমাকে স্বপ্নদৃষ্ট সব ঘটনা বলিলেন। আমি বলিলাম যে, স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা প্রত্যক্ষ হোতে পারে, ভগবতীর লীলা কে বুঝতে পারে। তারপর দিন হঠাৎ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটী (যিনি দু'দিন আমার বাটীতে পূজা কোরেছিলেন) আমার কাছে এলেন এবং বোল্লেন, "বাবা! আপনার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ কথা আছে।" আমি বলিলাম, "কি কথা? আমাকে খুলে বলুন না।" তিনি বলিলেন, "আমি একটি বড়ই আশ্চর্য্য দেবীমূর্ত্তি আপনার জন্য পেয়েছি" আপনাদের বাড়ী থেকে পূজা কোরে দেশে আসবার একদিন পরে আমি রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম যে, একটি অপূর্ব্ব সিংহবাহিনী মূর্ত্তি আমার কাছে এসে বোলছেন যে "দ্যাখ্, আমি অমুক গ্রামে অমুক জায়গার মঠে আছি, আমাকে সেখান থেকে নিয়ে আয়, নিয়ে এসে কলিকাতার জ্যোতিবাবুর কাছে নিয়ে যা, আমি যাব।" আমি সেই স্বপ্ন দর্শন কোরেই, অতি প্রত্যুষেই স্নান কোরেই স্বপ্নদৃষ্ট স্থানে গমন ক'ল্লাম। সেই স্থানটি গড়মান্দারণের নিকটেই অবস্থিত ছিল। আমার বাড়ী থেকে (কোলাঘাট হইতে) সেই জায়গাটা প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বাড়ীর লোক কেহ জানিল না যে, আমি কোথায় গেলাম। সেখানে একটি মঠ ছিল। মঠের ভিতর গিয়া দেখি যে, আমার সম্মুখেই আমার স্বপ্নদৃষ্টা দেবীটি রয়েছেন। মঠের মোহন্ত আমাকে দেখেই আমার নিকটে এলেন ও আমাকে যথোচিত সম্মান দেখালেন। আমি তাঁকে বোল্লাম, মহাশয় আমাকে এই মূর্ত্তিটি প্রদান করুন। তিনি তৎক্ষণাৎ কোনও দ্বিরুক্তি না কোরে আমাকে সেই অমূল্য মূর্ত্তিটি প্রদান কোল্লেন। বোধ হয় তাঁর প্রতিও দেবীর কোনও আদেশ হোয়েছিল। আমি মূর্ত্তিখানি লইয়াই তৎক্ষণাৎ নিজের বাড়ীতে এলাম। আমার জ্যেষ্ঠপুত্রও পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্নে ঐ মূর্ত্তি দর্শন কোরেছিল, সে বোল্লে, "বাবা! আপনি কি কিছু দেবীমূর্ত্তি পেয়েছেন! আমি কাল রাত্রে স্বপ্ন দর্শন কোরেছি, যেন একটি চতুর্ভুজা দেবী আপনি এনেছেন ও তারপর তাঁকে আপনি কলিকাতার কোনও এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির ত্রিতলের গৃহে তাঁর পূজা কোচ্ছেন। মনে হোল যেন তিনি তাঁর বাড়ীতে গেলেন।"

আমি আমার ছেলেকে বলিলাম, "হাঁ বাবা! আমি মাকে পেয়েছি, তিনি শীঘ্রই তাঁর ভক্তের গৃহে গমন কোর্‌বেন।" এই কথাগুলি বলিয়া পুনরায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণটি আমাকে বলিলেন, "বাবা মাতো আপনার কাছে দয়া কোরে এসেছেন, আমার উপর আপনার নিকট নিয়ে আস্‌বার জন্য আদেশ কোরেছেন, আপনার অনুমতি লইবার জন্য আপনার নিকটে এসেছি। আপনি অনুমতি দিন, আমি মাকে নিয়ে আসি।"

আমি ও আমার ভ্রাতা পূর্ব্বেই স্বপ্নে মাতৃমূর্ত্তি দর্শন কোরেছে, সুতরাং কিঞ্চিৎ দ্বিরুক্তি না কোরেই তাঁকে মূর্ত্তিটি আনিবার জন্য অনুরোধ কোল্লাম। গত ১১ই ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার প্রাতে দেবীমূর্ত্তি আমার গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক আমাকে উদ্ধার কল্লেন। যা' স্বপ্নে দর্শন কোরেছিলাম, মূর্ত্তিটি অবিকল ঠিক সেইরূপ। চতুর্ভুজা, মহিষাসুরে একপদ ও সিংহপৃষ্ঠে একপদ দিয়া মা ভগবতী দাঁড়িয়ে আছেন। হস্তে শঙ্খ, চক্র ও শূল বিদ্যমান। বড় বড় পণ্ডিত পরীক্ষা কোরে বোলেছেন যে, মূর্ত্তিটি প্রায় ৩০০ বৎসরের পুরাতন। এ মূর্ত্তি বর্ত্তমান সময়ে দেখাই যায় না। কোন সাধকের প্রতিষ্ঠিতা খুব পুরাতন মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি অষ্টধাতুতে নির্ম্মিত। এমন অপূর্ব্ব, মনোহর মূর্ত্তি! যেন দেবী ভগবতী হাসিতেছেন।

গত ১৮ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ, শুক্রবারে আমি দেবী মূর্ত্তিটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।

অদ্ভুত উপায়ে দেবীর এইরূপ আবির্ভাবে আমাদের আত্মীয়েরা এবং অন্যান্য অনেকে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হোয়েছেন। ঐরূপ ঘটনা আমরা স্বচক্ষে দর্শন কোরেছি। যখনই দেবীর কৃপার বিষয় চিন্তা করি, তখনই মন আনন্দে অভিভূত হয়। মূর্ত্তিটি আমার পূজার গৃহেই অবস্থান কোর্‌ছেন। কোন মহাত্মা ইচ্ছা করিলেই অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে জানাইলে, আমি সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তাঁকে দর্শন করাব।

শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ সেন।